উৎসর্গ

তোমাকে

পাগল

হঠাৎ মনে পড়েছিল গহরজানকে।

বিয়ে হওয়ার আগে থেকে কত দিন হয়ে গেছে, যেন ভুলে গিয়েছিল গহরজানকে। হঠাৎ ভেসে উঠেছে স্মৃতির পটে, গহর আর গহরজানের কথাবার্ত্তা। কথা বলার আদব-কায়দা। দেখা হওয়ার শেষ-দিনে কত সোহাগ দেখিয়ে কথা বলেছিল গহরজান। কত হেসেছিল আর হাসিয়েছিল! আবার যাতে যায়, ভুলে যাতে না যায়, সে-জন্য কত ক'রে বলেছিল গহরজান। ঘুম থেকে জেগেই মনে পড়েছিল গহরজানকে। কা'কেও কিছু না ব'লে কাছারী থেকে টাকা নিয়ে কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে পড়েছিলেন দিনমানেই। আবদুল শুধু বলেছিল,—হুজুর, ভুলে যাও। যেও না।

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্য হুজুর দ্বিধা বোধ করেছিলেন। তবুও বলেছিলেন,—চল' চল', জরুরী কাজ আছে। আবদুল, কেউ যেন জানতে না পায়। শুধু তুমি জানো।

গহরজান দেখে প্রথমে কিছু বলেনি। বেশ কিছুক্ষণ মুখ ফিরিয়েছিল। রাগ ক'রে কথা বলেনি। গরজ গহরজানের, বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকলে কি হয় কে জানে। কথা বলেছিল গহরজান। হাসতে হাসতেই বলেছিল। নোটের গোছা পেয়েছে গহরজান। খাওয়া-দাওয়া আর আদর-আপ্যায়িতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। লেমোনেডের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে খাইয়েছিল বেশ দামী বিলেতী। এক-আধ গেলাশ হ'লেও কথা ছিল, পুরা পাঁচ পেগ ক্ষণেকে ক্ষণেকে।

আবদুল ধরাধরি ক'রে গাড়ীতে তুলেছে। নেশার ঝোঁকে আবদুলকে কি বলতে কি বলেছে! বাড়ীতে যখন পৌছেছে তখন যে দেখেছে বুঝেছে নেশাচ্ছন্ন অবস্থা। দেখে শিউরে উঠেছে কেউ কেউ।

ঘরে আসতেই রাজেশ্বরী আঁচলে মুখ ঢাকে।

কৃষ্ণকিশোর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অনন্তরাম শুইয়ে দেয়। অনন্তরাম পেছনে পেছনে এসেছিল। অনন্তরামকে বলে,—অনন্তদা, ক্ষমা কর' ভাই। অন্যায় করেছি।

—ঢের হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়' দেখি। অনন্তরাম বললে ধমকের সুরে। বললে,—ভুলে যেও না, বৌ—

ডুগরে ডুগরে কাঁদে রাজেশ্বরী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আঁচলে মুখ ঢেকে। এলোকেশী দেখে-শুনে চলে যায় সেখান থেকে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে।

বিনোদা শুধু সিঁড়ির তলার ঘরে গিয়ে হাসে আপন মনে। মনের সুখে হাসে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। একেক বার থামে, আক্রোশের ভঙ্গীতে বলে কত কথা ফিসফিসিয়ে। কথা থামিয়ে হাসতে থাকে। বলে,—মুখে বলতে হ'ল না। চোখেই দেখতে পেয়েছে!

অশান্তির ছায়া নামে বাড়ীতে। ডেকে-আনা অশান্তি।

নায়েবরা অনন্তরামকে বলেন,—পকেটে দেখ' দেখি টাকা-পয়সা কত আছে? বেরুবার সময় হাজার দুয়েক টাকা নিয়েছিলেন।

অনন্তরাম বললে আফসোসের সুরে,—বলতে হবে না আমাকে। দেখেছি আমি। একটা পয়সাও নেই। কথা বলতে বলতে খানিক চুপ ক'রে থাকে অনন্তরাম। বলে,—পায়ে ঢেলে দিয়ে এসেছে। দেখতে হবে না। কি করা যায় বলুন তো?

নায়েবরা কিছু বলেন না। সকলের চোখে আশাহীন দৃষ্টি। বয়োবৃদ্ধ

এক জন নায়েব বললেন,—আবদুলকে ডেকে ব'লে দেওয়া হোক, যখন তখন গাড়ী চাইলে যেন না দেওয়া হয়।

অনন্তরাম বললে,—আবদুল কি করবে! তাকে বললে যদি না যায়, কলকাতার শহরে গাড়ী পাওয়া যাবে না? কিন্তু যায়টা কোথায়?

নায়েবরা তৎক্ষণাৎ বলে,—হ্যাঁ, যাওয়া হয় কোথায়?

আবদুলকে ডাক পড়ে। জেরা করা হয় যেন তাকে। আবদুল ভয়ে শিউরে বলে,—হুজুরকে আমি বলেছি, যেও না হুজুর। ভুলে যাও। শাদি হয়েছে—

নেশার ঘোর ধীরে ধীরে যখন কাটে—তখন সন্ধ্যা উৎরে যায়।

রাজেশ্বরী বসেছিল পাশে। চোখ চাইতে রাজেশ্বরীকে দেখে মনে মনে লজ্জিত হয় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী তখনও কাঁদছে। চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে। চেয়ে আছে শূন্য-দৃষ্টিতে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় ছিলাম আমি?

রাজেশ্বরী কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে,—ঘুমিয়ে পড়'।

কৃষ্ণকিশোর উঠে বসে। ঘরে আলো জেলে দিয়ে যায় মশালচি। সাঁঝের আঁধার হয়েছে। মশা উড়ছে ভোঁ ভোঁ। ডাকছে ঝিঁঝি। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কে কথা কইছে বল' তো?

সত্যিই ঘরের বাইরে কে কথা বলছিল। জিজ্ঞেস করছিল,—বৌ কোথায়? ডাকো বৌকে।

বিনোদা ঘরের ভেতর আসে। বলে,—বটঠাকুমা এসেছে বৌকে দেখতে। ঘরে আসবে?

—বটঠাকুমা! বললে কৃষ্ণকিশোর। উঠে পড়ে বিছানা থেকে। বলে

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বটঠাকুমাকে। বললে,—কত কষ্ট ক'রে এসেছেন? ঘরে চলুন।

বটঠাকুমা। ফুলকুমারী। অশীতিপর বৃদ্ধা। ধনুকের মত শরীর তাঁর বেঁকে গেছে। হাসি-খুশীর মানুষ। বললেন,—বে'তে আসতে পারলাম না ভাই। কত অসুখ গেল।

বিনোদা বললে,—কেমন আছে এখন? শুনলুম যে, কে সাধু ওষুধ দিয়ে ভাল ক'রে দিয়েছে?

ফুলকুমারী কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—হ্যাঁ, হৃষিকেশ থেকে সাধুটি এসেছিলেন। কি টোটকা খাইয়ে ভাল করলে। এখন উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য্যি ভাল করলে বটে!

পূর্ণেন্দুকৃষ্ণ। বেঁচে উঠবেন ব'লে আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যাঁর? পূর্ণেন্দুকৃষ্ণ এখন বলছেন,—নেশা ত্যাগ করলুম আমি। কখনও ছোঁব না।

বটঠাকুমা ঘরে আসতেই রাজেশ্বরী প্রণাম করলে তাঁকে। ফুলকুমারী বললেন,—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যে দেখছি। বৌ করেছে বটে কুমু। কথা বলতে বলতে আঁচল থেকে খুললেন আশীর্ব্বাদী। বললেন,—আয় তো ভাই!

রাজেশ্বরী এগিয়ে আসে। ফুলকুমারী কপালে পরিয়ে দিলেন জড়োয়া টায়রা। ঝলমলিয়ে উঠলো টায়রাটা লণ্ঠনের আলোয়। ফুলকুমারী বললেন, —মা কাশীবাসী হয়েছে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—হ্যাঁ। বললাম কত, শুনলে না। এখন থেকে কাশীতে থাকবে।

কুমুদিনীর চলে যাওয়ার কারণটা জানতেন ফুলকুমারী। জানতেন ছেলে যে-কীর্ত্তি করেছে, কুমুদিনীর কাছে অসহ্য হয়েছে। আর কিছু বলেন না ফুলকুমারী। বলেন,—এখন আমি উঠি ভাই।

—না, না, এখন যাওয়া হবে না। বললে কৃষ্ণকিশোর।—কখনও তুমি আসো না। থাকো এখন।

—না ভাই। জপ-আহ্নিক আছে। কথা বলতে বলতে সত্যিই উঠে পড়লেন ফুলকুমারী। বললেন,—পাকীতে পৌছে দিক, বল কাউকে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চল', আমি তোমার হাত ধ'রে পৌছে দিচ্ছি।

—চলি ভাই। রাজেশ্বরীকে বললেন ফুলকুমারী।—স্থবিধে পেলে যেও। কাছেই তো থাকি।

রাজেশ্বরী সায় দেয় মাথা হেলিয়ে। ফুলকুমারী কাঁপতে কাঁপতে চলেন। কৃষ্ণকিশোর হাত ধ'রে নিয়ে যায়।

এলোকেশী আসে। বলে,—গা ধুতে যা। রাত হয়ে গেল যে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। টায়রাটা খুলে রেখে দেয় বিছানায়। হতাশ-চোখে চেয়ে থাকে। বলে,—কি হবে এলো?

কি বলবে ভেবে পায় না এলোকেশী। বলে,—কি হবে, কি বলবো বল। তুমি যদি—

কথা শেষ হয় না। কৃষ্ণকিশোর ফিরে আসে। এলোকেশী চুপ ক'রে যায়। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বটঠাকুমাকে দেখলে? দেখি কি দিলে?

—ঐ যে। ইশারায় দেখিয়ে দেয় রাজেশ্বরী। টায়রাটা তুলে দেখে কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী গা ধুতে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় যাচ্ছো?

কথায় জড়তা ফুটিয়ে রাজেশ্বরী যেতে যেতে বললে,—গা ধুতে।

কৃষ্ণকিশোর দেখে বোঝে যে, রাজেশ্বরী বোধ হয় বুঝেছে কিছু কিছু। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে। টায়রাটা দেখতে দেখতে কি মনে হয়। লুকিয়ে ফেলে কৃষ্ণকিশোর। রাখে এমন জায়গায় যে, কেউ দেখতে পাবে না। কি উদ্দেশ্যে রাখে কে জানে!

অনন্তরাম হঠাৎ কথা বললে,—আসব আমি ?

চমকে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কে, অনন্তদা ?

—হ্যাঁ। কাছারী থেকে ব'লে পাঠিয়েছে যে, টাকা দু'হাজারের খরচ লেখাবে না ? কি কি খরচ হয়েছে বলবে আমাকে ?

কথাগুলো শুনে মুখটা শুকিয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে। ভ্রু দু'টো কুঁচকে ওঠে। বলে কৃষ্ণকিশোর,—খরচা লেখাতে হবে না। বল' যে দিয়ে দিয়েছি, বিলিয়ে দিয়েছি।

হেসে ফেললে অনন্তরাম। বললে,—আমাকে কিছু দেওয়া হোক না। কা'কে দেওয়াটা হ'ল ?

—যাকে ইচ্ছে হয়েছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।—কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

অনন্তরাম বললে,—ছি, ছি, কৈফিয়ৎ দেবে তুমি ? তুমি এখন খোদ-কর্ত্তা হয়েছো। তবুও লেখা থাকলে কাছারীতে—

কথা শেষ করতে দেয় না অনন্তরামকে। বলে,—বলছি তো দিয়ে দিয়েছি।

হেসে ফেলে অনন্তরাম। শব্দহীন হাসি। হাসি দেখতে পায় না কৃষ্ণকিশোর। আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়েছে। পেছন থেকে কথা বলছিল অনন্তরাম। বললে,—তবে, হাজার হাজার টাকা যদি ঘড়িক ঘড়িক বিলিয়ে দিতে থাকো—

কথাটা শেষ করে না অনন্তরাম। খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। হাসে শব্দ-হীন হাসি। মনে মনে বলে,—তুমি বলবে না, আবদুল যে ব'লে দিয়েছে !

অনন্তরাম ফিরে তাকিয়ে দেখে রাজেশ্বরী। ফিস-ফিস ক'রে বলে,—বৌদিদি তুমি !

—খরচা পেলে অনন্ত ? শুধোয় রাজেশ্বরী।

—উঁহু। বললে অনন্তরাম। বললে তবে তো ! বললে যে, বিলিয়ে দিয়েছি।

রাজেশ্বরী বললে,—কি হবে অনন্ত? নেশা করছে কবে থেকে?

—বললে তবে তো! বলে কিছু? মা থাকতে। বলে অনন্তরাম। বলে,—আমি যাই। শুনতে পেলে—

রাজেশ্বরী ঘরে ঢুকে বললে,—কোথায় বেরিয়েছিলে?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বিশেষ কাজ ছিল। কাছারীর কাজে।

অনন্তরাম সোজা আস্তাবলে যায়। আবদুলকে ডাকে। বলে,—মিঞা, কে জোগাড় ক'রে দিলে বল' তো? কে যোগালে?

আবদুল সাদাসিদা মানুষ। রেখে-ঢেকে কথা কয় না। বলে,—ধরতে পারলে না অনন্ত? তুমি ধরতে পারলে না? বসির জোগাড় ক'রে দিয়েছে।

অনন্তরাম বললে,—তুমি দেখেছো জেনানাকে? উঁচু জাতের না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। আচ্ছা দেখতে আছে। বয়স ভি বেশ কমতি আছে। গরাণহাটাতে কোঠি লিয়ে আছে।

—গরাণহাটা? আড়ৎ যে আবদুল! বললে অনন্তরাম। বললে,—কি করা যায় বল' তো?

—আল্লা জানে। বললে আবদুল।—আমি কি বলবো? তুমি বল' না হুজুরকে। বুঝিয়ে বল' না। আমার তো মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

—বোঝালে বোঝে! বলে কি মাকেই তোয়াক্কা করলে না। অনন্তরাম বলে।—বেশী কিছু বললে, বলবে যে যাও হঠ যাও।

—ঠিক বাত আছে। ডর তো ঐ আছে। আবদুল বলে।

অনন্তরাম তবুও বলে,—কি করা যায় বল' তো? মেয়েটাকে গিয়ে বলবো আমি? বলবো যে—

হেসে ফেললে আবদুল। হাসতে হাসতে বললে,—কি হ'বে ব'লে? কুছ্ ফায়দা হবে না। শুনে হাসবে।

গহরজান তখন মাসীকে জড়িয়ে ধ'রে খুশীতে উপচে পড়ছে যেন। মুখে হাসির ঝিলিক তুলে বলছে,—মাসী, কইতে না কইতে টাকা! আমি ভাবি, ক'দিন হ'ল আসা-যাওয়া করলে, কৈ টাকা কৈ ফেলে!

নোটগুলো গুণছিল মাসী। বুড়ো আঙুলে থুথু মাখিয়ে গুণছিল। গুণতে গুণতে বললে,—ভাল ঘরের ছেলে। শুধু নেবে, দেবে না, হয় কখনও! দিলে তো দিলে দু'হাজার না বলতেই দিয়ে গেল। খাও এখন কদ্দিন খাবে!

গহরজানের পাশে ছিল ডালিম। থেকে থেকে চুমু খায় গহরজান ডালিমকে। বলে,—ডালিম, ডালিম, ডালিম!

মাসী বললে,—কবে আসবে কিছু বললে?

গহরজান বলে,—বললে আসবে। সুবিধে পেলেই আসবে।

নোটগুলোকে তুলে রাখতে ওঠে মাসী। বলে,—ঠিক কথা। বয়স্থ লোক হলে খুশীমত আসতো। সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে তো। যা হোক, তুই মুখ-হাত ধুয়ে আয়। খেতে দি তোকে।

—সৌদামিনী আছো?

কে ডাকে। কান খাড়া ক'রে শোনে দু'জনে, গহরজান আর সৌদামিনী। সৌদামিনী বলে,—কে বল্ তো?

গহরজান আলুথালু বেশে বসেছিল। শাড়ীটা জড়িয়ে নেয় বুকে-পিঠে। বলে,—মালুম হচ্ছে না তো। দেখো না তুমি।

—সৌদামিনী। সৌদামিনী আছো?

—হ্যাঁ। কে? ঘর থেকে উত্তর দেয় সৌদামিনী। বলে,—কে ডাকছে?

—আমি ঘোষাল। বলে আগন্তুক।

—ঘোষাল, কি মনে ক'রে? সৌদামিনী বলে।

—কথা আছে। দেখা দাও, তবে তো। যাবো আমি? ঘোষাল বললে।

—হ্যাঁ। সৌদামিনী বলে।

মাধব ঘোষাল। ঘোষালকে দেখতে বেশ। মাথায় বাবরি। পাকানো গোঁফ। চোখে সুর্মা। ফর্সা রঙ। ছিপছিপে চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বয়স হ'তে না হ'তে দাঁতগুলো পড়ে গেছে। মদ খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে গেছে দাঁত। বাঁধানো দাঁত। কানে আতরের তুলো। মটকার জামায় ফিরোজা পাথরের বোতাম। হাতে কোঁচানো কাঁচির ধুতির কোঁচা। সৌদামিনীকে দেখেই বললে,—গহর কোথায়? খদ্দের আছে। বসাবে?

—দেবে কত? সৌদামিনীর কথায় গুমরের সুর। বলে,—কত দেবে কত?

ঘোষাল বাবরিতে হাত বুলিয়ে বললে,—গান-বাজনা শুনবে, থাকবে রাতভোর। দু'তিন জন। দেবে হয়তো টাকা বিশ-ত্রিশ।

—ধ্যাংরা মারো! মুখ ঘুরিয়ে নেয় সৌদামিনী। বলে,—তোমার কত থাকবে ঘোষাল?

ঘোষাল হাসে। বাঁধানো দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে ঘোষাল,—সাত-আট টাকা। বসাবে তো বল', ডাকি তবে?

—ত্রিশ টাকায় কি হ'বে? সৌদামিনী বলে,—গান শুনে যাক, ত্রিশ টাকা দিক।

—চল্লিশ? ঘোষাল বলে।

সৌদামিনী ঘুরে দাঁড়ায়। বলে,—দেখি, গহর যদি রাজী থাকে। গহরজান উঠে গিয়েছিল পাশের ঘরে। মুখ-হাত ধুতে যাচ্ছিল গামছা হাতে ক'রে। সৌদামিনী চুপি-চুপি বললে কি যেন। গহরজান আপত্তি জানালে মাথা দুলিয়ে। বললে,—না মাসী না। যে টাকা দিচ্ছে তাকে আমি ঠকাবো? হাটিয়ে দাও ঘোষালকে।

—চল্লিশ টাকা দেবে বলছে। সৌদামিনী হাল ছাড়ে না। বলে,—চল্লিশটা টাকা!

চ'টে যায় গহরজান। বলে,—না।

সৌদামিনী বেশী জোর করে না। দু'হাজার টাকা হাতে পেয়ে জোর করবার মুখ থাকে না। বলে,—হ্যাঁ, দি বিদেয় ক'রে দি।

ঘোষাল ভেবেছিল হয়তো চল্লিশে আপত্তি হবে না। সৌদামিনী বলবে,—ডাকো লোক। কিন্তু সৌদামিনী বললে,—ঘোষাল, হ'বে না। রাস্তা দেখ'।

মাধব ঘোষাল কোঁচানো কোঁচাটা ঝাড়ে। বাবরিতে হাত বুলিয়ে বলে, —আচ্ছা, কিন্তু ঘোষালকে ভুললে চলবে না মাসী! কলকাতায় ঘোষালকে চেনে না কে আছে?

সৌদামিনীর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বলে,—যাঃ গেল। বলছি হবে না!

কোঁচানো কোঁচাটা ঝাড়ে মাধব ঘোষাল। কি ব'লতে গিয়ে বলে না। সিঁড়ি বেয়ে চ'লে যায়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল গহরজান, এখন থেকে অন্য কাকেও বসতে দেবে না ঘরে। কেনা হয়ে থাকবে গহরজান। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল পেয়ে গেছে। পেয়েছে কত প্রতীক্ষায়, খোঁজাখুঁজি ক'রেও যা মেলে না। বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, যার অন্য কেউ ভাগীদার নেই। যাকে তুষ্ট করলে ভাবতে হবে না কখনও। যাকে পেলে অপেক্ষায় থাকতে হবে না

রোজগারের আশায়। গুন-গুন গান গায় গহরজান। খুশী হলে গায়। গাইতে গাইতে যায় মুখ-হাত ধুতে।

মাসী টাকাটা গুণতে বসে। ভুল হ'ল না তো! মাধব ঘোষাল ভণ্ডুল ক'রে দিয়ে গেল। হয়তো গণনায় ভুল হয়ে গেছে। মাসী টাকাটা গুণতে থাকে। আঙুলে থুথু মাখিয়ে।

কাছারীতে কে এমন আছে যে, খরচা চেয়ে পাঠায়।

উগ্র নেশা। ঘোর কাটলেও আমেজ থাকে। কড়া মেজাজ হয়ে ওঠে থেকে থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কাছারী থেকে আসছি।

রাজেশ্বরী বললে,—আমি যাবো নাট-মন্দিরে। লক্ষ্মীপুজো হবে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ডেকে দেবো এলোকেশীকে?

রাজেশ্বরী বলে,—এলো ডাকবে বলেছে পুজো যখন হবে।

এলোকেশী আসে। বলে,—চল্ রাজো। পুরুত ডাকতে পাঠিয়েছে।

নাট-মন্দিরে যায় রাজেশ্বরী। পায়ে তোড়া। শব্দ হয় ঝম-ঝম।

হঠাৎ দেখা পেয়ে কাছারী শুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে যায় যেন। কৃষ্ণকিশোর বলে, —খরচা কে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন?

বয়োবৃদ্ধ নায়েবদের এক জন বললেন,—আমি হজুর বলেছিলেম অনন্তকে। হজুর যদি খরচাটা—

—অনন্ত বলেছে খরচা? বলে পাঠিয়েছি? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে চড়া মেজাজে। বলে,—লিখেছেন খরচা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হজুর। লিখেছি দাতব্য খাতে।

লেখা-পড়া হ'ল না। বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরেজী—শেখা হ'ল না একটা ভাষাও। শিক্ষায় জ্ঞান হয়, জ্ঞান হ'ল না কিছুতে। শিক্ষিত না হয়েও কত মানুষ আছে—যারা হয় শিষ্ট ও ভদ্র। ভদ্র রীতি-নীতিও জানলো না।

ন্যায় না শিখে শিখলো শুধু অন্যায়, নম্র না হয়ে হ'ল দাম্ভিক। বিগতরা ছিলেন কত জ্ঞানী, কত বিচক্ষণ, কত শিষ্ট ও ভদ্র। বিগতদের কত কষ্টে অর্জিত টাকা-পয়সা, বর্তেছে ভাগ্যক্রমে। যথা ব্যবহার না ক'রে উড়িয়ে দিতে হবে খোলামকুচির মত।

—যদি অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে ক্ষমা করবেন হুজুর। বৃদ্ধ নায়েবটি বললেন কম্পিত কণ্ঠে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—টাকা আমার, খরচা আমি করব। লক্ষ গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

—ক্ষমা করবেন হুজুর। অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

অট্টহাসি। হঠাৎ বিকট শব্দে অট্টহাসে কে।

চমকে ওঠে যে যেখানে ছিল। কে হাসে এত উল্লাসে? হাসি থামতে চায় না। অবিরাম অট্টহাসি। কাছারীর দালানে কে, যে হাসছে? লণ্ঠনের আলো। স্পষ্ট মানুষ চেনা যায় না।

—হুজুর কাছারীতে কাজ-কর্ম দেখছো?

কথা শেষ ক'রে বক্তা হাসে। অট্টহাসি। হো-হো শব্দে।

—পিসেমশাই!

হ্যাঁ, শিবচন্দ্র। হেমনলিনীর স্বামী। কি খেয়াল হয়েছে হঠাৎ দেখা দিয়েছেন। আদ্দির বেনিয়ান, চুনোট-করা থান ধুতি। কোঁচা লুটোচ্ছে। তৈরী হয়ে বেরিয়েছেন শিবচন্দ্র শিমলেয় যাচ্ছিলেন, গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়েছেন দেখা ক'রে যেতে। হাতে কতগুলো আঙটি। লণ্ঠনের আলোয় চিক চিক করছে। বোধ হয় নেশা করেছেন, যে জন্য হাসছেন এত অধিক। হাসতে হাসতে বললেন,—ভাল আছো তোমরা?

—হ্যাঁ। পিসীমা ভাল আছেন? জহর, পান্না?

—বিলকুল ভাল। কাজ দেখছো কাছারীতে? ত্যাম্ গ্ল্যাড হয়েছি দেখে। বলবো গিয়ে পিসীকে। কথা বলছেন পিসেমশাই জোরে জোরে।

'কাছারীতে কাজ দেখছে' কথাটা শুনে নায়েবরা হাসলেন। বিদ্রূপাত্মক হাসি। বয়োবৃদ্ধ নায়েবটি বললেন, চাপা গলায়,—কাছারীতে কাজ দেখছেই বটে!

পিসেমশাই বললেন,—মা চিঠি দিয়েছে? কাশীতে গিয়ে কোথায় উঠেছে?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না। পেয়াদা দু'জন গিয়েছিল। ফিরে বললে, মা অসীতে ঘর ভাড়া করেছে। কে সাধুমা আছে, ঐ সাধুমা মাকে দেখবে বলেছে।

পিসেমশাই বললেন,—পিসীমা ব'লে দিয়েছে গাড়ীটা যখন হোক পাঠিও, আসবে। আমার গাড়ী তো কাজে খাটে।

—হ্যাঁ, পাঠাবো। কৃষ্ণকিশোর বলে।

পিসেমশাই বললেন,—যাই তবে।

পিসেমশাই চলে যেতেই কাছারীতে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—পিসীমা গাড়ী চেয়েছেন। আবদুলকে ব'লে দেওয়া হোক।

—অবশ্যই ভোরে গাড়ী যাবে হুজুর। বয়োবৃদ্ধ নায়েবটি বললেন।

নাট-মন্দির থেকে ফিরে রাজেশ্বরী ঘরে গিয়ে বসেছিল। ভূমিতে, ভেলভেটের গালচেয়। ভাবছিল কি করবে। কি কর্ত্তব্য। ভাবছিল, বলবে স্বামীকে। বলবে, তুমি কাছে থেকে যা খুশী খাও। যেও না কোথাও। ভাবছিল বলবে, যা খেয়েছো খেয়েছো, ভবিষ্যতে—

—বৌ, ভাঁড়ার দেবে কে? যাবে তুমি, দাঁড়াবে যেয়ে? কথাগুলো বলে ব্রাহ্মণী। বলে ধীরে ধীরে।

—হ্যাঁ, চল যাচ্ছি। রাজেশ্বরী বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—এলোকেশী কোথায়?

—ডেকে দেবো? বলে ব্রাহ্মণী।—দিচ্ছি ডেকে।

এলোকেশী আসে। বলে,—কি বলছিস ?

রাজেশ্বরী চুপি চুপি বলে,—কোথায় আছে ? পিসেমশাই আছে তো ? আমি যাচ্ছি ভাঁড়ার দিতে।

এলোকেশী বললে,—খোঁজ করছি।

পিসেমশাই চ'লে যেতে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কাছারীর দালানে। চড়া মেজাজে কথা ব'লেছে। নায়েব মশাইকে ডাকে কৃষ্ণকিশোর। বলে, —নায়েব মশাই !

নায়েব মশাই বলেন,—হুজুর ! কাছে এসে বলেন,—হুজুর !

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হয়তো বেয়াদপি হয়ে গেছে। ভুলে যাবেন, যদি—

কথার মাঝেই কথা বলেন নায়েব। কাঁচুমাচু হয়ে বলেন,—হ্যাঁ, হুজুর। ভুলে গেছি।

খুশী হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। ঘরে গিয়ে দেখে, এলোকেশী রয়েছে। বিছানা করছে। বললে,—তোমাদের মেয়ে কোথায় ?

ঘোমটা টানে এলোকেশী। বলে,—ভাঁড়ার দিতে গেছে।

বলতে বলতে রাজেশ্বরী এসে দাঁড়ায়। এলোকেশী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—ভাঁড়ার দিতে গিয়েছিলে ?

মুখটা থম-থম করছে। চোখ দু'টো বুঝি ফুলে উঠেছে একটু। রাজেশ্বরী বলে,—হ্যাঁ।

কাছে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরীকে টানে বুকের কাছে। জড়িয়ে ধ'রে বলে,—কত কথা আছে।

রাজেশ্বরী ফুঁপিয়ে ওঠে। চেয়ে থাকে ড্যাবা-ড্যাবা চোখ তুলে। যে-চোখে টাটকা কাজল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কতক্ষণ।

গাঢ় অন্ধকার নেমেছে শহর কলকাতায়। অতিবাহিত হয়েছে কর্মচঞ্চল দিন। বিশ্রান্তিতে মগ্ন এখন শহরবাসী। ঘরে ঘরে স্তব্ধতা। শীঘ্র শয্যাগ্রহণ এবং শীঘ্র শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত মানুষ—নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়েছে। অদূরে চিৎপুর পল্লী, ফেরিওয়ালাদের ডাক অস্পষ্ট শ্রুত হচ্ছে। ক্ষীণ চিৎকার। শুধু সর্বসাক্ষী আকাশে দেখা যায়, ঘোলাটে চন্দ্রিকালোকে দেখা যায় চলোর্মি। চঞ্চল তরঙ্গ। সারি সারি মেঘ উড়ে চলেছে। যেন দলে দলে চলেছে অভিসারিকা, লজ্জায় আবৃত ক'রে মুখবিম্ব। কেশরাশিতে আর গুচ্ছ গুচ্ছ অলককেশে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় বৃক্ষশাখা কাঁপছে। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে শৃগাল ডেকেছিল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, স্তব্ধতাকে ভঙ্গ ক'রে।

পূজা শেষ হয়েছে, তবুও কি মন্ত্র বলছেন পুরোহিত। গৃহ-দেবতার বেদীমূল থেকে উঠে গিয়ে নাট-মন্দিরে ব'সে তখনও বুঝি পূজা করছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত ধীর শান্ত হন, হঠাৎ সশব্দে মন্ত্রোচ্চারিত হয়। স্তব না স্তোত্র। চাণক্যশ্লোক না বানষ্টক। মোহমুদ্গর না শান্তিশতক। ভক্তির উচ্ছ্বাসে ও স্বর্গীয় গীত-ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে নাট-মন্দির। চির অমোঘ ঋষিবাক্যে কি অপূর্ব্ব মধু। পুরোহিত বৈদিক সূক্ত বলছেন। ঋকমন্ত্রী কবিতা।

নানালঙ্কারে সুশোভিতা কে এক জন নারী।

নাট-মন্দিরে উঠে ভক্তিনম্র ভঙ্গীতে হয়তো চলেছিল প্রণাম করতে। পুরোহিত চকিত হয়ে বললেন,—কে যায় ?

লালপাড়বিশিষ্ট পট্টবস্ত্র। তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর। মাথায় অল্প গুণ্ঠন, বস্ত্রাঞ্চলে বেষ্টিত কণ্ঠ। পদদ্বয়ে অলক্ত। গমনোদ্যতা বাক্যব্যয় করে না। ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করে পুরোহিতের উদ্দেশে। অপরিচিতাকে দেখে বিস্ময়ে যেন হতবাক হন পুরোহিত। বলেন,—সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হউক। কিন্তু কি পরিচয়?

নারী তথাপি মৌন থাকে। গললগ্ন বস্ত্রাঞ্চল খুলে কয়েকটি রৌপ্য-মুদ্রা পুরোহিতের পদপ্রান্তে রাখে। প্রণামী দেয়। পুরোহিত বলেন,—কি আকাঙ্ক্ষা?

বিনম্রভঙ্গীতে বসে নারী। সুমিষ্ট স্বরে বলে,—বক্তব্য আছে। প্রতিকার জানতে চাই।

—তৎপূর্ব্বে তুমি কে জানাও। কদাপি তোমাকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তুমি কে মা? পুরোহিতের কথায় বিস্ময়।

—আমি এক জন প্রতিবেশী। এই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী কুমুদিনী আমাকে কন্যার মত স্নেহ করতেন।

—তথাস্তু। বক্তব্য কি? পুরোহিত শুধোলেন।

পূর্ণশশী। শশী বৌ। অপরূপ রূপময়ী পূর্ণশশী বক্তব্য বলে না। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে করজোড়ে ব'সে থাকে। পুরোহিত লক্ষ্য করেন বধূটিকে। মনে হয় অতি সুলক্ষণা, ভাগ্যবতী। জ্বলন্ত বেল-লণ্ঠনের আলোয় দেখা যায় দু'চোখে জলবিন্দু। সত্যিই কাঁদে পূর্ণশশী। কি অব্যক্ত দুঃখে কে জানে। শিশিরবিন্দুর ন্যায় টলমল করে দু'ফোঁটা জল। শুভ্র কপোলে বুঝি গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। পুরোহিত বললেন,—লক্ষ্মী পূজার দিন, মা লক্ষ্মী বৃথা কাঁদো কেন? অভীপ্সা ব্যক্ত কর'।

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে বললে পূর্ণশশী,—পুরোহিত মশাই, লোক পাঠাবো, দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের গৃহে? জানাবো বক্তব্য। এখন আমি যাবো কুমুদিনীর পুত্রবধূকে দেখতে। ক'দিন দেখা নেই।

—কখন মা? কবে? পুরোহিতের কথায় কৌতূহল।

পূর্ণশশী আশ্বস্ত হয়ে বলে,—যখন সুবিধা হবে।

পুরোহিতের ভাবালু দৃষ্টি থমকে থাকে কয়েক মুহূর্ত। পূর্ণশশী বলে,—যদি দয়া হব।

পুরোহিতের কথায় আশ্বাস।—আগামী কল্য বেলা একটায়। লোক পাঠিও, আমি উপস্থিত হব।

কথা শুনে হয়তো খুশী হয় পূর্ণশশী। ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে নাট-মন্দির। বলে,—যে আজ্ঞে।

পুরোহিত সবিস্ময়ে দেখেন গৃহাভিমুখে গমনোদ্যতা ঐ বধূটিকে। মনে হয়, এমন সুলক্ষণা নারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন অপূর্ব্ব রূপ। যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। পূর্ণশশী তখন অন্ধকারে বিলীয়মান।

তখন দু'জনে ব'সেছিল পালঙে। খুব কাছাকাছি।

বাইরে স্তব্ধ রাত্রি। ঘনান্ধকার। টুকরো কথা শোনা যায়। কোথা থেকে ভেসে আসে। গৃহলগ্ন পুকুরে মধ্যে মধ্যে শব্দ হয়, জল চলকায়। মাছ লাফাচ্ছে পুকুরে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিরাম। হুগলী থেকে ক'ঘর প্রজা এসেছিল দুপুরে। খাজনা দিয়ে গেছে। কাছারীতে টাকা বাজে। লৌহখণ্ডে টাকা পরীক্ষা হচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে ঠং ঠং। নায়েব পরীক্ষা করছেন, দেখছেন আসল না নকল। সচল না অচল। খাজনা আদায়কারী গমস্তা জনা কয়েক সাহায্য করছে নায়েবকে। লাল খেরোর থলিতে টাকা পুরছে। প্রজাই-পাট্টা-কবুলতি মেলাচ্ছে মুহুরী। মহল এবং প্রজাদের নাম। কত জমি, জমাই বা কত। বকেয়া কিছু আছে না নেই। একেক জমি একেক বাজনাকায় বিলি হয়েছে। যেমন জমি তেমন খাজনা। ফাঁকা জমি না জমিতে ঘর-বাড়ী। ধানজমি না সব্জীক্ষেত।

জমিতে পান-তামাকের চাষ না বাঁশঝাড়। ফলবাগান না শুধু তৃণপূর্ণ জমি। অন্যান্য কাজ মিটে গেছে। ফাঁকা হয়েছে কাছারী। নায়েব এতক্ষণে টাকা গুণতে লেগেছেন। হুগলীর প্রজাদের খাজনা দেওয়া টাকা।

—কথা আছে বললে যে? বললে রাজেশ্বরী। বললে,—আমি শুঁয়ে বসি, কে কোথায় দেখবে। বলতে বলতে পালঙ থেকে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। মেঝেয় বিছানো গালচেয় বসে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কে দেখবে! বলছিলাম পিসীমা আসতে চেয়েছে, ভোরে গাড়ী যাবে। পিসেমশাই গাড়ী পাঠাতে ব'লে গেলো।

—বেশ তো। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—পিসীমা বেশ লোক।

কৃষ্ণকিশোর বলে মৃদু হেসে,—বেশ তো বললে হবে না। তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে হবে পিসীমাকে। পিসীমা ব'লেছে বৌ যদি রেঁধে খাওয়ায় তো যাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে রাজেশ্বরী। কি বলবে ভেবে পায় না। বলে,—বেশ তো। তবে আমি রেঁধে দিলে হয়তো পিসীমা'র রুচবে না। আমি তো ভাল রাঁধতে জানি না। হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে ঠাগ্‌মা যে উনুনের ধারে যেতে দিতো না। রাজেশ্বরী কথা বলে, কিন্তু কথায় যেন জড়তা। মুখে গাম্ভীর্য্য। চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিসীমা মুখ ফুটে খেতে চেয়েছে। যা জানো রেঁধে দিও।

মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ে। পিসীমার জন্তে কি রাঁধবে? ভেবে পায় না রাজেশ্বরী। রাঁধবে অথচ রুচবে না মুখে, তখন লজ্জায় যে মরে যাবে রাজেশ্বরী। শাকের ঘণ্ট, এঁচোড়ের দম না মাছ-শাক। কৈ-কপি, কৈ মাছের হরগৌরী, না পটলের দোর্ম্মা। মাছের দম-পোস্ত না মুড়োর মুড়ি-ঘণ্ট। কাঁচা ইলিশের ঝাল না দই-ইলিশ। লাউচিংড়ী না চিংড়ীর মালাইকারী।

—যাই তবে, যোগাড় দিয়ে আসি। বললে রাজেশ্বরী।—ব'লে আসি বামুনদিদিকে। বলতে বলতে প্রায় উঠে পড়ে। বলে,—ভোরে গাড়ী যাবে ব'লছো, জোগাড় ক'রে না রাখলে—

কৃষ্ণকিশোর হেসে ফেললে।—থাক্ থাক্, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। বামুনদিদিই রাঁধবে। পিসীমা বলেনি, আমিই বলছিলাম পিসীমা'র হয়ে।

কথা ক'টা শুনে বসে পড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—তাই বল। আমি ভাবছি সত্যিই বুঝি পিসীমা—

ক্ষণেকের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল রাজেশ্বরী। আশৈশব লালিত-পালিত হয়েছে যাঁর কাছে তিনি তো কখনও রাঁধতে বলেননি। রেঁধেই খাইয়েছেন যখন রাজেশ্বরী যা খেতে চেয়েছে। ঠাগ্‌মাকে মনে পড়ে যায় হঠাৎ, বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। রাজেশ্বরী ভাবে ঠাগ্‌মাকে, ঠাগ্‌মা'র কথাবার্ত্তা। কত সময়ে কানে শোনা যায়, যেন ডাকছে ঠাগ্‌মা। রাজেশ্বরী বসে থাকে চুপচাপ।

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করে রাজেশ্বরীকে। দেখে রূপৈশ্বর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব। আয়ত চোখ। কুঞ্চিত কেশ। গাল দুটোতে ফাগ মেখেছে বুঝি, ঠোঁটে আলতা। আকৃতিটা কৃশ, তবুও কত যে কোমল। চোখে ভ্রমরকৃষ্ণ তারা, ধীরমধুর কটাক্ষ চঞ্চল। কবরীস্পৃষ্ট শ্বেত শুভ্র গ্রীবা। অলঙ্কারখচিত সুডৌল বাহু। পদ্মারক্ত কোমল করপল্লব, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়। রাজেশ্বরী কি পটে আঁকা ছবি! ঘরে ঘর-আলো-করা রূপপ্রভা থাকা সত্ত্বেও তবুও, তবুও অন্যে কেন আসক্তি!

খতিয়ে দেখছিল কৃষ্ণকিশোর। দেখছিল কত তফাৎ। আইভিলতা, লিলিয়ান, গহরজান ও রাজেশ্বরীতে কত পার্থক্য। প্রথমা রূপগর্ব্বে যেন অন্ধ, দ্বিতীয়া পাশ্চাত্য রূপচ্ছটায় পরিপূর্ণ হ'লেও হিমশীতল, কমলের ন্যায় কোমল; তৃতীয়া রূপবতী, তবুও বুঝি দলিত ও অনাদৃত, যে জন্য স্নেহময়ী, প্রেমভিক্ষু। রাজেশ্বরী! ঘর-আলো-করা রূপ, রূপে মুগ্ধ করে,

মহ করে না। তবুও, তবুও অন্তে কেন আসক্তি। গহরজান বাইজীর স্মৃতিতে মন কেন মথিত হয়। মূল্য না দিলে যে-মুখে হাসি ফোটে না সে-মুখ না দেখায় কি ক্ষতি।

—তুমি লেখাপড়া করতে, ছেড়ে দিয়েছো? হঠাৎ কথা বললে রাজেশ্বরী। বললে দীপ্ত কণ্ঠে,—আমি চাই তুমি পাঠ ত্যাগ না কর'। অভাবের জন্তে কত কে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তুমি কেন ছাড়বে?

কথাগুলো শুনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করে কৃষ্ণকিশোর। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, উত্তর দেয় না কথার। উত্তরটা খোঁজে যেন মনে মনে। বলে,—কাছারীর কাজ দেখতে হ'লে লেখাপড়া সম্ভব হবে না।

উত্তরটা যেন মুখে অপেক্ষা করছিল। রাজেশ্বরী বললে,—লেখাপড়া না শিখে কাছারীর কাজ দেখা যাবে?

ভাবছিল কৃষ্ণকিশোর কি বলবে এ কথার উত্তরে। ভাবছিল উত্তর দেবে, না দেবে না। বললে,—কাছারীর কাজ শিখেছি। লেখাপড়া যা শিখেছি চলে যাবে।

রাজেশ্বরী বললে একটু হেসে,—লেখাপড়া কি শেষ হয়?

—বৌ আছো? কে এয়েছে দেখো।

দাসীদের মধ্যে কে এক জন কথা বললে। লজ্জায় আত্মগোপন ক'রে। বাইরের দালান থেকে। বললে।—কে এয়েছে দেখো।

দালানের দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি। ফুরফুরে হাওয়ায় আলোর শিখা কাঁপছে। দালানটাও কাঁপছে। রাজেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখে। দেখে সেই বৌটি, সেই পূর্ণশশী। বক্তির দিন যাকে দেখেছিল, চেনা-জানা হয়েছিল যার সঙ্গে। একমুখ হাসে রাজেশ্বরী। বলে,—কত ভাবছি আমি। দেখাই পাওয়া যায় না। আসব বলে গেলেন, আমি রোজ ভাবি আজ বুঝি—

কথা বলতে বলতে রাজেশ্বরী এগিয়ে যায়। প্রণাম করতে যায়। পূর্ণশশী বলে,—থাক থাক। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাজেশ্বরীকে। বলে,—কত দিন দেখতে না পেয়ে চলে এলাম। ঘরে কি হচ্ছিল? ভাবা কোথায়।

লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। মাথা লুকায় পূর্ণশশীর বুকে। কৃষ্ণকিশোর উঠে আসে ঘর থেকে। দেখে সেই বধূটি, কুমুদিনীর কাছে যে শ্লোক পড়তো। দৃষ্টি-বদল হয় কয়েক মুহূর্ত। পূর্ণশশীর মুখে হাসি। চোখেও বুঝি হাসি। মিষ্টি মৃদু হাসি। দেওয়াল-গিরির আলোয় গা-ভর্ত্তি গয়না—ঝিলিক তুলছে বিজলীর মত।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি কথা হয়, বসা হবে না? বললে রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশী সহাস্যে বলে,—চল' ঘরে চল'; বসি গে।

কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পড়ার ঘরের দিকে। লেখাপড়ার কথা শুনে ভাল লাগে না কিছু। লেখাপড়ার নাম শুনলে বিরক্ত হয়। পড়তে হ'লে কত কষ্ট করতে হয়। সকল কিছু ভুলে পড়তে হয় শুধু। কতগুলো বিষয়, ভাষাও নয় একটা। জ্ঞানলাভ সহজে কি হয়। লেখা-পড়া—স্মৃতি থেকে যে মুছে গেছে কত দিন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রে পূর্ণশশী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। কক্ষটি প্রশস্ত, সুশোভিত। হর্ম্যতল পাদস্পর্শসুখজনক গালচেয় আবৃত। গবাক্ষে পর্দা। কত শত মহার্ঘ সামগ্রীতে সজ্জিত। পূর্ণশশীকে দেখে রাজেশ্বরী। পট্টবস্ত্র পরিহিতা পূর্ণশশী, পবিত্র এক আবেশে যেন বিহ্বল। রাজেশ্বরী বলে,—মন্দিরে আসা হয়েছিল?

পূর্ণশশী বললে,—হ্যাঁ, পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। কথা হয়ে যেতে দেখতে এলাম তোমাকে। ভালো আছো? শ্বশুর-ঘর ভাল লাগছে?

মুখাকৃতিতে কৃত্রিম হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। বলে,—

হ্যাঁ। ভাল লাগছে। তবে একা থাকি। দু'টো কথা কই, তেমন কে আছে?

—স্বামী তো আছে। কথা কও যত খুশী। বললে পূর্ণশশী। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে। বললে,—শাশুড়ীর চিঠি-পত্র পাও?

রাজেশ্বরী বললে,—আমি পাই কৈ? তাঁকে দেখতে সাধ হয়।

কিয়ৎক্ষণ রাজেশ্বরীকে দেখে পূর্ণশশী। দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। গয়না-গুলি দেখে। হস্ত স্পর্শ ক'রে দেখে। জিজ্ঞেস করে,—কে দিয়েছে?

রাজেশ্বরী বলে,—শাশুড়ীর গয়না, আমি পেয়েছি।

—চমৎকার। বললে পূর্ণশশী—তোমাকে বিমর্ষ দেখছি, মুখে হাসি কৈ?

রাজেশ্বরী চমকে ওঠে বুঝি। বুকের ভেতরটা কি দেখতে পেয়েছে পূর্ণশশী। রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, দিদি—

—কি হয়েছে বল' তো। বললে পূর্ণশশী। বললে,—বল', লজ্জা কি? মুখটি যে শুকিয়ে গেছে।

চোখ দু'টো বুঝি ছলছলিয়ে ওঠে হঠাৎ। কাঁপতে থাকে ওষ্ঠাধর। রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, নেশা করে। দেখলাম, ঐ অবস্থায় দেখলাম। কথা বলতে বলতে চোখে আঁচল চাপে রাজেশ্বরী।

হেসে ফেললে পূর্ণশশী। বিষয়টা লঘু ক'রে দিতে চায়। রাজেশ্বরী যাতে ভেঙে না পড়ে তাই হাসতে হাসতেই বলে,—যুগের হাওয়া বউ, যুগের হাওয়া। বল' তো নেশা করে না, কত জন লোক আছে? টাকা কোথা থেকে যে আসে ভাবতে হয় না। ব'সে ব'সে দিন কাটে। নেশা তো করবেই। তবে তুমি—

—আমি যে ভয় পাই দিদি। কথার মাঝেই কথা বলে রাজেশ্বরী। —নেশাকে যে ভয় হয় দিদি।

—বল' তো শশী বৌদিদি, বুঝিয়ে বল' তো।

কোথায় ছিল, অনন্তরাম। ঘরে ঢুকেই বললে কথাগুলো। কোথা থেকে শুনেছিল কে জানে। বললে,—বল' তো শশী বৌদিদি। মেয়েটা কচি যে, জানবে কোত্থেকে! জ্ঞান হয়েছে কিছু! টলতে দেখেই বেবাক্ দাঁত-কপাটি লেগে গেছে। কত দেখতে হবে, কত শুনতে হবে। সাহস দিয়ে যাও তো শশী বৌদিদি।

কথার মাঝে হঠাৎ অনন্তরামকে কথা বলতে দেখে পূর্ণশশীও কিছুটা সাহস পায় মনে। বলে,—তাই তো আমিও বলছি। তোমাকে বুক বাঁধতে হবে। শুধরোতে হবে। যাতে খারাপ-ভাল বুঝতে শেখে দেখতে হবে। ঘরে ঘরে হামেশাই হচ্ছে। ভেঙে পড়লে চলে? কথা বলতে বলতে কথা থামায় পূর্ণশশী। থেমে থাকে খানিক। বলে,—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে? ছেলে তো ভাল ব'লেই জানি। কে ধরালে কে?

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছে।

অনন্তরাম বললে,—ব'ল না শশী বৌদিদি। বসিরকে জানো? তা তুমি জানবে কোত্থেকে? বেশ ছিল, বসির শেখালে খাওয়াতে, শেখালে—

কথার শেষাংশটা বলতে গিয়ে বলে না অনন্তরাম। জিব কাটে। বলে,—যাই হোক, শশী বৌদিদি, তুমি যে কথাটা বলেছো, খাঁটি কথা। বৌদি শুধরোতে চেষ্টা করুক, যদি কিছু হয়, ঠিক ব'লেছি কি তুমিই বল' শশী বৌদিদি? তুমিই বল'।

দাসীদের এক জন দেখা দেয় দু'হাতে দু'টি পাত্র ধ'রে। বলে,—হুজুরে ব'লে পাঠিয়েছে, না খেয়ে গেলে চলবে না।

হেসে ফেললে পূর্ণশশী। মুক্তাঝরা হাসি। বললে,—কে খাবে?

অনন্তরাম বলে,—দেখো শশী বৌদিদি, দেখো, আপ্যায়িতটা দেখো। তোমাকে খেয়ে যেতে হ'বে। ব'লে পাঠিয়েছে।

দাসী পাত্র দু'টি পূর্ণশশীর সমুখে উপস্থাপিত ক'রে চলে যায়। আহার্য্য দেখে হাসতে হাসতে বললে পূর্ণশশী,—অসময়ে খাওয়া যায়?

অনন্তরাম বলে,—তা হোক শশী বৌদিদি, যা হয় খাও।

পাত্রপূর্ণ জল। থালিতে হু'টি লবঙ্গলতিকা ও হু'টি পাটিসাপটা। হয়তো গৃহে প্রস্তুত।

রাজেশ্বরী ফিসফিসিয়ে বললে,—অনন্ত, কোথায় গেল বল' তো? দেখতে না পেলেই ভয় করে।

হেসে ফেলল অনন্তরাম। হাসতে হাসতেই বললে,—দেখো শশী বৌদিদি, দেখো। ভয় কাকে বলে দেখো। দেখেছি আমি, দেখেই আসছি। পড়ার ঘরে ব'সে আছে।

পড়তে ব'লেছে রাজেশ্বরী। ব'লেছে, লেখাপড়া করতে হবে।

খুশী হওয়ার চেয়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে কথাগুলো শুনে। পাঠ চুকিয়ে দিয়েছে লেখাপড়ার। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে শেষে। কৃষ্ণকিশোর তবুও পড়ার ঘরে যায়। পাঠ্য গ্রন্থ তোলা-পাড়া করে। বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ। জ্বলন্ত লণ্ঠনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছে দপদপিয়ে। মনে হয় অক্ষরগুলো বুঝি কাঁপছে। গ্রন্থ-পৃষ্ঠায় লিখিত অক্ষর। স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তক। সংস্কৃত কৌমুদী ও কলাপ। অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য ও মীমাংসা।

—আমি চাই তুমি লেখাপড়া কর'। বলেছে রাজেশ্বরী।

কথাগুলো শুনে খুশী হওয়ার চেয়ে কথাগুলোতে ঘা খেয়েছে মনে। পড়তে কি শুধু রাজেশ্বরী বলেছে। মা কুমুদিনী বলেছিলেন। পিসীমা বলেছিলেন। পণ্ডিত মশাই তো বলেই ছিলেন। কত কথা বলেছিলেন।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা বাজতে থাকে। ক'টা বাজে? বোধ করি আটটা। কথা বলতে বলতে পূর্ণশশী বলে,—উঠি ভাই আমি। আটটা বেজে গেলো। অনন্ত, তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে। সময় হবে?

অনন্তরাম বললে,—কি যে বল' শশী বৌদিদি!

পূর্ণশশী বললে,—দেখো বউ, কিছুতে ভেঙে পড়' না তুমি। কত ধকল সইতে হবে। ভেঙে পড়লে চলে?

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো পূর্ণশশী। কাছেই থাকে সে। প্রতিবেশী। আবক্ষ গুণ্ঠন টেনে গৃহোদ্দেশে যাত্রা করে পূর্ণশশী। সদরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে অনন্তরামকে,—অনন্ত, পড়ার ঘর কৈ?

অনন্তরাম বলে,—ঐ যে। ঐ তো আলো জ্বলছে। পড়ছে।

অদূরে ঘরটি দেখে পূর্ণশশী। দেখে কয়েক মুহূর্ত। কেন দেখে কে জানে!

কলকাতা শহর হ'লে কি হবে, আঁধার হ'তে না হ'তে জনতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পথে কচিৎ লোক দেখা যায়। যে যার গৃহে ফিরে অর্গল তুলে দেয়। বিশেষতঃ শহরের কয়েকটা অঞ্চলে গাঁটকাটা, সিঁদকাটা এবং মাতালদের উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ, ত্রস্ত হয়ে থাকে। দিবাপেক্ষা নিশীথে দুষ্ট ও দুর্বৃত্তদের লীলা চলে। যে জন্য লোকজন একত্র না হয়ে চলতে সাহসী হয় না। পূর্ব্বে কত ভয়াবহ ডাকাতি ও লুণ্ঠন হ'ত। যদ্যপি ইংরেজী কোম্পানি বাহাদুর কর্তৃক সুব্যবস্থা হওয়াতে ঈদৃশ দস্যু-বৃত্তি হ্রাস হয়েছে তথাপি শহরের কয়েক অঞ্চলে এখনও দুষ্ট লোক উৎপাত করে।

শুক্ল পক্ষ। আলোয় আলো হয়ে আছে ঝিরিঝিরি। আকাশে মেঘের জটলা চলেছে। ফটক থেকে পথে পৌঁছতেই পূর্ণশশী বললে,—অনন্ত, তুমি পিছনে চল'। আমি আগে যাই।

পূর্ণশশীকে মনে হয় কেমন যেন ভয়ার্ত্ত। কিয়দ্দূর যেতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—অনন্ত, লোকগুলো যদি যেতে বাধা দেয় তুমি আক্রমণ করবে।

বিস্মিত হয় অনন্তরাম। বল্লে,—কিছু তো বুঝতে পারছি না শশী বৌদিদি। তোমাকে যেতে বাধা দেবে কেনে?

—যা বলছি শোন'। সময় হ'লে ব'লবো। ভীত কণ্ঠে বললে পূর্ণশশী। কিছু দূরে পথিপার্শ্বে দেখা যায় ক'জন লোক। ভদ্র ব্যক্তি হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু লোকগুলিকে দুর্বৃত্ত ব'লেই মনে হয়। বেশ-ভূষাও কেমন বিসদৃশ। কদাকার আকৃতি।

অনন্তরাম বললে,—ভয় নাই শশী বৌদিদি। কোন শূয়োরের বাচ্চার সাহস হবে না। তুমি চ'লে চল'।

রুদ্ধশ্বাসে পথটুকু চলে যায় পূর্ণশশী। পথিপার্শ্বে লোক ক'টি কেন যে ছিল বোঝা গেল না। লোকগুলির উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে বোঝা যায়। নিকটবর্তী হ'তেই লোকগুলির কেউ কেউ কথা বলে।

অনন্তরাম বললে,—কান দিও না শূয়োরের বাচ্চাদের কথায়।

—বডিগার্ড নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—গহনা ক'টা খুলে দিয়ে যাও দিদি।

—মুখটা দেখিয়ে যাও।

কিছু দূরে কতকগুলো কুকুর। লোক দেখে ডাকাডাকি করে। দুর্বৃত্ত ক'জন দেখতে দেখতে কোথায় লোপাট হয়ে যায়। কুকুরগুলো শুধু ডাকে।

গৃহে পৌঁছে স্বস্তি-শ্বাস ফেলে পূর্ণশশী। বলে,—অনন্ত, দেখলে তো?

—দেখলাম তো। বুঝলাম না তো কিছু। বললে অনন্তরাম।

—বুঝবে কোত্থেকে? সময় ক'রে আসো তো ব'লবো। দেরী হয়ে গেছে ফিরতে, নয় তো বলতাম। বললে পূর্ণশশী। হাঁপাতে হাঁপাতে।

অনন্তরাম বললে,—বেশ কথা। তুমি যাও, আমি আসি।

পূর্ণশশী তৎক্ষণাৎ ভেতরে চ'লে যায় অনন্তরামকে ছেড়ে। বহির্দ্বারে অর্গল তুলে। আশ্চর্য্য হয়ে অনন্তরাম পথ চলে। ভেবে পায় না দৃশ্যটার তাৎপর্য্য।

ঘরে কেউ ছিল না।

রাজেশ্বরী জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে আকাশে চোখ তুলে। শৈশব থেকে আকাশ দেখতে ভালবাসে সে। ঠাগ্‌মা ছড়া ব'লতো, রূপকথা ব'লতো। ব'লতো,—সাত ভাই চম্পা জাগো রে—

রাজেশ্বরী ব'লতো,—সাত ভাই চম্পা কোথায় থাকে ঠাগ্‌মা ?

ঠাগ্‌মা বলতেন,— ঐ আকাশে।

আকাশে ? আকাশ দেখতো রাজেশ্বরী। শুক্ল পক্ষ। আলোয় আলো হয়ে আছে শহর কলকাতা। দূরে দূরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোকবিন্দু। জ্বলছে টিম-টিম ক'রে। আকাশে রুপালী চুমকি, দপ-দপ করছে। কে দেখে না আকাশ! সুখে-দুঃখে কে দেখে না আকাশ! শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কে দেখে না আকাশ! জানে না ঐ গোলার্দ্ধের মধ্যে কত অজ্ঞাত বিজ্ঞান। তবুও আকাশ দেখে মানুষ। বায়ুপ্রেমে কিছুই দৃষ্ট হয় না ঐ অপ্রবেশ্য আকাশে, দেখা যায় কেবল অজস্র গ্রহ-উপগ্রহ। দিগ্‌দর্শী হাওয়া-অফিস আকাশ-লীলা লক্ষ্য করে! বায়ুশকুন আবহাওয়া জানায়। আবহচিত্র দেখে মানুষ বোঝে আকাশ থেকে বারিবর্ষণ হবে। আর্দ্রতা কত ? জোয়ার-ভাঁটার সময়।

ঝিঁ ঝির কীর্ত্তন স্পষ্টতর হয়। শহর কলকাতা হয় স্তব্ধ। নৈশ আকাশে উড্ডীয়মান পেচক।

আকাশে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। জানে না আকাশ-

বিজ্ঞান, তবুও দেখে আকাশ। কত আশা ছিল মনে, মনটা বুঝি ভেঙে গেছে কেন কে জানে। নেশাসক্ত স্বামী—

আকাশ যেন লাঘব ক'রে দেয় মনের আলোড়ন। আকাশ কেড়ে নেয় বুক-ফাটা কষ্ট। রাজেশ্বরী চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে আকাশ। দেখে মেঘের জটলা। দেখে জ্যোতির্ময় জ্যোতিষ্ক। নক্ষত্র-মণ্ডল। আকাশ-বিজ্ঞান জানে না রাজেশ্বরী। জানে না ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, মরীচিকে। জানে না কোথায় ক্যাসিওপিয়া। কোথায় বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র! কোথায় দেখা যায় ছায়াপথ—বিচ্ছুরিত আলো। মুগ্ধ হয়ে দেখে রাজেশ্বরী। দেখে কন্যা, চিত্রা, তুলা।

হঠাৎ চোখে পড়ে দূর-দূরান্তরে নক্ষত্র খসে প'ড়লো তীব্রবেগে। আকাশ থেকে ধাবিত হ'ল ভূলোকে। রাজেশ্বরী জানে না, ঐটা উল্কা।

—আজ কত হ'ল, খাওয়া-দাওয়া হবে না?

এলোকেশীর কথায় বিরক্তি। ঘরে ঢুকেই বললে কথাগুলো। বললে,—ডাকতে পাঠাও খোকাবাবুকে। ভ্যালা ছেলে তো। খেয়াল হয় না, মানুষগুলো না খেয়ে আছে।

রাজেশ্বরী জানলা ত্যাগ ক'রে পর্য্যঙ্কে বসলো। বললে,—না, ডাকতে হবে না। পড়তে গেছে যে। সময় হ'লেই আসবে।

কাছাকাছি ঘরে যেন ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলে উঠলো। শব্দ হ'ল ঠুং-ঠাং। রাজেশ্বরী বললে,—নাচ-ঘর কে খুলেছে এলো?

এলোকেশী বিরক্ত হয়েই বলে,—ঘর সাফ্ করছে যে। পেয়াদা দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন সাফ্ করছে।

রাজেশ্বরী উঠে যায়। এত দিন শুনেছে নাচ-ঘর আছে। দেখতে যায় ঘরটা।

নাচ-ঘর। পর্ব্বোপলক্ষে বাইনাচ হ'ত নাচ-ঘরে।

অন্তঃপুরবাসীদের উপভোগের জন্য ঘরটি তৈয়ারী হয়েছে কত যুগ আগে। চব্বিশটি দ্বারযুক্ত বৃহৎ কক্ষ। উত্তম কার্পেটে আবৃত কক্ষতল। পাশাপাশি কতগুলি আলোর ঝাড়। ক্যাবিনেট আলমারী ও সোফা ধারে ধারে সজ্জিত। ব্র্যাকেটে ঝালর ঝুলছে। দেওয়াল-গায়ে ছবি। রাজেশ্বরী কাছে গিয়ে দেখে চিত্রশোভা। অবাক হয়ে দেখে। তিন প্রিন্ট ছবি। চেনে না, বোঝে না, তবুও দেখে।

বুঝবে কোত্থেকে। ছবিতে যে বিদেশী। লর্ড ক্লাইভ। ওয়াটস্। ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ইলাইজা ইম্পে। ফ্রেডারিং। ফিলিপ ফ্রান্সিস্। ভান্সিটার্ট। সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত জোন্স। কর্ণেল কিড। লর্ড কর্ণওয়ালিস। ওয়েলেসলী। হ্যালিডে। সিসিল বিডন। গ্রে। ক্যাম্বেল। রিচার্ড টেম্পল। বেলী। জে. ই. ডি. বেথুন। রিপন। বেন্টিঙ্ক। মেও, ডেভিড হেয়ার। ক্যানিং প্রভৃতিদের ছবি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি। পূর্ব্বপুরুষদের ইংরেজ-ভক্তির নিদর্শন।

কত যুগ পূর্ব্বে যে কক্ষটি নাচে-গানে মুখরিত থাকতো কে জানে! বাইজীদের কণ্ঠ-ঝঙ্কার, নৃত্যচ্ছন্দ কি এখনও শ্রুত হয়! কক্ষটির দুই বিপরীত দেওয়ালে দু'টি আয়না। [illegible] প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। ঝাড়-লণ্ঠনের প্রতিবিম্ব। শত সহস্র ঝাড়-লণ্ঠন দেখা যায়। অন্তঃপুরবাসীদের হাস্যলাস্য কি এখনও মোহ সৃষ্টি করে? এখনও কি পাওয়া যায় আতর-গোলাবের সুগন্ধ! যে-কক্ষে পূর্ব্বে খেলার সামগ্রীরূপে পুষ্পমালা হেলাফেলা হ'ত তথায় কি দু'একটা শুষ্ক পাপড়িও পাওয়া যাবে না! দুর্মূল্য কার্পেটে কি দেখা যাবে না কিঞ্চিৎ অলক্তরেখা! মখমলের বালিসে একটি কি দু'টি চূর্ণ কেশ!

পেয়াদা এবং অন্যান্য লোকজন মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে।

রাজেশ্বরী দেখছে। আয়ত আঁখি-যুগল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে কক্ষটি। নাচ-ঘর দেখছে রাজেশ্বরী।

দালানে শুয়ে পড়েছিল এলোকেশী।

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেছিল। কিন্তু নিদ্রা জয় করে ফেলেছে এলোকেশীকে। এলোকেশী দালানে গড়িয়ে পড়েছে ঘুমে অচেতন হয়ে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে রাজেশ্বরী ডাকলে,—এলো, তুমি তো আচ্ছা লোক! উঠে পড়ো। লোকে কি ভাববে!

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো এলোকেশী। বললে,—ঘুমিয়েছি আমি? পড়ে আছি, কি করবো?

রাজেশ্বরী বললে,—অনন্তকে বল' ডাকতে। পড়া শেষ করতে বল'।

—বলি। বলে এলোকেশী। উঠে যায় দালান থেকে।

রাজেশ্বরী ঘরে গিয়ে বসে পর্য্যঙ্কে। মুদিত চক্ষে বসে থাকে। নাচ-ঘর থেকে শব্দ আসে ঠুং-ঠাং। ঝাড়-লণ্ঠনের শব্দ। ঘর সাফ করছে লোকজন।

টাকাটা লুকিয়ে রেখেছিল।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল কতক্ষণে ফর্সা হবে আকাশ। পাঠ্য-পুস্তক প'ড়ে থাকে। গহরজান যে মনটা অধিকার ক'রে আছে। টাকাটা দিলে গহর কত যে খুশী হবে।

—খাওয়া-দাওয়া করতে হবে যে। ঢের পড়েছো। অনন্তরাম বললে ঘরে ঢুকে। বললে,—তোকে পড়তে দেখে আমি হাতে স্বর্গ পাই। লেখা-পড়া ক'রে মানুষ হ', চোখ টাটাবে কত লোকের।

—লেখাপড়া ক'রে কি হবে! বললে কৃষ্ণকিশোর। রুক্ষ মেজাজে। বললে,—কষ্ট ক'রে পড়ে লাভটা কি হবে? পড়বে গরীব লোক, পড়ে চাকরী করবে। উপার্জ্জন করবে।

—লেখাপড়া গরীবদের জন্যে! কথাটা ব'লে হেসে ফেললে অনন্তরাম। হতাশ হাসি। হাসতে হাসতে বললে,—চাকরীর জন্যে শুধু লেখাপড়া? আশ্চর্য্য। কে শেখালে?

কৃষ্ণকিশোর ভ্রূ কুঁচকে বলে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকরীর জন্যেই লেখাপড়া। লেখাপড়া জানা লোক হ'লেই চাকরী পেয়ে যায়। আমাকে চাকরী করতে হবে না। যা আছে বেশ হেসে-খেলে চলে যাবে।

হেই-হেই ক'রে ওঠে অনন্তরাম। বলে,—ছি, ছি, আমি তা বলি নাই। বলতে চাই নাই। লেখাপড়া, বিদ্যা, বিদ্যায় জ্ঞান হয় যে! বিদ্যা না থাকলে মানুষ মানুষ হয়? বিদ্বান লোক পূজো পায়। বিদ্বান লোক—

কথার মাঝেই কথা বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—শিক্ষা দিতে হবে না, থাক্।

অনন্তরাম তবুও বলে,—দেখো, আমাকেই দেখো। লেখাপড়া জানলে চাকর হয়ে থাকতাম! দুর্ভাগ্য যে মূর্খ হয়ে আছি। যাই হোক, চল', খাবে চল'। ভাত-টাত কড়কড়িয়ে গেল।

অনন্তরাম ভাবে, যে বুঝবে না তাকে বুঝিয়ে কি হবে। কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনন্তরাম। হতাশ-মনে। অনন্তরাম বোঝে, দৃষ্টি হুজুরের বদলে গেছে, ভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সম্পত্তি পেয়ে ভোল পালটে গেছে।

খাওয়া হয়ে যেতে পর্য্যন্ত বসেছিল দু'জন।

রাজেশ্বরী বললে,—পণ্ডিত মশাইকে ডেকে পাঠাবে?

অবাক-চোখে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। কৌতূহলী হয়ে বলে,—পণ্ডিত মশাইকে! তুমি জানলে কোত্থেকে?

হেসে ফেলে রাজেশ্বরী। বলে,—বল' তো কোত্থেকে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কে জানে। পণ্ডিত মশাইকে ডেকে কি হবে?

রাজেশ্বরী বলে,—পড়বে তুমি। বললাম যে, আমি চাই তুমি লেখা-পড়া ত্যাগ না কর'।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—দেখা যাবে। পণ্ডিত মশাইকে ডাকাতে হবে? পণ্ডিত মশাইকে ডাকিয়ে পড়বো আমি?

ঘুম-চোখে তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। লণ্ঠনের আলোয় চোখ দু'টো তবুও জ্বল-জ্বল করে। বলে,—হ্যাঁ! লেখাপড়ায় কত জ্ঞান হয়। লেখাপড়ায়—

কথাগুলো শোনে, কিন্তু মন ছুটে চলে কোথায় রাজেশ্বরী জানে না। কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, কতক্ষণে ফর্সা হবে আকাশ। কতক্ষণে আলো ফুটবে। কুঙ্কুম ছড়াবে আকাশে। কতক্ষণে দেখা দেবে গ্রহপতি আদিদেব সহস্রাংশু সূর্য্য।

জড়োয়া টায়রাটা যেন শূন্যে দেখতে পায় কৃষ্ণকিশোর। আকাশ শুভ্র হ'লে টায়রাটা—

কখনও হয়তো দেখা যায় এমন কিছু, হাজারো ঝড়ের তুফানে যা মুছে যায় না মন থেকে। শাশ্বতী কণ-স্মৃতি। জল-জল করে যেন স্মৃতিটা। মনটাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে গেছে ঐ পূর্ণশশী। শুধু হ'য়েছে দৃষ্টি-বিনিময়, দেখেছে কয়েক মুহূর্ত। বেশীক্ষণ দেখতে লজ্জা পেয়ে চ'লে গেছে দৃষ্টির বাইরে। কেন কে জানে, পূর্ণশশীই কি এক শঙ্কায় যেন কাতর হয়ে থাকে। মুখে কথা ফোটে না, শুধু চেয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টি মেলে। পূর্ণশশী, শশীবৌ, বৌ,—কত নাম হয়েছে এখন—কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আকৃতিতে। দেখলে কি মনে হয় যে সেই পূর্ণশশী। মনে হয় না। অবোধ্য রূপ, ধরা যায় না কত যে বয়স—যেন বয়সকে ফাঁকি দিয়ে হয়ে আছে অটুট-যৌবনা। চোখে ধুলো-দেওয়া রূপচ্ছটায় এখনও পরিপূর্ণ পূর্ণশশী আসে হঠাৎ। থাকে কিছুক্ষণ। চলে যায় হাওয়ায়-ওড়া মেঘের মতই। সাজ-সজ্জায় চমক এখন নেই, শুধু আছে হরেক রকম রঙীন শাড়ীর সখ। আর শুধু গয়না। অঙ্গে যেন মিশে যায় গয়নাগুলো। চুড়ি, কাঁকন, তাবিজ। কানে চুনীর টব। রাঙা ঠোঁটের দু'ধারে লাল চুনীর রক্তিম চাকচিক্য। মাথায় থাকে গুণ্ঠন, নয় তো দেখা যেতো চালচিত্র খোঁপায় এখনও [illegible] বাগান। ফুল-কাটার-বাগান। পূর্ণশশীর দাঁতে মিসি, হাতের তালুতে মেহেদি। স্নিগ্ধ-শান্ত হাসিতে ভরে থাকে মুখটা। তবুও কোথায় যেন ব্যথার ক্ষীণ রেশ পাওয়া যায়। হাসিতে না কথায়, চাউনি না ভাবভঙ্গীতে ঠিক বোঝা যায় না। পূর্ণশশীর ম্লান দৃষ্টিতে কেন যেন হতাশ-ছায়া।

ঘুমের ঘোরেও মনে পড়ছিল ঐ পূর্ণশশীকে।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল পূর্ণশশীর যখন বিয়ে হয়নি, তখনকার কথা। কত দিন আগের কথা! যোগ্য ঘরে বিয়ে হয়েছে, পেয়েছে যোগ্য পাত্র। পূর্ণশশীর স্বামী প্রত্নতত্ত্বের গবেষক, অধ্যাপনাবৃত্তিতে কালাতিপাত করেন। বৈদেশিক সাময়িকপত্রে গবেষণামূলক লেখা মুদ্রিত ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। তক্ষশিলা, মহেঞ্জোদড়োর পাতালিক ভগ্নস্তূপ পরীক্ষা ক'রে ঐতিহাসিক সময়-নির্ণয় করেন। মৃন্ময় স্তূতত্ত্বে মোহগ্রস্ত তিনি,—পলি, খাড়ি ও শিলাময় ভূগর্ভে বিগত কৃষ্টির পরিচয় উদ্ধার করেন। কঙ্কাল-করোটি দেখে ব'লে দেন আর্য্য না অনার্য্য, মঙ্গোলীয় না ককেশীয়। মৃত মানুষ ও পশুর অস্থি, কণ্ঠমণি, নেত্রগোলক, পশু'কা, কোটর, মেরুদণ্ড, ও জঙ্ঘাস্থি পরীক্ষা করতে-করতেই তিনি বিভোর হয়ে থাকেন। 'ন্যাশানাল জিওগ্রাফি' ম্যাগাজিন থেকে আমন্ত্রণপত্র আসে, লেখা দেওয়ার তাগিদ-পত্র। পূর্ণশশী পরিহাসচ্ছলে তাঁকে ডাকে এক নামে। বলে,—তুমি মহেঞ্জোদড়ো।

আসল নাম কাশীকিঙ্কর। কাশীকিঙ্কর নামটা শুনলে কত সায়েব-সুবো পর্য্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। দেশ-বিদেশের উদ্যোগী খনন-কার্য্যের দল থেকে সাহায্যকারী হিসাবে আহ্বানেও সাড়া দিতে হয় কাশীকিঙ্করকে। মেক্সিকো, [illegible] ভ্যাটিকান থেকেও ডাক পড়েছিল। সম্মানযোগ্য পাথের [illegible] বহু হয়েছিল আহ্বানকারীরা। কাশীকিঙ্কর সময়া-[illegible] জন্য অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। পূর্ণশশী স্বামিগর্ব্বে গর্ব্ব বোধ করে। [illegible] তবুও কেন কে জানে, পূর্ণশশীর দৃষ্টিতে মালিন্য। দুই পুত্র-কন্যার জননী পূর্ণশশী, তবুও তো এখনও অক্ষয়যৌবনা। তবে কেন যে শশীবৌ হেসেও হাসে না কে জানে!

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল এখনই না হয় শশীবৌদির গায়ে গহনা উঠেছে রাশিরাশি। মাথায় চড়েছে ঘোমটার ঢাকা। কিন্তু যখন সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না, যখন ছিল না বধূবেশরূপ, তখনকার কথা। মধ্যে ঐ শশীবৌদিদি যেন কুমুদের ফুল হয়েছিল, কত—কত দিন দেখা নেই। কুমুদিনীর বুক

পড়তে করছে আসা-যাওয়া। আসছে ইদানীং কখনও কখনও। নয় তো কত দিন দেখা নেই শশীবৌদিদির, বোধ করি যত দিন বিয়ে হয়েছিল তত দিন।

—দিদি বেশ লোক। খুব ভাল লাগে আমার। যেমন রূপ তেমন কথাবার্ত্তা। দিদি তোমাদের কে হয়? হঠাৎ কথাগুলো জিজ্ঞেস করলে রাজেশ্বরী। বললে,—তোমাদের আত্মীয়?

ঘরটা তখন অন্ধকার। নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে লণ্ঠনের আলো। শুয়ে পড়েছিল দু'জনে। কাছে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—না, আত্মীয় কে বললে? শশীবৌদি, শশীবৌদি আমাদের পাড়ার মেয়ে। পাড়াতেই বিয়ে হয়েছে শশীবৌদির।

মুক্ত বাতায়ন। দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত শান্ত আকাশ। নিবিড় মেঘ ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে নক্ষত্র,—হীরকচূর্ণ যেন। ঘনকালো আকাশে চোখ তুলে শুয়েছিল রাজেশ্বরী। ঘুমের আবেশে স্তিমিত চোখ, পূর্ণশশীর কথা তবুও শুনতে ভাল লাগে। রাজেশ্বরী বললে, —তুমি কত দিন দেখছো দিদিকে?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে কৃষ্ণকিশোর। যেন ভাবতে থাকে পূর্ণশশীর পূর্ব্বকথা। বলে,—কত দিন মনে নেই। জ্ঞান হ'ওয়া পর্য্যন্ত দেখছি। আগে আগে খুব আসতো, বিয়ে হ'তে বেশ কিছু দিন [illegible] পাওয়া যেতো না।

পূর্ণশশীর কথা বলতে গিয়ে কত কথা যেন অব্যক্ত থেকে যায়। পূর্ণশশীর পূর্ব্ব-পরিচয় বলা হয় না। বোধ হয় বলা যায় না। ছায়া-ছায়া মনে পড়ে, কত দিন আগের কথা। তখন কেবল শৈশব উত্তীর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণকিশোর ছিল পূর্ণশশীর দূত। অন্তত বাহক বললেই হয়।

পুরভাত কৃষ্ণকান্ত তখন জীবিত। তরুণ যুবক। গৃহের আঙিনায়

ছায়ামণ্ডপে ব'সে দু'বেলা অধ্যয়ন করতেন। শুভ্রপ্রশান্ত মূর্তি দিব্যাকৃতি ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকান্ত একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রপাঠ করতেন। বেদ, স্মৃতি ও সঙ্গীতশাস্ত্র। পূর্ণশশী তখন চপলা কুমারী। ব্রত পালন করতে হ'ত পূর্ণশশীকে। মেয়েলী ব্রত। পূর্ণশশী বাগানে ফুল তুলতে আসতো। প্রজাপতির মত নেচে-নেচে ফুল তুলে সাজি পূর্ণ করতো। কচি-কচি বিল্ব, তুলসী ও দূর্বা চয়ন করতো। প্রতিবেশী মেয়ে, ব্রতে পুষ্পার্ঘ্য দেবে, আপত্তি করতো না কেউ। পুষ্পগন্ধবাহী ঠাণ্ডা হাওয়া বইতো। মধুলোলুপ অলিদল ওড়াওড়ি করতো গন্ধে মাতাল হয়ে ফুলে-কুঁড়িতে।

রূপকথার রূপকুমারী—কোথা থেকে এলো। প্রথম দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পূর্ণশশী তখন একটা গাছের প্রায় শিখর ধ'রে নামিয়েছে। অজস্র জুঁইপদ্ম ফুটেছিল গাছটিতে। কৃষ্ণকান্তের বিস্ময়পূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টির সমুখে অধিকক্ষণ চোখ তুলে চাইতে সাহসী হয়নি পূর্ণশশী। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত দেখেছিলেন, লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলেন মেয়েটিকে। দেখেছিলেন সৌম্য রূপপ্রভা, প্রথম সূর্য্যালোকের মত রূপচ্ছটা। আয়ত আঁখিযুগলে আবেগমাখা দৃষ্টি। খোঁপায় ঝুলছে মাধবীর স্তবক। বিলুণ্ঠিত শাড়ীর আঁচল চুমা খাচ্ছে ঘাসফুলকে।

কুমারী হ'লে হবে কি, পূর্ণশশীও কয়েক পলকে দেখেছিল কৃষ্ণকান্তকে। শুভ্র ব্রাহ্মণ, বক্ষে উপবীত; রুদ্রাক্ষের মালা। ললাটে চন্দন-তিলক। বাহুতে মঙ্গল-কবচ। ছায়ামণ্ডপে ব'সে তখন শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পূর্ণশশীকে সহসা দেখতে পেয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কিয়ৎক্ষণ। পূর্ণশশী দেখেছিল, চোখ দু'টি যেন শিবনেত্র। বৃক্ষলতা সাক্ষী ছিল দু'জনের দেখাদেখির, সাক্ষী ছিল অনন্ত আকাশ। প্রভাত-সূর্য্য।

—তুমি কে? মনে মনে ব'লেছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

হয়তো পূর্ণশশীও অস্ফুট কণ্ঠে ব'লেছিল,—কে তুমি?

বড় বাধা হ'য়েছিল যেন দিবালোকে। লজ্জা দিয়েছিল আলো।

লজ্জাহীনের মত। কতকগুলো শালিক হঠাৎ ডাকতেই সসম্ভ্রমে অদৃশ্য হয়েছিল পূর্ণশশী। কুমারী-মনকে প্রথম বিবাক্ত ক'রে।

পাঠে বিঘ্ন হয়েছিল কৃষ্ণকান্তর। যাকে দেখলেন, যা দেখলেন, সত্য না মিথ্যা ভাবছিলেন তিনি। স্বর্গ থেকে আবির্ভাব হ'ল, না মর্ত লোকের— আকুল হয়ে ভাবছিলেন। আবিষ্টচিত্তে। কৃষ্ণকান্তর ব্যগ্র দৃষ্টি অনুসন্ধান করে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে। কোথায় কে, শুধু পুষ্পশোভা। শুধু শেফালী, মাধবী, মালতী। শুধু কামিনী, অতসী, দোপাটী। শুধু সূর্য্যমুখী।

মনসিজের ফুলধনুতে তখন বিদ্ধ হয়েছে দেহ-মন। পূর্ণশশীও জর্জ্জরিত হয়ে দ্রুতপদে চলেছে গৃহপথে। সাজি থেকে পড়ে যাচ্ছে কত ফুল, দৃষ্টি নেই। বক্ষমাঝে জেগেছে তখন অপূর্ব্ব কান্তিময়ের মুখচ্ছবি, কল্পনাতেও যাকে কখনও দেখেনি পূর্ণশশী।

কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে রাজেশ্বরী। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভেবে-ভেবে যেন ক্লান্ত রাজেশ্বরী, নেশাসক্ত স্বামী হওয়ার ভাবনায়। খুব দূরে, কোথায় শৃগাল ডাকছে আকাশ কাঁপিয়ে। পাল্লা দিয়ে ডাকছে। ডাক শুনে অন্যান্য দলও হয়তো ডাকতে থাকে। প্রতি-ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে নিশীথ-নগরী। ঘুমের ঘোরে যেন চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। ভয় পেলে শিশু যেমন চমকায়।

ছায়া-ছায়া মনে পড়ছিল। ছবির মত দেখতে পায় কৃষ্ণকিশোর কত দিন আগের মুছে-যাওয়া ছবি। মাঝে-মিশেলে দেখা হ'লে বলতো পূর্ণশশী। বলতো,—যাও তো, ডেকে দাও তো। কাকাকে বল' তো আমি ডাকছি।

দিনে দিনে পূর্ণশশী তখন বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। লজ্জা নেমেছে দেহবল্লরীতে ; দৃষ্টিতে বিনম্র সঙ্কোচ ; চলাফেরায় সলজ্জ ভঙ্গিমা। প্রতিবেশী, কালে-অকালে মেয়েমহলে মহলে আনা-যাওয়া ছিল। সুযোগ ছিল দেখা

হওয়ার। প্রথম থেকে কৌতূহলী মন যেন অদম্য হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণকান্ত শুধিয়েছিলেন কুমুদিনীকে। ফাঁক পেয়ে নির্জ্জনে জিজ্ঞেস করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত,—বৌঠান, মেয়েটিকে দেখলাম কিন্তু ঠিক চিনতে—

মুনি-ঋষির মুখে যেন অসৎ কথা শুনেছিলেন কুমুদিনী। বিস্ময় এবং কৌতুকে তিনিও উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

—মেয়ে, তুমি দেখলে মেয়ে! বলতে বলতে বেশ হেসেছিলেন কুমুদিনী।—কা'কে দেখলে বল' তো? কোথায় দেখলে?

ক্রোধে এবং লজ্জায় কৃষ্ণকান্ত বেশী কিছু শুনতে না চেয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন। কুমুদিনী বলেছিলেন,—চ'লে যাচ্ছো, কে চিনিয়ে দেবে!

কৃষ্ণকান্ত ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বললেন,—বল' না ছাই। বলছ কৈ?

কুমুদিনী টের পেয়েছিলেন মনে-মনে। বললেন, হেসে হেসেই বললেন, —আহা, মেয়েটি যদি কুলীন না হ'তো!

কুলীন!

চড়াৎ ক'রে ওঠে যেন বুকের ভেতরটা। অধিক কথা যেন শুনতে মন হয় না কৃষ্ণকান্তর। কুলীন! কুলীনকুলসর্ব্বস্বা। কুমুদিনী বললেন, —পাড়াতেই থাকে। অধর চাটুজ্জের মেয়ে। মেয়েটি যেন রূপে-গুণে—

গম্ভীর প্রকৃতি ছিল কৃষ্ণকান্তর। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু কি না ক'রে কি কাজের অজুহাত দেখিয়ে চ'লে গেলেন অন্যত্র। কৃষ্ণকান্ত চ'লে গেলেও কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কতক্ষণ। কি ভাবলেন কে জানে। মুখে ফুটে উঠলো খুশীর হাসি। 'কুলীন' কথাটা বলতেই ঠাকুরপো কেন যে হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে উঠলো, দেখতে পেয়েছিলেন কুমুদিনী। তবুও হেসেছিলেন মৃদু হাসি ঋষির ভাব-পরিবর্ত্তনে।

আবছা আবছা মনে পড়ে।

দু'জনে হাসতেন দু'জনকে দেখে। কৃষ্ণকিশোরের মনে পড়ে এরই শৈশবের কয়েকটা দৃশ্য। ঐ পূর্ণশশী দাঁড়াতো দেওয়াল ঘেঁষে, দেওয়ালের সঙ্গে মিশে। দেহটা যেন সর্পিল গতিতে লতিয়ে উঠতো থেকে থেকে। ফর্সা ধবধবে বাহু দু'টো তোলা থাকতো মাথায়। বারে বারে খুলে-যাওয়া চুলের খোঁপা জড়াতো পূর্ণশশী। দাঁড়াতো এমন জায়গায়, যেখানে চট ক'রে অন্য কেউ আসতো না।

পূর্ণশশী হাসতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দুষ্টুহাসি। মুখ টিপে টিপে হাসতো। হাসতেন কৃষ্ণকান্ত। হাসির উত্তরে হাসতেন? লুকানো হাসি দেখে কিছু বুঝতো না, কৃষ্ণকিশোর তখন শিশু।

কিছুটা অনুমানে বুঝেছিলেন কুমুদিনী। পূর্ণশশীর আসাযাওয়াটা কেমন চোখে লাগতো যেন। মুখ ফুটে কিছু বলতেন না তিনি। কৃষ্ণকান্তর সদাগম্ভীর মুখে যদি হাসি দেখতে পাওয়া যায়, ঠাকুরপো যদি বীতস্পৃহ না হয়ে হাসিমুখে থাকে—কুমুদিনী দেখে-শুনেও তাই মুখ ফুটে বলতেন না কিছু। পূর্ণশশীকে সময়ে-অসময়ে ডেকে পাঠাতেন, বড়ি দেওয়ার ছলে, পাঁচালী শুনতে। পূর্ণশশীর চুল বেঁধে দেওয়ার নামে।

কুমুদিনী চুল বেঁধে দিতে দিতে বলতেন,—শশী, তোরা যদি কুলীন না হয়ে হতিস্ আমাদের ঘরের!

কথাটা পূর্ণশশীর মনেও কত বার উদিত হয়েছে। মনে হ'তে ধিক্কার দিয়েছে নিজেকে, ধিক্কার দিয়েছে কৌলীন্যপ্রথাকে। মনে উদয় হ'তে বুকটা যেন ফেটে গেছে, তবুও মুখটা ফোটেনি। ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি কাকেও। পূর্ণশশীর আত্মাহুত ষোড়শী-মনে বড় ব'য়ে গেছে, কেউ জানেনি।

—অক্ষর-পরিচয় আছে?

কথা বলার সুযোগ পেয়ে শুধিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। স্বভাবগম্ভীর কণ্ঠেই জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন।

পূর্ণশশী এতকাল [illegible]। বোধ করি অপমান বোধ ক'রে-ছিল। মৌন থাকলে পাছে সবকিছু প্রকাশ পায়। পূর্ণশশী বলেছিল,—মৈত্রেয়ী, অনসূয়া, চিত্রলেখা, লীলাবতী না হ'লেও পড়তে আমি জানি।

নামগুলো শুনে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। বলেছিলেন,—পাঠশিক্ষা, লেখাপড়ায় কত জ্ঞান হয়। স্বাধীন দেশে স্ত্রীজাতি শিক্ষা পেয়ে কত উন্নত হয়েছে। তুমি লেখাপড়া কর'। পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধিতে স্ত্রীজাতি চতুর্গুণা।

কথাগুলি শুনে খটকা লেগেছিল পূর্ণশশীর।

অবোধ্য না ঠেকলেও আশাতীত মনে

হবে শুধু মিষ্টি কথা, পূর্ব্বরাগের ভাবাবেগ।

বুঝেছিল, কৃষ্ণকান্ত কেমন যেন বদলে যাচ্ছেন।

নৈকট্যের আহ্বান নেই। কথা বলতে হয় তাই যেন কথা বলেন। কৃষ্ণকান্তর মুখে হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে।

কেন, কেন, কেন? আশাহত ষোড়শী-মন পূর্ণশশীর। বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরে যেতো। কখনও বিবস্ত্রা হ'লে গোপনে নিজেকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। ব্যর্থবাদ।

কৃষ্ণকান্তর মন যে তখন সভা-সমিতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। কোথায় লেকচার দিচ্ছেন সখারাম গণেশদেউস্কর, রবিবাবু কোথায় কবিতা পাঠ করছেন, সুরেন বাঁড়ুজ্যে কোথায় বক্তৃতা দেবেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত ফেরারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোথায় ব্রাহ্মণ-সভা বসেছে; কৃষ্ণকান্ত [illegible] হয়েছেন সেখানে। নয় তো উত্তোক্তা।

স্বদেশী যুগ। স্বদেশী মেলা দেখে দেশবাসী জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

এক হাতে গীতা, এক হাতে বোমা! আধ্যাত্মিক দেশপ্রেমে জেগেছে তখন মানুষ। দিকে দিকে ছড়িয়েছে মুক্তির মন্ত্র। ধর্মপথে মুক্ত করতে হবে দেশকে, শৃঙ্খল ছিঁড়তে হবে। দাসত্ব-মোচনের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত!

কৃষ্ণকান্তকে কেউ ডাকেনি। তিনিই [illegible]। [illegible] অধিকক্ষণ থাকতেন না। কোথায় যেতেন কেউ জানতো না। যেতেন সভা-সমিতিতে, যেতেন গুপ্ত আড্ডায়। কৃষ্ণকান্তর আকৃতি [illegible], সাধকের সাজ-সজ্জা। গৈরিক বস্ত্র, গৈরিক উত্তরীয়। মাথায় চুল চূড়া ক'রে বাঁধা। শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ। ললাটে তিলক। কণ্ঠে স্ফটিকের মালা, শূন্য পদ। অশ্বপৃষ্ঠে যেতেন যেখানে খুশী। ওয়েলার ছিল একটা কৃষ্ণকান্তর। কৃষ্ণকান্ত ব্যতীত অন্যকে চিনতো না। পথ কাঁপিয়ে ছুটতো তীব্রগতিতে।

পূর্ণশশীর ডাক কানে পৌঁছতো না হয়তো। পূর্ণশশী সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকতো ঘরের জানলায়। দেখতো অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণকান্ত বেরিয়েছেন। ওয়েলারের পদশব্দে পথ ছেড়ে দিচ্ছে পথিক-জন। পূর্ণশশীর চোখ থেকে জল পড়তো টুপ-টুপ। দুঃসহ ব্যথায় গুমরে উঠতো মনটা।

দেখা হ'লে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বলতো পূর্ণশশী,—কাকা কোথায়? লক্ষ্মী ছেলে বল' তো।

কৃষ্ণকিশোর বলতো,—কি জানি কোথায়। ক'দিন দেখছি না কাকাকে।

পূর্ণশশীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো করুণ ছায়া। হতাশ-চোখে চেয়ে থাকতো কতক্ষণ ধ'রে।

—ঘুমোলে? চুপিসাড়ে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর

সাড়া পাওয়া যায় না। রাজেশ্বরী ঘুমিয়ে যেন কাদা হয়ে গেছে। বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েছে কখন।

অন্ধকারে একটা মুখ। না, ভুল দেখেছে কৃষ্ণকিশোর। শুধু একটা মুখ! যে দিকে চোখ ফেরায় দেখা যায় মুখটা। প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্ম যেন একটা। মুক্তার কর্ণভূষা কানে, বাঁকা সিঁথিতে মুক্তার সিঁথি, চিবুকের তলায় দুলছে মুক্তামালা। গলায় দপদপ করছে একটা ধুকধুকি। বৈদূর্য একটা।

অধরোষ্ঠে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। নয়নে দিশা নেই, শুধু চেয়ে আছে আঁখি মেলে। ঘন চুলের রাশি ঢাকা পড়েছে ওড়নায়। ঘন লাল রঙের মখমলিনে।

গইয়জান? তুমি কোথা থেকে?

মনশ্চক্ষে দেখছিল কৃষ্ণকিশোর। মনে মনে বলছিল, টায়রা দেব তোমাকে। টায়রা নিয়ে যাবো। জড়োয়া-টায়রা। যাও, ঘুমিয়ে পড়'।

—কবে আসবে কাকা? আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কখনও হয়তো চুপি-চুপি বলতো পূর্ণশশী।

—জানি না। শুনছি শীঘ্রি আসবে। বলতো কৃষ্ণকিশোর।

—কোথায় গেছেন? পূর্ণশশীর কথায় কঠিন ব্যগ্রতা।

—কেউ জানে না। ব'লে যায় না, কোথায় যায়। শুনছি হুগলীতে গেছে। উত্তরপাড়ায়। লোকমুখে যা শুনতো বলতো কৃষ্ণকিশোর।

উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়ার দামাল ছেলে মিছরীবাবু তখন শিষ্য হয়েছেন দেশসেবকের কাছে।

মিছরীবাবুকে পিতা প্যারীমোহন পর্যন্ত বাগ মানাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। ছেলে জনগণের হিতার্থে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন—পিস্তল দাগতে শিখেছেন।

কৃষ্ণচরণ ভাইকে যেমন চিনতেন তেমন অন্য কেউ চিনত না। কৃষ্ণকান্তর গতিগতি লক্ষ্য ক'রে বললেন,—পিতৃপুরুষের কষ্টার্জিত বিষয়টা বিকিয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ খোঁজ ক'রে গেছে তোমার। সন্ন্যাসী সেজে হিংসাত্মক কাজে লেগেছ?

অগ্রজ। পিতৃতুল্য অগ্রজ।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দেওয়ায় সাহসী হবেন? বিনয় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। বাক্যস্ফূর্তি হ'ত না কৃষ্ণকান্তর।

পূর্ণশশী কৃষ্ণকান্তকে দেখতে পায়। পুকুর-যাওয়ার পথে। ফাঁক পেয়ে বলেছিল,—সন্ন্যাসী হয়েছো তুমি?

কৃষ্ণকান্ত স্মিত হাস্যে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কথাটা।—ভাল আছো তুমি? অনেক দূর থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

চোখে জল টলমলিয়ে উঠেছিল। বাঙালী বালাইয়ে তখনও বিয়ে না হ'লে কি হবে, বেশ ডাগর হয়ে উঠেছিল পূর্ণশশী। শাড়ীতে দেখিয়েছিল যেন কত বিজ্ঞ। পরিপূর্ণ বিকাশে তখন পূর্ণশশীর দেহটা ঢল-ঢল। তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে দাঁড়িয়েছিল পুকুর-যাওয়ার পথে। কুশল জিজ্ঞাসায় বলেছিল,—খুব ভাল আছি।

কৃষ্ণকান্ত বলেছিলেন,—মনে হয় তুমি গার্গী, তুমি মৈত্রেয়ী, তুমি খনা হয়েছো। মনে হয়—

কথা শেষ হয় না। ধমকে ওঠে পূর্ণশশী। বলে,—থাক্, বৃথা কথা থাক্। শুনলাম তুমি দেশসেবায় লেগেছো!

—তোমাকে দেখা যায় না কত দিন। কৃষ্ণকান্ত কথাটা চেপে গিয়ে বললেন,—কত দিন হয়ে গেছে, দেখা যায় না।

—থাক, দেখা হয়ে কাজ নেই। কাতর কণ্ঠে বলে পূর্ণশশী। বলে,—দোহাই, তুমি, তুমি তেমন হও না। তুমি যে কেমন হয়ে যাচ্ছো দিন-দিন!

কথা বলতে বলতে কিছুটা কাছে এগিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পূর্ণশশী দেখলে, কৃষ্ণকান্তর দৃষ্টিতে যেন স্পৃহা নেই, মুখাবয়বে কেমন যেন রুক্ষ-কঠোর গাম্ভীর্য। কৃষ্ণকান্ত পুকুর-ঘাটে চলেছিলেন। বললেন,—কত ভাল দেখতে হয়েছো তুমি? কোথায় যাচ্ছো, বৌঠান ডেকেছে বুঝি? যাও, কোথায় কে দেখবে।

কথা বলতে বলতে পূর্ণশশীকে ছেড়ে ঘাটের দিকে চললেন কৃষ্ণকান্ত। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল পূর্ণশশী। দেখেছিল গমনোদ্যত মানুষটাকে। দেখেছিল সাশ্রুলোচনে।

ঠাকুরপোকে গৃহে ফিরতে দেখে মিথ্যা অছিলায় কুমুদিনী ডাকিয়েছিলেন পূর্ণশশীকে। যেমন ছিল তেমনি বেশে এসেছিল পূর্ণশশী। ম্লান বেশে।

কৃষ্ণকান্ত তখন যেন ঘুম থেকে জেগেছেন।

ঘুমে অচেতন ছিলেন। ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হবে, কথাটা কানে মন্ত্র পড়েছে কে কৃষ্ণকান্তর। বিদেশীদের কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ভারতবর্ষকে। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সঙ্গীতচর্চাতে কালাতিপাত করতে করতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন কি এক লুকানো মন্ত্রে—যে-মন্ত্র তখন বাঙলা থেকে ছড়িয়েছে সমগ্র ভারতে। ভারত থেকে এশিয়ায়।

ঘুমের ঘোরেও যেন মন থেকে মুছে যায় না ঐ পূর্ণশশী। কৃষ্ণকিশোর ভাবে পূর্বকথা। পূর্ণশশীর সঙ্গে সঙ্গে খুল্লতাতকেও মনে পড়ে। কৃষ্ণকান্তর সাধক রূপ।

কৃষ্ণকান্ত যে তখন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন কাদের সঙ্গে কেউ জানতো না। রীতিমত যাওয়া-আসা। মন্ত্র পড়ছেন, দিন নেই, রাত্রি নেই, মন্ত্র পড়ছেন। অস্পষ্ট মনে পড়ে, মা কুমুদিনী অন্দরে ঘরে গিয়ে লুকোতেন। মূর্তি হয়ে উঠতো যেন পাষাণ। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন।

বৈঠকখানা-ঘরে পুলিশ আসতো! লাল-পাগড়ী। সাদা মুখের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। কৃষ্ণচরণকে জেরা করতো। শাসাতো। ভয় দেখাতো জমিদারী উচ্ছেদের। ভয় দেখাতো কালাপানির। ভাইকে সামলাও।

পূর্ণশশী দূরের কথা, কৃষ্ণচরণ পর্যন্ত ভেকেছিলেন। কানে উঠলো না কথা। পিতৃতুল্য অগ্রজ ভাইকে সামলাতে হিমশিম খেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঘোড়া থেকে প'ড়ে মৃত্যু যদি না হ'ত, কি হ'ত বলা যায় না।

কৃষ্ণকান্তকে পড়িয়েছিলেন যে-গুরু, তিনিই ছদ্মবেশে ছিলেন। পরিচয় জানতেন না কৃষ্ণকান্ত। গুরু দেখিয়ে দিলেন পথ। বুঝিয়ে দিলেন মত। পথ ও মত মেনে নিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। মন থেকেই মেনেছিলেন।

হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করতেন। ত্রিসন্ধ্যা জপ করতেন। গীতা পাঠ করতেন সময়ে-অসময়ে। খুশী থাকলে, মেজাজ ভাল থাকলে, মৃদঙ্গ বাজাতেন। বেহালা বাজাতেন। পিয়ানো বাজাতেন।

রক্তের বদলে রক্ত।

মানুষের বদলে মানুষ চাই। বাঙলা দেশে তামার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে যুবক-দল। পরিত্যক্ত জনহীন বাগানে লুকিয়ে পূজা চ'ড়েছে তামার পায়ে। রক্তজবা। আঁধারে ধূনি জ্বলছে ধিকি-ধিকি। তামার পায়ে পূজারীদের সঙ্গে হিংস্র শৃগাল! লাঠি খেলা, অসি খেলা শেষ ক'রে পূজায় ব'সেছে ঘনান্ধকারে, মন্ত্র আওড়াচ্ছে। রক্তের বদলে রক্ত। মানুষের বদলে মানুষ চাই।

—ঠাকুরপো তুমি যেও না।

—কোথায় বৌঠান?

—ঐ যে বললে পিস্তল দাগতে যাচ্ছো! যেও না তুমি। পুলিশ আসবে। উনি কত উচাটন হবেন।

—বৌঠান, তুমি বলবে, বুঝিয়ে বলবে দাদাকে। কিছু ভয় নেই। পিস্তল দাগবো না আমি, শুধু শিখবো। বৌঠান আশীর্বাদ কর', পায়ধূলি দাও।

কুমুদিনী সাশ্রুলোচনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাথায় বৌঠানের পায়ধূলি মেখে কৃষ্ণকান্ত ওয়েলার ছোটাতেন তীব্র-বেগে। ওয়েলার তো ছুটতো।

ধুলোও উড়তো খুরের। কৃষ্ণকান্ত ভাবতেন, কত কথা ভাবতেন অশ্বপৃষ্ঠে ব'সে ব'সে। ওয়েলারের কি তীব্রগতি! হয়তো ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ

কল্পনায় দেখা দেয় কৃষ্ণকান্তর। ইংরাজী ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ, ২৪শে আগষ্ট। যেদিন ইংরাজ কলকাতা অধিকার করলে। কৃষ্ণকান্ত যেন কল্পনায় দেখেন।

চব্বিশে আগষ্টের দিন বর্ষা-ভারাক্রান্ত। শস্য-শ্যামল বাঙলায় বর্ষা-মেঘের পবিত্র ধারা নেমেছে। ভাদ্রের প্রথমে তখনও বর্ষা শেষ হ'ল না? ভাদ্রের জলভরা মেঘ তখনও আকাশে। কখনও বৃষ্টি হয়, কখনও শুধু বা আকাশ সহসা ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়। কখনও বা মেঘ-ভাঙা সূর্য্যকিরণ দিগ্বিদিক প্লাবিত ক'রে তোলে।

সলিল-সম্পদময়ী ভাগীরথী কূলে কূলে ভ'রে উঠেছে। দুকূল-প্লাবী প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ভাগীরথীর উভয় কূলেই ধস্ নেমেছে। যেদিনের কথা সেদিন আকাশ প্রথমটা মেঘাবৃত ছিল। কিছু বারিপাতে মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত হয়। অস্তগামী সূর্য্যের সিঁদুর-আলো দেখা যায়।

সূর্য্য যখন প্রায় ডুবু-ডুবু, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পতাকাবাহী কয়েকটি বাণিজ্য-জাহাজ, ভাগীরথীর প্রচণ্ড শক্তিশালী উর্ম্মিমালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পাল উড়িয়ে সুতালুটীর দিকে এগিয়ে আসে। সংখ্যায় হয়তো ছয়।

জাহাজগুলির সঙ্গে কয়েকটি দেশী ছিপ, জালি-বোট এবং ডাউলিয়া। সেগুলিও ভাগীরথীবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে জাহাজগুলির পেছনেই ছিল।

জাহাজগুলি যখন সাঁখরাইলের কাছাকাছি, তখন সূর্য্য অস্ত গেছেন। ঝিল্লান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ভাগীরথী-তীর। বৃক্ষাদিপূর্ণ, জঙ্গলময় জনশূন্য কূলে তখন জমাট অন্ধকার।

তখন মোগল আমলের মধ্যযুগ। তখন শুধু কলকাতা ছিল না, ছিল সুতালুটী, গোবিন্দপুর, ও কলিকাতা নামে পাশাপাশি তিনটি গণ্ডগ্রাম। ভাগীরথীও ছিলেন অতি বেগশালিনী এবং বিস্তৃতকায়া।

অগম্য জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম তিনটি। গ্রামগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে মধ্যে একটি খাত ছিল।

সূর্য্যালোক ব্যতীত কেউ পথে বেরোয় না। দস্যু-তস্করের ভয়, হিংস্র জানোয়ারের ভয়!

সুতানুটীতে ভাগীরথীর উপকূলে একটি হাট ছিল।

শেঠ ও বসাকেরা তখন সুতানুটীর বিশিষ্ট অধিবাসী। সুতানুটীর হাটে সূক্ষ্ম-কাটুনী সুতা ও বস্ত্র বিক্রয় হ'ত। চরকা ও কাটনায়-কাটা সুতা।

সাঁঝের বিরল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে, ধীর-মন্থরগতিতে জাহাজগুলি সাঁখরাইল ছাড়িয়ে, খিদিরপুরের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সুতানুটী গ্রামে পৌঁছলে নাবিকগণ যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রচণ্ড তরঙ্গের ওপর জালি-বোট নামিয়ে জাহাজগুলি নঙ্গর করলে। ভাগীরথীতে তখন বন্যা কোথায়? বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে বৃক্ষমূলে বেঁধে নঙ্গর করা হ'ল।

বজরার মধ্যে থেকে এক জন ইংরাজ জালি-বোটের সাহায্যে তীরে উপস্থিত হলেন। নদীতীর ধ'রে সুতানুটীতে যাবেন তিনি।

কৃষ্ণকান্তর কল্পনানেত্রে তখন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ।

পূর্ণশশীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। কুলীন-কন্যা। কিছু অধিক বয়সে বিয়ে হয়েছিল পূর্ণশশীর। পাত্র কাশীকিঙ্কর, কৃষ্ণচরণের কাছে যিনি কিছু দিন ভারতেতিহাস পাঠ করেছিলেন। হাণ্টার, উর্ম্মি প্রভৃতির লিখিত ভারতেতিহাস। কৃষ্ণচরণ সেজন্য তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কাশীকিঙ্কর এখন খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক।

বিয়ে হওয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল পূর্ণশশী। লজ্জার মাথা খেয়ে সোজা চলে গিয়েছিল কৃষ্ণকান্তর শয়ন-ঘরে।

কৃষ্ণকান্ত তখন বিশ্রাম-রত। পূর্ণশশী ঘরে যায় বিনা দ্বিধায়। বলে,—শুনছো, আমার বিয়ে হচ্ছে।

পূর্ণশশীর সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। বলেছিলেন,—আমি জেনেছি, কাশীকিঙ্কর তোমাকে বিবাহ করছে।

দ্বিতীয় কথা কেউ বলে না। গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের বেলা বয়ে যায়। দৃষ্টি-বিনিময় হয় শুধু। পূর্ণশশী মর্মরমূর্তির মত দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘড়ি-ঘরে ঘন্টা পড়তে পূর্ণশশী শেষ-কথা বলে,—তুমি?

—আমি বেশ আছি। হৃদয়ে আছেন আমার এক দেবী। তাঁকে পূজা করছি। বলতে বলতে হেসেছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

—পরিহাস থাক, জন্মের মত বিদায় চাইছি। ওঠ, একটা প্রণাম করি। পূর্ণশশী ব'লতে ব'লতে গমনোদ্যত হয়।

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—তুমি প্রণাম করবে? দেবীর মত যাকে আমি—

সত্যিই পূর্ণশশী ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল আঁচলে মুছেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে।

কৃষ্ণকান্তর চোখে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ।

ওয়েলারের পিঠে চেপে শহরময় ঘোরাফেরা করছেন। যাচ্ছেন হেথায়-সেথায়। যখন-তখন। যাচ্ছেন বাগানে, শ্যামা পূজা করছেন। লাঠি ও অসিখেলা শিক্ষা হয়ে গেছে। কৃষ্ণকান্তর গহন-মনে দেখা দেয় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ। যে-ইংরাজকে টেররিজিমে উৎখাত করতে হবে, সেই ইংরাজ প্রথম যেদিন কলকাতা অধিকার করে সেই ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্টের কথা।

ভাগীরথীর তীর থেকে সুতানুটীর বাজারে পৌঁছে সাহেবটি তো শিউরে উঠলেন। নদীতীরে বাণিজ্য-কার্য্যের জন্ম কোম্পানীর কর্মচারীদের যে ক'টি চালা-ঘর ছিল, মনে হ'ল বুঝি উড়ে গেছে ঝড়ে। চালের খড় নেই,

দেওয়াল ভেঙে গেছে, বাঁশ-বাখারির চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কেবল ভিত্তির মাটি। বর্ষায় ধুয়ে গেছে। শুধু অস্তিত্ব আছে।

সায়েবের পিছু-পিছু কেউ কেউ ছিলেন। সকলেই চমকে শিউরে উঠলেন। লণ্ঠন ছিল সঙ্গে, অন্ধকারময় শ্মশানের মত নির্জ্জন নদীতীর ভয়াবহ হয়ে আছে যে!

অগ্রগামী সায়েবটির বেশভূষা অন্যান্য অপেক্ষা সুন্দর। তিনি কিয়ৎক্ষণ নক্ষত্রালোকপূর্ণ মেঘমণ্ডিত আকাশে দৃষ্টিপাত ক'রে কি যেন ভাবলেন। বললেন,—"বন্ধুগণ, আমরা সুতানুটীতে যে আশ্রয়টুকু রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহার দুরবস্থা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিলে। বর্ষার রাত্রি, জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে রাত্রি যাপন করা কষ্টকর। চল, আমরা আজিকে রাত্রিটুকু জাহাজে কাটাই। প্রাতে মাল-মসলা জোগাড় করিয়া আশ্রয় তৈয়ারী করিব।"

অন্যান্য লোকজন সায়েবের মত সমর্থন করলে।

ইংরাজ সায়েবটি কেউ নয়, জব চার্ণক। যিনি না কি কলকাতাকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতাকে।

লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল, দূরে কয়েকটা হিংস্র জানোয়ার। নেকড়ে, খাটাস, নেউল। পালাচ্ছে লণ্ঠনের আলো দেখে। কোথাও দু'টো ভাম, কোথাও শৃগাল।

দুর্ভেদ্য অন্ধকার। ভাগীরথীর কুলু-কুলু স্রোতশব্দ পাওয়া যায়। বিস্তৃত-কায়া ভাগীরথীর তীরে গহন অন্ধকার। বর্ষাজলসিক্ত মাটি। কর্দ্দমপূর্ণ। বৃক্ষশাখায় দেখা যায় কতগুলো বাদুড় ঝুলছে। অদ্ভুতাকৃতি প্যাঁচা।

চার্ণক জালি-বোটে উঠলেন। জাহাজে যাবেন। অন্ধকার দেখে চার্ণক পর্য্যন্ত শিউরে উঠেছেন। কি দুর্ভেদ্য অন্ধকার!

ওয়েলারের পিঠে কৃষ্ণকান্তর মুখে ফুটে ওঠে স্মিতহাস্য। সত্যিই তখন অন্ধকার। শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে তখন কি দুর্ভেদ্য অনাদ্ধকার!

চকমকি ঘষে গাঁজার কল্কেটা ধরিয়ে ফেললে অনন্তরাম

নিঝুম রাত। শুধু ঝিঁঝির কীর্ত্তন চ'লেছে। মশা উড়ছে ভোঁ-ভোঁ। কাজল-কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে যেন সকল কিছু। কল্কেয় আগুন ধরাতে ধরাতে অনন্তরাম হাই তুললে কয়েকটা। টপ্পা শুনতে যাওয়ার ঠিক ছিল, খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে ভেবেছিল। শেষ পর্য্যন্ত গেল না অনন্তরাম। ভুষো-পড়া লণ্ঠনটা পাশেই ছিল। জ্বালাবে মনে ক'রেছিল, জ্বালিয়ে খানিক পড়বে যতক্ষণ না ঘুম আসে চোখে। গড়-গড় ক'রে না হ'লেও অনন্তরাম বাঙলা পড়তে জানে। কবে শৈশবে পড়তে শিখেছিল গ্রামে থাকতে। পড়েছিল বোধোদয়, ঈশপের গল্প। শিখেছিল শুভঙ্করী। এখন অনন্তরাম ফাঁক পেলে পড়ে বিল্বমঙ্গল, লয়লা-মজনু, হাতেমতাই, গোপালভাঁড়, আলিবাবা। বই থাকে প্যাঁটরায় লুকানো, লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে পড়ে অনন্তরাম। বটতলা থেকে বই কিনে আনে। ভেবেছিল টপ্পা শুনতে যাবে, চিৎপুরে কাদের চত্বরে টপ্পা-গাওনা হচ্ছে। গাঁজার কল্কেয় টান দেয় অনন্তরাম। অন্ধকারে কল্কেটা রাঙা হয়ে ওঠে। অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ে অনন্তরাম। বোধ করি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায় ঘরটা। অনন্তরামের ঘর। মহলযুক্ত সুদীর্ঘ গৃহে একটা পরিত্যক্ত ঘর বেছে নিয়েছে অনন্তরাম। ঘরে আছে অনন্তরামের বাক্স-প্যাঁটরা! দেওয়ালের কোণে আছে কয়েকটা বল্লম, বর্শা, ভোঁতা খাঁড়া। কখনও যদি প্রয়োজন হয়।

চমকে ওঠে যেন অনন্তরাম। নিশুতি রাতে হঠাৎ ডাক শুনে। মেয়েলী গলায় অস্ফুট ডাক। নিশির ডাক নয় তো?

প্রথম ডাকে সাড়া দেয় না অনন্ত। কণ্ঠটা লুকিয়ে ফেলে।

—অনন্ত! অনন্ত শুনছো?

—শুনছি।

—দূর ছাই, ভালো লোক তো!

—তুমি লোকটা কে? শুধোয় অনন্তরাম। বলে,—কে, নিশি না?

হ্যাঁ, নিশিই তো ডাকছে। নিশীথে দেখা দিয়েছে। ডাকছে ফিসফিসিয়ে।

—হাঁ, নিশিই বটে। তুমি ছাই কোথায়?

নিশির কথ ভয়-জড়ানো। চোরের মত। অন্ধকারে মিশে গেছে নিশি। কষ্টি কুঁদে তৈরী যেন নিশি। নিটোল দেহ, শিলামূর্ত্তি যেন। পাটো শাড়ীতে আঁটসাঁট বেঁধেছে দেহটা। তবুও যেন উপ্‌ছে পড়ছে নিশির দেহের কিনারা। জড়ানো-শাড়ী থেকে মুক্ত হতে চাইছে। মাথা থেকে তেল গড়িয়েছে মুখে, মুখটা তৈলাক্ত। মাথার চুল চূড়া ক'রে বেঁধেছে নিশি। বেশ টেনে আঁচড়ে বেঁধেছে। চূড়ায় গুঁজে দিয়েছে একটা পাশচিরুণী। চিরুণীতে লেখা আছে কি একটা বচন। গলায় আছে কণ্ঠি। গলায় জড়িয়ে আছে।

—ডাকাত পড়েছে বুঝি? শুধোয় অনন্তরাম।

—হাঁ, উদ্ধার কর' তুমি। নিশি ফিসফিস করে। বলে,—চোখে পোড়া দেখতে নারি। তুমি ছাই কোথায়?

—আয়। বলে অনন্তরাম।—ভয় নাই, চলে আয়।

—বর্শায় বিঁধে যাবো না তো? তোমার ঘরে সড়কি, বল্লম ছড়িয়ে থাকে যে।

হেসে ফেললে অনন্তরাম। বললে,—বিঁধে তো গেছিস। ভয় কেনে?

চাপা-গলায় খিলখিল ক'রে হাসে নিশি। হাসির বেগে দুলে উঠলো যেন দেহটা। বললে,—বুকটা যে ছরকুটে গেছে। বিঁধেছে যে বুকে। হাসতে হাসতেই বললে,—দেখ না কেনে, ঘা দগদগ করছে। জ্বালা ধরছে যখন-তখন।

অনন্তরাম ডাক শুনে ভেবেছিল কে না কে। নিশিকে দেখে কল্কেটা আর লুকোয় না। কড়া টান দেয়। ধোঁয়া ছাড়ে অর্গল। কল্কের আগুন দেখে এগোয় নিশি। পা টিপে-টিপে। অনন্তরাম জিজ্ঞেস করে, —তোর মা কোথায় ?

নিশি কথার সুরে খুশীর আমেজ টেনে বললে,—ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে এতক্ষণে। দম নেয় নিশি। বলে,—আমিও শুয়েছিনু। পোড়া চোখে ঘুম আসে ছাই। উঠে এলাম।

—বেশ ক'রেছিস। বললে অনন্তরাম।—ঘরে যাবি কবে ?

নিশি বললে,—ভেবেছি যাবো না। তুমি কি বল' ?

চাকুরী করতে করতে অনন্তরাম দেখেছে কত কি। এমন কত নিশিকে দেখেছে।

—যাবি না ? অনন্তরামের কথায় বিস্ময়।

অন্ধকারে নিশি গান জুড়ে দেয়। গানের মধ্যে কথার উত্তর শুনতে পায় অনন্তরাম। নিশি ইচ্ছাকৃত রুদ্ধকণ্ঠে গাইতে থাকে :

যেতে তুমি ব'লো না আমায়।
যেতে যে ভাই পা চলে না,
যাওয়ার নামে ভয়ে মরি, হায়
চোখের আড়ালে রাখি,
যেতে যে ভাই মন চলে না।

গানটা শুনলে অনন্তরাম কান খাড়া ক'রে। দেখলো নিশির মায়ের মেয়ে নিশিকে, বর্ষার বাঁধভাঙা খরস্রোতা যেন। উথলে উঠছে যেন

ফুলে-ফুলে। অনন্তরাম বললে,—ভয়-ডর নেই তোর নিশি! কেউ যদি শোনে?

নিশি হাসির হিল্লোল তুলে গায়:

আমরা যে লজ্জার মুখে মেরেছি ঝাঁটা,
যা খুশী হয় বলুক লোকে,
কার যাবে মাথা কাটা॥

নিশি বৃত্তিভোগী দাসী নয়।

নিশির মা দাসীদের অন্যতমা। যম দয়া করছেন না, যে জন্য এখনও নিশির মা বেঁচে আছে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আটের কোঠাতে গিয়েও। নিশি ছিল না, মা'র কাছে এসেছে হুজুরের বিয়েতে। বিয়ে হয়ে গেছে নিশির, থাকে শ্বশুর-ঘরে। কাটোয়ায়। অজয় নদের তীরে।

অনন্তরামকে দেখে কেন কে জানে মিটি-মিটি হেসেছে নিশি। যত বার দেখা হয়েছে তত বার। প্রথমে কেমন খটকা লেগেছিল অনন্তরামের, নিশির মতি-গতি অবোধ্য ঠেকেছিল। লক্ষ্য ক'রে-ক'রে বুঝেছিল অনন্তরাম। দেখেছিল নিশির মুখে কেমন যেন ধূর্তামি। আড়ালে পেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল অনন্তরাম। বলেছিল,—ছেনাল।

নিশি আপত্তি করবে না, খিলখিল ক'রে হাসির জোয়ার তুললে।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ রে নিশি, শেয়াল ডেকেছে?

—হাঁ ডেকেছে। দু'-দু'বার ডেকেছে। বললে নিশি।

—ভোরে উঠেই যেতে হবে গাড়ী নিয়ে হুজুরের পিসীকে আনতে।

বেশ ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো বললে অনন্তরাম। কাছারী থেকে হুকুম হয়েছে অনন্তরামের প্রতি। আগামী প্রাতে গাড়ী নিয়ে যাবে কর্তা মশাইয়ের মাননীয়া ভগিনী হেমনলিনীর গৃহে। অনন্তরামের কেয়ারে তিনি আসবেন।

হোক রাত্রি, হোক না যত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘড়ি-ঘরের বিরাম নেই। যারা

ঘড়ির কাঁটা দেখে ঘড়ি বাজায়, ছুটন্ত সময়কে ধ'রে রাখে, তাদের ছুটি নেই। অন্ধকারকে যেন তিরস্কার করতে করতে বেজে চললো ঘড়ি-ঘর। নিশি অনন্তরামের পিঠে একটা হাত রাখে হঠাৎ। নেহাৎ কালোয় তখন কিছু দেখা যাচ্ছে না, নয় তো অনন্ত নিশির মুখটা দেখতো। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, নিশি চিবুকটা ঠেকায় অনন্তরামের কাঁধে। ঘড়ি-ঘরের ঘন্টা শুনে কত যেন ভয় পেয়েছে।

অনন্তরাম শুধু বলে,—আয়, কাছে আয়।

নিশি কাছেই ছিল। বললে,—অনন্ত, বৌটাকে খুশী দেখছিনে তো। কেনে বল তো?

অনন্তরাম কথায় হাসি ফুটিয়ে কথা কয়। বলে,—দেখেশুনে বুঝে ফেলেছে যে। হুজুরের যে এক বিবিস্তান জুটেছে। হুজুর এখন নিয়ম-মত লাল জল খেতে শিখেছে। যা হয়ে থাকে হয়েছে। মালিকানা পেয়ে উড়তে লেগেছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো নিশি। বললে,—হুজুরদের একটা মেয়ে-মানুষে চলে না কি! আহা, জানবে কেমনে, বৌটা যে ছেলেমানুষ।

—যথার্থ কথাটা তুই-ই বললি নিশি। দ্যাখ না, হৈ-হৈ প'ড়ে গেছে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দুটোকে রাঙা ক'রে ফেললে বৌটা। বললে অনন্তরাম। বললে,—এখন টাইম বদলে গেছে। কর্তাদের দু'জন ছিলেন দেবশিশু। একটা দিনের তরেও বেচাল দেখা গেল না! ছেলেটা যে হয়েছে মুখ্যু, আহাম্মুক!

অনন্তরামের কথাগুলো শুধু শুনে যায় নিশি। বলে না কিছু। অনন্তরাম বলে,—বৃথা মাংস কখনও কর্তাদের মুখে তুলতে দেখি নাই। ছেলে কাক-বক মেরে খাচ্ছে! মুর্গী চিবোচ্ছে?

এমন কত যে তুলনামূলক কথা ব'লে যায় অনন্তরাম, নিশি শুনতে শুনতে বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়ে অনন্তরামের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে।

—ঘুমোলি ? কখনও হয়তো শুধোয় অনন্তরাম।

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে নিশি বলে,—না না।

অনন্তরাম যেন জানতো, নিশি এই রাতেই না হোক যে কোন এক দিন দেখা দেবে বিজনে। চাকুরী করতে করতে এমন কত নিশিকে দেখেছে পুরাতন ভৃত্য অনন্তরাম। নিশি বুঝি মুগ্ধ হয়ে গেছে অনন্তরামের পেশীগুলো দেখে। আবলুস কাঠের মত ঘন কালো রঙে। অনন্তরামের মুখে কোমলতা নেই, আছে ক্রুর, হিংস্র কাঠিন্য। তবুও নিশি হেসেছে যখন তখন, দেখিয়েছে দেহটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে।

যখন ভোর হ'ল, তখন শুধু পিলানে কবুতরের দল জেগেছে, নয় তো দুর্গ-পুরী সুপ্তিমগ্ন। নাটমন্দিরে পুরোহিত জেগেছেন। অনুচরেরা কেউ কেউ উঠে মন্দির মার্জনা করছে। শুভ্র সকাল, শুভ্র হয়েছে দিগন্ত। পুরোহিত সিন্দূরপরিশোভিত গণ্ডমুণ্ডের স্তোত্র বলছেন। বিলাসচতুর গৌরী-পুত্র গণেশের। ভোরের হাওয়ায় টলমলিয়ে উঠছে জবা আর মল্লিকার ঝাড়। মালী দূর্ব্বা তুলসী চয়ন করছে পূজার্থে। ভোরের ভোঁ বেজে চলেছে শহরতলীতে কোথায়। পুরোহিতের উচ্চারিত স্তব বুঝি হাওয়ায় ভাসছে।

ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলো পথে বেরিয়েছে। চাকার শ্রুতিকটু শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো পবিত্র প্রভাত !

মনটা পুরোহিত মশায়ের কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। পূর্ণশশীকে দেখে, পূর্ণশশীর মুখে কাতর মিনতি শুনে পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে আছেন। বধূটির অসহায় মুখাকৃতি বারে বারে জেগে উঠছে। মুহূর্ত্তের জন্য পুরোহিতের অনুভূতিতে কি দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখা যায় ? কি অপরূপ মুখশ্রী বধূটির, কি অপূর্ব্ব গঠন, চোখে কি বিনম্র দৃষ্টি ! কি মিষ্টি বাচনভঙ্গী। স্মৃতির লাগাম কষেন পুরোহিত। ভোরের স্নিগ্ধ আকাশে চোখ

তুলে বধূটির মুখ তুলতে সচেষ্ট হন। বিকার দেন স্বীয় মনোভাবকে। গণনাথের মন্ত্র আওড়াতে থাকেন। সূর্য্যস্তোত্র। নাটমন্দিরে ধূপ ধূমায়িত হয়। হাওয়ায় অগুরুগন্ধ।

চোখ মেলে শুভ্র আকাশ দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো রাজেশ্বরী।

বেলা হয়ে যাওয়ার লজ্জায় তাড়াতাড়ি উঠে দ্বার খুলে বেরিয়ে দেখলো কে কোথায়। খিলানে কবুতরেরা শুধু ডাকছে। পাখা ঝাপটাচ্ছে। পিসীমা হেমনলিনী আসবেন, এসে দেখবেন বৌ তখনও ঘুমোচ্ছে, সেই লজ্জাতেই চোখে বুঝি ঘুম ছিল না। অনুমানে বোঝে রাজেশ্বরী, আকাশই ফর্সা হয়েছে, বেলা বেশী হয়নি। হেমনলিনীই শিখিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যহ সকালে নাটমন্দিরে যেন যাওয়া হয়। কুল-বধূর কর্ত্তব্য। যেখানেই যাক, এলোকেশীকে যে চাই। কিন্তু কোথায় এলোকেশী, কোথায় কে। ঘুমোচ্ছে কোথায় কে জানে। ভাল ক'রে এখনও চেনা-জানা হয়নি। এলোকেশীকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া যায় পুকুর-ঘাটে! বৌ-মানুষ হয়ে! রাজেশ্বরী চুল খুলতে থাকে খোঁপার বিনুনী থেকে।

শয্যাসঙ্গী তখনও ঘুমে অচেতন। রাজেশ্বরী বেলা হয়ে যাওয়ার ভয়ে এগোয় দাসীদের এলাকার দিকে। কেউ কোথাও নেই, ভোরের থমথমে আবহাওয়ায় বুঝি ভয়-ভয় করে। দাসীদের ঘরের কাছাকাছি গিয়ে ডাকে রাজেশ্বরী,—ও এলো, এলো।

এলোকেশীর সাড়া পাওয়া যায় না। সাড়া দেয় বিনোদ। ঘর থেকে বেরিয়ে বলে,—সাতসকালে উঠে পড়েছো বৌদিদি! ডেকে দিই এলোকেশীকে। কাকপক্ষী ওঠেনি যে এখনও!

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ বিনোদ। পিসীমা আসছেন, খাওয়া-দাওয়া করবেন, যোগাড়যান্ত করতে হবে না?

হাসে বিনোদা। বলে,—আক্কেল তো দেখছি খুব। গিন্নী হয়ে গেছে বৌদিদি আমাদের। ডেকে দিই এলোকেশীকে। বলি ও এলোকেশী। উঠে পড়' গো ভালমানুষের মেয়ে। বৌদিদি উঠে ডাকতেছেন তোমাকে।

কথার শেষে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিনোদা। বিনোদার বাসি মুখের দু'পাশে পান খাওয়ার গড়ন্ত চিহ্ন। বিনোদা দেখে রাজেশ্বরীকে। ভোরের টাটকা আলোয় এমন স্পষ্ট কোন দিন দেখতে পায়নি বিনোদা। চোখে ঘুম-ভাঙা দৃষ্টি, এলোমেলো রুক্ষ চুলের বোঝা নেমেছে পিঠে। বাসি রূপের বোধ করি বিশেষ এক আকর্ষণ আছে—বিনোদা চেয়ে থাকে অবাক চোখে। রাজেশ্বরী বললে,—বিনোদা, ব্রাহ্মণীকে বল' উনুন ধরাবে।

চক্ষুলজ্জায় মরে যায় যেন এলোকেশী। রাজেশ্বরী উঠে প'ড়েছে অথচ ঝি হয়ে এলোকেশী তখনও ওঠেনি!

নাট-মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে।

হয়তো পূজায় ব্রতী হয়েছেন পুরোহিত। এক জন অনুচর ধূম্রবান ধুনাচি [illegible] দ্বারে-দ্বারে দেখাতে বেরিয়েছে। অন্য এক জন গঙ্গাজলের ছিটে দিচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে ঘুমন্ত শহরও জেগে উঠলো। কলের ভোঁ বাজতে বাজতে ধ্বস্ত হয়ে কখন ক্ষান্ত হয়ে গেছে। পথে মানুষ দিয়েছে দেখা। পুণ্যার্থী গঙ্গাযাত্রী। ভিস্তি কাঁধে মেথর পথ ধৌত করে। ঝাড়ুদার সাফ্ করে পথ। কোচম্যান আবদুল জুড়ী ছোটায় অনন্তরামকে পাশে নিয়ে। সদর্পে জুড়ী ছুটতে থাকে পথিকজনকে সচকিত ক'রে। মালিক তখনও ঘুমে অচেতন। প্রথম সূর্য্যালোক দেখার সৌভাগ্য হয় না কোন দিন। কিন্তু সময়ের কেউ মালিক নেই। ঘড়ি-ঘর সময় জানান দেয়।

কাছারীতে কাজে মন দেয় আমলাতন্ত্র। দলিল-দস্তাবেজ খোলাখুলি হচ্ছে। আমিন আদায় তহশীলের কাগজপত্র পরীক্ষা করে। খাজাঞ্চী

আয়-ব্যয় হিসাব করে। জমানবিশ রেজেষ্ট্রী ওলটায়। মোক্তার মকদ্দমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে। মহাফেজ দলিলাদি পর্য্যবেক্ষণ করে। মুন্সী মফঃস্বলে পত্রোত্তর লিখতে বসে। কড়চা, সেহা, চেকমুড়ী, রোকড় এবং জমাওয়াশীলবাকির নথিপত্র স্তূপীকৃত হ'তে থাকে। মালিক শুধু তখনও ঘুমে অচেতন থাকেন।

নাটমন্দিরে প্রণাম ক'রে ভাঁড়ার দিতে চলেছিল রাজেশ্বরী।

ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা হ'ল মুখোমুখি। ব্রাহ্মণী বললে,—পিসীমা ঠাকরুণ খাবেন, কি রাঁধতে দেওয়া হবে? দু'টো উনুন জ্বলে যাচ্ছে।

কথাটা রাজেশ্বরীও ভেবেছিল। পিসীমাকে কি খাওয়াবে ভেবেছিল মনে মনে। রাজেশ্বরী বললে,—আমি কি ব'লবো বল'? আমি তো জানি না।

অন্দরের কাছাকাছি কোথায় ছিল বিনোদা।

হরিনামের মালা জপছিল। হয়তো কথা ক'টা বিনোদার কানেও পৌঁছেছিল। বিনোদা বললে,—দু'দিনের বৌমানুষ, ও জানবে কোত্থেকে বামুনদি! পিসীমা এয়োস্তিরি মানুষ, খাবে মাছ-মাংস। মাছের ভালমন্দ কিছু কর।

হঠাৎ দৈববাণী শুনলে যেমন বিস্ময় উপস্থিত হয়, রাজেশ্বরী তেমনি বিস্মিত হ'য়ে পড়ে হঠাৎ কথা শুনে। যদিও মিথ্যা বলেনি বিনোদা। মালা জপতে জপতে বললে বিনোদা,—নায়েবদের ব'লে পাঁঠাও মাছ কিনে আনিয়ে দিক। মাছের ঝাল, ঝোল, পোলাও, মুড়ীঘণ্ট যা খুশী কর', ল্যাটা চুকে যাবে। আমি জানি পিসীকে, পিসীর যে মাছের নোলা!

ব্রাহ্মণী বললে,—ঠিক কথা। বিনো অন্যায় বলেনি।

রাজেশ্বরী বললে,—তবে তাই হোক।

বিনোদা তখনও খাবে না। বলে,—মাছটা আনতে পাঠাও, বেলা হ'লে ভাল মাছ মিলবে না। গোবিন্দভোগ চালের ভাতটা ততক্ষণ চাপিয়ে দাও। দুধটা ফোটাতে দাও। চিঁড়ে বার হোক, পায়েস তৈরী কর'।

সমস্যা তো চুকেই গেল। রাজেশ্বরী বললে,—তবে, মাছটা যাতে শীঘ্রি আনে ব'লে দাও ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী বলে,—ব'লে দিচ্ছি। তুমি বৌদিদি জল খাও আগে।

চাতালে তিনটে রূপোর রেকাবী সাজানো, দেখলো রাজেশ্বরী। একটায় ছাড়ানো ফল, একটায় মিষ্টান্ন, একটায় কতগুলো ফুলকো লুচি; আলু-পটল ভাজা। রাজেশ্বরী দেখে তো হেসে ফেললে।

কাছারী থেকে লোক পাঠিয়েছে অন্দরে। লোক খোঁজ নিতে এসেছে, হুজুর কি শয্যাত্যাগ ক'রেছেন? একটি জরুরী চিঠি আছে, হুজুরকে লেখা। মালিক ব্যতীত কেহ খুলিবেন না, লেখা আছে লেফাফার গায়ে। পত্রবাহক হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজেশ্বরী ঘোমটা টানে মাথায়। ব্রাহ্মণীকে বলে ফিসফিসিয়ে'—ঘুম থেকে ওঠাতে বল' না।

কেউ সাহসী হয় না। হুজুরের কাছে এগোয় কার সাধ্য! অনন্তরাম থাকলে না হয় কথা ছিল। অনন্তরাম গেছে হেমনলিনীর গৃহে। বিনোদা হরিনাম শেষ ক'রে, উঠে আসে। ব্রাহ্মণীর মুখে ঘুম থেকে তোলার কথা শুনে বলে,—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে ছেলেকে? গরজ থাকে তো অপিক্ষা করতে বল চিঠি নিয়ে।

লোক খোঁজ পেয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়। পত্রবাহক অপেক্ষাই করে। পত্রাধিকারীর সাক্ষাৎ না পেয়ে যাবে না বাহক। কাছারী থেকে প্রশ্ন করা হয়, কে দিয়েছে পত্র, কোথা থেকে আসা হয়েছে। কিন্তু বাহক বলতে চায় না। বলে,—হুজুরকে ব'লবো।

আমলা-ভদ্র বিস্মিত হয় বিষয়টায়। অথচ পত্রবাহক ভদ্রবেশী নয়। চাপরাসির মতই আকৃতি।

প্রথম পূজা শেষ হয়ে যায়। নাট-মন্দিরের দেওয়ালে দৃষ্টিপাত করেন পুরোহিত। দেওয়ালের ঘড়িটা দেখেন। বেলা কত হয়েছে। হয়তো দেখেন, বেলা একটা বাজতে দেরী আছে কত। বধূটির মুখটি কেন এত ঘন ঘন মনে উদিত হয়। বধূটির বেদনা-কাতর মুখ— অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সে মুখে। পুরোহিত লোলচর্ম্মা বৃদ্ধ। বার্দ্ধক্যের জরায় শরীরটার ধনুকের মত আকার হয়েছে। কপালে বলিরেখা ফুটেছে। চোখে দৃষ্টিহীনতা। তবুও ক্ষণেকের জন্য পুরোহিতের অনুভূতিতে চাপল্যের উন্মেষ হয়। কখনও যা হয় না। প্রথম সূর্য্যালোকে স্বচ্ছ হয়েছে আকাশ। পেঁজা তুলার মত ছিন্নভিন্ন মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে আছে আকাশ। পুরোহিত আকাশে চোখ তুলে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন। কপালের বলিরেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। পুরুষানুক্রমে বেতনভোগে পৌরোহিত্য করছেন পুরোহিত। বোধ করি কখনও মনটা যেন কিছুতে এত আচ্ছন্ন হয়নি।

—চরণামৃত দিন। উপবাসী আছি, চরণামৃত খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করব।

পুরোহিতের জরাগ্রস্ত অপটু দেহটা যেন চমকে শিউরে ওঠে। কে কথা বলে? সেই বধূটি কি, না অন্য কেউ? নাট-মন্দিরের দালানে বসেছিলেন পুরোহিত। পিছনে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলেন এক জন মহিলা। প্রাপ্তবয়স্কা হ'লে কি হবে, রূপের জৌলস আছে অপূর্ব্ব।

—কে মা তুমি? কম্পিত কণ্ঠে বললেন পুরোহিত।

—চিনতে পারলেন না আমাকে? আমি ক্ষেম।

লজ্জা পেলেন যেন পুরোহিত। কিছুটা অপ্রস্তুত হ'লেন। বললেন,—কিছু মনে ক'র না মা! কখন এলে মা? কুশল তো?

—হ্যাঁ। এলাম এখনি।

ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন হেমনলিনী কথার শেষে।

—জয়তু। কম্পমান হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন পুরোহিত। বসেছিলেন, উঠে পড়লেন। বললেন,—তিষ্ঠ, চরণামৃত দিই।

পুরোহিতের অন্যান্য অনুচরগণ পলকে দেখে নেয় কেউ কেউ, মৃত গৃহস্বামীদের ভগিনীকে। হেমনলিনী অতি দুঃখে কালাতিপাত ক'রে চ'লেছেন। এখনও যেন চক্ষুপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত দৃষ্ট হয়। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা বলেন হেমনলিনী। অনাবিল মন-খোলা হাসি। তবুও পরিধান করেন শুভ্র ধৌতবাস। অঙ্গে তোলেন দু'-একটা গহনা। পায়ে অলক্তক।

কি অপূর্ব্ব মানিয়েছে হেমনলিনীকে! কটিদেশে জড়িয়ে আছে মুক্তাই যোহরের বিছা। দিবালোক পেয়ে জল্‌-জল্‌ করছে শেলীর মুক্তাগুলো। কর্ণমূলে চকল দু'টি বাঘের নখ।

কত প্রতীক্ষার পিসীমা এসেছেন।

হেমনলিনীকে দেখে রাজেশ্বরী যেন অকূলে কূল দেখলো। দেখেই হাসলো একমুখ। ভাঁড়ারে ছিল রাজেশ্বরী, বেরিয়ে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করলে পিসীমাকে। বললে,—চলুন, ঘরে চলুন। কতক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করছি!

বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন হেমনলিনী। মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন,—তুই ভালো আছিস তো? আমার ভাইপোটি?

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হয়ে যায় মুখটা। অধোবদন হয়ে বলে রাজেশ্বরী,—হ্যাঁ, বেশ ভাল আছি। তবে ঠাকুরের জন্যে মাঝে-মাঝে মনটা ভাল লাগে না। দেখতে ইচ্ছা হয়। পিসীমা, ঘরে চলুন।

—ব্যস্ত হয়ো না বৌ। সহাস্যে বললেন হেমনলিনী।—তুমি তো কালকে এয়েছো, আমি যে এখানে মানুষ হয়েছি। কেমন লাগছে বল'। ঘর-দোর চিনে জেনে নেওয়া হয়েছে ?

বিনোদা ছিল বঁটিতে। কুটনো কুটছিল। আলুর দমের আলু। বললে,—তোমাকে বলতে হবে না। লক্ষ্মী মেয়ে বটে, কোন' হাঙ্গামা নেই। কথায়-বার্তায় কাজে-কম্মে বৌ খু—ব দড় হয়েছে। পিসীমা আসবে শুনে ওবধি হেদিয়ে হেদিয়ে গেল। উঠেছে কখন ? আকাশে নক্ষত্র থাকতে উঠেছে। পিসীমা খাবে এখানে, ভাবনায় ঘুম নেই চোখে !

হেমনলিনী কথায় কৃত্রিম ক্রোধ ফুটিয়ে বললেন,—হাঁ বৌ, সত্যি ? এমন জানলে আসতুম না তো।

হেমনলিনী যা বলছেন যেন শুনতেই পায় না রাজেশ্বরী। স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। চোখে যেন ফুটে ওঠে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। যত দেখে ততই যেন অবাক হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। বলতে গিয়েও নয়।

—হ্যাঁ বৌ, বড়মা এসেছিল শুনলুম ? অনন্ত বললে। কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে ? হেমনলিনীর কণ্ঠে সাগ্রহ কৌতূহল।

রাজেশ্বরী যেন শুনতেই পায় না। দেখে, হেমনলিনীকে দেখে। আরও চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে দেখে। হেমনলিনীর শেষ কথাটা বোধ করি কানে পৌঁছেছিল। রাজেশ্বরী বললে,—জড়োয়া টায়রা দিয়ে।

—আমি এসেছি, তুমি বৌ ভাঁড়ারে বসে থাকবে ? চল', তোমার ঘরে চল'। বললেন হেমনলিনী।

হাসলেন রাজেশ্বরী। মৃদু হাসি। বললে,—চলুন। বামুনদিদি আছে, কিছু দেখতে হবে না।

টায়রাটা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা যেন ছাঁৎ ক'রে উঠলো। মনে মনে ভাবতে থাকে, টায়রা কি তোলা হয়েছিল ? কোথায় আছে টায়রাটা। কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

হেমনলিনী চললেন ভাঁড়ারের এলাকা থেকে। পেছনে চললো রাজেশ্বরী। আড়ালে গিয়ে হেমনলিনী বললেন,—অমন ক'রে কি দেখছিলি বৌ আমার মুখে ?

বলবে কি বলবে না ভাবছিল রাজেশ্বরী। হেমনলিনীর প্রশ্নটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো যেন। মনে মনে লজ্জিত হ'ল। আঘাতের চিহ্ন যে হেমনলিনীর মুখের কোথাও কোথাও। লাল দাগ হয়ে আছে। কালসিটা। রাজেশ্বরী বললে,—পিসীমা কি প'ড়ে গেছলেন ? লাগলো কোথায় ?

খানিকটা দুঃখের হাসি হাসলেন হেমনলিনী। যেন কিছুই নয়। নির্মল হাসি হেসে বললেন,—হ্যাঁ বৌ, দেখে বোঝা যাচ্ছে বুঝি ? বড্ড লেগেছে, এখনও টন-টন করছে !

রাজেশ্বরী বললে,—প'ড়ে গেছলেন ?

সিঁড়ির মুখে পৌঁছে হেমনলিনী লজ্জিত হয়ে বললেন,—বল' কেন বৌ ! তোমাদের পিসে মশায়ের কীর্ত্তি। জানো তো ওঁকে ? জানবেই বা কোত্থেকে ! পিসে মশাই ধ'রে মেরেছেন। নেশায় চুর হয়ে ফিরলেন। ফিরেই বললেন, তুমি তৈরী হও। তা বললুম যে, কি দোষ হয়েছে ? বললেন—

কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। চোখ দুটোতে বোধ করি যন্ত্রণা ফুটে উঠলো। চিক-চিক ক'রে উঠলো। বললেন,—আমি না কি তাঁকে মদ খেতে বাধা দিয়েছি। তুমিই বল' বৌ ? নেশায় চুর হয়ে ফিরেই বললেন কি না, ডিকেণ্টার গেলাস দাও। মদ ঢেলে দাও। বাধা আমি দিয়েছিলুম সত্যি ; কিন্তু তাই ব'লে মেরেছে দেখো বৌ ! এখনও টন-টন করছে।

লজ্জায় যেন মরে যায় রাজেশ্বরী। এমন জানলে কি কেউ শুধোয়। তবুও যোরতম বিস্ময়ে কেমন বুঝি হয়ে যায় বৌ। চোখ দুটোতে জল

টকমকিয়ে ওঠে। নেশা কথাটা শুনে মনে মনে যেন হতাশ হয়ে পড়ে। নেশায় মানুষ এমন করে ?

জড়োয়া টায়রা! যত বার মনে পড়ে তত বার রাজেশ্বরী ভীত হয়ে ওঠে। কোথায় আছে টায়রাটা। ঘরে আছে তো। হেমনন্দিনী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন,—শুধু মুখে, সর্বাঙ্গে দাগ। নড়তে-চড়তে পর্য্যন্ত যেন পারছি না।

যেন শুনতে চায় না রাজেশ্বরী। বলে,—চলুন, ঘরে চলুন পিসীমা।

অনন্তরামই ভাঙিয়েছিল ঘুম। ঘুম থেকে তুলে বলেছিল,—কে চিঠি নিয়ে এসেছে। জরুরী চিঠি।

—চিঠি! কে পাঠিয়েছে ? জিজ্ঞেস করলে কৃষ্ণকিশোর।

—তোমাকে লেখা চিঠি। কে পাঠিয়েছে বললে না লোকটা। বললে অনন্তরাম।

—মালিক ছাড়া কা'কেও কিছু বলবে না বলছে।

—যাচ্ছি চল'। বললে কৃষ্ণকিশোর।

কাছারীতে বসেছিল পত্রবাহক। হুজুরকে দেখেই নত হয়ে কুর্নীশ করলে। বললে,—কসুর মাফ্ করবেন হুজুর। দিক্দারী মাফ্ করবেন। গরিবকে যেমন হুকুম হয়েছে হুজুর।

—কে দিয়েছে চিঠি ? শুধোয় কৃষ্ণকিশোর।

পত্রবাহক ইদিক-সিদিক দেখে চুপি-চুপি বলে,—হুজুর, গহরজান বাই পাঠিয়েছে।

আশাতীত কথাটা শুনে কিছু উক্তি করে না কৃষ্ণকিশোর। চিঠিটা হাতে নিয়ে শুধু বলে,—ঠিক আছে।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর। পত্রবাহক কথার শেষে নত হয়ে বলে,—সালাম হুজুর, সালাম।

পিছু হটতে হটতে, সেলাম জানাতে জানাতে চলে যায় পত্রবাহক। চিঠিটা মুঠোয় নিয়ে কৃষ্ণকিশোর কোথায় যাবে ভেবে পায় না। পিসীমা এসেছেন শুনেও যায় পড়ার ঘরের দিকে। বিরলে গিয়ে দেখতে হবে চিঠিটা। গহরজান কেন চিঠি লিখেছে। খামে লেখা আছে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে, মালিক ব্যতীত কেহ খুলিবেন না।

ঘড়ি-ঘরে ঘন্টা বাজতে থাকে। বেলা অনেক হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে। সূর্য্যালোকে তখন ঢেকে আছে দিগ্বিদিক। হলুদ-রঙ কাঁচা রোদ্রে। নীলাভ আকাশে ছড়িয়ে আছে শুভ্র-মেঘ পেঁজা তুলার মত।

যে লোকটা চিঠি দিয়ে গেল তাকে যেন ঠিক হাব্সীর মত দেখতে। যেমন কালো তেমনি কদাকার। চুলে তেল নেই, পায়ে জোড়াতালির নাগরা। জামায় সেলাই হ'লে কি হবে, জামাটা সাদা অর্গাণ্ডির। ময়লা হয়ে গেছে। পাজামাটা তথৈবচ। লোকটা যেন হাল-হকিকৎ দেখতেই এসেছিল। কি যেন হাসিল করতে। মৎলবটা যে ভাল ছিল না, দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তবুও কাকেও কিছু মালুম দিলে না। খোসামোদে হাসি হেসে কাজ হাতে ক'রে হাওয়ার মত চলে গেল।

লোকটার মুখে যেন কদর্য্য দাগ। অত্যাচারের শারীরিক বিকাশ? হয়তো উপদংশের ক্ষত, নয় তো অন্য কিছু, যার কোন ওষুধ নেই। বংশে বর্ত্তে যায় যে ব্যাধি।

গহরজান লিখতে জানে!

জানলেও কোন মতে উচিত হয়েছে এমন বেইজ্জতী দেখিয়ে চিঠি দেওয়া। কেউ যদি জানে তো কত ফেসাদ হবে। কৃষ্ণকিশোর খামটা খুলতে দেখলো গোলাপী কাগজ। কড়া চামেলী আতরের খোশবায় মাখানো। চিঠিতে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লাল কালিতে লেখা:

জাঁহাপনা,

ইজ্জৎ হারাইয়া চিঠি লিখিতেছি। হুজুরকে জুলুম করিতে ডর হয়। বহুৎ মেহনতে আমি মুর্গীর ঝোল ও লুচি বানাইতেছি। মালিক যদি মেহেরবাণী ক'রে আসতে রাজী থাকেন আমি কৃতার্থ হইব। বেওকুফের বেআদবী মাফ্ করিয়া কাঙ্গালের মর্জ্জি মঞ্জুর করুন। খোদা হুজুরকে আমীর করিবেন। ইতি

হুজুরের বাঁদী

গহরজান বাই

গহরজান লেখাপড়া জানে না। গহরজানের হয়ে কে লিখে দিয়েছে কে জানে! কৃষ্ণকিশোর ভেবেছিল কি না কি। চিঠিটা প'ড়ে আশ্বস্ত হয়। চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে দেয়। পাছে কেউ দেখে।

—পিসীমা যে ডাকছে।

পেছন থেকে বললে অনন্তরাম।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—যাচ্ছি বল'।

অনন্তরাম বুঝেছিল চিঠিটা জমিদারী সংক্রান্ত নয়। চিঠিটা কে পাঠিয়েছে বুঝে ওঠে না, কিন্তু চিঠি যে বিশেষ কেউ পাঠিয়েছে আন্দাজে অনুমান করে। অনন্তরাম বলে,—কে দিয়েছে চিঠি? প'ড়ে যে ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'রে ফেলা হ'ল?

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি চিনবে না অনন্তদা। এমন কিছু ছিল না চিঠিতে।

—কে লিখেছে কে? শুধোয় অনন্তরাম।

থতমত খেয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—চিঠিটা? চিঠিটা? চিঠিটা দিয়েছে—

—থাক্, শুনতে চাই না। বললে অনন্তরাম।—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে

পিসীর কাছ যাও। কাছারী থেকে ডাকতে পাঠিয়েছে, বলছে, হজুর যখন এসেছেন তখন সই-টই মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভাল হয়।

সই করতে হয় কাগজ-পত্রে। দলিল-পত্রে। বজেটে। মফঃস্বলে লেখা চিঠিতে। কাছারীতে প্রস্তুত হয়ে থাকে, নায়েব শুধু আসল জায়গাটা দেখায়। সই ক'রে দিতে হয়।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি, ব'লে দাও অনন্তদা।

পিসীমা তখন বসেছিলেন পালঙে।

বৌ ভয়ে ব্যস্ত হয়ে টায়রা খোঁজাখুঁজি করছিল। পিসীমা দেখছিলেন শয্যা, আলমারীতে পুতুল, আসবাব। পিত্রালয় থেকে দিয়েছে রাজেশ্বরীকে। এলোকেশীও খুঁজতে লেগেছিল। রাজেশ্বরী বললে,—এলো, অনন্তকে বল' দেখি জিজ্ঞেস ক'রে আসবে। কোথায় আছে জানেন কি না।

হেমনলিনী বললেন,—ব্যস্ত হ'য়ো না বৌ। আছে আছে, যাবে কোথায়!

এলোকেশীও বললে,—ডানা তো নেই যে উড়ে যাবে ঘর থেকে!

রাজেশ্বরী বললে,—পাচ্ছি কৈ! থাকলে তো পাওয়া যাবে। আশ্চর্যি!

অলক্ষ্যে বিধাতা হয়তো হাসলেন। অড়োয়া টায়রাটা কোথায় লুকিয়ে থেকে হয়তো আভা বিচ্ছুরিত ক'রে হাসলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। দাস-দাসীদের কানে পৌঁছলো। তাজ্জব হয়ে গেল যে শুনলো। কখনও এমন হ'তে দেখেনি কেউ যে, ঘর থেকে গহনা বেমালুম লোপাট হয়ে গেছে। এলোকেশী পরিচারিকা, লজ্জা ও ভয়ে

কেমন্ যেন হয়ে গেছে। কারও দোষ ধরবে না কেউ, যত দোষের ভাগী হবে এলোকেশী। হেথায়-সেথায় খোঁজাখুঁজি ক'রেও আশা মেটে না এলোকেশীর। অনেক তল্লাশী ক'রেও যখন মিললো না তখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে,—না পিসীমা, আমি ছাড়বো না। দুষবে তো আমাকেই! কি ঘেন্নার কথা মা! রাজো, তুই চাল-পোড়া খাওয়া। বাটি-চালা ডাক।

রাজেশ্বরী যেন দিশাহারা হয়ে গেছে। মুখে কথা নেই। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে শুধু।

অনন্তরাম এসে বললে,—হুজুর তো বলে, জানি না। বললে, ঘরেই আছে, যাবে কোথায়?

হেমনলিনী বললেন,—ঠিক কথাই তো। যাবে কোথায়! বৌ, তুমি গয়নাগাটি কোথায় রেখেছো?

হতচকিতের মত বললে রাজেশ্বরী,—ঐ সিন্দুকে পিসীমা!

ঘরে ছিল একটা লোহার সিন্দুক—তার চাবি থাকে দেরাজে। একটা চাবি-দেওয়া ক্যাস-বাক্সে।

দাস-দাসী মহলে কথাটা ছড়িয়ে গেছে। শুনে কেউ গালে হাত দিচ্ছে, কেউ কোন কথা বলছে না। বলাবলি করছে কত কথা। ফিস-ফাস গুঞ্জন চলছে। সামান্য বস্তু হ'লেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু একটা টায়রা। জড়োয়া টায়রা!

—দেখো দেখি, পিসীমা এসেছে, কত আনন্দ করবে! কোথা থেকে এলো চৈড়া কামেলা, ঘর থেকে মোদুম দামী গয়নাটা চুরি হয়ে গেল? বললে অনন্তরাম। কা'কে বললে কে জানে!

পরিস্থিতিটা যেন ভাল লাগছিল না হেমনলিনীর। ক'দিনের জন্যে এসেছেন, খোঁজাখুঁজি আর মন্তব্যে কেটে যাবে সময়টুকু, ভাল লাগে না যেন। হেমনলিনী বললেন,—থাক্ বৌ, থাক্। ঠিক পাওয়া যাবে।

বৌ, তুমি বৌঠানের ঘরটা খুলতে বল'। চল যাই, ঐ ঘরে বসি গে। আহা, ঘর জুড়ে থাকতো বৌঠান!

কুমুদিনী! মা কুমুদিনী।

মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটে তখন লকলকে অগ্নিশিখা জ্বলছে—দেখা যাচ্ছে শেষ-সীমা হরিশ্চন্দ্রের ঘাট থেকে। গঙ্গাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কাশীধাম। বরুণা ও অসির সঙ্গম-স্থল। গঙ্গাতীরে অসংখ্য স্নানার্থী। কুমুদিনী তখন স্নান-শেষে সিঁড়ি ভাঙছেন। স্বর্গের সিঁড়ি—যার শেষ নেই বুঝি। কুমুদিনীর পা দু'টোয় বেদনা ধ'রে গেছে। কুমুদিনী গুণ্ঠনাবৃত কপালে ভস্ম মেখেছেন। ছাইভস্ম। দগ্ধচিতার ছাই তুলে মেখেছেন কপালে। হাতে পেতলের কমণ্ডলু। গঙ্গোদক। কেটের থান পরিধান ক'রেছেন। জলগ্রহণ হয়নি তখনও।

ডুলী ভাড়া করা আছে কুমুদিনীর। ডুলীতে চেপে যাবেন তিনি কোন দেবালয়ে। তেত্রিশ কোটির কাকে পূজা করবেন, কে জানে! পেছনে কুলু-কুলু শব্দে ব'য়ে চলেছে দু'কূলপ্লাবী গঙ্গা। ভাদ্রের ভরা গঙ্গা।

শেষ-সিঁড়িতে উঠে কমণ্ডলু নামিয়ে করজোড়ে প্রণাম করেন কুমুদিনী। গঙ্গাকে প্রণাম করলেন।

ঘর খুলে কিছুক্ষণ দেখেই কেঁদে ফেললেন হেমনলিনী। যেমনকার তেমনি সাজানো আছে। যেখানকার যেটি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখেন হেমনলিনী—অশ্বপৃষ্ঠে যুবক কৃষ্ণচরণ। মাথায় মুকুট, হাতে লাগাম। মুখে আহ্লাদের হাসি মাখানো। অয়েল-পেন্টিং।

কাগজে-পত্রে সই করলে কি হবে, ভূসম্পত্তি ও জমিদারীর মালিক হ'লে কি হবে, সই করতে করতে বুকটা যে ধড়াস-ধড়াস করছে। টাকা খোঁজাখুঁজি হচ্ছে শুনে পর্য্যন্ত আশঙ্কায় যেন ভীত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোর।

ইতিপূর্বে কখনও চৌর্য্যবৃত্তি জাগেনি মনে, চুরি কা'কে বলে জানা ছিল না। সত্যিই চুরি করেছে, বুকটা ধুকপুক করছে। কিন্তু টায়রাটা যে চাই।

দেখা হতেই বললেন হেমনলিনী,—এতক্ষণে মনে পড়লো পিসীকে? বৌ যে একটা গয়না হারিয়েছে! ব্যাচারী তোলপাড় ক'রে ফেললে।

—হারিয়েছে তো কি হবে! যাবে কোথায়, আছে কোথাও। ভয়ে-ভয়েই বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—জহর-পান্নাকে আনলে না কেন?

ঠোঁট ওল্টালেন হেমনলিনী। বললেন,—কলকাতায় আছে না কি? গেছে কাশীপুরে কোথায় কাদের বাগান-বাড়ীতে। হপ্তাটাক থেকে ফিরবে বলেছে। ভাগ্যি যেমন আমার!

জহর আর পান্না দু'ভাই হেমনলিনীর দুই গুণধর পুত্র।

ইয়ার-বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে গেছে কাশীপুরে। কাদের উদ্যান-বাটীতে। দল বেঁধে ফূর্তি করতে। কলকাতার কাছাকাছি কাশীপুর, দমদম, ব্যারাক-পুরে কলকাতার বাবুদের সাজানো বাগান-বাড়ী আছে। কাপ্তেন বাবুদের মাঝে-মিশেলে যেতে হয় শহর থেকে দূরে। তখন বোতলে কুলায় না, ডজন বোতলের বাক্স কিনতে হয়। বীয়রে নেশা হয় না, বীয়রের সঙ্গে হুইস্কি মেশাতে হয়। বাগান মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ইয়ারদের উপদ্রবে। গাছে উঠে টিয়া, কোকিল ও ময়না সেজে হরেক পাখীদের নকল; বাই সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচানাচি, ভাড়া-করা মেয়েমানুষদের জামা-জুতা পায়ে লুটিয়ে পড়া—বাগান-বাড়ীতে বাবুদের করতেই হয়।

জহর আর পান্না গেছে কাদের বাগান-বাড়ীতে। হেমনলিনী টাকা তুলে দিয়েছেন হাতে। টাকা না পাওয়া গেলে দু'ভাই যখন ছাদ থেকে ঝাঁপ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হেমনলিনী তখনই সিন্দুক খুলে নোটের বাণ্ডিল খুলেছেন। টাকা পেয়ে জহর আর পান্না মাকে গড় ক'রে কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করেছে। বারোটহাতী ধুতিতে চাদর দিয়ে তবে হাসিতে যোগ দিয়ে হাসতে পেরেছে।

মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। চিত্রার্পিতের মত। ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চললো ভাঁড়ারের দিকে। পিসীমার খাওয়া-দাওয়ার কি কত দূর এগিয়েছে দেখতে গেল।

বৌ চলে যেতে হেমনলিনী বললেন,—ক'টা কথা বলছিলাম। মন দিয়ে শোন'।

কৃষ্ণকিশোর বসলো হেমনলিনীর কাছে। অনেক কাছে যেতে দেখলো পিসীমার মুখটা, দেখলো ক্ষত-বিক্ষত। বললে,—পিসে মশাই তোমাকে বাঁচতে দেবে না। মেরেছেন তো?

অব্যক্ত দুঃখে কিছু উত্তর করলেন না হেমনলিনী। শুধু চেয়ে থাকেন অপলক শূন্যদৃষ্টিতে। হেমনলিনীর ওষ্ঠাধর কি কাঁপছে থরো-থরো! তিনি চেয়ে আছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচরণের ছবিতে। কুমুদিনীর খাস-মহলের খাস-কামরা। যেখানকার যা সেখানে সাজানো আছে, ঘরে শুধু মানুষটা নেই। দেরাজে আলমারীতে কত মহার্ঘ সামগ্রী। যেন একটা মিউজিয়াম। কত দুর্মূল্য বস্তুর একত্র মিলন হয়েছে। ঐ যে কৃষ্ণচরণের ঘড়ি—ঘড়ির চেন, প্লাটিনামের চেনটা, ঘড়িটা ওয়ালথাম। কাচের আলমারীতে ঐ যে৷ হীরার বোতামের নীল ভেলভেটের কেশটা। আড়াই রতির ছাকা কমল হীরার বোতাম একেকটা। কত রকমের জড়োয়া বেনারসী, কত উঁচু দামের। একটা শো-কেশে শুধু হাতীর দাঁতের পুতুল। দেব-দেবীর মূর্তি। হেমনলিনীর চোখ দুটো জলে ভরে গেলেও হেসে কথা বললেন তিনি। ম্লান হেসে বললেন,—বলছি যে, মাকে আনাও। নয় তো দোষের ভাগী হবে যে। কারও কি জানতে বাকী আছে যে, মায়ে-ছেলে মন-কষাকষি হয়েছে বা চলে গেছে। চিঠি দাও না তুমি?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—মা আমাকে যে চিঠি দেয় না।

—ছিঃ। সে অভিমান ক'রে আছে। তুমি চিঠি দাও মাকে। ক্ষমা চেয়ে চিঠি দাও। বললেন হেমনলিনী চুপি-চুপি ফিসফিসিয়ে।

—চিঠি দিলে মা কি আসবে? আমি চিঠি লিখলে?

হতাশ-কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর। কঠিন দৃষ্টি-ভরা মুখটা মনে পড়ে। সঙ্কল্পে অনড় কুমুদিনী, সামান্য চিঠি পেয়ে কি মত পরিবর্ত্তন করবেন? কাশীতেই মন বেঁধে ফেলেছেন তিনি। একাহারী হয়ে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেবতাদের দুয়োরে মাথা খুঁড়ে চলেছেন। সেবাশ্রমে, মন্দিরে কীর্ত্তন ও নাম-গান শুনছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করছেন। যেন তিনি ভুলে গেছেন গত দিনের স্মৃতি। ভুলে গেছেন, তিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর মতই জমিদার-বধূ। জটাজুটধারী সাধক তপস্বী সন্ন্যাসীদের পদতলের ধূলা মাখছেন মাথায়। উদ্বৃত্ত পয়সা-পাই বিলিয়ে দিচ্ছেন ভিক্ষুকদের। চলাচলে পা দু'টো বুঝি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, খেয়াল নেই; কাশীর মাটিতে বিকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। অসিতে ঘর পেয়েছেন কুমুদিনী, গঙ্গার তীরে। বিশ্রামের সময়ে ভাদ্রের উত্তাল গঙ্গার প্রতি দৃষ্টি নিমীলিত ক'রে ব'সে থাকেন সাধিকার মত। কত যেন অভিমান পুষে রেখেছেন মনে, দুঃখের ছায়া দেখা যায় মুখে। কথা ক'ন না, মৌন থাকেন অধিক সময়ে।

মাঝে মাঝে ছেলেই বিস্মিত হয়ে পড়ে, কখনও কখনও মা যখন মনে ভাসে, অমন মায়ের মত মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে আছে। খাঁ-খাঁ করছে দুর্গ-পুরী, ফাঁকা হয়ে গেছে কেমন যেন কুমুদিনীর অনুপস্থিতিতে।

—লোকে কি বলবে? শত্রু হাসবে যে! বললেন, হেমনলিনী।—তুমি চিঠি দিয়েই দেখো না।

চুপ-চাপ থাকে কৃষ্ণকিশোর। পিসীমার মুখের দিকে চেয়ে। লজ্জিত হন হেমনলিনী, কথা বলতে বলতে মুখ নামিয়ে নেন। রাত্রি হ'লে কথা ছিল, দিনের আলোতে লুকানো যায় না আঘাতের চিহ্ন। ঘরের কোণে ছিল গ্র্যাণ্ডফাদার্স ঘড়িটা। চেনে-বাঁধা পেতলের পেণ্ডুলাম দুলে

চলেছে বিরামবিহীন। প্রতি পনেরো মিনিট তফাতে চার্চের পবিত্র সুরে যেন পিয়ানো বাজতে থাকে। ঘড়ি বাজতেই হেমনলিনী বললেন,—বেলা কত হ'ল? তুমি জল খেয়েছো?

টায়রাটার চিন্তায় বিভোর ছিল কৃষ্ণকিশোর। বললে,—না। এখন খাবো।

—ও মা যাটৃ! যেন চমকে উঠলেন হেমনলিনী। স্নেহের আতিশয্যে। বললেন,—যাই আমি নিয়ে আসি। কথা বলতে বলতে উঠে পড়লেন। সত্যিই বুঝি চললেন জলখাবার আনতে।

চিঠি আর টায়রা। গহরজানের দেওয়া বেহায়া চিঠি আর রাজেশ্বরীর পাওয়া টায়রা।

হেমনলিনী উঠে যেতেই টায়রাটা কোথায় ছিল, অতি দ্রুত নিয়ে কামিজের পকেটে পুরে ফেললে কৃষ্ণকিশোর। সত্যি সত্যিই চুরি করলে! গহরজানের জন্যে চুরি করলে?

গহরজান ঘুম থেকে উঠে কিংখাবের কাঁচুলি কড়া ক'রে আঁটতে আঁটতে ফন্দিটা এঁটেছিল। দিনের আলোতে গরাণহাটা তখন স্বচ্ছ পরিষ্কার। দোকানীদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। জর্দা আর আতরের দোকান, মুসলিম টুপির দোকান, তামাকের দোকান, খাঁটি হিন্দুর হোটেল, পান আর সোডাজলের দোকান। অধে দোকান-ঘর আর উর্ধে মেয়ে-মানুষদের ঘর। এমন সময় নেই যে কেনা-বেচার ডাক না চলতে থাকে।

মাসী যাচ্ছিল শ্মশানেশ্বরের কাছে। গঙ্গায় দু'টো ডুব দিতে। গহরজান মাসীকে পাকড়াও করলে। ফাঁস করলে ফন্দিটা। মাসী হাসলে শুনে। আপত্তি করলে না। বললে,—তবে, রামপাখী আনতে দে। বেশ তো, দ্যাখ না চিঠি লিখে।

সাত-সকালে মুরগীর নাম করতে চায় না সৌদামিনী। মুরগীকে বলে রামপাখী। গহরজানের মনের মণিকোঠায় ঘর বাঁধবার সাধ, অপেক্ষা প্রতীক্ষা সহ্য হয় না যেন। যাকে পেয়েছে তাকে নিকট করতে চায় গহরজান। আদর্শনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিংখাবে জরির ঝিলিমিলি দেখা যায় বুকে। আয়নায় দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায় গহরজান। চটুল হাসে, কন্দি আঁটে। বুকে দু'টো উঁপাখীর ডিম, চাঞ্চল্যে দোলায়িত হয়।

সতীর্থ ছিল গহরজানের কেউ কেউ। আশে-পাশে।

ছিল চপলা, যূথিকা, গোলাপের দল। মল্লিকাকে বললে গহরজান। কাগজ-কলম দিয়ে বললে চিঠিটা লিখে দিতে। মল্লিকা আলতায় কলম ডুবিয়ে লিখলে গহরজান যা বললে। চিঠিটা লিপিয়ে পাঠিয়ে দিলে কে এক জানপছনের লোক মারফৎ। হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ব'লে দিলে লোককে। বললো, ফিরতি পথে দু'টো আচ্ছা মুরগী সওদা করতে বাঁধিবে গহরজান।

বেলা কারও অপেক্ষা করে না। বেলা ঠিক বয়ে যায়।

নাট-মন্দিরে পুরোহিত ঘড়িতে চোখ তুলে অপেক্ষা করছিলেন। আহারাদি শেষ ক'রে হরীতকী মুখে দিয়ে বসেছিলেন। এক জন অনুচর কোথা থেকে এসে বললে,—লোক এসেছে।

কথা মত লোক পাঠিয়েছে পূর্ণশশী। পুরোহিতের পট্টবস্ত্র, কাঁচা-কোঁচার ঠিক নেই। পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন কাঁপতে কাঁপতে। বার্দ্ধক্যের জরায় জর্জরিত তিনি। গলায় ঝুলছে গলকম্বল। বাহুতে লোলচর্ম। পক্ককেশ মাথায়। বললেন,—ঘটিটা দেওয়া চোক আমাকে।

সূর্য্য তখন ঠিক মধ্যাকাশে।

ভাদ্রের ঘোলাটে আকাশে কতকগুলো চিল উড়ছে, অচঞ্চল ডানা মেলে। খেয়ালী হাওয়া চলেছে থেকে থেকে। দুপুর গড়িয়ে এসেছে।

হেমনলিনী খেতে বসেছিলেন তখন। রাজেশ্বরীও বসেছিল পিসীমার পাশে। রূপার সেটে খেতে দেওয়া হয়েছে। রূপার থালা, গেলাস, বাটিতে।

পিসীমাকে শুধোয় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কখন যাবে পিসীমা? আজ থাকো না তুমি।

হেমনলিনী বললেন,—পিসে মশাই ব'লে গিয়েছেন বিকেলে যেতে। না গেলে যদি কুরুক্ষেত্র করে!

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ কেউ কিছু কথা বলে না। কৃষ্ণকিশোর বললে, —আমি তোমাকে পৌঁছতে যাবো।

আর মনে মনে ভাবলো, পিসীমাকে রেখে ফেরার পথে যদি গহরজানের কাছে যাওয়া যায়। একটা লুকানো আনন্দে ক্ষণেকের জন্য মনটা কোথায় উড়ে যায়।

কিংখাবে ইজেৎ সামনে গহরজান তখন কোমর বেঁধে রাঁধতে বসেছে। রাঁধছে মুরগী-মুসল্লম। কড়াই কোড়ন দিয়ে হাঁচতে হাঁচতে ভাবছে কখন আসবে সেই মধু মুহূর্ত।

খটখটে শুষ্ক দুপুরটা হঠাৎ হাসি-খুশীতে হেসে উঠলো যেন।

কাছারীর সমুখের দালানে জনতা কেন? কালো কালো মানুষগুলোর কালো কালো মাথা। রোদ্দুরে পুড়ে গেছে দেহ; মাথায় সর্ষপ তেল চিকচিক করছে; খোয়া কাপড় পরেছে; চোখে ভয়-কাতর দৃষ্টি। সাঁওতালদের যেন একটা ক্যারাভান, গ্রামের বুক ফুঁড়ে সোজাসুজি চলে এসেছে মর্ত্ত্যের স্বর্গ কলকাতায়। হেঁটেও চলে এসেছে বললে ভুল হবে, ঐ ক্যারাভান বিশুষ্ক মরুভূমি পেরিয়ে আসেনি, এসেছে জল-পথে। কয়েক দিন পূর্ব্বে, একটা গুরুভার বজরায় পাল তুলে দিয়ে পঁচিশ জন মাঝির হাল টানতে টানতে পৌঁচেছে শেষ পর্য্যন্ত বাবুঘাটে। এলোমেলো দুর্দান্ত হাওয়া, গঙ্গার বুকে বুকে বজরা এসেছে অতি ধীরগতিতে। কতটা পথ কে জানে, বজরার হাল চলেনি। গঙ্গা যেখানে শীর্ণকায়া সেখানে গুণ টানতে টানতে টেনে আনা হয়েছে ঐ বিপুলকায় বজরাকে—যে জন্য দিন ফুরিয়ে কাঁটা রাতও কাবার হয়ে গেছে। দালানে ভীড় জমেছে ঐ কালো মানুষদের—যারা চর আর দ্বীপের বাসিন্দা। বঙ্গোপসাগরের মোহানা,—মাতলা আর জামীরা নদী যেখানে বয়ে চলেছে কুলু-কুলু—দলটা এসেছে সেখান থেকে। সাগর ছাড়িয়ে, ডায়মণ্ডহারবারের কোল ঘেঁসে বজরা এসেছে ভাসতে ভাসতে। জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে বজরা; কত বাষ্পপোত বজরাকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে গেছে দুরন্ত বেগে। কল্লোল উঠেছে গঙ্গায়, বজরাটা শুধু দুলে উঠেছে ঢেউয়ের আঘাতে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে কি না কে জানে বর্ষাশেষে চর আর দ্বীপ জেগে ওঠে নদীবক্ষে। মরুভূমিতে মরূদ্যান যেখানে তৃষিতের

যেমন আনন্দ হয়, সীমাহীন জলের মাঝে চর দেখে তেমনি ওরা তৃপ্তির হাসি হাসে। চরে ফসল হয়; ধান, সর্ষে, মুগ, খেঁসারি আর রবিশস্য।

যৌথ-সম্পত্তির সামান্য জমিদারী আছে ঐ জলের দেশে, এখন ভাগ-বাঁটোয়ারায় যার ভাগ্যে যতটুকু পড়েছে। কোন কোন সালে সর্ব্বগ্রাসী গঙ্গার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায় ঐ চর আর দ্বীপ। তখন দুঃসময়ে দুরবস্থার অন্ত থাকে না। মকরপূজার উপঢৌকনেও কিছু কম হয় না। যেমনকার জল তেমনি থাকে,—ঘর-দোর, জমি-জমা ভেসে যায়। ধুয়ে যায় কত কষ্টের ফসল। সেই সঙ্গে দু'-চারটে মানুষেরও মায়া কাটাতে হয়। পশু-পক্ষীর কথাই নেই।

কাছারীতে আমলা-বৃন্দ অভ্যর্থনা জানায়। পানীয় জল দেওয়া হয়। মাদুর আর চ্যাটাই বিছিয়ে দেওয়া হয় বসতে। হাওয়া খেতে দেওয়া হয় কতগুলো হাত-পাখা। দলের হয়ে কথা বলে দলপতি। এক দল অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সৈনিক, যেন শুধু হুকুম পালনের অপেক্ষায় বসে আছে অধীর আগ্রহে। আজব দেশ কলকাতাকে দেখে বুঝি বা কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে ওদের দৃষ্টিতে। ইটের কোঠা দেখে মনে করছে, হয়তো স্বর্গ থেকে পাঠানো যত প্রাসাদ ও অট্টালিকা। যেখানে উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই কেনায় কেনা, সেখানকার অধিবাসী ইমারত দেখে যেন হকচকিয়ে গেছে। দেখছে শুধু চোখ ফিরিয়ে। যেন গ্রীস দেশ দেখছে।

পাইক আর সিপাইদের ডাক প'ড়েছে।

ওদের সঙ্গে এসেছে একটা মোষের গাড়ী। বাবুঘাট থেকে। ভরী পূর্ণ ক'রে এনেছে ঐ চর আর দ্বীপের অধিবাসীরা। ঘরের লক্ষ্মী তুলে দিয়ে যেতে এসেছে। ধান্যলক্ষ্মী। ডাল—ভাজা মুগের ডাল। পোড়া-মাটির জারে খাঁটি মধু। মতায় খৈ। চিনির মুড়কী। রামদানা কা লাড্ডু। মাদুর-পাটি।

আর টাকা এনেছে। কত টাকা কে জানে!

সেলামী বা নজরানা নয়, বকেয়া খাজনার টাকা। মুরুব্বীদের মাথায় মুগার পাগড়ীর খাঁজে খাঁজে আছে। কাছারীর কড়িতে ঝুলন্ত চালিতে চোখ পড়েছে আমলাদের। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় যৌথ-সম্পত্তির ভাগে পাওয়া মৌজার রেকর্ড আছে ঐ চালিতে। মনোহরপুর মৌজার কাগজ-পত্র—যেগুলো জটিলতম ঠেকে গমস্তাদের কাছে। চুল পরিমাণ জমির জন্যে শোনা যায় যেখানে দু'-চার মানুষের জান ধূলি-পরিমাণ গণ্য হয়। তাজা রুধিরে চর আর দহের জল কয়েক মুহূর্তের জন্য লাল হয়ে উঠে কোথাও কোথাও। নিমেষের মধ্যে রক্ত জল হয়ে যায় জলেরই ঘূর্ণাবর্তে। তরোয়াল চলে না সেখানে, কিংবা বর্শা। যা করে তীর-ধনুক। মনোহর-পুরের অধিবাসীদের লক্ষ্য অব্যর্থ।

হঠাৎ বিষম সমস্যায় প'ড়ে জমিদারের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে [illegible]ছে। যৌথ-সম্পত্তি বিভক্ত হওয়ায় টাকা লেন-দেনের ব্যবস্থা হয়েছে [illegible] ভিন্ন, যার প্রজা তাকেই দিতে হবে খাজনা। মনোহরপুর মৌজার [illegible] চালের মফঃস্বল-কাছারী টাকা জমা করতে চাইছে না। টাকা [illegible] দিচ্ছে। বলছে, কার টাকা কে নেয়?

কতগুলি মানুষ, তবুও কোন হৈ-চৈ নেই। জলের মানুষ, ওদের যত কেরামতি জলে। কলকাতার মাটিতে ওরা হয়তো তাই স্তব্ধ-গম্ভীর। বিনম্রচিত্ত।

তখন প্রায় সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে।

কেবল হুজুর শুধু এখনও পর্যন্ত আহারাদি করতে ফুরসৎ পাননি। সূর্য অস্তাচলের দিকে হেলে না পড়লে কোন দিন খাওয়া হয় না। কি যে করেন ঠিক নেই, বেলা প্রত্যহই ব'য়ে যায়। খেতে খেতে বেজে যায় তিনটে। অসময়ে নাওয়া-খাওয়া না করলে হয়তো জমিদারী চাল বজায় থাকে না। হুজুর তখন স্নানাস্তে চুলে টেরী কাটছিলেন। এ্যালবার্ট ক্যাপনের চুল, জল

ঘষছিলেন মাথায়। গুন-গুন ক'রে গান গাইছিলেন। ফুলেল তেলের সুগন্ধে মেতে উঠেছিল হাওয়া।

—হুজুরকে কাছারী থেকে ডাকাডাকি করছে যে। কোথা থেকে এসে বললে অনন্তরাম। বললে,—মনোহরপুর থেকে এক পাল প্রজা এসে হাজির হয়েছে। না ব'লে-ক'য়ে এয়েছে, এখন ম্যাও সামলাও কেনে।

কথাগুলো শুনে উত্তর দিতে যাবে, কথা বললেন হেমনলিনী দরজা থেকে। বেশ তর্জ্জন ক'রেই বললেন,—খেয়ে-দেয়ে যেখানে যেতে হয় যাও। বেলা চারটে অবধি হেঁসেল নিয়ে কেউ ব'সে থাকবে না।

স্বেচ্ছায় কথা ক'টি বললেন না হেমনলিনী। প্রজা এসেছে শুনেই রাজেশ্বরী কানে কানে ব'লে দিয়েছে হেমনলিনীর। বলেছে,—পিসীমা, খেয়ে যেতে বলুন।

অগত্যা খেতে বসতে হয়।

কিন্তু খাওয়ার ঘরে যেতে মন চায় না হুজুরের। শয়ন-ঘরেই খাওয়া। হেমনলিনী আজ আছেন, যে জন্য তিনিও কাছাকাছি বসেন। এটা-সেটা খেতে বলেন। মাছি তাড়াতে হাত-পাখা চালান। প্রজা এসেছে কানে পৌঁছনো পর্য্যন্ত হেমনলিনীর চোখে বিগত দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে। কর্ত্তাদের আমলের ঐ মনোহরপুরের জমিদারী। চর দখল নিয়ে যেখানে কত বার খুনোখুনি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। মনোহরপুরের জমিদারী ছিল সে যুগের স্বর্গমত্ত আমোদ-আহ্লাদের জায়গা। কর্ত্তাদের মধ্যে ছিল যাঁদের শিকারের সখ ছিল, মনোহরপুরে গা-ঢাকা দিতেন কখনও সখনও। পোর্ট ক্যানিংয়ের পথে যাত্রা করতেন। শিকারের পোষাকে। তখন মাতলা আর জামীরা নদীর তীরের মানুষ বুঝতো মৌসুমী ফুল ফুটলো মনোহরপুরে। জমিদার বাবুদের বন্দুকের গুলীর আওয়াজে অস্থির হয়ে উঠলো চকাচকীর ঝাঁক। উড়ন্ত কাদাখোঁচার বুক থেকে টাটকা লাল রক্ত ঝরলো আকাশেই। মেয়ে-মহলে সাড়া প'ড়ে গেলো। গোমস্ত যুবতীদের কেউ কেউ আঁৎকে উঠলো ভয়ে।

হেমনলিনী ভাবছিলেন—

ঘড়ি-ঘরের ঘন্টায় ভাবনাটার জাল বুঝি ছিন্ন হয়ে গেলো। অন্ত দিন হ'লে ভ্রাতুষ্পুত্রকে এটা-সেটা খাওয়াতে কত জোর-জবরদস্তি করতেন। আজ স্মৃতির পটে ভেসে উঠেছে মনোহরপুর। আরও কত কথা ও কাহিনী ঐ মনোহরপুরকে জড়িয়ে।

খাচ্ছে, কিন্তু খাওয়ায় মন নেই। এক দল প্রজা এসেছে মনোহরপুর থেকে। এসেছে তো কি হয়েছে! জড়োয়া টায়রাটাই তখন মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। আর একটা অপরূপ মুখ—গহরজানের অনিন্দ্য রূপশ্রী। মিষ্টি চটুল হাসি। মধুমাখানো কথা। কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিসীমা, আমি তোমাকে পৌছতে যাবো। যখন যাবে ডাকতে পাঠিও আমাকে।

হেমনলিনী ক্ষণেক ভেবে বললেন,—তুমি আর যাবে কেন? বৌটা একলা থাকবে। অনন্তই যাক্ না, পৌছে আসবেখন।

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে মুখে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—অনেক দিন জুড়ী চালাইনি। আজ আমি হাঁকিয়ে যাবো। তুমি আপত্তি ক'র না।

দেওয়ালের কাছে, এক কোণে রাজেশ্বরী দাঁড়িয়েছিল। এক গলা ঘোমটায় মুখটি ঢাকা প'ড়েছে। ধবধবে ফর্সা বাহুযুগল শুধু দেখা যায়। আর আলতা-রাঙা দু'টি পা। এক জোড়া তোড়া ছিল পায়ে। দিনশেষের আলো-আঁধারিতে ঝিলিক মারছিল। চাঁদির চাকচিক্য।

হেমনলিনী আপত্তি করতে পারেন না। কথাগুলো শুনে মৌন থাকেন। দেওয়ালের কাছে এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে শুধু রাজেশ্বরী। গাড়ীতে যাবে শুনে পর্যন্ত মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। আশাহত দৃষ্টিতে দেখে রাজেশ্বরী, ঘোমটার ফাঁক থেকে। মনোহরপুরের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে থাকেন হেমনলিনী; চোখ মেলে থেকেও যেন দেখতে পান না কখন উঠে গেছে কৃষ্ণকিশোর। ঘোমটা খুলে ফেলে বললে রাজেশ্বরী,—চলুন পিসীমা। ঘরে বসবেন চলুন।

হেমনলিনী একটা ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলে বললেন,—হ্যাঁ মা, চল' তাই চল'।

টম কুকুরও ঘরের অদূরে বসেছিল পেটে মুখ গুঁজে। লোমে ঢাকা চোখ দু'টো পিটপিট ক'রে দেখছিল। প্রভু উঠে চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টমও চললো পেছনে পেছনে।

অত ছকাপাঞ্জা জানেন না হেমনলিনী।

দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে কোমরের মুঘলাই মোহরের গয়নাটা খুলতে খুলতে বললেন,—আয় বৌ, আমরা গল্প করি। কেমন ভাবসাব হ'ল, বল্ শুনি।

লজ্জায় আনত করে মুখটা রাজেশ্বরী। রূপোর একটা পানের ডিবে রাখে হেমনলিনীর কাছে। বই-ডিবে। আর জর্দা-সুপুরির কৌটা। কেউ কোথাও নেই, তবুও মাথায় ঘোমটা দেখে বললেন হেমনলিনী তিরস্কারের সুরে,—ভাখ্ বৌ, আমার কাছে এত লজ্জা চলবে না। হোঁচট খেয়ে প'ড়ে মরবি যে!

স্মিতহাসি ফুটে উঠে মুখে। গুণ্ঠন তুলতেই রাত্রিশেষের রক্তিমাভ শুভ্র এক খণ্ড আকাশ যেন দেখা গেলো। ষোড়শী কন্যার ঢলো-ঢলো মুখ। পক্ষ্মবহুল চোখ দু'টোতে নম্র দৃষ্টি। বিহারের মেহাত্তী ছাপা শাড়ী পরেছিল রাজেশ্বরী। ফিনফিনে পাৎলা খোলে হলুদ রঙের সূক্ষ্ম নক্সা। লাল পাড়। হেমনলিনী খানিকক্ষণ দেখে বললেন,—তোকে বৌ, খোট্টাদের বৌ ব'লে মনে হচ্ছে। দেখিস্ বৌ, বাপ তোর খোট্টা ছিল না তো?

কথাটা শুনে শুধু একটু হাসলো রাজেশ্বরী। হেমনলিনী বলতে পারেন, অবশ্যই বলতে পারেন এমন দু'-একটা কথা। ঠাট্টার সম্পর্কে বলতে পারেন। রাজেশ্বরী বসলো হেমনলিনীর কাছে। মাটিতে সুজনী বিছিয়ে। হেমনলিনী মাতৃতুল্য হ'লে কি হ'বে, স্নেহময়ী পিসীমাকে মনে হয় যেন সমবয়সী।

বয়স এবং সম্পর্কের বাচ-বিচার নেই, অন্তরটা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। শিক্ষিত মন হেমনলিনীর, উঁচু ঘরে জন্ম। অতুল ঐশ্বর্যের মাঝে আজন্ম লালিত-পালিত হয়েছেন। শ্বশুরালয়েও তিনি [illegible]। নকল হেসে বললেন,—কি লো বৌ, মুখে কথা নেই কেন? বলবি নে বুঝি আমাকে?

অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

হাসে মিটি-মিটি। বলে না কিছু, শাড়ীর আঁচলটা পাকায়। পিসীমার মুখ আর দেহটা লক্ষ্য ক'রে দেখে। দুই ছেলের মা, বয়স দু'কুড়ি পেরিয়ে গেছে, তবুও হেমনলিনীর দেহের গঠন এখনও আছে অটুট। রূপ-লাবণ্যে মুখাবয়ব এখনও কত মিষ্টি। গায়ের রং কাঁচা হলুদের মত। তাই কালসিটের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। হেমনলিনীর সঙ্গে এসেছিল একজন পরিচারিকা। খাস-দাসী যাকে বলে। সঙ্গে এনেছিল একটা হাত-বাক্স। তাতে আছে পানের ডিবে, দোকতা-জর্দা। শাড়ী-জামা। আর কি কি এনেছিলেন হেমনলিনী, কে জানে। দাসী এসে হাত-বাক্সটা বসিয়ে দিয়ে যায়। হেমনলিনী দেখলেন বৌয়ের মুখে কথা নেই। বললেন,—তুই তো বৌ গান জানিস। শোনা, একটা গান শোনা।

রাজেশ্বরী লজ্জা পায় যেন। বলে,—না তো পিসীমা, আমি তো গান জানি না।

কৌতুকের ছলে বললেন হেমনলিনী,—তবে যে শুনেছিলুম, তুই খুব ভাল গাস।

ভাইপো-বৌকে নিয়ে যে-ঘরে এসে বসেছিলেন হেমনলিনী, সে-ঘরটা অন্দরে মেয়েদের বৈঠকখানা। দেওয়ালের কোলে ছিল সারি সারি লাল ভেলভেটের সোফা। কুলুঙ্গিতে আয়না দেওয়া গো-কেসে হাতীর দাঁত আর পোরসিলিনের পুতুল। কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা—পশু, পক্ষী আর পোটা-মন্দ। আর এক দিকে ছিল একটা পিয়ানো।

হেমনলিনী যেমন পড়তে শিখেছিলেন, তেমনি শিখেছিলেন গান। কেউ শিক্ষা দেয়নি, নিজে শিখেছিলেন। গাইতে আর বাজাতে শিখেছিলেন। হেমনলিনী বললেন,—জানিস বৌ, আমাকেও গান শিখতে হয়েছিল। আমার খেলুড়ীদের কেউ কেউ গান জানতো। আমিও হার মানি কেন, আমিও শিখেছিলুম।

পেয়ে বসলো যেন রাজেশ্বরী। বললে,—তবে পিসীমা আপনাকে গাইতে হবে। গান না শুনে ছাড়বো না। ঐ তো বাজনাও আছে।

হেমনলিনীর অন্তরটা হ'ল জলের মত। অত ছলাপাঁজা জানতেন না। বললেন,—ওটা যে পিয়ানো। শুধু বাজাতে হয়। পিয়ানোতে গান খুব জমে না। তবে গাওয়া কি আর যায় না!

খুশীতে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। বলে,—তবে একটা গান গাইতে হবে। বাজনাগুলো প'ড়ে আছে, কেউ বাজায় না।

কথাটা শুনে হেসে ফেললেন হেমনলিনী। বসেছিলেন, উঠে এগিয়ে গেলেন পিয়ানোটার কাছে। বসলেন পিয়ানোর সামনে, গোল তেপায়ায়। বললেন,—তুইও যেমন বৌ! আর কি এখন গাইতে পারি আগের মত! মনে-টনে নেই ছাই।

রীতিমত গানের অভ্যাস না থাকলেও বাংলা গানের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন হেমনলিনী। রবি ঠাকুরের কোন্ গানের সুর হালে প্রকাশ হয়েছে হেমনলিনীকে শুধোলে জানা যাবে। কান্তকবি আর অতুলপ্রসাদ কি কি নতুন গান রচনা করলেন, হেমনলিনীর অজানা থাকে না। কত চেষ্টায়, কত যত্নে খাতায় তুলে রাখেন তিনি গানগুলি; নিজে লিখে রাখেন। গানের খাতা আছে হেমনলিনীর। কয়েক খণ্ড। সোনালী অক্ষরে নাম লেখা আছে, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো। কেউ জানতে পারে না, অতি গোপনে সংগ্রহ করেন হেমনলিনী। বিজনপদর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন সকলের অলক্ষ্যে। সাহায্যে [illegible] অভিমান ক'রে থাকেন হেমনলিনী।

সোহাগের সুরে বল্লেন,—গানগুলো না লিখে এনে দিলে কথা থাকবে না ঠাকুরপো। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

দ্বিজপদ নামজাদা সাহিত্যিক হয়ে উঠতে না পারলেও, সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তিনি যথেষ্ট উদ্যমশীল। হেমনলিনীর অধরোষ্ঠে হাসি দেখতে পাওয়ার লোভে দ্বিজপদ শেষ-পর্য্যন্ত সাহিত্য থেকে সঙ্গীতশিল্পের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তদুপরি হেমনলিনীর সঙ্গে দ্বিজপদর সম্পর্কটা এখন আর ঠিক যথাযথ নেই। পরমগুরু স্বামীর হিংস্রমূলক অত্যাচারে হেমনলিনীর অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মুছিয়ে দেন দ্বিজপদ। ব্যথিত মনে আনন্দের খোরাক জোগান। বিধাতা ব্যতীত কেউ জানতে পারে না।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝঙ্কার উঠলো পিয়ানোতে।

মৃত একটা কিছু যেন সহসা বেঁচে উঠলো যাদুস্পর্শে। কি একটা গানের সুর অনেকক্ষণ ধ'রে বাজিয়ে চললেন হেমনলিনী। ব্যবহার নেই পিয়ানোটার, তবুও কত মধুমিষ্ট আওয়াজ। বেশ কিছুক্ষণ বাজিয়ে অতি মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন হেমনলিনী। গাইলেন: 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে তুমি তুমি ধন্য ধন্য হে—'

অস্ফুট চাপা কণ্ঠে গাইছেন হেমনলিনী আর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে শুনছে রাজেশ্বরী। ভাবছে পিসীমা'র কত গুণ! কি সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি! মৃতপ্রায় হয়েছিল যেন এই যক্ষপুরী—হেমনলিনীর গান আর বাজনায় ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। খটখটে শুষ্ক দিনটা যেন হেসে উঠলো হাসি-খুশীতে।

—শুনছো বৌদিদি? ভাঁড়ারে যেতে হবে যে! দু'টো চুলোয় আগুন পড়েছে উদিকে। পান হচ্ছে কেয়ার না ক'রেই বললে।

রাজেশ্বরী থ হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিনোদা মুখ গুঁজে গুঁজে বললে, —মনোহরপুর থেকে শত খানেক পেয়াদা এয়েছে যে! পাত পেড়ে খাওয়াতে হবে, অভার হয়ে গেছে কাছারী থেকে।

রাজেশ্বরী বললে,—চল' তুমি, এখুনি আসছি আমি।

বিনোদা মুখ খিঁচিয়ে বলে,—হ্যাঁ, না চলে তো রেহাই নেই। এসো তুমি। উনুন নিকোতে না নিকোতে আগুন পড়লো।

গান থেমে যায়। উঠে পড়েন তেপায়া থেকে হেমনলিনী। বলেন, —আমি আর বসে থাকি কেন? চল্ বৌ, তুই ভাঁড়ার দিবি, আমি দেখবো। আমার ভাইপোটি গেল কোথায়? থাকলে না হয় কথা কইতুম।

অর্থপূর্ণ হাসি এক ঝলক হেসে বললে বিনোদা,—পেরজা এয়েছে, জমিদার দেখা দিতে গেছেন। কথার শেষে রাজেশ্বরীকে শুনিয়ে বলে, —ভাঁড়ার দিলেই শুধু চলবে না বৌদিদি। তুলতেও হবে। কত সামগ্রী এয়েছে মনোহরপুর থেকে।

হ্যাঁ, অনেক খাদ্য এবং ব্যবহার্য দ্রব্য সঙ্গে এনেছে মনোহরপুরের প্রজাদল। শুধু বকেয়া খাজনার টাকা নয়, দেশজাত কত কি শস্য আর আহার্য বস্তু। হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে খাঁটি মধুর গন্ধ।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

শুধু নারিকেলের শাখে শাখে সূর্যালোক কাঁপছে থরো-থরো। বেলা অতিক্রান্ত হওয়ায় ফেরীওয়ালার ডাক শোনা যাচ্ছে পথে পথে। এখন রুদ্ররবির জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে। নীলাকাশে আলুথালু শুভ্র মেঘ। বুঝি কোন্ এক পক্বকেশ জটাধারী অলক্ষ্যে কোথায় ব'সে ব'সে ছিঁড়ে কাটছে জটার জট। কাছারীতে যেতেই ঘিরে ধরলো মনোহরপুরের অধিবাসী—কালো কালো মানুষ। জাতিতে শূদ্র, ব্রাহ্মণকে দেবতা জ্ঞান করে। ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল সকলে। যেন এক পবিত্র মন্দিরে এসেছে; অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে এসেছে চর আর দ্বীপের ঐ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষগুলি। আন্তরিক ভক্তিতে ওদের গদগদ চিত্ত। শঙ্কিত দৃষ্টি ওদের চোখে, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের আওতায় চিরদিনের

যত বুঝি বা হারিয়ে ফেলেছে ব্যক্তিগত সত্তা। এখনও পাকা জীবন্দার হ'লে কি হবে—ওদের দিন যে শেষ হয়ে যায় আল আর ক্ষেতে; সূর্য্য পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গেই ফসল বুনতে আর ঘরে তুলতে। ক্ষেতের ফসলের সঙ্গে ওদের যত মিতালী; দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমিই শয্যা।

কিন্তু বুলবুলিতে যত ধান খেয়ে গেলেও পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে। যার জমিতে চাষ, মুখের গ্রাস,—সেই জমিদারকে ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হয়, ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। জমিদার যে দেবতা, কত অনুগ্রহে ভূমি দিয়েছেন। মনোহরপুরের মফঃস্বল-কাছারী খাজনা জমা না নেওয়ায় ওদের টনক ন'ড়ে গেছে। সোজা চ'লে এসেছে খোদকর্ত্তার কাছে—ভূমির মালিকের কাছে।

শুধু প্রণাম নয়, শুধু হাতে প্রণাম নয়।

শুধু খাজনাও নয়, সাধ্যমত সেলামী দেয় সকলে। নজরানার টাকা রাখে মেঝেয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত-জল-করা টাকা। প্রণাম করজোড়ে সমীহ করে ঐ মূর্ত্তিমান অজ্ঞানের দল। পাছে কোন ত্রুটি হয় সেই ভয়েই যেন জড়সড়। দলপতি শুষ্ক কণ্ঠে বলে ভয়ে ভয়ে,—হুজুর, জমি ভাগাভাগি হয়ে গেল, আমাদের ভাগের জমিদার হয়েছেন আপনি। কাছারীও ভাগে পড়েছে। জমির ঠিক-ঠিক মালিক যে কে কে হয়েছেন, কাছারীতে কেউ জানেন না। নায়েব মশাইদের টাকা জমা নিতে সাহস হচ্ছে না। হুজুর, আমাগোর টাকা কেন বাকী পড়ে থাকে! আমরা মা গঙ্গাকে হুজুর, পূজো দিয়ে চলে এলাম আপনার দরবারে হুজুর! টাকাটা না দিলে হুজুর, খেয়ে সুখ নেই, শুতে ঘুম নেই। ভাবলাম, শেষ পর্য্যন্ত ভাবলাম হুজুর, টাকাটাও জমা দেওয়া হবে, হুজুরকেও দেখা যাবে। আর দোনামনা না ক'রে মা গঙ্গার পূজো দিয়ে বেরিয়েই পড়লাম হুজুর।

দলপতি যখন বক্তব্য শেষ করছে তখন অজ্ঞাত সঙ্কেতে পাষাণ মূর্ত্তির

মত বসে আছে অনড় হয়ে। শুনছে, প্রতিনিধির মুখে নিজেদের কথা শুনছে।

কিন্তু হুজুর কি শুনছেন।

সময় হয়ে আসছে যে। দেখতে দেখতে ব'য়ে যাচ্ছে বেলা। এখন ক্লান্ত-মধ্যাহ্ন। টায়রা, জড়োয়া টায়রা; অন্ধকারে লুকিয়ে রাখলেও জল-জল করে যে গয়নাটা, সেটাই যে এখন অধিকার ক'রে আছে মন আর মেজাজ। যতক্ষণ না একটা কিছু গতি হচ্ছে, যতক্ষণ না কপালে উঠছে গহরজানের, ততক্ষণ হুজুর অন্য কিছু শুনছেন না।

নায়েবদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ যে-জন, তিনি আসতেই বিষয়টা লঘু হয়ে গেল। বললেন, দলপতিকে লক্ষ্য ক'রেই বললেন,—কত কষ্টে এসেছো, দু'দণ্ড এখন জিরিয়ে নাও। পেটে জল পড়ুক। হুজুর তো আছেনই। শুনবেন, যথা-সময়ে শুনবেন তোমাদের আর্জি। হুজুরও খেয়ে উঠলেন এখনই, বিশ্রাম করতে দাও হুজুরকে।

—যথার্থ ব'লেছেন নায়েব মশায়। কথায় বিনয় ফুটিয়ে বললে দলপতি। বললে দুরুকরে। বলতে বলতে ব'সে পড়লো।

হুজুর শুধু বললেন,—খাওয়াবেন, গেরস্থকে ব'লে পাঠিয়েছেন নায়েব মশাই?

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন,—তৎক্ষণাৎ হুজুর। তৎক্ষণাৎ ব'লে পাঠিয়েছি। মনে হয় এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে এলো।

কিছুই মনে ধরলো না? কত আনন্দ, কত ঐশ্বর্য, কত ভক্তি বুকে ক'রে এনেছে ঐ মেহনতী চাষা মানুষগুলি! যেন যাত্রীর মত এসেছে কোন পবিত্র তীর্থে, ভাল ক'রে দেখলেন না হুজুর। ফিরেও তাকালেন না।

পশ্চিমাকাশে বুঝি এতক্ষণে ফুটে উঠলো অস্তছবি। দিনের আলো মলিন হয়ে আসছে ক্ষণে ক্ষণে। কাক ডাকাডাকি করছে।

গহরজান বাই নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়েছে। কোন অজুহাত চলবে না।

মুরগী-মুসল্লম বানিয়ে খাওয়াবে! না গেলে কত আফসোস করবে কে জানে। ভাববে হয়তো আহাম্মক। আমন্ত্রণ ক'রে শুধু কি খাইয়েই খুশী হবে, খোশগল্প করবে।

*

সূর্য্য ডুবু-ডুবু দেখে পল্লীতে তখন সাজগোজের পালা চ'লেছে। মুখে খড়ি-মাটি মাখতে বসেছে। ঠোঁটে আর পায়ে আলতা। চোখে কাজল। চুল বাঁধতে বসেছে কেউ কেউ মেলায় কেনা আয়না সামনে ধ'রে। কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের আলো নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হবে, যে জন্য এখন চলছে প্রস্তুতি। সাজসজ্জা। কার কত রূপ, কার দেহশ্রী কত—পরীক্ষা চলবে আঁধার হ'তে না হ'তে। ঘরের কোণে ঝুলন্ত আলসেয় জ্বলবে লণ্ঠন, রূপের হাট ব'সে যাবে।

ও গহর, কে এলো ছাখ। কোথা থেকে বললে সৌদামিনী। খুশী-ভরা কণ্ঠে। বললে,—কেমন অসময়ে এলো ছাখ, যাতে আর থাকতে না হয় বেশীক্ষণ।

চমকে উঠেছিল গহরজান। ভেবেছিল যার জন্য প্রতীক্ষা, এলো বুঝি সেই।

মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে গহরজান দেখতে গিয়ে দেখলো, না অন্য জন। বললে, কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বললে,—কেন এলে তুমি, যাও, চলে যাও। কথা নেই তোমার সাথে।

আগন্তুক দিলখোলা হাসি হাসলো হো হো শব্দে। অপমান গায়ে মাখলো না। বললে,—গহর, তোর তো খুব বাড়্‌চিড় হয়েছে! বেমালুম বদলে গেছিস তুই?

—কে না বদলায়? গহরজানের রুক্ষ কণ্ঠ।—তুমিও তো বেজায় বদলে গেছো। আগে রোজ আসতে। এখন ন'মাসে ছ'মাসেও পাত্তা মেলে না।

—দোষটা আমাদের কি শুনলুম না তো জলিল। হাসি চেপে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে সৌদামিনী। বললে,—গহরকে বল' দে, ও তোমার মেয়ের মত। মেয়েকে এক-আধ বার দেখতেও তো আসতে হয় জলিল!

আগন্তুকের দিল-খোলা হাসি থামে না। হাসতে হাসতেই বলে,—পেটের ব্যামোয় ভুগতেছিলুম কত দিন। হাকিমকে দেখাতে হাকিম কত দাওয়াই খেতে দিয়েছে। খানাপিনার নিয়ম ক'রে দিয়েছে। গান গাইতে মানা ক'রেছে বেশ কিছু দিন।

কথা শুনতে শুনতে মুখটি শুকিয়ে যায় গহরজানের। শরীর ভেঙে পড়েছে জলিলের? গাওয়া থামিয়ে দিয়েছে জলিল। অনেকগুলো প্রশ্ন তুফান তোলে গহরজানের মনে।

জলিলই গান শিখিয়ে গাইয়ে ক'রে তুলেছে গহরজানকে।

কত চেষ্টায় একটা যোগ্য শিষ্য করেছে জলিল। স্নেহের বশে শিক্ষা দিয়েছে কত ভাল ভাল জিনিস। গহরজান দেখছে, হ্যাঁ, সত্যিই জলিল যেন একটু বেশী বৃদ্ধ হয়ে প'ড়েছে। ভ্রূ দু'টোতে পাক ধ'রেছে। জলিলের পোষাক কিন্তু আছে পূর্ব্বের মতই। সাদা মলমলের বুটিদার পাঞ্জাবী, জাম রঙের ভেলভেটের ফতুয়া একটা, যার কারচোবের কাজের জৌলসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ডুরিদার গুলবদনের ইজার। পায়ে লাল ভেলভেটের জরিদার নাগরা।

জলিল সত্যিকার গুণী ওস্তাদ। সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট দখল। গহরজানের কণ্ঠে গীতসুধার হদিশ পেয়ে পর্য্যন্ত নাড়াচাড়া করছে গহরজানকে। জলিল একটা বিছানো মাদুরে বসে পড়লো। মাদুরের এক পাশে প'ড়েছিল হারমনিয়মটা। কখন হয়তো গলা সাধতে বসেছিল গহরজান। জলিল বললে,—গহর, বাঙলা গান শিখেছি, শুনবি?

গহরজানের মুখে কথা নেই। জলিলের শারীরিক পতন দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে। জলিল বললে,—ময়না বাই শিখিয়েছে। গজল গান।

বলতে বলতে হারমনিয়মটা এগিয়ে নেয় জলিল। বলে,—ছুঁচো পান ছেঁচে খাওয়াবি গহর?

সৌদামিনী বললে,—আমি পান ছেঁচে দিচ্ছি জলিল। গহর যাক, চুল বেঁধে পোষাক-আষাক করুক। সময় বেশী নেই।

জলিল বললে,—কেন, কেউ আসছে?

ঠোঁট উলটে হাসলো সৌদামিনী। কেমন যেন দুঃখের হাসি হেসে বললে,—আসুক চাই নাই আসুক, তৈরী হয়ে না থাকলে তো আমাদের মুখে ভাত উঠবে না জলিল।

—হাঁ, হাঁ, ঠিক বাত আছে। হারমনিয়মের শব্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। জলিল বললে,—চুল বাঁধতে বাঁধতে শুনতে থাক্ গহর।

—আমি পান ছেঁচতে ছেঁচতে শুনি, তুমি গাও জলিল। কত দিন তোমার গান শুনতে পাইনি। বললে সৌদামিনী।

জলিল গান ধরলো। বাংলা গজল গান। গাইলে:

তোমরা কে তুঁহারে চায়
তোমার মত কত শত, লোটে আমার পায়।
কে তুঁহারে চায়—

বাইরে আকাশে-বাতাসে আজানের সুর। কাছাকাছি মসজিদ আছে চিৎপুরে। মিনারের কবুতর পাখা ঝাপটাচ্ছে ভয়ে-ত্রাসে।

মধ্য-কলকাতার তখন একটি গৃহে ফটক খুলে সেলাম জানাচ্ছে বেহারী দারবক—একটা জুড়ী দৌড়তে দৌড়তে পথে বেরিয়ে পড়লো।

হেমনলিনী ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে চলেছেন জহুর। কোথায় যেন বিঁধছে হীরা-জহরৎ চঞ্চলকে। অস্বস্তি বোধ করছেন জহুর। সঙ্গে কোথায় আছে টাকাটা কে জানে,—লুকিয়ে রাখলেও যে চাবি ছড়ায়।

আকাশে ফুল ফুটলো কোথা থেকে !

সদ্য-প্রস্ফুটিত যুঁই না মালতী না টগর কে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে মুঠো-মুঠো। অচঞ্চল নক্ষত্র, কোন সাড়া-শব্দ নেই। অতি ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে কখন একে একে ফুটেছে। গতি নেই, কেন তবে কাঁপছে ঝিকি-ঝিকি ! মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। যুগ-যুগ ধ'রে উদিত হচ্ছে, তবুও দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় রাজেশ্বরী। পর্দা-খোলা জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কতক্ষণ। তখনও আকাশে হাসির আভা লেগেছিল, দিনের শেষ আলোটুকু তখনও মোছেনি। কালো হয়নি আকাশ ! পিসীমা যখন গালে চুমা খেয়ে হাসি-অশ্রু মাখানো মুখে চ'লে গেলেন, সেই তখন থেকে। কত তুলসীতলায় শাঁখ বেজে-বেজে থেমে গেছে কখন, ঘরে-ঘরে জ্বলেছে লণ্ঠন, বাতি, ল্যাম্প। তথাপি খেয়াল নেই, রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই ! যেন সব কিছু ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমল পা দু'টিতে ব্যথা ধ'রে গেছে, টন-টন করছে। ভুলে গেছে চুল বাঁধতে, সাজতে, কাপড়-জামাটা পর্যন্ত বদলাতে। অন্ধকার আকাশের মতই গম্ভীর হয়ে আছে মুখ, স্থির আঁখি আকাশে মেলে মর্মর-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রাজেশ্বরী।

শুধু হেমনলিনী গেলে হয়তো ভাবনা থাকতো না। কিন্তু—

—বৌদিদি, আছো হেথায় ?

কথাগুলি শুনে যেন চমকে উঠলো রাজেশ্বরী। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে বললে,—হ্যাঁ, আছি বিনো দিদি। বল', কিছু বলছো ?

বিনোদা বললে,—আমি কিছু বলি নাই। লণ্ঠন জ্বালবে যে, লোকটা কাকেও দেখতে না পেয়ে আমাকে ডাকতে গেছলো। তাই ডাকছি।

লোক এসেছে। ঘরের লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। রাজেশ্বরী এতক্ষণে যেন বুঝলো সময় কোথা দিয়ে বহে গেছে। দিন শেষ হয়ে আঁধার হয়ে গেছে দিগ্বিদিক! লোক দাঁড়িয়ে আছে, ঘোমটা টেনে মুখটা ঢেকে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রাজেশ্বরী। বিনোদাকে চুপি-চুপি বললে,—এলোকে বল' না আসতে। আমি পুকুরে যাচ্ছি গা ধুতে।

—সে কি বৌদিদি! এখন যাবে তুমি পুকুরে? অন্ধকারে পা পিছলে পড়বে যে। না বৌদিদি, পুকুরে তোমাকে যেতে আমি মানা করছি! বিনোদা কথা বলে বয়োজ্যেষ্ঠর ভঙ্গীতে।

—তবে? বললে রাজেশ্বরী।

বিনোদা বললে,—ভারীকে বলছি জল তুলে দিয়ে যাবে। চানের ঘরে যাও, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে রাজেশ্বরী। গায়ে কাঁটা দেয়। বুকটা আনচান করে। হাতের তালু ঘামে। পা দু'টি হিম হয়ে যায়। পিসীমাকে পৌঁছতে গিয়ে যায় যদি অন্য কোথাও। হেমনলিনী আসতে কিছুক্ষণের জন্যে তবুও মুখে হাসি ফুটেছিল; অকূলে কূল দেখতে পেয়েছিল যেন রাজেশ্বরী। বুঝেছিল যে শূন্য দুর্গপুরীতে মানুষ আছে। কিন্তু টায়রাটা কে চুরি করলে! কে চুরি করতে পারে? যখন-তখন ঐ হারিয়ে যাওয়া টায়রাটা ভেসে ওঠে চোখে। ভাল ক'রে দেখতেও পাওয়া যায়নি টায়রাটা। মুহূর্তের দেখায় দেখেছিল রাজেশ্বরী, আলো পড়তে ঝলমল করেছিল জড়োয়া টায়রা। সহস্র দ্যুতি ছড়িয়েছিল। তীব্র আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে এগোয় রাজেশ্বরী। প্রশস্ত দালানে মাত্র একটি দেয়ালগিরি লণ্ঠন জ্বলছে টিম-টিম ক'রে। ভাল ক'রে অন্ধকার

ঘোচেনি। যেতে যেতে সহসা চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। কি দেখলো কে জানে! কোন প্রেতাত্মার ছায়া নয় তো! না, ভুল ক'রেছে সে। দেখেছে চলন্ত ছায়া। নিজ মূর্তির। ভুল বুঝতে পেরে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হয়। অধীর আগ্রহে কান পেতে থাকে। জুড়ী ফিরলো নাকি এতক্ষণে। অন্দর থেকেও শোনা যায় জুড়ীর ঘন্টাধ্বনি। কিন্তু কোন শব্দ এখনও কানে পৌঁছয়নি। মনে মনে রাগ হয়, রাজেশ্বরীর। এলোকেশীর প্রতি। তাকে একা রেখে গেল কোথায় পোড়ামুখী! প'ড়ে প'ড়ে কোথাও ঘুম মারছে না তো!

দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে, যার এমন বিকটাকার! যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রাজেশ্বরী। ভীত চোখে দেখলো লক্ষ্য ক'রে। না, কেউ নয়। দেওয়ালে টাঙানো আছে আড়াআড়ি দুটো তরোয়াল, মধ্যে গণ্ডারের চামড়ার একটা ঢাল। অব্যবহারে ও ধূলায় আসল রঙ হারিয়ে ফেলেছে। বিরক্ত হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। কেমন বিশ্রী লাগে যেন এই অচ্ছেদ্য তমিস্রা—তিমিরাকীর্ণ রাত্রি। ষোড়শী কন্যা, বিয়ের যুগল-মিলনের মাল্যগন্ধ এখনও যার দেহে—রাত্রি দেখে সে কেন ভীত হবে! সে তো প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হয়ে থাকবে—কখন আলো মুছে গিয়ে নামবে আঁধার। যখন শুধু মুখোমুখি হওয়ার সময়, যখন শুধু সোহাগ-প্রীতির বিনিময় হয়। দিনের আলোয় বেশ থাকে রাজেশ্বরী, যখন কেউ কাছে না থাকলেও গাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপতে দেখা যায়, উড়ে-যাওয়া পাখি মিষ্টি মিষ্টি ডাকে, জেগে থাকে দুনিয়ার মানুষ। দিকে দিকে ভয়-ভাঙানো আলো।

—কোথায় ছিলে তুমি পোড়ামুখী?

কাকে দেখে বললে রাজেশ্বরী। কাকে আসতে দেখে। এত চীৎকার ক'রে এই প্রথম বোধ হয় কথা বললে। দালানের শেষ প্রান্তে দেখা দিয়েছিল এলোকেশী। সম্বোধন শুনে এগোতে সাহস করলে না। বললে,

—তোরই ভালর জন্তে গেছলুম রাজো। মিথ্যে গাল দিস কেন! দিন দেখাচ্ছিহু একটা। কাছাকাছি যদি একটা ভাল দিন থাকে তো দিন কতক—

রাজেশ্বরী সত্যিই কুপিত হয়। বলে,—থাক্, আমার ভাল তোমাকে করতে হবে না, দোহাই, এখন কাপড়-চোপড় যা দেবে দাও। দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পেছন ফেরে এলোকেশী। বকুনির সুর শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে

কথাটা কানে বাজে। দিন দেখাতে গিয়েছিল এলোকেশী? শুভদিন?

নাট-মন্দিরে গিয়ে পড়েছিল এলোকেশী। পুরোহিত বসেছিলেন চিন্তাকুল হয়ে, এলোকেশী তাঁকেই অনুরোধ করেছিল। পুরোহিত নিজে দিনক্ষণ বলেননি, অনুচরদের কাকে আদেশ করেছিলেন। পঞ্জিকা দেখে দিন ব'লে দিতে হবে। কোন্ দিন শুভ, আর কোন দিন শুভ নয়। কবে যাত্রা আছে, কবে যাত্রা নাস্তি।

পুরোহিত ব'সে ব'সে কেমন যেন বকছিলেন বিড়বিড়।

এলোকেশী অন্ত দাসী হ'লে কি হবে, ঠিক লক্ষ্য করেছিল। দিন-ক্ষণ দেখতে গেছে জেনে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন কয়েকটি কথা। ব'লেছিলেন,—বধূমাতা কি পিত্রালয়ে যেতে অভিলাষী?

এলোকেশী কোন প্রত্যুত্তর দেয়নি। শুভদিনের নির্ঘণ্ট জেনেই ত্যাগ করেছিল নাট-মন্দির। পুরোহিত তখন সবে ফিরেছেন। ফিরে পর্য্যন্ত কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। পূর্ণশশী বোধ করি তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা দাওয়া পাক খেতে-খেতে উড়লো। ফিস্-ফাস হাওয়া। ঘুমন্ত গাছের শাখা কেঁপে উঠলো। পাতায় পাতায় শব্দায়িত হ'ল।

চানের ঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। অন্ধকারে একা। ভাবতেও লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। কথাটা মনে আনতে ঘৃণা বোধ করে। বিশ্বাস হয় না ভাবতে, তবুও যেন বিশ্বাস করে রাজেশ্বরী। মন থেকেই বিশ্বাস করে। একটা কথা, মাত্র একটা কথা, ঐ একটা কথাই জুড়ে থাকে যত কিছু ভাবনা। চুরি! চুরি! চুরি!

চৌর্য্যাপবাদ!

হ্যাঁ, সত্যিই চুরি বৈ কি। জুড়ীর ভেতরে বসে হুজুরের মনেও কথাটা যে উদয় না হয়েছে এমন নয়। টায়রা চুরি করতে হ'ল? গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে কিনে দিলে কি ক্ষতি ছিল? ক্ষণেকের জন্য কেমন অস্বস্তি বোধ হয়।

জুড়ী তখন ছুটছিল দ্রুতবেগে। ফাঁকা পথ, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ছুটছিল। দূরে দূরে কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে, নয় তো শুধুই কালো, ঢেকে আছে যত দূর চোখ যায়।

টায়রা যদি একটা কিনে দেয় রাজেশ্বরীকে। হারিয়ে গেছে, অভাব পূরণ ক'রে দেয় নতুন একটা দিয়ে। খুশীই হবে রাজেশ্বরী, মনে মনে ভাবছিল কৃষ্ণকিশোর। কত গয়না আছে রাজেশ্বরীর, কত রকমের, কত কত দামের। গা-মেলানো, সেট-মেলানো গয়না। কত মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরৎ।

কিন্তু, গহরজানের আগে গয়না কৈ? অন্ধকারে শুধু একটা মুখ, হাসি-মাখা ধারালো একটা মুখ, চকিতে ভেসে ওঠে আঁখিপাতে। রুক্ষ কেশের দুলন্ত বেণীতে জরি পাক পেয়েছে। নাকে নকল হীরের নাকছাবি, কানে পুঁতির ঝুমকো, গলায় স্ফটিকের মালা। বেদেনীর মত ঠিক দেখতে যেন গহরজানকে, কিম্বা বেদুইনদের মত। ঠোঁটের কোণে হাসির

ঝিলিক, চোখে মায়াময়ী চাউনি, চাল-চলনে যেন খুঁজে পাওয়া যায় বেদিয়া ছন্দ। গয়না নেই গহরজানের। যা আছে গিল্টির। নকল। চোখ-ধাঁধানো।

ভেসে-ওঠা মুখে বিকিয়ে দেওয়ার আভাষ। গহরজানের চোখে যেন আত্মসমর্পণ!

চিঠিতে লিখেছে, কি যেন একটা খাদ্য রেঁধেছে গহরজান।

মুরগীর কোপ্তা না কাবাব কি যেন। না ভাজা-মুরগী। গহরজান বানিয়েছে মুরগী-মুসল্লম। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, ক্ষীর আর মুরগীতে একত্র তৈয়ারী।

গহরজান তখন আলস্যে হেলান দিয়ে বসেছিল উবু হয়ে। দেখছিল ইদিক-সিদিক। জুড়ী কখন দেখা যাবে। যে কোন জুড়ী নয়, সেই বোতল-সবুজ রঙের জুড়ী-গাড়ী। দিনের শেষে এখানে জমজমাট হয় পথ, কত ল্যাণ্ডো, ফীটন, পাল্কী গাড়ী যাওয়া-আসা করে। গহরজান বসে বসে ডালিমকে খেলা দেয়। লোফালুফি করে। চুমু খায়।

—বৌদিদি, পুলিশ এসেছে বাড়ীতে।

মাথায় যেন বজ্রপাত হয় রাজেশ্বরীর। ভুল শুনছে না তো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,—কি বললে, পুলিশ এসেছে?

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছিল বিনোদা। দু'হাতে দু'টো দরজা। বললে, —হ্যাঁ গো হ্যাঁ বৌদিদি। পুলিশই এসেছে। আমি কি মস্করা করছি তোমার সঙ্গে?

—সে কি কথা বিনোদা! পুলিশ কেন আসবে?

আয়নার সামনে থেকে বিনোদার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললে রাজেশ্বরী। ভ্রু দু'টো বিস্ময়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে!

চোখ দু'টো যেন ঠেলে ঠিকরে পড়বে বিনোদার। বললে,—কী [illegible] আ[illegible]দের ঘরে গিয়ে বসেছে। দেখো আবার, খুনের দায়ে ফাঁসী যেতে না হয়!

কি অলক্ষুণে কথা বলছে বিনোদা! রাজেশ্বরী হাতে কাটিতে সিঁদুর। টিপ পরতে যাবে [illegible] কথা বলেছে বিনোদা। মড়ার মত। লণ্ঠনের আলোয় ঠিক দেখতে পায় না বিনোদা, রাজেশ্বরী চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছে। অন্তরের চোখ দিয়ে যেন দেখছে। হতাশা, পরিপূর্ণ হতাশায় চোখ বন্ধ করেছে রাজেশ্বরী। বিয়ে হওয়ার স্বাদ যে কত তিক্ত, অনুভব করছে হয়তো মনে মনে।

—উনি ফিরেছেন বিনোদা?

ভয়ে ভয়ে শুধোয় রাজেশ্বরী। আড়ষ্ট কণ্ঠে।

বিনোদা বললে,—কোথায় কে বৌদিদি! পিসীকে পৌঁছুতে যেয়ে কখনে গেছে কে জানে!

রাজেশ্বরী বললে,—পুলিশ কি বলছে? কেন এসেছে খোঁজ নিতে বল' না আমলাদের।

বিনোদা বললে,—ঠিক কথা বলেছো। আমি যাই, আমলাদের কানে কথাটা তুলে দিয়ে আসি।

ছায়াকে পেছনে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে চলে যায় বিনোদা। সেই হাওয়াটা ঘূর্ণীর মত কোথা থেকে পাক খেতে খেতে আকাশে উড়ে যেতে চায়। গাছপালা দোলাচলি করে। ঝরে-যাওয়া পাতা খড়খড়িয়ে ওঠে। মানুষের চোখে-মুখে হিমেল স্পর্শ দিয়ে শন-শন বইতে থাকে হাওয়া। অবিরাম ডেকে যায় ঝিঁঝি পোকা। দুর্গ মধ্যে অত্যন্ত একা মনে হয় নিজেকে, পা টিপে-টিপে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে রাজেশ্বরী।

দালানের লণ্ঠনটা হাওয়ায় দুলছে মৃদু-মৃদু। জ্বল-জ্বল করছে। ভয়ে জড়সড় হয়ে দালান পেরিয়ে আরেক দালানে পৌঁছয় রাজেশ্বরী।

কাকে দেখে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে। বাড়ীতে পুলিশ এসেছে শুনে হয়তো স্থির থাকতে পারেননি, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন উত্তরাধিকারীকে। নবরকান্তি দেহ, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, বক্ষে উপবীত। কে এসেছেন ঐ রক্ষাকর্ত্তা! ভয়লেশহীন দৃষ্টিতে দেখছেন এই অসহায়া কুলবধূটিকে। রাজেশ্বরী ভেবেছিল ঐ অপরিচিত পুরুষ নিশ্চয় কথা বলবেন। মুখে কথা নেই দেখে রাজেশ্বরী গুণ্ঠনের ফাঁক থেকে আড়-নয়নে দেখলো। দেখলো দাঁড়িয়ে আছেন সেই একই ভঙ্গিমায়। দেখছেন, দেখছেন এই ভয়পাওয়া বৌটাকে।

এলোকেশী এসেছিল পেছন পেছন। বললে,—কাকে দেখে এত লজ্জা এখানে! এক-গলা ঘোমটা টেনেছিস কেন?

—ত্যাখ্ তো এলো, ও-দালানে কে দাঁড়িয়ে আছেন? রাজেশ্বরী কথাগুলি বললে ফিসফিস ক'রে।

খানিক গিয়ে দেখে এসে বললে এলোকেশী,—কেউ তো নেই রাজো। কাকে দেখলি তুই?

তখন ঘোমটা খুলে ভাল ক'রে দেখলো রাজেশ্বরী। লণ্ঠনের আলোয় ভুল দেখেছে? আলো-আঁধারিতে ঠাওরাতে পারেনি। সামনের দালানের দেওয়ালে ছিল একটি তৈলচিত্র। মানুষের পূর্ণ আকৃতির আকার। সোনালী গিল্ট-ফ্রেমে বাঁধানো। পূর্ব্বপুরুষদের কে এক জন। হঠাৎ দেখায় মনে হয় যেন ছবি নয়, জীবন্ত।

—কোথায় চলেছিস তুই? জিজ্ঞেস করলো এলোকেশী।

ঢোঁক গিলে বললে রাজেশ্বরী,—পুলিশ এসেছে যে বাড়ীতে। জানিস না, তুই?

এলোকেশী শুনে বুঝি মূর্চ্ছা যায়। কোন কথা বলে না, ভয়-কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোথায় যাবে এই ভেবে অনন্যোপায় হয়ে ঘরে ফিরে চলে রাজেশ্বরী। আয়নার সামনে যায় না। সাজতে যেন আর

ইচ্ছা হয় না। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ী পরেছিল, লাল রঙের ভেলভেটের জামা। মনে হয়, সর্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশন করছে। রাজেশ্বরী পালঙ্কে এলিয়ে পড়ে। ভয় আর আশঙ্কায় মুখে কথা ফোটে না। ভাগ্যকে দোষে।

শুধু দু'জন লাল-পাগড়ী নয়, এক জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীও সঙ্গে এসেছে। দু'জন ট্যাস সার্জন। ওদের কটিদেশে চামড়ার বন্ধনীতে ঝুলছে সত্যিকার আগ্নেয়াস্ত্র। রিভলভার। ইংরাজ কর্মচারীটি ঘুরে-ফিরে দেখছিল কাছারী। গৃহাধিপতি নেই শুনে অপেক্ষা করছিল। কাছারীর দালানের দেওয়ালে এ্যালবার্ট ও ভিক্টোরিয়ার পাশাপাশি যুগল মূর্তির ছবি দেখে কর্মচারীটি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিল। রাজপূজা যেখানে হয়, সেখানে রাজদ্রোহী কোন কেউ কি থাকতে পারে? নিস্তব্ধ কাছারীতে ইংরাজের বুটের শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্মচারীটি দালানে ঘোরাফেরা করছিল। কেদারা এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বসছিল না।

আমলাদের মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে,—মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে কিছু লাভ হবে না।

কিন্তু মালিক তো নেই এখন! শীঘ্র ফিরে আসবে এই আশায় অপেক্ষা করছিল পুলিশ-পার্টি।

অন্দরে ভয় আর আশঙ্কায় বুকটা ঢিপ-ঢিপ করছিল রাজেশ্বরীর।

দেখে দেখে পুলিশ বিভাগ জেমস ব্র্যাডলেকে তত্ত্বাবধান করতে পাঠিয়েছে। বিষয়টা জটিল, আসামীদের কেউ চোর-বাটপাড় নয়, অথচ বিপক্ষ হলেন খোদ্ গভর্ণমেন্ট—জেমস ব্র্যাডলে ব্যতীত অন্য কে আছে যে তল্লাস করবে। কাজে এগোবে। কিন্তু বা দেরী হয়ে গেছে ব্র্যাডলের কানে উঠতে। হদিস্ করতে পারেননি গভর্ণমেন্ট যথাসময়ে। জেমস ব্র্যাডলে দু'হাত পেছনে পায়চারী করে কাছারীর দালানে। অধি-

কথায় সে অতি রূঢ়। তদুপরি আত্মম্ভরিতায় পাকাপোক্ত। বার্দ্ধক্যের প্রথম ধাপে উপনীত হয়ে ব্র্যাডলে পূর্ব্বের মত স্থির গম্ভীর নেই, সদাই বিরক্ত হয়ে থাকে। মুখের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে থাকে। যাকে বেত মারলে দোষ কবুল করবে, ব্র্যাডলে তাকে বুট-চালনায় অর্দ্ধমৃত ক'রে ছাড়বে।

দল-বল নিয়ে ব্র্যাডলে বেরিয়েছে যখন, তখন সূর্য্য ছিল মধ্যাকাশে। এখনও এক বোতলও বীয়র পেটে পড়েনি। মেজাজ বিগড়ে আছে। কেদারা দেওয়া সত্ত্বেও বসছে না, পায়চারী করছে অন্যমনস্কের মত।

ঘূর্ণী হাওয়ার মত হাওয়া বইছে থেকে থেকে। জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মোছে ব্র্যাডলে। পুলিশ-সার্জ্জন কায়দা বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু যেন হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

শুধু এখানে নয়, অন্যান্য কয়েক জায়গায়ও ঢুঁ মেরে আসতে হয়েছে। বিষয়টা জটিল, জড়িয়ে আছে আরও অনেকে। ব্র্যাডলে গিয়েছিল পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে—নির্ব্বাণ বিনয়েন্দ্রর বাঙলোয়। পাক্কা দেড় ঘণ্টা লেগেছে সেখানে। তছনছ ক'রে এসেছে।

কাছাকাছি মিশনারীদের চার্চ্চে তখন অবিরাম ঘণ্টা বেজে চলেছিল। গাছে গাছে ডাকাডাকি করছিল কাক। মুখর হয়ে উঠেছিল যত লুকানো বাসা। চার্চ্চের ঘণ্টায় ছিল যেন কোন মায়ামন্ত্র—হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলেছিল দূরে—বহুদূরে। পল্লীর ঘরে ঘরে তখন উনানে আঁচ পড়ছিল। ধোঁয়ার ধূসর আবরণে বুঝি আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

নির্ব্বাণ বিনয়েন্দ্র তখন ডুবে ছিলেন পাঠে।

ড্রইং রুমে ছিলেন, সোফায় শায়িত হয়ে। হাতে ছিল বই, একটা ফাইল। রাজা দক্ষিণারঞ্জনের বেঙ্গল স্পেক্টেটর কাগজের। সরকারী কাজে কি প্রয়োজনে কাগজের কোন কোন অংশ বাঙলায় তর্জ্জমা করতে

হবে। সরকারী ষ্টানস্তেটর নর্মাণ বিনয়েন্দ্র, বিশ্রামেও তাঁকে কাজ করতে হয়। না করলে চলে না।

জেমস ব্র্যাডলের দলকে কটকে দেখেই কিছুটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলেন। স্বগত করেছিলেন : Too late, my friends.

ড্রইং রুমটা নর্মাণ বিনয়েন্দ্রর দিনেও থাকে আধো-অন্ধকার। স্কাই-লাইটগুলোর দড়ি ধ'রে কেউ দয়া ক'রেও টেনে দেয় না। বাতিদানে জ্বলছিল বাতি, দপ দপ ক'রছিল আলো। বেঙ্গল স্পেকটেটর পড়ছিলেন নর্মাণ বিনয়েন্দ্র।

কাছাকাছি চার্চে তখন ঘন্টা বেজে চলেছে।

আহ্বানের ডাক ডাকছে ধর্মমন্দির থেকে, যত সব ধর্মগতদের ভিড় জমছে চার্চের লনে। আবালবৃদ্ধবনিতা। শুধু ঘড়ির আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে অর্গানের আত্মবিলাপ। বাজনা শুনেই বুঝেছেন নর্মাণ বিনয়েন্দ্র, অর্গানে নিশ্চয়ই মন্টিরো বসেছে। তাকে ঘিরে আছে কয়েকটা প্রতিবেশী অজিন—যাদের চোখে স্বর্গীয় পবিত্রতা।

জেমস ব্র্যাডলেও পার্ক ষ্ট্রীটের অভ্যন্তরে ঢুকে অর্গান শুনে ক্ষণেকের জন্য বিমনা হয়ে প'ড়েছিল। কানভোলানো কি একটা গৎ তখন সবে ধরেছে মন্টিরো। গোয়ানীজ মন্টিরো—যাকে দেখতে ঠিক ওথেলোর মত—যার প্রেমে সাড়া দিয়েছিল ডেসডিমোনা। মন্টিরো জাতে মূর নয় কিন্তু দেখতে ঠিক যেন ওথেলো।

প্রথম কথা জিজ্ঞেস করলে জেমস ব্রাডলে,—বাঙলোটা তোমার না ছিল ম্যাকেঞ্জীর গভর্ণমেন্ট অনুগ্রহ ক'রে বাস করতে দিয়েছে ?

নর্মাণ বিনয়েন্দ্র মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন,—তোমরা তোমাদের সীট টেক্‌আপ্ না করলে আমি কথা বলছি না। বাঙলোটা আমার পৈতৃক।

জেমস ব্র্যাডলে ধীরে একটা গর্জন করলে। বললে,—কাকে আমি

আসিনি। তবুও বলবার, আমি বলছি। এখন কাকে কোথায় পাঠিয়েছো বলে দাও খান। আমি লিখে নিই।

শিশুর মত হাসলেন নর্মাণ বিনয়েন্ন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন,—সময়টা আমার এখন তত ভাল নয় যে, কারও কোথায় যাওয়া-আসা নিয়ে মাথা ঘামাবো। আমার অতি প্রিয় কন্যার বিয়োগ-ব্যথায় মন আমার কাতর। আমি তোমাদের দেখেই বুঝেছি, তোমরা এসেছো আমার ছেলের জন্যে। কিন্তু বিশ্বাস কর, ভগবানের দিব্যি বলছি, ছেলের কোন খোঁজ আমি জানি না। জানতেও চাই না। তোমরা যদি এখন তল্লাসী ক'রে তাকে খুঁজে পাও। নচেৎ আমার দ্বারা কোন সাহায্য মিলবে না। আমি এখন ডিপলি মোর্ণড।

জেমস ব্র্যাডলে বললে,—তোমার মেয়ে মারা গেছে? কবে, কত দিন?

আবার এক ঝলক হাসলেন নর্মাণ বিনয়েন্ন। হাসিতে দুঃখই যদিও ফুটে উঠলো। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দেখালেন কি যেন, বললেন,—ঐ আমার প্রিয়তমা কন্যা। লিলিয়ান। ম্যালেরিয়ার কবল থেকে ওকে আমি বাঁচাতে পারিনি।

জেমস ব্র্যাডলে পাকা ভ্রূ কুঁচকে দেখলো। নর্মাণ বিনয়েন্নের সম্মুখের দেওয়ালে এক স্বর্গভ্রষ্ট দেবকন্যা। হাতে ফুলের তোড়া, দাঁড়িয়ে আছে হাসি-হাসি মুখে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কথা বললে জেমস ব্র্যাডলে,—ছেলে যেখানে থাকতো সেই কামরা ক'টা সার্চ করতে চাই।

নর্মাণ বিনয়েন্ন সায় দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন,—অবশ্যই তোমরা সার্চ করবে। চল' এখুনি চল'। আমি তোমাদের ঘর দেখিয়ে আসি। খানিক থেকে বললেন,—আমি কিন্তু থাকতে পারছি না, আমাকে ছুটি দিতে হবে। জরুরী কাজ আছে হাতে। যদিও আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি এক জনকে, যিনি সহজে তল্লাস করতে সক্ষম হবেন।

—অল রাইট। বললে ব্র্যাডলে।

ঘর দেখেই ইশারায় হুকুম করলে তাঁদের আদমীদের। বললে,—Don't search, just haunt.

নর্যাণ বিনয়ের সোফায় গিয়ে বসলেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে। ব্র্যাডলে হঠাৎ দেখলো যে, পাশে এসে কে যেন দাঁড়ালো। বলমলে গাউন, কালো জালের ভেল-ঢাকা মুখ। ক্রেমণ ব্র্যাডলে হঠাৎ গর্জন ক'রে ওঠে। বাঙলোটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। বলে,—We want few lanterns.

বলমলে গাউন থেকে ফর্সা একটা হাত থেকে লণ্ঠন একটা এগিয়ে ধরা হয়। ব্র্যাডলে এক-নজরে দেখে নিয়ে বলে,—থ্যাঙ্কস্।

ভেল-ঢাকা মুখ বললে,—More lanterns will be supplied. Please wait a minute.

এখনও লণ্ঠন ও বাতিদান সাফ ক'রে উঠতে পারেনি আয়া। নিমেষের মধ্যে আরও দু'টো লণ্ঠন এনে হাজির করে বৃদ্ধা। কাঁপতে কাঁপতে আসে। লণ্ঠন নামিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে যায়। শুধু বার্দ্ধক্য নয়, পুলিশ এসেছে শুনে পর্য্যন্ত ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছে আয়া। শরীরের মধ্যে মাথাটা দুলছে অত্যধিক। লিলিয়ান বিদায় নেওয়ার সময় থেকে সেই যে গম্ভীর হয়েছে আয়া, এখনও হাসিমুখে কথা বলেনি। বোধ করি আর কখনও বলবে না। ক্রেমণ ব্রাডলে দু'বার তিন বার দেখলে আয়াকে। ভাবলে ঐ পুরানো পাপীটাকে ধ'রে বন্দুকের কুঁদো দেখিয়ে জেরা করলে কেমন হয়।

পুলিশ আর সার্জ্জন তত্ক্ষণে ঘরের ভেতরে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে লেগে গেছে। আলনা থেকে ময়লা পোষাকের স্তূপ নামিয়ে ফেলেছে।

—What's that? হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠেছিল ক্রেমণ ব্র্যাডলে। ঘরের এক কোণে কি ছিল কে জানে, ব্র্যাডলে প্রাণাঘাতে রহস্য উদ্‌ঘাটন

ক'রে দেয়। কতকগুলো ছিন্নভিন্ন টুপী আর পুরানো জুতো জড় করা ছিল। বস্তগুলি কোম আর একবার গর্জন করেছিল ব্র্যাডলে।

একটা ক্যাবিনেট ছিল এক পাশে। ক্যাবিনেটের পাল্লা ধ'রে টেনে খুলে ফেললে একজন সার্জন। চাবি দেওয়া ছিল, টানাটানি করতে চাবির কল বিকল হয়ে যায় হয়তো। এক লাফে ব্র্যাডলে ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বইগুলো কি বই? ব্র্যাডলে বইয়ের গাদা থেকে বই তুলে নেয় খানকয়েক। একেকটা বই দেখে আর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দেয় যেখোন। নামগুলো শুধু সজোরে পড়ে,—

Æsop's Fables! Madame Campan's Memoirs of the Private Life of Marie Antoinette! The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer! John Bunyan's The Pilgrim's Progress! Life of William Blake by Gilchrist! Complete works of William Shakespeare.

যেমন ব্র্যাডলেকে যথেচ্ছ বই ছুঁড়তে দেখলে পেয়েছিল ভেল-ঢাকা মুখ। কোন কথা বলেনি, শুধু একেক বার ভেলের আড়াল থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছে। ক্ষোভ আর ক্রোধে মিশ্রিত মৌখিক প্রকাশ। যদিও ব্র্যাডলে ফিরেও তাকায় না।

সার্জনদের এক জন হঠাৎ যেন আবিষ্কারের আনন্দেই চীৎকার ক'রে উঠেছিল। একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। কাগজের মত কি যেন উঁকি মারছে দেখে সার্জন বাক্সটা খাটের তলা থেকে বের ক'রে ফেলেই চীৎকার করে,—Eureka, Eureka!

বাক্স ওলট-পালট ক'রে দেখা যায় কয়েকটা শূন্য বোতল ব্যতীত কিছুই নেই। হুইস্কির শূন্য বোতল। সার্জনের চোখে পড়েছিল বোতলের লেবেল, ভেবেছিল বুঝি বা রাজদ্রোহের সপক্ষে কোন কিছু লিখিত বক্তব্য।

শেষ পর্যন্ত হয়তো ধৈর্য্য থাকে না জেমস ব্র্যাডলের। বই ছুঁড়তে হঠাৎ বলে নিজের মাতৃভাষায়,—থাকলে কি আর এখানে লুকিয়ে থাকবে! এই ভাইবিনে?

ভেল-ঢাকা মুখ কথাগুলি শুনে মৃদু মৃদু হেসেছিল। কিন্তু একটি কথাও বলেনি। হ্যাঁ কি না, কোন কথা নয়।

কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলে কে জানে, জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ব্র্যাডলে বললে,—Come, let us go.

সহকর্মীরাও হয়তো ক্লান্ত হয়েছিল। কেউ আপত্তি তুলতে সাহস পায় না। জেমস ব্র্যাডলের পিছু-পিছু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। অন্ধকার ক'রে দিয়ে যায় ঘরটা। নিস্তব্ধ বাঙলোতে শুধু বুটের খট-খট ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ড্রইং রুমে যেতেই বেঙ্গল স্পেকটেটর থেকে মাথা তুললেন নর্থান বিনয়েন্দ্র। সহাস্যে বললেন ইংরেজী ভাষায়,—বোধ হয় তোমাদের হয়রাণ হ'তে হয়েছে? ছেলে আমার কোন চিহ্নই রেখে যায়নি। অথচ কোথায় যে গেল কেউ জানলো না। কথা বলতে বলতে মুখের পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বললেন,—তোমরা ইচ্ছা করলে আমার পুরানো রিপোর্ট প'ড়ে দেখতে পারো। তখনই আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমার ছেলের মতিগতি ভাল দেখছি না। ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তোমরা তো তখন আমার কথা কানে তুললে না! যখন সত্যিই চোখে ধূলো দিয়ে গেল তখন তোমাদের খেয়াল হ'ল।

জেমস ব্র্যাডলে অযথা বাক্যব্যয় করে না। কথাগুলি গলাধঃকরণ ক'রে বললে,—আমরা তবুও যেখানে যেখানে তোমার ছেলের গন্ধ পাবো, সেখানে খোঁজ করতে পেছপাও হবো না। শুভ রাই, এখন আমরা চলি।

নর্থান বিনয়েন্দ্র বললেন,—নিশ্চয়ই হবে না। তোমাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করবে কেন?

একটু একটু আলো তখনও ছিল।

বাসায় ফেরা পাখী ডাকছিল দলে-দলে। প্রতিবেশীর উনুনে আঁচ প'ড়েছিল তখন, ধোঁয়ার ধূসর আস্তরণ কোথাও কোথাও। চার্চে একটানা ঘন্টাবাদ্য থেমে গেলেও ভজনা তখনও থামেনি। সারি সারি নরনারী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে বাইবেলের উক্তি পাঠ করছিল মনে মনে। মন্টিরো শুধু অর্গ্যানে ব'সে শব্দ-তরঙ্গ তুলছিল অতি ধীরে ধীরে।

নর্বাণ বিনয়েন্দ্রর বাঙলোয় একটি ভেল-ঢাকা মুখ তখন উন্মুখ হয়েছিল ফটকের পানে তাকিয়ে। গরম কেক তৈরী শেষ ক'রে কিচেনের জানলা থেকে দেখছিল সজাগ দৃষ্টিতে। মন্টিরো এখনও কেন আসছে না? মন্টিরোকে দেখতে মুর ওথেলোর মত কালো, অন্ধকারে মিশে যায়নি তো সে! ভেল-ঢাকা মুখ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কখনও আয়না সামনে ধ'রে ভেল সরিয়ে দেখে। ঢল-ঢল মুখে কি অপূর্ব্ব শোভা! দেখতে দেখতে বিমুগ্ধ হ'তে যায়। মোহ কেটে গেলে ব'সে ব'সে ভাবতে থাকে, কখন আসবে মন্টিরো! কখন মন্টিরোর ডাক শোনা যাবে! কখন মন্টিরো হাঁটু মুড়ে বসে ডাকবে সোহাগী কণ্ঠে,—মিসেস্ বোনার্জ্জী, মিসেস্ বোনার্জ্জী।

নর্বাণ অরুণেন্দ্রকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল, সে জন্য আদৌ মর্মাহত নয় মিসেস্ বোনার্জ্জী, শুধু মন্টিরো এখনও আসছে না ব'লে কিছুটা আশাহত হয়েছেন।

নর্বাণ বিনয়েন্দ্র কিছুই জানেন না। শুধু বাঙলা থেকে ইংরেজী আর ইংরেজী থেকে বাঙলা তর্জমা করতে জানেন। এখন আর বলতে বাধা নেই, ভেল-ঢাকা রহস্যময়ী মিসেস্ বোনার্জ্জী হ'লে কি হবে, নর্বাণ অরুণেন্দ্রর জন্মদাত্রী নয়। তিনি বন্ধ্যা, অনন্যা।

দেওয়াল-গাত্রে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি সসম্মানে রক্ষিত হয়েছে

দেখেই যেন জেমস ব্র্যাডলের সকল আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। চিবুক চিমটিতে ধ'রে ভাবলো, বেশ কিছুক্ষণ, রাজপূজা এবং রাজদ্রোহ একসঙ্গে হয়! হয়তো ছলনা। পার্লামেন্ট সেটেলমেন্ট করেছেন ভিক্টোরিয়া—যাতে জমিদারের লাভ হলেও প্রজাদের ক্ষতি হয়েছে। যে জন্য সদর আর মফঃস্বলের কাছারীতে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়ার ছবি। হয়তো ছলনা, হয়তো চোখে ধূলো-দেওয়া। তবুও জীবটাকে দেখতে হয়, কেমন ধাতুর চিজ!

কাছারী থেকে কেদারা দেওয়া হয়েছে। জেমস ব্র্যাডলের ঘর্মাক্ত ললাট দেখে আমলাদের ঘর থেকে পেতলের গেলাসে জল দেওয়া হয়েছে, ঢক-ঢক ক'রে খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। তাঁবেদার যখন রুপোর গুড়গুড়ি পর্যন্ত এনে দিয়েছে তখনও আপত্তি জানায়নি ব্র্যাডলে। অম্বুরী তামাকও খেয়েছে।

আকাশে নক্ষত্র গুণতে গুণতে কি কুগ্রহ দেখলো কে জানে রাজেশ্বরী।

বৌটা সিঁটিয়ে গেছে যেন। এলোকেশী পালঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে,—রাজো, ভয় পেয়েছিস্?

কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে শুয়েছিল রাজেশ্বরী। ক্লান্তি আর অবসাদে। বিরক্ত হয়ে বললে,—আঃ, যাও না তুমি। দেখো না গাড়ী আসলো না, না।

ঘূর্ণী হাওয়ায় লণ্ঠনের শিখাটা থেকে থেকে জেল্লাহীন হয়ে ওঠে। চোখ খুলে সামনে কাকে দেখতে পায় রাজেশ্বরী। ভয় না পেয়ে চোখ মেলে দেখে। সত্যিই কি কাঁদছেন। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, চোখের তীর ব'য়ে নেমেছে দর-দর অশ্রুধারা।

জল নয়, লণ্ঠন-শিখা দেখা যায় ছবির কাচে। প্রতিচ্ছবি।

কুমুদিনীর ছবিতে। ছেলের জন্যে দুঃখ পেয়েছেন হয়তো, মনে

ক'রেছিল রাজেশ্বরী। সধবা অবস্থায় তখন কুমুদিনী, তখনকার ছবি। অলঙ্কারে ভূষিতা, পাতা-কাটা চুল, নাকে নোলক। মাথায় মুকুট।

কুমু তখন কোথায়? পঞ্চক্রোশী কাশীতে।

অসিতে বাসা। বাঙালীটোলার সর্পিল সুড়ঙ্গ-পথে তর-তর ক'রে চলেছেন ঘরমুখে। তপঃক্লিষ্টার রুক্ষ মূর্তি। তখনও জলস্পর্শ হয়নি কিছু মাত্র। উপোষ করেছেন কেন কে জানে! হাতে ফুলের সাজি আর তাম্রকুণ্ড। পথে যেতে যেতে গঙ্গাজল উৎলে পড়ে। যাত্রাপথ পবিত্র করতে করতে প্রায় ছুটছেন কুমুদিনী। কাল-ভৈরবীর মন্দিরে গিয়েছিলেন। ভৈরবীর মুখের হাসি দেখে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। জগদাহ্লাদজননীর সদাহাস্য মুখ।

ফেলে-যাওয়া, ছেড়ে-আসা পেছনের স্মৃতি প্রথমে যেমন উতলা ক'রে তুলেছিল কুমুদিনীকে, এখন আর ততটা নেই। পুণ্যতীর্থের ধূলি অঙ্গে মেখে সকল দুঃখ ও বেদনা লাঘব হয়ে গেছে। গঙ্গার জলে হয়তো ধুয়ে গেছে। তবে কেউ কোথাও কাকেও মা-নামে ডাকলে কেমন অন্যমনা হয়ে যান কুমুদিনী। খোঁজাখুঁজি করেন, কে কোথায় ডাকলো। কে হারালো মাকে!

ধর্মের সাধন কিংবা শরীর পাতন—প্রবাদ বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে চলেছেন কুমুদিনী। পথ পরিষ্কার করছেন; লোকান্তরে যাওয়ার পথ। বাবুকের জন্য মনে পড়লেও মরমে মরে যান তিনি। ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলতে পারলেন না, এই লজ্জায়। বিপথগামী ছেলেকে তিনি মন থেকে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। মনে পড়লে মন বিভ্রান্ত হয়; কাজ ভুল হয়ে যায়; জপ-তপে বাধা পড়ে।

রাজেশ্বরী শয্যা থেকে উঠে পড়লো

কেমন অস্বস্তি বোধ করছে যেন। এলোকেশী সেই যে গেছে, এখনও ফিরে আসছে না? পোড়ামুখী, হতচ্ছাড়ী,—সত্যিই ফিসফিস গাল পাড়ে রাজেশ্বরী। কান পেতে শোনে, গাড়ী এলো হয়তো এতক্ষণে। এলো নয়, গাড়ী গেল একটা পথ দিয়ে। অস্তু কানের ভুল। রাজেশ্বরী জানলার ধারে যায়। জরির চুমকি দেওয়া কালো কাপড় পরেছে আকাশ। যেন হীরা-মাণিক জ্বলছে অজস্র।

দূরে, কোন গাছের শিখরে ব'সে একটা প্যাঁচা ডাকাডাকি করছে তীব্র কর্কশ কণ্ঠে।

—নাট-মন্দিরে যাবে না বৌদিদি?

দরজা থেকে শুধোয় বিনোদা। বলে,—পুরোহিত ডেকে পাঠিয়েছেন।

—না, বিনো দিদি। আজ আমি যাবো না। শরীরটা ভাল নয়, ব'লে পাঠাও। রাজেশ্বরী কথা বলে শুষ্ক কণ্ঠে। হতাশায় মুহ্যমান হয়ে।

—তোমাকেও বলি বৌদিদি, তুমিও তো আচ্ছা মেয়ে! কোথায় আমোদ-আহ্লাদ ক'রে হেসে-খেলে থাকবে, না মুখ শুকিয়ে মেজাজ খারাপ ক'রে সময় নেই অসময় নেই বসে থাকবে? কথা বলতে বলতে এক মুহূর্ত থামলো বিনোদা। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে,—তা হ'লেই হয়েছে। তুমিই দেখছি বশ করবে দাদাবাবুকে!

কথাগুলি শুধু শুনে যায় রাজেশ্বরী। আয়ত আঁখি-যুগলে চেয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল। বিনোদায় এত দিনে যেন চোখে পড়ে, বৌটা রূপের ডালি। লণ্ঠনের আলোয় তবুও স্পষ্ট দেখা যায় না। যেমন রঙ, তেমনি গড়ন। যাকে বলে পটে আঁকা বিবি। দরজা ত্যাগ ক'রে চলে যায় বিনোদা। যেতে যেতে বলে,—দাদাবাবু কি চট্ ক'রে ফিরবে মনে করছো? সূর্য্যি তা হ'লে পশ্চিম দিকে উঠতো আর পূবে অস্ত যেতো।

পালোয়ান হেসেও কেন যে হাসছে না ভেবে পায় না কৃষ্ণকিশোর!

নিমন্ত্রণ রক্ষা করলো, তবুও মুখে হাসি নেই কেন? গহরজানের গম্ভীর মুখ, কথায় অভিমানের আভাষ। চাল-চলনে কেমন যেন ঔদাসীন্য। জরির ফিতায় জড়ানো লুণ্ঠিত বেণী কেবল প্রকাশ করে চাঞ্চল্য। চলা-ফেরায় হয়ে উঠে দোদুল্যমান। কিংখাবের কাঁচুলীতে বন্দী বিহঙ্গের মত বারে বারে মুক্ত হতে চায় নিটোল বক্ষ। গহরজান কাছাকাছি বসে একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দু'বাহুতে মুখ রেখে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—আমি যে বেহাত হয়ে যাচ্ছি! বেনেটোলার দত্তবাবু আমাকে কিনে নিতে চাইছে। মাসে দু'শো টাকা নগদ দেবে বলেছে হাত-খরচা। বলেছে, গয়নায় মুড়ে দেবে। থাকতে দেবে না এখানে, নিয়ে গিয়ে রাখবে আলমবাজারে, গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ীতে।

কৃষ্ণকিশোর নকল হেসে বলে,—বেশ কথা। ভালই হ'ল, তোমার একটা হিল্লে হয়ে গেল।

কথায় কর্ণপাত করে না যেন গহরজান। বুক চিতিয়ে এলিয়ে পড়ে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে,—তোমার বুকে জ্বালা ধরবে না আমি যদি বেহাত হয়ে যাই?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—না। তোমার যদি ভাল হয়, আমার বুকে জ্বালা ধরবে কেন! আমি খুশী হব।

দেওয়ালের ঘড়িটা টিক-টিক বেজে যায় ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে। গহরজান ঘরের অর্গল ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তবুও আশ-পাশ থেকে ভেসে আসছে গানের কলি; তবলার তাল। নাচের ছন্দ।

তাকিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে গলার মালাটা দাঁতে কামড়াচ্ছিল গহরজান। তড়াক ক'রে উঠে প'ড়ে দেরাজ খুলে বললে নিজের মনে,—তবিয়ৎ ঠিক লাগছে না।

তবিয়ৎ ঠিক হওয়ার ওষুধ দেরাজে আছে না কি। ঠুং-ঠাং আওয়াজ উঠলো দেরাজের ভেতর। গহরজান চোখে মোহ মাখিয়ে বললে ঠোঁটের

এক কোণে ঠেসে,—রোজ, তুমিও এক পেয়ালা খাও। না খেলে মাইরী জরিমানা হয়ে যাবে। ভোকা লাগবে, চু'চুমুক খেয়েই দেখো না।

ঢক-ঢক ক'রে খেয়ে ফেললে গহরজান। এক পেয়ালা। কোমরে-গোঁজা জাফরান রঙের রুমালটা টেনে নিয়ে মুছলে মুখটা। একটা বোতল আর দু'টো পেয়ালা হাতে নিয়ে বসলো তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে।

বেহাত হয়ে যাওয়ার ভীতিতে যেন মগ্ন হয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। বললে,—তুমি বলছো যখন দাও খাই। লেমনেড বললে কিন্তু আর ঠকবো না! আমি বুঝেছি সোডা-লেমনেড নয় ও।

—তবে?

পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে গহরজান। হাসি চেপে বলে,—সাফ বললে যে তুমি কেসাদ করতে তখন। বেগার ভয় পেতে।

গহরজানের চোখ নেই শাড়ীর আঁচল খলিত হয়ে লুটোচ্ছে মাটিতে। কেমন যেন বেহুঁস হয়ে আছে। হাসি হারিয়ে ফেলেছে। কোমর থেকে শাড়ীও খসে পড়-পড় হয়েছে খেয়াল নেই।

পেয়ালাটা মুখে তুলতে গিয়ে তোলে না কৃষ্ণকিশোর। পেয়ালার জলে যেন একটা মুখ ভেসে ওঠে। পাংলা রঙ যেন এক পেয়ালা। টলমল করছে। দেখা যায় শুধু একটা মুখবিম্ব। বেশ কিছুক্ষণ দেখে বোঝে যে, মুখ অন্য কারও নয়। নিজের মুখের ছায়া!

পেয়ালা শেষ ক'রে মুখটা বিকৃত করে কৃষ্ণকিশোর। মুচকি হেসে গহরজান বলে,—মসলা খাবে?

একটা রূপোর রেকাবী ঠেলে দেয় কথা বলতে বলতে। বলে,—মৌরী খাও, এলাচ খাও, ঝাঁজ লাগবে না। জোনাকীর মত জলে আর নিবে যায় না কি কেউ। কথা বলতে বলতে গহরজানের মুখাবয়বে নামে বর্ষার মেঘ। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ক'দিন থেকেই এমনটি হয়ে আছে গহরজান। হাসতে হাসতে বেবাক কেঁদে ফেলছে কখনও

না। চোখ ছু'টো কেবল জলসিক্ত হয়ে যায়, বেশী কাঁদে না গহরজান। ক'দিন থেকে যেন মুক্তি পাওয়ার লোভ জাগছে বুকের মধ্যে। এই পরিবেশ যেন আর ভাল লাগছে না। হীন, নোংরা, জঘন্য। যাকে-তাকে দেহ বিলিয়ে দিয়ে মুখের গ্রাস রোজগার করতে বাধ্য করেছে ঐ শয়তানী সৌদামিনী। কত সগোপনে গহরজান ভেবেছে যে, মাসীকে বিষ খাইয়ে দিলে-কেমন হয়। শেষ হয়ে যায় ঐ বজ্জাতি মাগী। তখন গহরজান খুশীমত বাঁচতে পারে। অনাহারেও মরতে পারে আল্লার নাম করতে করতে। সৌদামিনী যে অনেক পাপ করিয়েছে গহরজানকে। হাসিমুখে এগিয়ে দিয়েছে ব্যাধিতে পঙ্গু মানুষের কাছে, কুষ্ঠরোগীর কাছে। কত বেজাতের খপ্পরে ছুঁড়ে দিয়েছে গহরজানকে। সৌদামিনী মুঠো-মুঠো টাকা কুড়িয়েছে গহরজানকে সাময়িক বিক্রী ক'রে দিয়ে।

কত পশু-মানুষ গহরজানকে খিমচে কামড়ে অজ্ঞান ক'রে দিয়ে গেছে—সৌদামিনী তবুও কত রাত্রি রেহাই দেয়নি গহরজানকে। মানুষ ডেকেছে, টাকা নিয়ে ঘর দেখিয়ে দিয়েছে অম্লান বদনে।

—চোখে জল কেন তোমার? আমি চ'লে যাই এখন?

মৌরী চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর। আধ-বসা অবস্থায় ছিল গহরজান, দু'হাতে চিবুক রেখে। লজ্জা পেয়ে গেল যেন। হাসতে চেষ্টা করলো। দু'হাতের তালুতে চোখ ঢাকলো। বললে,
—কোথায় যাবে?

—বাড়ী যাবো। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে বলে কৃষ্ণকিশোর। কোঁচানো ধুতির কোঁচাটা ঠিক করে।

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল তখন বাড়ীময়।

পুলিশ এসেছে। কেমন ক্রাভনে কাছারীর দালানে থেকে দেখছে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। সাদা জিনের মিলিটারী পোষাক দেখে যে-যার লুকিয়ে

পড়েছে যে-যেখানে আশ্রয় পেয়েছে। শমন কৈ হাতে! তবে কেন পুলিশ এলো? রেজিমেণ্ট থেকে যেন ছিটকে এসে গেছে ব্র্যাডলে। ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তেই কব্জীর সঙ্গে মিলিয়ে নেয় সময়টা। হাতঘড়ি ছিল হাতে একটা—যেটা ছুঁড়ে যাকে-তাকে আহত করা যায়। ব্র্যাডলে, দলের লোকদের প্রতি কথা ছুঁড়লে,—আর অপেক্ষা নয়। We will come to-morrow. It's useless to wait any more. কথার শেষে মাথায় সোনার সাদা টুপী চড়ালে ব্র্যাডলে। টুপীতে পেতলের চিহ্ন—ব্রিটিশ ক্রাউন। বুকে আরও কয়েকটা উচ্চ পদের নিশানা—আলো-আঁধারিতে চক্ চক্ করছে।

ফটক পেরিয়ে পথে যেতেই ব্র্যাডলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ হয়েছে সে। ব্র্যাডলে যেন চোখের সম্মুখে দেখছিল, অশান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ। দুর্দিনের কালো ছায়া।

বাঙলা দেশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে কেউ কেউ চলে গেলো দেশান্তরে—বুঝেছে ব্র্যাডলে। কিন্তু যখন বুঝলো তখন জাহাজ বোধ হয় ভিড়েছে খেয়াঘাটে।

ব্যারাকে ফিরেই মিসেস্ ব্র্যাডলেকে বললে,—ডার্লিং, আমি আগুনের ফুলকি দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষে কোথাও কি দাবানল জ্বলেছে?

মিসেস্ তো পশম বুনতে বুনতে হতবাক্। ব্র্যাডলে স্বগত করলে,—

Oh! East is East, and West is West, and
Never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at
God's great Judgement Seat.

কবিতা বললে না তো ব্র্যাডলে, যেন গর্জন করলে কিছুক্ষণ। কিপলিং ওড়ালে। দি ব্যালাড্ অফ্ ইষ্ট্ এণ্ড ওয়েষ্ট্।

মিসেস্ বললে,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মুখ-হাত ধুয়ে এসো, কফি খাও এক কাপ।

র‍্যাডলে একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লো আড় হয়ে। বললে,—কয়েক মুহূর্ত যাক্। গিয়েছিলাম তদন্ত করতে, দেখা পেলাম না।

দেখা পাওয়া যাবে কোত্থেকে।

পুরোহিত গণনাকার্য্যে দক্ষ। পুলিশ অপেক্ষা করছে শুনে চক কেটে ব'লে দিলেন,—শীঘ্র, আসবেন না তিনি। বৃথা অপেক্ষা কেন?

ঘরে শুধু একটা আলো।

দেওয়ালগিরিতে স্থির জলন্ত শিখা। চিমনিটা রঙীন, না ধক-নীল রঙ। গহরজানের বাহু দু'টি শূন্য, গলায় শুধু ঝুলন্ত একছড়া মটরমালা। ঝুলছে ব'লে আভা ঠিকরোচ্ছে প্রায় অন্ধকার থেকে।

কৃষ্ণকিশোর রুমাল খুলে ধ'রলো। জড়োয়া টায়রার জৌলস দেখতে পায় না গহরজান। দু'বাহুতে চোখ ঢেকে দেন কিসমাতে থাকে।

—তোমাকে দিলাম আমি।

চোখ মেলে তাকালো গহরজান। রত্নের ঝাঁপি খোলা পড়ে আছে জাফরানী আলপাকার রুমালে।

গহরজান ধীরে ধীরে তুলে নেয় গহনাটা। নেড়ে-চেড়ে দেখে বোঝে মাথায় পরতে হয়।

দু'পাশে পরী-আঁকা আয়নার সামনে উঠে গিয়ে টায়রাটা লাগায় যথাস্থানে যত্ন সহকারে।

রাজপুতানীর মত দেখায় যেন গহরজানকে। জুড়ীতে আবদুল কি ঘণ্টা বাজায়? কোচম্যান কি ডাকছে মনে ফিরে গেছে? নেশা লাগে চোখে। না অন্য কারও জুড়ী?

মেবারের যুগের কোন এক রূপসী যেন। মধু-ঝরা হাসিতে ভরে যায় গহরজানের বর্ষার মেঘের মত মুখ।

—না, অত কাজের জুড়ী! ঘণ্টা বাজিয়ে পথ চলেছে। রাজেশ্বরীও সেই কথা ভাবে। জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। কালো আকাশের অজস্র নক্ষত্র দেখে। যেন জোনাকী দপ্-দপ্ করছে।

কলকাতা মহানগরী তখন শান্ত হয়ে গেছে।

মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। ঘরে ঘরে আলো নিবে গেছে। দোকান-পাট বন্ধ। প্রায় জনহীন পথ। উতল হাওয়া বইছে থেকে থেকে। অসংখ্য নতুন নতুন মেঘ কোথা থেকে এসে জড় হচ্ছে অজস্র নক্ষত্রখচিত সোনালী আকাশে। গঙ্গার বুকে জাহাজ, হয়তো আসছে কোন দূরদেশ থেকে। থেকে থেকে বাঁশী বাজায় তীব্র, কর্কশ, গগন-বিদারক শব্দে। কলকাতা যেন কেঁপে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। জেগে ওঠে ঘুমন্ত নগরবাসী। শিউরে ওঠে মাতৃবক্ষের শিশু। দমকা হাওয়ায় দুলে উঠছে গাছের শিখর! এক গাছ থেকে আরেক গাছে ওড়াওড়ি করছে বাদুড়ের ঝাঁক। রাত্রি, যখন ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রণা চালায় কুটিল মানুষ, গোপন প্রেমে তখনই তো মগ্ন হয় প্রেমিক-প্রেমিকা। হাজার চোখের অধিকারী অশেষ রাত্রি চুপিসাড়ে কান পেতে থাকে। কান পেতে শোনে ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা আর প্রেম-সম্ভাষণ! অলঙ্কারে সাজসজ্জা করেছে গভীর মধ্যরাত্রি। রাত্রির গলদেশে ঝুলছে হীরা-জহরৎ। দপ্ দপ্ জ্বলছে সৌরজগৎ।

পৃথিবীতে এখন হয়তো সকল মানুষ নিদ্রায় অচেতন। জেগে আছে

শুধু রাজেশ্বরী। রাত্রি যত ঘন হয় তত বেশী জলের ধারা নামে চোখে। উষ্ণ অশ্রু পড়ছে দর-দর বেগে। কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে। মনে হয় অবহেলিত। অনাদৃত। সত্যিই কাঁদে রাজেশ্বরী। আসতে কি ভুলে গেল সে? ভুলে গেল রাজেশ্বরীকে! একলা বসে যত ভাবে তত উষ্ণ অশ্রু বর্ষিত হয় রাজেশ্বরীর দু'চোখ বেয়ে। দুঃখ-বেদনায় যেন মথিত হতে থাকে বুকের ভিতরটা। চোখের জলে কাঁচুলীটা বুঝি বা ভিজে যায়।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় কিছুক্ষণ আগে দু'টো বেজে গেছে ঢং-ঢং। শিয়াল ডেকে থেমে গেছে অনেক দূরে কোথায়। এখন শুধু ঝিঁঝি ডাকছে। রাত্রিকে গান শোনায় ঝিল্লী সমতানে। রাজেশ্বরী কাঁদে অঝোরে।

কাছারীতেও কেউ কেউ জেগে আছে তখনও।

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে গেছে। জুড়ী এখনও এলো না। রাত কাবার হতে চললো তবুও নয়। ফটকে জেগে আছে প্রহরী, মশা তাড়াচ্ছে আর দীপ-শিখায় পড়ছে তুলসীদাসী রামায়ণ। বয়োবৃদ্ধ নায়েবদের এক জনের এ্যাজ্‌মা আছে। ঘুম হয় না, কাশি হয়। বেশীক্ষণ শয়নে সহ্য হয় না, অধিকক্ষণ বসে থাকতে হয়। তিনি একটা লণ্ঠন হাতে শয্যা থেকে উঠে কাছারী-ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখেন আকাশের অবস্থা। জ্যোৎস্নালোকিত নভোমণ্ডল। একসঙ্গে এতগুলি মানুষ এলো কোথা থেকে,—দেখে যেন চমকে ওঠেন নায়েব। কাছারীর দালানে সারি-সারি শুয়েছিল কারা দুষ্টি দেন। লণ্ঠনের আলোয় দর্শাক মুখগুলি দেখে নায়েব এতক্ষণে বুঝতে পারেন ওরা মনোহরপুর মৌজার প্রজাবৃন্দ—মফঃস্বল থেকে এসেছে সদরে। বৃদ্ধ, সবল মানুষ—গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু হুজুর কি ফিরেছেন? নায়েব ইতিক-সিতিক দেখেন আর কাশির বেগ সামলাতে ধ'রেন বুকে হাত দিয়ে। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী—দেখতে দেখতে বিমনা হয়ে পড়েন বুঝি নায়েব। একসঙ্গে এক জোড়া পাখী ডাকাডাকি ক'রে ওঠে প্রাঙ্গণের বৃক্ষশাখায়। ঝিঁই কূজন নয়, প্যাঁচা ডাকছে বিশ্রী কর্কশ সুরে।

একটা ছুঁচোকে ধ'রেছে পেচক দু'টি। শিকার করেছে, ডাকছে আনন্দাতিশয্যে। চাঁদের আলোকে যেন বিদ্রূপ করছে।

—ঘুমোলি রাজো?

পালঙের কাছে এগিয়ে চুপিসাড়ে জিজ্ঞেস করে এলোকেশী। মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে রাজেশ্বরী। এলোকেশীর ডাকে সাড়া দেয় না ইচ্ছা ক'রেই। এলোকেশী স্বগত করে,—ঘুমিয়েছিস? বেশ ক'রেছিস। আহা, আমার বাছা রে! ধ'রে-ক'রে মেয়েটাকে কি না তুলে দিলে একটা কুলাঙ্গারের হাতে? কি লজ্জার কথা! গেছে তো গেছেই, ফেরবার নাম নেই এখনও? রূপে-গুণে লক্ষ্মীর মত বৌটাকেও মনে পড়লো না?

ফিস-ফিস গুঞ্জন শেষ ক'রে এলোকেশী ঘরের সমুখে দালানে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বিড়-বিড় ক'রে বকতে লাগলো আরও কত কথা। বিধাতাকে দুষতে লাগলো।

এলোকেশী যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে অনুমানে বোঝে রাজেশ্বরী। চোখ মেলে তাকায়। চোখে পড়ে কুমুদিনীর ছবি। কুমুদিনীর চোখেও জল না কি! না, লণ্ঠনের শিখার কম্পমান প্রতিবিম্ব!

একটা কলসী পাওয়া যাবে না এখন কোথাও থেকে? ভাবতে ভাবতে উঠে বসলো রাজেশ্বরী। পুলিশ এসেছিল, চলে গেল কখন? বেরিয়েছেন সেই দিন থাকতে, এখনও মনে পড়লো না একটি বারও রূপে-গুণে লক্ষ্মীর মত বৌটাকে? রাজেশ্বরী ভাবছিল, একটা কলসী থাকলে এই মাঝ-রাত্তেই কলসী কাঁখে যেতো পুকুরঘাটে। কলসীটা গলায় বেঁধে একটা ডুব দিতো জলে। আর উঠতো না। ঘরে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতো সকলে। ভোরের আলো ফুটলে দেখা যেতো পুকুরে দেহটা ভাসছে। কিন্তু কলসী এখন কোথায় পাওয়া যায়? একা থাকতে থাকতে কখন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয় কে জানে! হয়তো একা-একা থাকার

স্বাভাবিক লক্ষণ ফুটে ওঠে রাজেশ্বরীর মনে। চোখ দু'টো ঘুমে জড়িয়ে আসে। বসে বসে ঢুলতে থাকে রাজেশ্বরী। উন্মুক্ত জানলায় আকাশটা চোখে পড়ে। ফর্সা হ'তে কত দেরী এখনও, সূর্য্য উঠতে?

হঠাৎ একটা হাওয়ার টুকরো উড়ে আসে ঘরে। শ্যামল মাটির গন্ধ-মাখানো উতল হাওয়া। জানলার পর্দাগুলো ঢেউ তুললে। চোখে-মুখে হাওয়ার স্পর্শ লাগে রাজেশ্বরীর, স্নিগ্ধ হয়ে যায় কপালটা। বুকভরা শ্বাস নিলে একটা। অন্যমনে বসে রইলো। বসে রইলো প্রভাতের প্রথম আলো দেখতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে। মাঝে-মাঝে শুধু হাওয়ার সঙ্গে চমকে উঠে। জেগে-থাকা রাত দেখে ভয়-ভয় করে। বিনিদ্র রজনী পোহায়।

—বৌদি, পুলিশ এসেছে!

তন্দ্রা টুটে যায় রাজেশ্বরীর। ভুল শুনছে না তো!—কি বললে, পুলিশ? চোখ মেলে তাকায় রাজেশ্বরী। কোথায় বিনোদ, কোথায় কে?

পুলিশ! মহামান্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কলিকাতা তথা বাঙলা তথা ভারতবর্ষস্থিত পুলিশ-ফোর্স চঞ্চল হয়ে উঠেছে কয়েকটা গোপন তথ্য আবিষ্কারে। ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদের তলব পড়েছে। সাহায্য করতে হবে পুলিশকে যদি প্রয়োজন হয়। ব্যারাকে ফিরেও রেহাই পায়নি জেমস্ ব্র্যাডলে। হেড-কোয়ার্টার থেকে অশ্বারোহী দূত এসেছিল জেমস্ ব্র্যাডলেকে ডাকতে। কমিশনার স্বয়ং লিপি পাঠিয়েছেন মধ্যরাতে। হুকুম দিয়েছেন পত্রপাঠ হাজির হ'তে হবে।

ডিনার শেষ ক'রে দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি মোচনের নিমিত্ত জেমস্ ব্র্যাডলে তখন গড়িয়ে পড়েছিল একটা ক্যাম্পখাটে। অকাতরে ঘুমোচ্ছিল নাক ডাকিয়ে। মিসেস্ তখন টেবিলের ধারে ব'সে, পত্র লিখছিল হোমে। দিনের বেলায় শতেক কাজে পত্র লেখার সময় হয় না। হোমে ফেলে আসা পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পত্রালাপে যা যতটুকু হয়।

স্কটল্যাণ্ডের গমের ক্ষেত আর ছোট ছোট গ্রাম্য কুটীর—মিসেস্ যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। পুত্র-কন্যাদের কচি কোমল কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসে কানে। ভেসে আসে পেতলের খাঁচায় পোষা ক্যানারী দু'টোর কিচির-মিচির। কসমস ফুলের গন্ধভরা স্কটল্যাণ্ডের হিম-শীতল হাওয়াও হয়তো ভেসে আসে।

ফটকের ভেতর অশ্বারোহী দূত প্রবেশ করতেই চিলের পালকের কলম রেখে সজাগ হয়ে ওঠে মিসেস্। ফটকের মুখ থেকে ব্যারাকের দরজা পর্য্যন্ত পথটুকু নুড়ি-পাথরের। অশ্বের পদক্ষেপে নুড়ি ছিটকে উঠেছিল। জানলার সার্শি খুলে মিসেস্ চাঁদের আলোয় দেখলে অশ্বারোহীর অফিসিয়াল পোষাক। মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে কে এক জন। আকাশের তারার মত কি একটা দপ্-দপ্ জ্বলছে অশ্বারোহীর গম্বুজের মত টুপীতে।

জেমস্ ব্র্যাডলের গায়ে হাত বুলিয়ে ডাকলে মিসেস্ কোমল কণ্ঠে। বললে,—ডিয়ার, কে যেন অপেক্ষা করছে লনে। অফিসিয়াল্ বলেই মনে হচ্ছে। তুমি কি উঠবে, না আমি আলাপ করবো ব্যক্তিটির সঙ্গে?

ঘুম-চোখেই উঠে বসলো তৎক্ষণাৎ জেমস্ ব্র্যাডলে। বললে,—Anything dangerous?

মিসেস্ স্বামীর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বললে,—বোধ হচ্ছে তোমার একজন কলিগ, লনে অপেক্ষা করছে।

ক্যাম্প-খাট থেকে এক লাফে সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো জেমস্ ব্র্যাডলে। বললে,—Is it?

মিসেস্ বললে,—Yes.

রিভলভার-আঁটা বেল্টটা দেওয়ালের হুক থেকে খুলে কোমরে জড়াতে জড়াতে ত্রস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জেমস্ ব্র্যাডলে। বলে,—Who is there?

অশ্বারোহী কায়দাসুযায়ী সেলাম ঠুকে বললে,—I am sir, Richard. কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসে পত্রবাহক। হুকুমনামার লেফাফাটা এগিয়ে ধরে।

চিঠিটা অন্ধকারে পড়তে পারেনা জেমশ ব্র্যাডলে। ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের 'পরে জলন্ত লণ্ঠনের কাছাকাছি গিয়ে এক নিমিষে পড়ে ফেলে। মিসেস্ দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে। কোন দুঃসংবাদের আশায়। জেমশ ব্র্যাডলে বললে,—ডার্লিং, আমাকে এখুনি হেড-কোয়ার্টারে যেতে হচ্ছে। মাননীয় কমিশনার ডাক পাঠিয়েছেন।

মিসেস্ শুধু বললে,—In the midst of night ?

একটু হাসলে জেমশ ব্র্যাডলে। বললে,—Darling, service is service. Duty duty.

দূরে, বহু দূরে কোথায় ডাক ছাড়লো শৃগালের পাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধড়া-চূড়া চাপিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলো জেমশ ব্র্যাডলে, তড়িৎগতিতে। সার্শি খুলে দাঁড়িয়েছিল মিসেস্। যতক্ষণ অশ্বের পদশব্দ কানে আসে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। পত্রবাহক দু'টি জেমশ ব্র্যাডলের পিছু-পিছু ঘোড়া ছোটালে। পথের বাঁকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জনে।

—Service is service ! Duty is duty !

কথা কয়েকটা উচ্চারণ করতে করতে মিসেস্ ব্র্যাডলে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলো। গভীর রাত্রে হঠাৎ কেন ডাক পড়লো ! চিন্তাকুল হয়ে আসে মনটা—যে-মন স্কটল্যাণ্ডের চিন্তায় বিভোর ছিল। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অশ্ববাহী লাঙল চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে চাষী ; মেঠো পথ ধ'রে ব্যাগপাইপে গ্রাম্য-সুর বাজাতে বাজাতে একা-একা চলেছে কোন এক গ্রামীন ; দক্ষিণ বাতাসে কল্লোলিত হয়ে উঠেছে সবুজ শস্যক্ষেত্র—মিসেস্ ব্র্যাডলের চোখে জেগেছিল স্বপ্ন-স্মৃতি। কত

এই গভীর রজনীতে কেন ডাক পড়লো! কদম ধ'রে বসে থাকতে হয়। ভেবে কিছু স্থির করতে পারে না মিসেস্।

বাইরে রাত্রির গতি যেন অচঞ্চল হয়ে আছে। স্তব্ধ আঁধার। ক'টা বাজে কে জানে! লনের ধারে ইউক্যালিপটাস গাছটার সুউচ্চ শীর্ষে উড়ে এসে বসেছে কয়েকটা প্যাঁচা—ডাকছে গলা ফাটিয়ে। অমঙ্গলের ডাক ডাকছে। মিসেস ব্র্যাডলে অনেক কিছুই ভাবে; অসময়ে তলব পড়ার কত কি প্রয়োজন থাকতে পারে!

জেমস ব্র্যাডলেকে দেখেই কমিশনার সোৎসাহে প্রশ্ন ক'রলেন,—What's about your search-work! How many guineapigs traced by you?

পুলিশ হেড-কোয়ার্টার যেন কেঁপে উঠলো কমিশনারের কথায়। দণ্ডায়মান প্রহরীর দল সচকিত হ'য়ে উঠলো। গিনিপিগ, গিনিপিগ এলো কোথা থেকে!

—Not a single one,—ব্র্যাডলে উত্তর দেয় হতাশ কণ্ঠে। বলে,—I have been directed to trace, when they have gone out of sight. What can I do sir?

—What!

কমিশনার ড্রাই জিনের পেগ নামালেন মুখ থেকে। কিছুক্ষণ থেমে মনে মনে কি এক অঙ্ক কষতে থাকেন যেন। পেগটা শেষ ক'রে বললেন,—What about that chap, the Bengalee boy-zaminder?

কি উত্তর দেবে যেন ভেবেই পায় না জেমস ব্র্যাডলে। আকাশ-পাতাল ভাবে। বলে,—He had gone to some prostitute, to pass a joyful night. I hope so. He was not in his residence during my visit.

রাইফেল হাতে প্রহরীর দল শুনলো শুধু একটা কথা, জমিদার। কোথা থেকে আবার জমিদার এলো!

জমিদার। সত্যিই জমিদার তখন গহরজানের ঘরে!

উগ্র কি এক মদের নেশায় কাতরাচ্ছে। দু'হাতে চিবুক রেখে আধা-শোয়া হয়ে হাসতে হাসতে আলাপ করছে গহরজান মদির চোখে। মুরগী-মুসল্লম আর রুটি খাওয়ার পালা চুকে গেছে। তোফা বানিয়েছে গহরজান। মাংস-রুটির সঙ্গে তৈয়ারী করেছে ভেটকী মাছের দমপোখৎ। দমপোক্তা। তোবা তোবা ব'লে খেয়েছে কৃষ্ণকিশোর। খেয়েছে মদের মুখে। তারিফ শুনে খুশীতে ভরে গেছে গহরজানের অন্তর।

নেশায় নিজেকে বেসামাল মনে হ'তে কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—এখন ফিরবো কেমন ক'রে? দাঁড়াতে পারবো না তো?

খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে গহরজান।

জামরুল রঙের রুমালে মুখটা চেপে-চেপে মুছে নেয়। সুর্মা-টানা চোখে মোহ-মাখানো দৃষ্টি কুটিয়ে বলে,—যাকে বুঝি মনে আসছে? আমি যেতে দেবো না এখন। ডাকাতের খপ্পরে পড়বে যে!

হুজুরের দেরী দেখে কোচম্যান আবদুল প্রথমটায় ঘন্টা বাজিয়ে হুজুরের খেয়াল যাতে হয়, সেই চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু হুজুরের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন রাত্রি গভীর হ'তে আবদুল নিজে গিয়েই গহরজানের দরজার কড়া ধ'রে নেড়েছিল। গহরজানের দেখা পাওয়া যায়নি, দেখা দিয়েছিল সৌদামিনী। টাকা পেয়ে সৌদামিনীর মন আনন্দাতিশয্যে ডগমগ হয়েছিল। আবদুলের হাতে গোটা দুই টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল ঘুম-চোখে,—যাও না বাছা, কিছু কিনে-টিনে খাও না। রাত কাবার না হ'লে তোমাদের হুজুর যাচ্ছে না। মিছে ডাকাডাকি ক'রে কাযেলা ক'র না।

কিছু খাওয়ার লোভে যায়নি আবদুল কোচম্যান। কিছু পাওয়ার লোভেও নয়।

রাত্রি ঘন হ'তে দেখে গিয়েছিল হুজুরকে ডাকতে। চোখের সামনে হুজুরকে জাহান্নমে যেতে দেখে বুকের ভেতরটায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়েছিল আবদুলের। চোখ ফেটে দু'এক ফোঁটা জলও বোধ করি প'ড়েছিল। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে মেলেনি, হুজুরকে উদ্ধার করবার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভেবেছিল, ঘোড়া দু'টো কি ভবৃগান্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ পথের মধ্যে! কিন্তু উপায় কি? আবদুল অনন্যোপায় হয়ে গাড়ীতে ফিরে এসেছিল। আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি। আল্লার নাম জপেছিল। হা আল্লা, হা আল্লা ক'রেছিল।

একটা এলাচ দাঁতে কাটতে কাটতে বললে কৃষ্ণকিশোর,—মা? মাকে মনে পড়ছে? না, না, মা তো সেই কাশীতে।

কাশী! মা আছেন কাশীতে?

অস্পষ্ট অতীত আবছা-আবছা মনে আছে গহরজানের। যেন শুনেছে ঐ নামটা। যেন দেখেছে ঐ দেশটা। কেমন যেন উদাসী চোখে চেয়ে থাকে গহরজান। নিশ্চুপ হয়ে থাকে। কাশী যেন কত যুগ-যুগান্তরের পরিচিত মনে হয়। গহরজান যে ঠিক জানে না গহরজানের পিতৃ-পরিচয়। কাশীর সঙ্গে ছিল কতটা যোগাযোগ। জানে সৌদামিনী, জানে সকল বৃত্তান্ত।

—মা কাশীতে কেন আছেন?

চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে শুধোয় গহরজান। আশ্চর্য্যের ভঙ্গীতে। কথা বলতে বলতে কিছুটা কাছে এগিয়ে আসে।

নেশা হ'য়ে গেছে অধিক। ঘুমের জড়তা লাগছে চোখে। কথা ব'লতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত যেন থমকে থাকে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—প্রথম যেদিন নেশা ক'রেছিলুম, সেদিন বাড়ী ফিরে [illegible] ক'রতে

মা রাগ ক'রে চলে গেছে কাশীতে। প্রথম যেদিন এখানে বসির আমাকে আনলে।

বসির। বসিরুদ্দিন। কত, কত দিন হয়ে গেছে, যেন বিস্মৃতির অতলতায় মুছে গেছে বসিরুদ্দিন। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে গহরজানের, বসিরুদ্দিনের কথা। বসির ব'লেছিল, যাবে কোন বাইজীর কাছে, গান শেখাতে। লক্ষ্ণৌ না লাহোরে, কোথায় যেন ব'লেছিল।

কিন্তু মায়ের কাশী যাওয়ার কারণটা শুনে কেমন যেন গুম মেরে যায় গহরজান। কেমন অন্যমনা হয় যেন। হয়তো নারীর প্রতি গহরজানের নারী ব'লেই সহানুভূতি জাগে। কে সেই মা, কেমন সে মা—যে ছেলের অপকীর্ত্তি চোখে দেখবে না ব'লে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে গেছে দূরে, বহু দূরে।

—

কুমুদিনী। কুমু!

কাশীর অসি-ঘাটের তীরে পাথরের এক অট্টালিকার এক প্রান্তস্থ ঘরে প্রদীপের আলোয় কুমুদিনী রাত্রি জেগে কাশীর মণ্ডপ-চরিত পড়ছেন। খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ীর রাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত কাশী-পরিক্রমা পড়ছেন। পড়ছেন :

অগস্ত্য কহেন শুন পার্ব্বতীনন্দন
কাশীতে প্রমাদে পাপ করে যেই জন।
কিরূপে নিষ্কৃতি তার কহ বিবরণ
কার্ত্তিক কহেন, কহি শুন তুমি মুনি—

কুমুদিনী এখন আর সেই কুমুদিনী নেই। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে শীঘ্র চেনা যায় না তাঁকে! শরীর কৃশ হ'য়ে গেছে, শুভ্র রং মুছে গেছে, চক্ষু কোটরগত হ'য়েছে। মুখে ফুটেছে দুঃখভোগের রেখা-চিহ্ন। কালো

পশমের মত রাশি-রাশি চুল ছিল মাথায়, কি খেয়ালে দয়াহীনের মত নিজেই কেটে ফেলেছেন। যাঁর আকৃতিতে ছিল স্নেহময় মাতৃরূপ, তাঁকে এখন সহসা দেখলে ভয় হয়। কুমুদিনীর কণ্ঠ হ'য়েছে রুক্ষ, প্রকৃতি হ'য়ে গেছে যেন সকল মোহমুক্ত, কঠিন ও কঠোর। কিন্তু কোথা থেকে যেন অসীম মনোবল সঞ্চয় করেছেন, কুমুদিনীর প্রতি পদক্ষেপে যেন দীপ্ত ভঙ্গী ফুটে ওঠে। কুমুদিনী গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন, নয় কণ্ঠস্থ ক'রতে থাকেন হয়তো কাশী-মাহাত্ম্য!

পুরাণজ্ঞ কাশীতত্ত্ববেদী শুদ্ধমতি।
তোমারে কহিব কাশীমাহাত্ম্য সম্প্রতি।
কাশীকৃত পাপিগণে নাহি আর গতি!
প্রায়শ্চিত্ত যাহা তাহা গোপনীয় অতি।
জ্ঞানাগ্নি ব্যতীত পাপ-ধ্বংস অপ্রমাণ।
বিষয়-আসক্ত চিত্তে দুর্লভ সে জ্ঞান।

বিষয়ে আর আসক্তি নেই কুমুদিনীর যেদিন থেকে সীঁথির সিঁদুর গেছে পুড়ে। এখন হয়তো নিজের প্রতিও নেই কোন মায়া-মমতা। একটি পরম মুহূর্তের জন্য এখন কেবল তাঁর আকুল প্রতীক্ষা। কিন্তু কবে যে সেই চরম ক্ষণ আসবে, যেদিন ঐ মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে দগ্ধীভূত হ'য়ে যাবেন তিনি?

গহন রাত্রি, দৃষ্টি নেই সেদিকে। প্রদীপের আলোক-শিখা দপ্-দপ্ ক'রে উঠে। হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। কুমুদিনী একান্ত মনে সুর ক'রে ক'রে পড়তে থাকেন। বাইরে কুলু-কুলু রবে প্রবহমানা গঙ্গা। চন্দ্রালোকে ঊর্মিমালা ঝিলমিল করে। যেন কে মুঠো-মুঠো স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে দিয়েছে জলে।

অসি-ঘাটে কারা যেন কথা বলাবলি করছে। এই গভীর নিশীতে কারা বাক্যালাপ করছে! হাসছে হো-হো শব্দে। অট্টহাসি হাসছে।

ঘাটের পৈঠায় জমা হয়েছে এক দল নাগা সন্ন্যাসী। পদব্রজে বিন্ধ্যাচলের পথে চলেছে সন্ন্যাসীর দল, রাত্রি অতিবাহিত ক'রে প্রাতঃকালে যাত্রা ক'রবে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই। জটাজুটধারী ঐ নগ্ন নাগা সন্ন্যাসীর দল বিনিদ্রায় জেগে আছে—বাক্যালাপ করছে পরস্পরে। হাস্য-বিনিময় করছে।

কয়েকটা ধুনি জ্বলছে লকলকে জিহ্বা বিস্ফারিত ক'রে। গঙ্গার জলে প্রতিবিম্ব জ্বলছে। সন্ন্যাসীদের টুকরো টুকরো কথা আর হাসির শব্দ হাওয়ায় ভেসে যায়।

কুমুদিনী মধ্যে-মধ্যে পাঠে বিরতি দিয়ে কান পেতে থাকেন। অনুমান ক'রতে পারেন না, কোথায় কারা কথা বলে হাসতে-হাসতে।

ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কথা বললে গহরজান।

বললে,—মা আর ফিরে আসবেন না ?

প্রশ্নটা শুনে হতচকিত হ'য়ে পড়ে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কি জানি ! কোন কথা তো জানান না।

নড়ে-চড়ে বসলো গহরজান। গলার হারটা কেন তুললো। গহরজানের সুর্মা-টানা চোখ দু'টো যেন নিদ্রালু হ'য়ে উঠেছে। বললে, —কাশীতে কোথায় আছেন তিনি ?

—অসিতে একটা ঘর ভাড়া ক'রেছেন।

আবছা-আবছা যেন মনে উদিত হয় কাশীর স্মৃতি। কথা বলতে-বলতে যখন-তখন গহরজান কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়ে। একটা শূন্য পেয়ালা ছিল কাছেই। বোতল থেকে রঙীন জল ঢেলে পেয়ালাটা পরিপূর্ণ ক'রে নেয়, হয়তো নেশা টুটে যাচ্ছিল, চাগিয়ে নেয় তাই নেশাটা। মদিরা পান করে। পরীক্ষা ক'রে দেখেছে গহরজান, নেশা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই সুখ। নেশা কাটলে চোখে পড়ে এই জঘন্য পরিবেশ। ধিক্কার

দিতে ইচ্ছা হয় নিজেকে। অসহ্য মনে হয় যেন বেঁচে-থাকা। নেশা না ক'রলে যেন মেজাজ বিগড়ে থাকে। হাসতে সাধ হয় না।

এলোমেলো দমকা হাওয়ায় একটা জানলা হঠাৎ খুলে গেল ধাঁ ক'রে। চমকে উঠলো যেন দু'জনে। দেওয়ালে ছিল টাঙানো ছবি। আদম আর ঈভের। ছবিটা কেঁপে ওঠে যেন। মদির নয়নে তুলে তাকালো গহরজান। চোখের কোণ দু'টো রাঙা হয়ে উঠেছে। রক্তাভ চোখ।

কথায় হঠাৎ সোহাগের সুর ফোটায় গহরজান। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে। জামরুল রঙের রুমালটা আঙুলে পাকায়। বলে,—তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে এখান হ'তে ?

প্রশ্নটা আশাতীত। মণি-মাণিক্য দিয়েছে, আবার বলে কি ? কিছুক্ষণ আগেও বলেছিল বেনেটোলার কে দত্তবাবু আলমবাজারের বাগান-বাড়ীতে নিয়ে যাবে। রাখবে। ভুলে গেল গহরজান ? নেশার ঘোরে যা-তা বকছে না তো ! কৃষ্ণকিশোর বলে, নিয়ে যাওয়ার মিনতি শুনে কিছুটা গ'লে গিয়েই বলে,—কোথায় ?

—যেথায় খুশী।

বাইরে স্তব্ধ রাত্রি। অচঞ্চল। বাইরে যেন তখন নিঃঝুমের পালা চলছে। এখন কোন ঘরে বোধ হয় কেউ গীত কিংবা নৃত্য করছে না। হাওয়ায় এখন নেই কোন গজল অথবা টোরীর রাগিণী। তবলার বোলও ভেসে আসছে না ! শুধু আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘ ভাসছে। আর হাসছে চাঁদ।

—হঠাৎ কখনও বলা যায় ? বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—বেশ তো আছো এখানে।

যেন দুঃখের মৃদু হাসি ফুটে উঠলো গহরজানের তরমুজ-রঙের ঠোঁটে। বললে,—বৌ আছে তোমার, জানলে দিক্‌দারী করবে ?

বৌ। বউ।

কচি-কচি মুখে যার কনে-চন্দন? ডাগর চোখে যার বিস্তব্ধ দৃষ্টি? বুকের ভেতরটায় হঠাৎ যেন কে হাতুড়ির ঘা মারলো। ভুলে গিয়েছিল যেন বৌকে। রাজেশ্বরীকে।

আকাশ পানে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে ক্লান্ত শরীরে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে রাজেশ্বরী। বালিসে মাথা নেই, বাহুতে মাথা। ঘুমোচ্ছে অকাতরে। এলোকেশী শুধু ক'বার কথা বলতে গিয়ে বকুনি শুনে পালিয়ে গেছে। শেষ বারে রাজেশ্বরী সত্যিই ধ'মকেছিল।

এলোকেশী জিজ্ঞেস ক'রতে গিয়েছিল,—রাজো, মুখে কিছু দিবি না? দাঁতে কাটবি না কিছু? তুই কি ঘুমোলি?

বেশ চীৎকার ক'রেই রাজেশ্বরী বলেছে,—আঃ, তুমি বিদেয় হবে কি না?

তখন হয়তো কলকাতা মহানগরীতে কেবল মাত্র শুধু মহামান্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে মানুষ কথা বলাবলি করছিল রাত্রির গাম্ভীর্য্যকে উপেক্ষা ক'রে। তখন শুধু বঙ্গদেশের পুলিশ কমিশনার গলা ফাটিয়ে চটাচটি করছিলেন। লালবাজারের অপারেশন ঘর তখন শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চমকে চমকে উঠছিল প্রহরীর দল। হাতে ভারী ভারী রাইফেল, হাত থেকে খসে প'ড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এক পেগ থেকে আরেক পেগ। হাফ নয়, অর্দ্ধেক নয়, ফুল। দু'ই জিনের একেকটা ফুল পেগ নিমেষের মধ্যে শেষ ক'রে ফেলছেন কমিশনার। আর চেঁচাচ্ছেন। বকছেন, ইতর ভাষায় গাল পাড়ছেন।

কমিশনার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন না। লালবাজারের অপারেশন ঘর কাঁপছে কেন তবে? কমিশনার হঠাৎ নিনাদ ক'রে ওঠেন।

বললেন,—You bitch, swine, Biswas Babu!

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বাস। এ. সি. বিশ্বাস। অর্থাৎ এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার বিশ্বাস বাবু। তিনি সেলাম ঠুকে হাজির হ'তেই কমিশনার পুনরায় বললেন,—You bloody bastard, didn't you check your area, inspite of innumerable orders and commands ?

ষড়ানন বিশ্বাস। বাঙ্গালী বাবু। বাঙালী চাকর। বিশ বছরের অধিক ইংরাজের পদসেবা করছেন। কথা বলতে গিয়ে কথা বলতে পারলেন না। মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হয়।

কি চেক করবে বিশ্বাস ?

এরিয়া চেক করবে। পল্লীর প্রতি ঘরে-ঘরে স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের লোককে পাঠিয়ে তদারক করবে। কোন্ ঘরে কে আছে আর কে নেই। কার ছেলে ভিন্‌দেশী হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস সময় মত কান দেয়নি কাজে। ডিরেকশন দিতে ভুলে গিয়েছিল সহকারীদের, কমিশনারের মেজাজ আজ বিগড়ে আছে।

কথা বলতে বলতে টেবিলে ঘুঁষি মারছেন যখন-তখন। বসে থাকতে থাকতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। কিছুতেই যেন স্বস্তি বোধ করছেন না। কেন কে জানে, কমিশনারের শান্তি যেন ব্যাহত হয়েছে। পার্লামেন্ট থেকে কড়া নোট এসেছে কি জন্য, অযোগ্য বিবেচিত হ'লে ইস্তফা দেওয়ার বাধ্য করানো হবে। তদুপরি, একটা বিশেষ ঘটনা অত্যন্ত চঞ্চল ক'রে তুলেছে কমিশনারকে। ভেবে যেন কিছু কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। টেবিলে ঘুঁষি মারছেন যখন-তখন।

জেমস ব্র্যাডলে একটা কেদারায় বসে থাকে। ভয়ে কোন কথা বলে না।

মধ্য-কলকাতায় কোন এক আউটপোষ্টে ধরা পড়েছে এক অদ্ভুত আসামী। মামাল সমেত গ্রেপ্তার হয়েছে। কে এক জন বাঙ্গালী যুবক, বেহালার বাক্স হাতে চলেছিল পথে। পুলিশ জেরা ক'রেছিল যুবকটিকে।

বি.—৯

শেষ পর্য্যন্ত বেহালার বাঘে পাওয়া গেছে দস্তুরমত ডবল ব্যারেল বন্দুকের খোলা যন্ত্রপাতি।

—Smuggled arms!

ঘটনা শুনে গলা ফাটিয়ে ফেলেছিলেন কমিশনার। আগ্নেয়াস্ত্র চালান হচ্ছে! লুকোচুরি খেলা যেন, কমিশনার চোর ধরতে না পেরে মরিয়া হয়ে গেছেন। দু'-পাঁচটা চোর নয়, দলকে দল ধরতে চাইছেন। টেবিলে ঘুঁষি মারছেন আর বলছেন,—I want gangs. I want to round up the gangs.

চুনো-পুঁটিতে মন উঠছে না কমিশনারের। ধরতে চাইছেন রুই কাতলা চিতল বোয়াল। তাই ডেকে পাঠিয়েছেন জরুরী ডাকে, জেমস ব্র্যাডলেকে। ঘুম থেকে তুলে এনেছেন।

কিন্তু যারা ধরা পড়ছে, গারদ-ঘরের অন্ধকূপে অকথ্য উৎপীড়নেও কিছু করছে না। এলোমেলো কথা বলছে। আসল কথা চেপে যাচ্ছে, উৎস বলছে না।

বিশ্বাস বাবু নত-মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকেন। চেঁচাতে-চেঁচাতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় কমিশনারের। কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, এক-এক পেগ হুইস্কী খেয়ে তবে শান্ত হন।

লালবাজারের অপারেশন ঘরটাই তো জগৎ নয়? বাইরে গহন রাত্রি। আকাশে চন্দ্রালোক, তবুও থমথমে রাত্রি দেখে যেন গা ছম-ছম করে। ক'টা বাজলো কে জানে।

জেমস ব্র্যাডলে কিছুটা সাহসে বুক বেঁধে হঠাৎ ব'লে ফেললে মাজু-ভাষায়। বললে,—Your honour, মিথ্যে-মিথ্যে যেখানে-সেখানে ঢুঁ মেরে কোন কাজই হবে না। রীতিমত তল্লাসী করতে হবে। খুঁজতে হবে root of evils.

কথাগুলো অত্যন্ত [illegible] জেমস ব্র্যাডলে।

অন্যান্য অফিসিয়ালও ছিল কয়েক জন। জেমস ব্র্যাডলের কথা শুনে মাথা দোলালে। সায় দিলে কথায়। অফিসিয়ালদের এক জন বললে,—আর root থাকে চোখের আড়ালে মাটির তলায়, তাকে খুঁজে নিতে হয়।

জেমস ব্র্যাডলে মন থেকেই হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিল যে, বৃথা তল্লাসী করতে গিয়েছিল সে। বারাঙ্গনার গৃহে রাত্রি যাপন আর দেশসেবা একসঙ্গে কেউ কখনও করে! অহেতুক অপেক্ষা ক'রে সময়ই নষ্ট হয়েছে।

গহরজান বারাঙ্গনা?

জেমস ব্র্যাডলে জানে না, গহরজান বারাঙ্গনা নয়। উচ্চবংশের রক্ত আছে গহরজানের দেহে। ভাগ্যদোষে গহরজান এখন রূপোপ-জীবিনী, কিন্তু পাপিষ্ঠা নয়। কুলটা কিন্তু কুলত্যাগিনী নয়। ঐ পোড়ামুখী সৌদামিনীর জন্যই গহরজানের এই হাল হয়েছে, নয় তো কোন নবাবের হারেমে হয়তো এতদিন খাস বেগম হয়েই থাকতো বহাল তবিয়তে।

উতলা হাওয়ায় আতর-গোলাপের মিশ্রিত সুগন্ধ বয়ে যায় গহরজানের ঘর থেকে। দেওয়ালগিরির আলোয় গহরজানের রূপপ্রভা চন্দ্রসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল মনে হয়। বারাঙ্গনা মনে হয় না যেন, ভ্রম হয় কে এক দেবলোকবাসিনী অপ্সরী।

অপ্সরীর তখন ঘুম না নেশায় কে জানে চক্ষু ঢুলু-ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; হয়তো দ্রাক্ষাসুধার পূর্ণাধিকার তখন। ঘরের মানুষ মুরগী-মুসল্লম আর দমপোখতের তারিফ করায় গহরজানের মুখ খুশীতে ভরে যায় যেন। নীড়-বাঁধার আনন্দ অনুভব করে। ঘর-বাঁধার সুখ।

হঠাৎ কথা বললে গহরজান। স্তিমিত চোখ মেলে বললে,—তুমি আমার তালিমের সাদি দিয়ে দেবে ব'লেছিলে। ভুলে গেছো? আমি যে বিত্তর আদমীকে ব'লে রেখেছি। কবে হবে?

কথা বলতে বলতে গহরজান এলিয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। বেসামাল হয়ে গেলো বুক-পিঠের কাপড়। কিংখাবের আঁটসাঁট কাঁচুলী, আলোর স্পর্শে চাকচিক্য তুললো। দু'বাহু মাথাতে তুলে শুয়ে রইলো আচ্ছন্নের মত।

নারীর কাকুতি শুনে হয়তো বিহ্বল হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—বলেছি তো সাদি দিয়ে দেবো। তুমি ব্যবস্থা কর' সাদির।

ভুরু নাচিয়ে মোহভরা মিষ্টি হাসি হাসে গহরজান। বলে,— সাদি হবে, খরচা লাগবে কত! তুমি খরচা দাও না, আমি বন্দোবস্ত করছি। এমন সাদি দেবো যে সাড়া লেগে যাবে পাড়ায়।

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ উঠে পড়লো গহরজান। দেওয়ালগিরির জলন্ত শিখা ফুৎকারে নিবিয়ে দিলো।

নরম-নরম স্পর্শ লাগে গায়ে। টনক ন'ড়ে চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। গহরজান একটা হাত এগিয়ে ধ'রেছে। কোমল হাত। কৃষ্ণকিশোর চমকে ওঠে; রাজেশ্বরীর হাত দু'টোও এমনি মোমের মত নরম।

কাক-ডাকার শব্দে তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল রাজেশ্বরী।

ভেবেছিল ভোর হয়ে গেছে। আকাশ ফর্সা হয়েছে। কাক-জ্যোৎস্না হয়েছে। খটখটে আলো দেখে থেকে-থেকে ডেকে উঠছে কাকের দল। রাজেশ্বরী উঠে বসেছে শয্যায়। অঙ্গে-অঙ্গে যেন জ্বরের জ্বালা ধ'রেছে। রাজেশ্বরী বসে থাকে চক্ষু মুদিত ক'রে। এলোমেলো হাওয়ায় শুধু চূর্ণকুন্তল ওড়াওড়ি করে।

আলোর আলোকময় আকাশ দেখে থেকে-থেকে ডেকে ওঠে কাক। পাখা ঝাপটায়। ঢিমেতাল হাওয়ায় গাছের শাখা দুলতে থাকে ধীরে-ধীরে।

ক'টা বাজলো কে জানে?

আশ্বিনের প্রথম।

বর্ষাঋতু অতীত হলেও আকাশ হঠাৎ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। বাঙলা থেকে হয়তো বর্ষা বিদায়-গ্রহণে রাজী নয়। হুগলী নদীর তীরে তীরে শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্য; গগনচুম্বী তাল আর তমালের যেন ঘন বসতি; শাল আর দেবদারু, আম জাম কাঁটাল। ওষধি আর আগাছায় বনভূমি পরিপূর্ণ। সবুজ নয়, ঘন নীল রঙ। বঙ্গোপসাগরের মোহানা থেকে মাতাল হাওয়া ছুটে আসে যখন-তখন। হুগলী নদীর তীরদেশে দুলে ওঠে অরণ্য। গাছে গাছে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়। ঝড়ের বেগে তখন ফুঁসতে থাকে নদীকূল, শোঁ-শোঁ শব্দ হয়। কত গাছের কোটরে কোটরে বাঁশী বেজে ওঠে। কিছুক্ষণের ভয়ে ঘেষাঘেষি ক'রে চিতা আর গোক্ষুরায় একত্র হয়। সর্প আর নকুলে। ঝড়ো হাওয়া যেন তখন ডেকে আনে কালো কালো মেঘ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আর বারিবর্ষণ হতে থাকে আকাশ থেকে। হুগলী নদীও তখন কূল ছাপিয়ে ওঠে।

আশ্বিনের প্রথম, তবুও ভোরের আকাশ মেঘাবৃত হয়ে দেখা দিয়েছে আজ। দিনের শুভ্রতাকে যেন পরিহাস করতেই জড়ো হয়েছে ঐ কালো মেঘের রাশি। থেকে থেকে মেঘ ডাকছে গুরু-গুরু। যেন কোথায় কারা হঠাৎ মেশিন-গান দেগে চলেছে। পাখীর দল বাসা থেকে উড়তে বুঝি ভয় পেয়েছে। তবে আর শঙ্কায় চক্ষু ব্যাদান ক'রে চোখ মেলে আছে কুজ্ঝটিকাময় আকাশে। শিউলীর গন্ধভরা বাতাসে বৃষ্টিজলের রেণু। দু'-চার ফোঁটা বৃষ্টিও হয়তো বা পড়লো। এ কি দুর্দৈব!

মানুষের সাড়া নেই কোথাও, তবুও গরাণহাটার গঙ্গামুখো পথে যেন মিছিল বেরিয়েছে। দলে দলে চলেছে শত শত। নানা অঙ্গভঙ্গী ও হাস্যালাপ করতে করতে ও সমুদ্রের কল্লোলের মত হেলতে-দুলতে চলেছে। হরেক রকম শাড়ীর বাহারে অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে। কারও কারও মুক্ত কেশজাল মনে হয় ঐ কৃষ্ণকায় মেঘেরই প্রতিচ্ছবি। চিৎপুরের যত বারাঙ্গনা চলেছে মুক্তিস্নান করতে। পাপমোচনের গণ্ডূষ পান করতে চলেছে। আলস্য-মন্থর গতিতে।

—বিষ্টি আসবে লো! পা চালিয়ে চল্।

কে যেন কথা বললে। শুনলো সকলে। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলে কেউ কেউ। বেশ লাগছে যেন এই ভিজে-ভিজে সকাল। অদৃশ্য সূর্য্যের মিষ্টি আলো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিতে সাধ হয়। বাদলা-দিনের ঔদাসীন্য।

—ভিজতেই তো যাচ্ছি! তবে আর বিষ্টিকে ভয় কেন?

কে যেন কথা বললে। কথা শুনে কেউ কেউ হাসলে খিল-খিল ক'রে।

—দেখিস্, ভেসে যাসনি যেন। বললে যেন কে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কথা গেলো এক দল থেকে অন্য দলে। সৌদামিনীও ছিল পিছনে। বললে,—শুকনো কাপড়গুলো যে ভিজবে না পোড়ারমুখী!

হয়তো বা দু'-চার ফোঁটা জলও পড়ছিল। শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া বইছিল।

গহরজান শুধু যায়নি। ঘরেই ছিল। শুয়েছিল জেগে জেগে। চোখে তখনও ছিল ঘুমের জড়তা। আলস্য ত্যাগ ক'রে উঠতে চায় [illegible]

না গহরজান। ভাল লাগে যেন শুয়ে থাকতে একটা চাদরে বুক পর্য্যন্ত ঢেকে। জেগেছিল না ঘুমোচ্ছিল কে জানে। হঠাৎ সিঁড়িতে পদশব্দ শুনে চোখ মেলে তাকালো একবার। ঘুম ভাঙা ঢুলু-ঢুলু চোখ। পাশেই বসেছিল ডালিম চুপটি ক'রে। ডালিমকে সরিয়ে উঠে পড়লো গহরজান। ঘরের মানুষ চলে গেছে সূর্য্য ওঠার আগে। তবে আবার কে আসে এমন অসময়ে! পরনের কাপড় বেঠিক হয়েছিল। শাড়ীর আঁচল বুকে জড়াতে জড়াতে শুনলো দরজার কড়া নড়ছে। ক্ষণেকের জন্যে মুখে যেন বিরক্তি ফুটে ওঠে গহরজানের। ঘুমের আমেজটা নষ্ট হয়ে গেল। বললে, বেশ জোর গলাতেই বললে,—কে, কে?

কোন সাড়া নেই বাইরে। শুধু দরজার কড়া নড়ছে ঘন ঘন! ডিমওলা ডিম দিতে এসেছে না ডালওলা ডাল এনেছে! না অন্য কেউ? কেন কে জানে কিছুটা ভয়ে ভয়েই দরজার অর্গলটা খুললে গহরজান। যে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে ঘোর বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। মুখে কোন কথা ফুটলো না।

—ভীষণ ভিজে গেছি! অবাক হয়ে দেখছো কি? ভেতরে যেতে দাও। সহজ সরল কণ্ঠে বললে আগন্তুক। কথায় ক্ষীণ হাসি মিশিয়ে বললে।

গহরজান কোন কথা বললে না। শুধু সরে গেল দরজা থেকে। ভেতরে যাওয়ার পথ ছেড়ে দিলে।

আগন্তুকের আকৃতি আর পোষাক দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছিল গহরজান। লোকটিকে আগে তো দেখিনি কখনও। লোকটির গায়ে গেরুয়া রঙের রেশমী আলখাল্লা। তসরের কাপড়। হাতে একটা ঝুলি, কি আছে কে জানে! লোকটির গোলাপী ফর্সা মুখে ঘন কালো শ্মশ্রু। মাথার চুলে কত দিন চিরুণী পড়েনি, অযত্নে এলোমেলো হয়ে আছে।

বড় বড় আয়ত আঁখিযুগলে গভীর দৃষ্টি। চোখের কোলে কালি পড়েছে। গহরজানকে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে সামান্য হাসির সঙ্গে বললে লোকটি,—একটা দিন থাকতে দিতে হবে আমাকে। সাঁঝের অন্ধকার নামলেই চলে যাবো আমি। এই নাও তোমার পাওনা।

কথা বলতে বলতে কাগজের একটা নোট এগিয়ে ধরলে। গহরজান দেখলে একটা একশো টাকার নোট। ভাবলে জাল নয়তো! এমন না চাইতে টাকা দিয়ে যায় কেউ কেউ, বেশী টাকাই দিয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় অনেক সময়, নোটটা আসল নয় নকল। জাল-করা টাকা। তবুও লোকটির আকৃতি আর পোষাক দেখে লোকটিকে অসৎ মনে করতে পারে না যেন গহরজান। হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে নেয়। বিশ-পঁচিশ নয়, এক কথায় একেবারে একশো টাকা! কেই বা দেয়? নোটটা কাচুলীর ভেতর রেখে দরজার অর্গল তুলে দিয়ে লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গহরজান। মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে সহজ হ'তে চেষ্টা করে।

হাতের ঝুলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে লোকটি বললে,—আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দাও! আমি শুতে চাই কিছুক্ষণের জন্যে। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

লোকটা মাতাল নয়তো! কথা শুনে ভাবলে গহরজান। টাকা দিয়ে ঘুমোতে এসেছে! তাও বিশ-পঁচিশ নয়, একশো টাকা! কথা শুনে হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে যেন হাসি আসে না। শুষ্ক কণ্ঠে বলে, —চলুন, ঐ ঘরে চলুন।

ঘরে ঢুকে বললে লোকটি,—আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। শুধু কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুম থেকে উঠে আমি খাবো।

লোকটা চোর নয়তো! গহরজান জিজ্ঞেস করে,—কি খাওয়াতে হবে?

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে লোকটি। বললে,—এই মাংস আর খান কতক রুটি। সুবিধে হবে না?

সন্ন্যাসী, গেরুয়াধারী হয়ে মাংস খাবে কি! গহরজান বললে,—হাঁ। কাবাব আর রোটি মিলবে।

কাগজের নোটটা বুকে বিঁধতে থাকে। গহরজানের বুকের ভেতরে কেমন একটা আলোড়ন হয়। বিশ-পঁচিশ নয়, একেবারে একশো টাকা! গহরজান ভাবছিল কতক্ষণে ফিরবে সৌদামিনী। একশো টাকার নোটটা হাতে পেয়ে না জানি কত খুশীই না হবে।

ঘরে ছিল একটা কাঠের চৌকি। মাদুর বিছানো। একটা তেল-চিটে বালিস। হয়তো সৌদামিনী ঘুমিয়েছিল ঐ চৌকিতে। লোকটি হাতের ঝুলিটা নামিয়ে সত্যিই শুয়ে পড়লো। বালিসে মাথা না রেখে মাথা রাখলো ঐ ঝুলিতে। বললে,—কেউ যদি তল্লাস করতে আসে তো ব'লে দিও না যেন ঘরে লোক আছে। নাম কি তোমার?

—গহর, গহরজান বাই।

কেমন যেন ভীত-কণ্ঠে কথা বলে গহরজান। তাকিয়ে থাকে অবাক চোখে।

—তুমি কি মুসলমান? লোকটির কথায় যেন কৌতূহল ফুটে ওঠে। বলে,—বলতে বাধা থাকলে ব'ল না।

দুঃখের হাসি দেখা যায় গহরজানের ওষ্ঠাধরে। বলে,—বেশ্যার কি জাত থাকে বাবু!

লোকটি প্রৌঢ়। বলিষ্ঠ আকৃতি। মুখে কঠোর কাঠিন্য। গহরজান ভাবছিল, লোকটা চোর নয়তো! খুনী ডাকাত কিংবা গুণ্ডা বা বদমাস! এখনও চোখে মুখে জল দেওয়া হয়নি। লোকটাকে ছেড়ে এখনই যেতে হবে গোসলখানায়। একশো টাকা দিয়ে যদি হাজার টাকার জিনিষ নিয়ে ভেগে পড়ে! যদি একটা তোরঙ্গ তুলে নিয়েই চলে যায়?

—আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি এই ঘুমোচ্ছি। ঘুম থেকে উঠেই ডাকবো তোমাকে। লোকটি কথাগুলো বলে যেন নিকটতম আত্মীয়ের মত। বললে,—তুমি কাছাকাছি থাকবে তো?

—হাঁ বাবু, ডাকলেই সাড়া পাওয়া যাবে। কেমন যেন হতচকিতের মত কথা বলে গহরজান। বলে,—তুমি কি বাবু নিদ্ যেতেই এসেছ?

লোকটি হেসে ফেললে। হাসতে হাসতেই বলে,—হ্যাঁ। শুধু ঘুমুতে এসেছি। ক'রাত্রি ঘুম নেই যে চোখে।

অনেক অভিজ্ঞতা আছে গহরজানের। দেখেছে কত মানুষ, কত রকমের। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। অন্য মানুষ একশো টাকা দিয়ে ঘরে এলে এতক্ষণ কত আদব-কায়দাই না দেখাতো গহরজান; লজ্জার মাথা খেয়ে কত হাসি-পরিহাস আর কত অঙ্গভঙ্গীই না করতো। কিন্তু লোকটির আকৃতি আর প্রকৃতি দেখে কেমন যেন সাহস হয় না গহরজানের। হাসতে চেষ্টা ক'রেও হাসতে পারে না। কথা বলতে গিয়ে মুখে যেন কথা আটকে যায়।

কথার শেষে লোকটি পাশ ফিরে শোয়। বলে,—অসময়ে এসেছি, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। কাজ থাকে তো তুমি যেতে পারো।

কেমন যেন ভয়-ভয় করে গহরজানের। ঘরের বাইরে গিয়ে বলে, —যো হুকুম বাবু!

লোকটি বললে,—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও গহরজান বাই।

গহরজান ঘরের দরজাটা শুধু বন্ধ ক'রে দেয় না, বাইরে থেকে দরজার শিকলী তুলে দেয়। কাঁচুলীর ভেতর থেকে নোটটা বের ক'রে আলোয় ধ'রে দেখে। দেখে নোটে রাজার ছাপ সত্যিকার আছে না নেই। জল রঙের রাজার ছবি দেখতে পেয়ে একটা তুষ্টির শ্বাস ফেলে। গহরজান ভাবে মাসী এসে দেখলে কত খুশীই না হবে। কোথায় যেন মনের গহনে একটা কাঁটা খচ্-খচ্ করে। গহরজান

স্থির করেছিল, লাখো টাকা দিলেও বসতে দেবে না অন্য কাকেও। থাকবে, বাঁধা হয়েই থাকবে। কিন্তু লোকটা তো চাইছে না কিছু, শুধু ঘুমোতে চাইছে। গহরজান গোসলখানার দিকে এগোয়। বালতি বালতি জল মাথায় না ঢাললে শরীরটা ঠিক হবে না। উগ্র মদের নেশায় কেটে গেছে রাত্রি, কপালটা দপ্-দপ্ করছে। দেহে যেন কত উত্তাপ।

হঠাৎ টায়রাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। গত রাত্রে লাভ করেছে গহরজান। জড়োয়া টায়রা। এখন মাসী বিক্রী ক'রে না দিলেই হয়। টায়রার সঙ্গে টায়রাটা যে দিয়েছে তাকেও বুঝি মনে পড়ে।

গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জন হয় হঠাৎ। আকাশ নিনাদ করে। কাচকাটির মত জলের ফোঁটা পড়ে আকাশ থেকে মাটিতে। গহরজান বেশ অনুভব করে বাড়ীটা পুরানো। ঝড়ঝড়ে বাড়ীটা কেঁপে উঠলো মেঘ-নাদে।

কিন্তু বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে বেলা বৰ্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে পথে মানুষের আনাগোনা। টোকা আর ছাতা মাথায় পথে মানুষের যাওয়া-আসা চলে। আশ্বিনের প্রথম তবুও বর্ষা যে কলকাতা থেকে কেন বিদায় গ্রহণ করছে না, সে জন্য শহরে কাপ্তেনদের মেজাজ চটে গেছে। যে যাঁর ল্যাণ্ডো আর পাল্কীগাড়ীতে বেরিয়ে পড়েছেন। কেউ বাজারে যাচ্ছেন, আবার কেউ বা রাত্রিটুকু গৃহে কাটিয়ে দিনের আলোয় যে যাঁর মেয়েমানুষের কাছে চ'লেছেন। কারও কারও হাতে ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা একেকটি ধরা রয়েছে। দু'পাশে তাকাচ্ছেন আর শুঁকছেন।

আশ্বিনের প্রথম। দুর্গোৎসব আসছে। রূপ বদলে গেছে যে কলকাতার বাঙালী পাড়ায়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই বেরিয়ে পড়েছে মানুষ।

গোসলখানার জানলায় পথে চোখ রেখে আলস্যে দাঁড়িয়ে থাকে গহরজান। কলকাতার বারোইয়ারী দুর্গাপূজার কত দেরী কে জানে! পূজার মরশুমে পাড়ার ভোল বদলে যায় জানে গহরজান। চোখের নিমেষে যেন হেসে ওঠে কলকাতা। গহরজানদের দরজায় যাওয়া-আসা

করে যারা কখনও আসে না। পাকা-পোক্ত খদ্দের নয়, বড বোকা বেনিক উটকো।

দুর্গোৎসব বাঙালীদের পর্ব্ব। বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই বাঙলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব। পূর্ব্বে নাকি রাজা-রাজড়াদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হ'তো, কিন্তু অধুনা মহেশ তেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যাচ্ছে।

দুর্গোৎসব। মেতে উঠবে কলকাতা। তবুও কেমন যেন ভয়-ভয় করে। দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, দেহটা কেমন শক্ত হয়ে যায় গহরজানের। শুষ্ককণ্ঠ, জিবের তালু শুকিয়ে যায়।

কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গেছে। ঠেল মেরেছে কলুটোলা পর্য্যন্ত। জায়গায়-জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টীন ও পেতলের অস্ত্রের ঢাল-তরোয়াল, প্রতিমার নানা রঙের ছাপা শাড়ী ঝুলে পড়েছে। দর্জ্জিরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরজায়-দরজায় বেড়াচ্ছে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালের দল আহার-নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটী, চুমকী ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্ছে। ধূপ-ধূনো, বেনে-মসলা ও মাথা-ঘষার একটা দোকান ব'সে গেছে।

হঠাৎ-বৃষ্টিতে বিলকুল লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তবুও লোক দেখা যায় পথে। একটা চটী-ওঠা এনামেলের জগভর্তি জল মাথায় ঢালতে থাকে গহরজান। শীত-শীত করে। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ। বর্ষার দিন।

ঘরের লোকটি তখন চোখ মেলে তাকিয়েছে। খুশি খুলে বসেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন দেখেছে দরজা আর খুললো না, তখন উঠে ব'সলো লোকটি। খোলা জানলার বাইরে বর্ষণমুখর ম্লান সকাল দেখে বললে,—গ্র্যাণ্ড! সে গ্র্যাণ্ডিশ!

ধীরানন্দ,

তুমি এই পত্র পাওয়া মাত্র মারাঠা দেশ ত্যাগ করিও। আমি পদব্রজে মণিপুর যাইতেছি; মণিপুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইলে অর্থ ভিক্ষা করিব। তুমি বর্দ্ধমানের সুজিৎনাথের নিকট তোমার কর্ত্তব্য জানিয়া লইও। তুমি জানিও, লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ম্যক্‌ল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তে মরিয়াছে ভারত-বন্ধু মাদাম ক্লারা—

চিঠিটা পড়া শেষ হয় না। দরজায় শব্দ শুনে লোকটি চিঠি থেকে চোখ তোলে। চমকে উঠে যেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই, হাওয়ার বেগে ন'ড়ে উঠেছে নড়বড়ে দরজাটা। অর্দ্ধ-পঠিত চিঠিটা বুকিতে রেখে পুনরায় শুয়ে পড়লো লোকটি। হতাশাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললে একটা। কড়িকাঠে চোখ রেখে শুয়ে রইলো নিস্পন্দের মত। ক' রাত্রি ঘুম নেই, তবুও ঘুম আসে না চোখে। ঘরের ছবিগুলো নজরে পড়ে। আদম আর ইভের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ছবি। নিদ্রামগ্ন শচী দেবী ও বৈষ্ণব-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের গৃহত্যাগের রঙীন বর্ণনার ছবি। ফোয়ারার ধারে জলকেলিরত নগ্নিকা।

মেঘবরণ কেশ। ভিজে চুলের বোঝা সামলাতে পারে না যেন।

গামছায় চুল জড়াতে জড়াতে গোসলখানার জানলা থেকে বর্ষার কলকাতা দেখে গহরজান। আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি চলেছে এখন। বৃষ্টির বেগ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথ যেন লোকে গিসগিস করছে। এত দিন দোকান-ঘর অন্ধকারপ্রায় ছিল, এখন দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙীন কাগজ সাঁটা হচ্ছে। শীতকালের কাকের মতই দোকানগুলোর চেহারা ফিরেছে। গোরা ও অন্ত লোকেরা আরসি, ঘুনসি, গিল্টির গয়না ও বিলেতী মুক্তো একচেটে কিনছে। রবারের জুতো, কম্‌ফর্টার, ছিট ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ী অগুন্তি উঠছে। বেলোয়ারী

চুড়ি, আঙিয়া ও চুলের গ্লার্ডচেনেরও অসংখ্য খরিদ্দার। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধতে বেরিয়েছেন। যাত্রার অধিকারী ও বাইরের দালালদের ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

দুর্গোৎসব ঘনিয়ে আসছে। ভাবতেও যেন গা শিউরে উঠে। হোক্ না উপরি রোজগারের সুদিন, তবুও যেন বুকের রক্ত জল হয়ে ওঠে গহরজানের। পূজার ক'টা দিন কি একদণ্ড স্থির হওয়া যায়। যত উটকো লোকের ভিড় হয়। পূজার মরশুমে কত টাকা উপার্জন করে সৌদামিনী। টাকা নেয় আর লোক বসায়। গহরজানের কোন আপত্তিই তখন টেঁকে না। অসহিষ্ণু হ'লে মদের সঙ্গে একটু-আধটু কোকেন গিলিয়ে দেয়। গহরজানের দেহে তখন যেন কোন সাড় থাকে না।

অর্থের বিনিময়ে খদ্দরের দল যথেচ্ছা মাল যাচাই ক'রে নেয়। কেমন যেন মুমূর্ষুর মত হয়ে থাকে গহরজান। শুধু কি গহরজান? আরও কত কে।

ঘরের মানুষ এতক্ষণে ঘরে ফিরেছে কিনা কে জানে। ক্ষণেকের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে গহরজান। দিনের আলোয় টায়রাটা দেখবার লোভ জাগে। কিন্তু মাসী যে কোথায় রেখে গেছে কে জানবে! হয়তো নগদ দামে বিক্রী করতে গেছে। শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায় গহরজানের।

দিনের আলো ফুটতে পুকুরে গিয়ে অবগাহন স্নান করেছিল রাজেশ্বরী। কতবার জলে ডুব দিয়ে ভেবেছিল আর উঠবে না। ডুবে মরবে, অতল জলে ডুবে যাবে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে আর···। কিন্তু একটা হাত যে খোকন ধরেছিল কে এক দাসী।

আলুলায়িত ভিজে চুলের রাশি পিঠের 'পরে। সুগন্ধি তেলের গন্ধ ভুরভুর করছে। সিঁথিতে টাটকা সিঁদুরের রেখা। কপালে টিপ। ভুঁতে

রঙের একটা আটপৌরে সাড়ী প'রে ঘরের মেঝেয় বসেছিল রাজেশ্বরী। চোখে শূন্য দৃষ্টি, চেয়েছিল কোন্ দিকে কে জানে। সূর্য্যমুখীর মত হয়তো ঐ অস্পষ্ট সূর্য্যের দিকে চেয়েছিল। কি ভাবছিল কে জানে! হয়তো মনে মনে হরিনাম জপছিল।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ফিরিয়ে সহস্র হরিনাম জপতে শিখিয়েছিলেন রাজেশ্বরীর বৃদ্ধা পিতামহী। রাজেশ্বরীর কত আদরের ঠাগ্‌মা।

ঘরের কোলের দালানে ছিল এলোকেশী।

ঠোঁটের ফাঁকে গুল না দোকতা টিপছিল। রাজেশ্বরী হঠাৎ ডাক দেয়। বলে,—এলো, ও এলো। এলোকেশী আছিস?

মুখে একমুখ গুলের পিক। ডাক শুনেই সাড়া দিতে পারে না। ধড়মড়িয়ে উঠে গিয়ে পিক ফেলে আসে। বলে,—কি বল'।

—কোথায় কে গুলী ছুঁড়ছে বল্ তো? রাজেশ্বরী শুধোয় আয়ত আঁখিযুগলে বিস্ময় জাগিয়ে।

—গুলী কোথায় ছুঁড়তে শুনলি? বললে এলোকেশী। কথায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে।

—ঐ তো শব্দ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছো না? তুমি যে কালা হয়ে গেছো। রাজেশ্বরী সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে।

—খানিক আগে তো মেঘ্ ডাকছিল ঘুমঘুমিয়ে। কৈ, এ্যাখন তো কোন' শব্দই শুনছি না বাছা। কে জানে বাবা, হয়তো কালাই হয়েছি! শেষের কথাগুলো আপন মনেই ব'লে যায় এলোকেশী।

রাজেশ্বরীর চোখে শূন্য দৃষ্টি। মুখে হতাশ-চিহ্ন। তুঁতে রঙের একটা আটপৌরে সাড়ী প'রে ঘরের মেঝেয় ব'সে থাকে। হয়তো পুনরায় হরিনাম জপতে থাকে।

সেই ফটকের কাছে ঘড়ি-ঘর। ঘণ্টা পড়ে ঢঙ ঢঙ। বেলা এখন

কত কে জানে! হয়তো রাস্তাটা-ঘাটটা। আকাশে অস্পষ্ট সূর্য্য। ঘষা-কাচের থালা যেন একটা।

মৃদু মৃদু হাওয়া চলেছে। ফুরফুরে বাতাস শরৎ-দিনের। শিউলীর গন্ধবাহী। প্রজাপতি উড়ছে ডানা মেলে। নক্সা-কাটা ডানা। পূজো-পূজো হাওয়া বইছে যেন।

পূজোর মরশুমে ময়রার দোকানে তুপ্‌সো মণ্ডা বা আগাতোলা মিষ্টান্নের বায়না দেওয়া হচ্ছে। পাঁটার রেজিমেন্ট-কে-রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড করতে লেগে গেছে। ঢুলী, ঢাকী ও বাজন্দারদের ভিড়ে পথ চলা দায় হচ্ছে।

ক্যালকেশিয়ান বাবুদের কোন কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্ছে; কোথাও তাস, দাবা আর পাশা পড়েছে। আতরের উমেদারদের শিশি হাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। মা না কি পিত্রালয়ে আসছেন ক'দিনের জন্য। গজে না নৌকায় আসছেন কে জানে!

হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল বিনোদা। হাঁফাতে-হাঁফাতে। ঘরে ঢুকে ইদিক-সিদিক দেখলো বার কয়েক। রাজেশ্বরীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে ফিসফিস শব্দে বললে,—বৌঠান, ফিরেছেন হুজুর।

কথা ক'টা শুনে রাজেশ্বরীর মলিন ও আয়ত আঁখিদ্বয় সামান্য বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। শুনলো, তবুও মুখ থেকে বিষাদের ছায়া মুছলো না। চোখ দু'টো জলসিক্ত মনে হয়। বিনোদা হয়তো ভেবেছিল রাজেশ্বরী খুশী হবে, হাসবে। কিন্তু ক্ষণেক আগেও আকাশের মত রাজেশ্বরীও কেঁদেছে। ঝর-ঝর জলের ধারা নেমেছিল চোখ থেকে।

কিন্তু কে বন্দুক ছুঁড়ছে! এত ঘন ঘন আওয়াজ?

চমকে চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। তাকায় জানলার বাইরে। ইতি-উতি তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করে, শব্দটা কোথা থেকে আসছে। বিনোদার কথাগুলো শুনে মনে মনে প্রস্তুত হয় রাজেশ্বরী। কখন হঠাৎ দেখা পাওয়া যাবে কে জানে?

যে কখনও মদের বুদ্‌বুদ্‌ দেখলো না, তাকে খাওয়ানো হয়েছে চোলাই-করা দেশী মদ, যার গন্ধে নেশা হয়ে যায়। জল নয়, সোডা নয়, লেবু নয়, শুধু খাঁটি দেশী মদ কয়েক পাত্র। দেশী কোহলের প্রতিক্রিয়া হয়তো দেরীতে হ'লেছে।

গাড়ী থেকে নেমে ট'লতে ট'লতে কোনক্রমে বৈঠকখানায় গিয়ে ফরাসে গড়িয়ে প'ড়েছে কৃষ্ণকিশোর। ঘুমে অচেতন হয়ে প'ড়েছে। পোষাক গেছে লাট হয়ে, মাথার চুল আলুথালু। অনন্তরাম কখন গিয়ে হলের জানলা ক'টা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। সূর্য্যালোকে যদি ঘুম ভেঙে যায়। অনন্তরাম জেনেছিল হয়তো। ভেবেছিল, ঘুমোক্‌। ঘুমে যদি নেশাটা কেটে যায়।

ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে তখন, বেলোয়ারি কাচের ঝাড়টা দুলছিল মন্থর গতিতে। ঠুং-ঠাং শব্দ উঠ্‌ছিল।

জানলা বন্ধ করতে করতে কাকে দেখলো অনন্তরাম। অস্ফুটে ব'লে ফেললে,—কর্ত্তাদাদু, তুমি?

কৃষ্ণকান্তর পিতামহ, যিনি ছিলেন ঘোর শাক্ত। শোনা যায়, কালীর সঙ্গে কথা বলতেন। অমাবস্যার রাত্রে মোষ কাটতেন, বলি দিতেন কালীর পায়ে। রক্ত-চেলী পরিধান করতেন, গায়ে রক্ত-চন্দন মাখতেন। [illegible] রক্ত-জবা। শোনা যায়, কলকাতার সিদ্ধেশ্বরী না ঠনঠনেতে গভীর রাত্রে কি জন্ত দু'-চার মানুষও বলি দিয়েছেন কর্ত্তাদাদু।

একটা দমকা হাওয়ার বেগে সম্বিৎ ফিরে পায় অনন্তরাম। কর্ত্তাদাদুর তৈলচিত্র টাঙানো ছিল ঘরের এক দেওয়ালে। অনন্তরাম দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দেখে আর জানলা বন্ধ করে।

মুখে বিষাদের ছায়া। চুপচাপ ব'সে থাকে রাজেশ্বরী হতাশ দৃষ্টিতে দরজায় চোখ রেখে। কখন হঠাৎ দেখা পাওয়া যাবে কে জানে। প্রতি

প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে রাজেশ্বরী। অপেক্ষা করে কাহিল ক্লান্ত হয়ে। আর হরিনাম জপ করে। কিছু যেন জানতে ইচ্ছা হয় না রাজেশ্বরীর। সন্তবিবাহিত হয়ে শ্বশুরালয়ে একা-একা শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করেছে; গত বৈকাল থেকে দেখতে পায়নি স্বামীর মুখ—তবুও ব্যস্ত হয় না বিন্দুমাত্র। জানতে চায় না কোথায় কাটলো রাত; কেন বাড়ী ফিরলো না। যেন হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে রাজেশ্বরী। বাড়ী ফিরেছে শুনেছে, বিষণ্ণ প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। কখন হঠাৎ দেখা পাওয়া যাবে কে জানে। ,উপবাসক্লান্ত শরীর রাজেশ্বরীর, ক্ষুধার তীব্রতা যেন লোপ পেয়ে গেছে।

অনন্তরাম কিন্তু শুধু দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায় না।

ব্যগ্র কৌতূহলে আস্তাবলে গিয়ে উপস্থিত হয়। কোচম্যান আবদুল তখন সবে নমাজ শেষ ক'রে উঠে পেঁয়াজ সহযোগে মুড়ী খেতে বসেছিল। অনন্তরাম বললে,—বুঢ্ঢা, তুম্ কুছ্ কাম্‌কা নেহি।

আবদুল অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—কাহে? হাম কেয়া করবে?

অনন্তরাম বললো উবু হয়ে। বললে,—মিঞা, বিলকুল যে ব'য়ে যাবে! ছোঁড়া কাল গয়নাটা বেমালুম গাপ্পা ক'রে বাইজীকে দিয়ে দিয়েছে। নির্ঘাত, তুমি খোঁজ কর কেনে, ঠিক জানতে পারবে।

আবদুল কোন কথার জওয়াব দেয় না। পেঁয়াজ সহযোগে মুড়ী চিবিয়ে যায়। একটা ঘোড়া শুধু নাকে না মুখে শব্দ ক'রে আস্তাবলের স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে চায়। অনন্তরাম বললে,—মিঞা যে কথা কও না দেখি! আমি কি মন্দ কথা বলেছি?

আবদুল এক মুঠো মুড়ী মুরগীর ছানাদের দিকে ছুঁড়ে বললে,—আমার ঠিক বাত্ আছে। তবে ঘোড়া বদমাসী করলে, বজ্জাতী করলে, দু'ঘা জোর চাবুক কষে দিতে পারি আমি। ঘোড়ার মুনীব যদি বেআক্কেলী করে

আমি তো তাই নাচার। খামকা বরখাস্ত ক'রে দিলে বুড়াকে তুমি খাওয়াবে ?

অনন্তরাম কথায় সায় দিলে মাথা দুলিয়ে। অনন্যোপায় হয়ে চুপ ক'রে রইলো। অনন্তরামের বুকের পাঁজরাগুলোয় যেন ব্যথা ধ'রেছে। বুকে কেন যেন কষ্ট হচ্ছে। মনে যেন কঠিন দাগা পেয়েছে অনন্তরাম।

ঝ'ড়ো হাওয়ায় আবদুলের দাড়ির পককেশ উড়ছিল। আবদুলও যেন কথায় কথায় চলে গেছে অন্য কোথাও, অন্য জগতে। চোখে ফুটে উঠেছে নির্লিপ্ত দৃষ্টি। বললে,—বুড়াকে বসিয়ে খাওয়াতে পারো তো বল, দেখো আমি দু'দিনে সায়েস্তা ক'রে দিই। মাগীকে লোপাট ক'রে দিই দুনিয়া থেকে।

অনন্তরামের পেশীবহুল ও কষ্টির মত কালো দেহটা যেন ভেঙে পড়েছে ক'দিনেই। অনন্তরাম কথা বললে হতাশ হাসি হেসে। বললে,—মিঞা, মাগীকে লোপাট ক'রলে দুনিয়ায় আর একটা মাগীও কি মিলবে না ? রূপেয়া ফেললে, জড়োয়া গয়না ফেললে, তুমি বল' না কাকে তোমার চাই ?

—সামনেওয়ালা ভাগো!

ফটকে ঢন ঢন ঘণ্টাধ্বনি হয়। একটা সুবৃহৎ ফীটন ফটকের মুখে লেগেছে না ? গাড়ীটার চকচকে পালিশ, ওয়াইন রঙের ফীটন গাড়ী। চালকদের মস্তকে উষ্ণীষ উড্ডীন।

অনন্তরাম বললে,—পিসীমার গাড়ী না ?

আবদুল এক লহমায় দেখে নিয়ে বলে,—হাঁ, পিসীমার ফীটনই বটে।

ফীটন গৃহাভ্যন্তরে পৌছলে গাড়ী থেকে পিসীমা নামলেন না, নামলো জহর আর পান্না। সঙ্গে আরও কত কে। কাশ্মেনী পোষাকে আরও কত কে। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিধানে আরও কত কে। কাঁচির কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী আর পাম্প্ আর লপেটা জুতোর

ভিড় দেখা যায়। বাবুরা বাগান-বাড়ীতে ফয়রা দিতে গিয়েছিলেন। কি জন্তে আগমন কে জানে! জহর আর পান্নার সঙ্গে এসেছে একদল ইয়ার-বন্ধু। মাথায় পাতা-কাটা সিঁথি; গলায় রঙীন আলপাকার রুমাল; চোখে কাজল; কোঁচানো কাঁচির ধুতি লুটোচ্ছে—যেন লক্কা পায়রা ব'লে ভ্রম হয়।

অনন্তরাম বললে,—কৌজ সঙ্গে এনেছে। মাটি করেছে দেখছি!

বেশী দূর যেতে হয় না, বৈঠকখানায় ঢুকেই গৃহের অধিপতিকে দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো জহর আর পান্না। উল্লসিত হ'লে যেমন চীৎকার করে। বললে,—হুর্‌রে, হুর্‌রে, হুর্‌রে!

ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। অবাক চোখে চেয়ে থাকে। জহর চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে সম্পর্কের ভাইকে স্রেফ একটা চুমু খেয়ে বলে,—ভায়া, তোমাদের বাজনার ঘরটা খোলাও মাইরী। আচ্ছা আচ্ছা বাজিয়ে এনেছি, শুনে তাক্ লেগে যাবে!

তৎক্ষণাৎ হুজুর তলব করেন,—কে আছিস? কে কোথায় আছিস?

মুহূর্ত্তের মধ্যে খানসামা হাজির হয়। সেলাম ঠুকে বলে,—জী হুজুর।

হুজুর হুকুম করেন, রাজা-ঘরকা চাবি লে আও।

হয়তো দলে ছিল গুণী কেউ-কেউ। গাইয়ে-বাজিয়ে।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বড়ো হাওয়ার সকল ছন্দ মুখর হয়ে ওঠে। কোন্ বাজনায় ঘা পড়ে কে জানে। তত, শুষির আনদ্ধ না ঘন? কনসার্ট বাজে হয়তো। নয়তো, হয়তো শুধুই অর্গ্যান।

—বৌ আছো?

—কে, অনন্তরাম ? চমকে ওঠে যেন রাজেশ্বরী।

—হ্যাঁ বৌমা।

রাজেশ্বরী যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে নেয়। অনন্তরাম ডাকছে শুনে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে,—কি বলছো ?

অনন্তরাম দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বলে,—পিসীর ছেলে দু'টি দলবল এনে বাজনার ঘর খুলে ব'সেছে। হুজুর হুকুম করলেন, জনা বারো-তেরোর মত জল-খাবার পাঠাতে। কাকে বলবো, তাই তোমাকে বলতে এসেছি! গোলাপজল চাইছে, পানও চাইছে।

ব'সেছিল, উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—আমি যাচ্ছি। সত্যস্নাত এলায়িত কেশ তুলে উঠলো। রাজেশ্বরী সিঁড়ির দিকে এগোয়। পায়ে অলক্তকের লালিমা,—শব্দহীন, ধীর পদক্ষেপে রান্নাবাড়ীর দিকে চলে রাজেশ্বরী। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, ধীরে ধীরে যেতে থাকে। যেতে যেতে মাথায় গুণ্ঠন টেনে দেয় কখন। তবুও ঢাকা পড়ে না ঘন কেশজাল।

তুঁতে রঙের শাড়ী সিঁড়ির পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সদরে তখন বাজনার সঙ্গে তবলা চলেছে। এস্রাজের সঙ্গে মিষ্ট-মধুর বাঁশী। বাইরে তখন আকাশ থেকে ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়ে আবার। স্বচ্ছ হয়েছে আকাশ। পেঁজা তুলার মত ছিন্ন-ছিন্ন শুভ্র মেঘ এখানে-সেখানে। শরতের আকাশ!

ঘড়ি-ঘরে ঘন্টা পড়তে থাকে ঢং-ঢং। বোধ হয় আটটা-ন'টা বাজে।

সম্পর্কের ভাইকে পাশে নিয়ে বসে জহর আর পান্না। মজলিসী আড্ডা জমে যায় যেন। জহর শুধোয় কানে-কানে,—এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম কেন? বৌটি কোথায়? রাতে ঘুমোতে দেয়নি তো?

বৌ। রাজেশ্বরী।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, ঘরে বৌ আছে। কি করছে এখন কে জানে? ক্ষণেকের জন্ত বৌয়ের প্রতি মনে যেন করুণার উদ্রেক হয়। কতক্ষণ দেখা পাওয়া যায়নি রাজেশ্বরীর। হয়তো কত ব্যস্ত হয়ে আছে। হয়তো অভিমান ক'রে আছে। কাল থেকে হয়তো আছে অনাহারে। গান-বাজনা মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্রুতিকটু লাগে কানে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বৌ এখানেই আছে। ঘুমোতে দেয়নি নয়, ঘুমটা ভাল হয়নি।

ঠাট্টার হাসি হেসে জহর বললে,—কেন, চোখে বুঝি তেল-হাত বুলিয়ে দিয়েছিল? যা, যা, মুখ-হাত ধুয়ে শীগ্গির আয়!

—না না। কি জানি কেন ঘুম হয়নি। কৃষ্ণকিশোর লজ্জিত হয়ে বলে।

ঘুম না হওয়ার কারণটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন।

গহরজানের ঘরে রাত্রি যাপনের মধু-মুহূর্ত্ত। টাকা লাভ ক'রে কত খুশীভরা হাসি হেসেছিল গহরজান। ব'লেছিল কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা। গহরজানের রূপপ্রভা—দেখতে দেখতে যেন দগ্ধ হয়ে যেতে হয়! গহরজান, গহরজান, গহরজান—মনটা যেন জুড়ে আছে গহরজান!

কিন্তু গহরজানের ঘরে তখন অন্ত মানুষ।

একশো টাকার নোট হাতে পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে অচেনা একজন লোককে ঘরে বসিয়েছে গহরজান। লোকটি বিচিত্র, টাকা দিয়ে ঘুমোতে এসেছে। শুধু খাবে আর ঘুমোবে, আর কিছু নয়। গহরজান দরজার শিকলি তুলে দিয়ে স্নান সেরে প্রাতরাশ করছিল ভালিমকে কোলে নিয়ে। তেলেভাজা খাচ্ছিল। আলুর চপ্, পেঁয়াজী আর বেগুনী। কিনে আনলে দু'-চার আনার এক ঠোঙা।

লোকটা ঘরে কি করছে কে জানে!

গহরজান আলুর চপে কামড় দিতে দিতে উৎসুক হয়ে ওঠে। লোকটি তখন উঠে ব'সে আছে। ঝুলি খুলে ব'সে আছে। মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে সঙ্গোপনে পড়ছে একটা সুদীর্ঘ চিঠি।

……ধীরানন্দ, তুমি অবশ্যই জানিও, মাত্র কয়েক জনকে হত্যা করিয়া আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। দেশের প্রতিটি মানুষের মনে শৃঙ্খল-মোচনের সদিচ্ছা জাগরিত না হইলে মুষ্টিমেয় দেশনেতাদিগের দ্বারা কোন কিছুই সম্ভব হইবে না। ধীরানন্দ, তুমি তোমার সঙ্গীদিগকে আমার বক্তব্য জ্ঞাত করিও। তাহারা যাহাতে গ্রামে গ্রামান্তরে যাইয়া…

বাইরে তখন আকাশ থেকে ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়ছে। ক্ষীণ সূর্য্যালোকে যেন অসংখ্য কাচকাটি চিক-চিক করছে। পেঁজা তুলার মত ছিন্ন-ছিন্ন শুভ্র মেঘ থমকে আছে আকাশে। ব'ড়ো হাওয়ায় শিউলীর মধুগন্ধ। পূজোর মরশুম লেগেছে শহর কলকাতায়। কত দেরী আর দুর্গা-পূজার?

হয়তো এঁটেল মাটি চেপেছে খড়ের প্রতিমায়। মূর্ত্তিগঠনের প্রথম পালা চলেছে ঘরে-ঘরে। প্রতিমার ডাকের সাজ সাজিয়ে দোকান খুলে ব'সেছে দোকানী। বেশ্যার দুয়োরে ধর্ণা দিয়েছে কুমোর। প্রতিমা নির্ম্মাণ হবে, মাটি চাই। গণিকালয়ের মাটি।

ঘেমে উঠেছিল রাজেশ্বরী।

ভাঁড়ার ঘর। দু'-মানুষ উঁচুতে জানলা। যেন গারদ-ঘর। জেলের সেল। হাওয়া ঢোকে না। কড়িকাঠের শিকেগুলো স্থির অচঞ্চল হয়ে থাকে। নর্দমার মুখে থান ইট। পোকা-মাকড় যাতে না ঢুকতে পায়। মেয়েদের মহল, যে জন্য দু'মানুষ উঁচুতে জানলা। আলো আসে কি না আসে। ঘেমে উঠেছে রাজেশ্বরীর কপাল, জামার পিঠ ভিজে গেছে হয়তো। বদ্ধ ঘর, তবুও ঘরে আছে নানা ফলের।গন্ধ। পাকা ফলের সুগন্ধ। দড়িতে টাটকা কদলী, ঝুড়িতে আঙুর, আপেল, খেজুর। কাঁচা ডাব। আখ। ডেকোটায় আমসত্ব। হাঁড়িতে নাড়ু। শিকেয় লাউ-কুমড়ো। চীনা মাটির জারে বাদাম-পেস্তা। জালায় ঘি। বঁটিতে বসেছিল রাজেশ্বরী। শশা কাটছিল।

দাসী-মহলে চাঞ্চল্য পড়েছে। রুপোর গেলাস-রেকাব বেরিয়েছে। গোলাপপাশ বেরিয়েছে। পানের ডিবে। ফল আর মিষ্টি একেক রেকাবে। জলে ক্যাওড়া

—ক'জন আছে গানের ঘরে?

ঘোমটার ভেতর থেকে শুধোয় রাজেশ্বরী। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞেস করে।

হুজুর তাড়া দেওয়ায় অনন্তরাম জল-খাবারের কত দূর খোঁজ করতে আসে। বলে,—আছে জনা বারো-তেরো। এক দল হাকে বলে।

রুপোর ফুলকাটা রেকাবের সারি। ফল আর মিষ্টায় সাজায় ব্রাহ্মণী। উপকরণ জোগায়। পেস্তা কুচোয়। রেকাবীতে দেয় গোলাপী প্যাড়া, অমৃতি, জিলাপী, ক্ষীরের ছাঁচ। মিছরী-মাখন।

মোমের মত দু'টো হাত, চাঁপার কলির মত আঙুল। হাতে দু'-তিন প্যাটার্ণের চুড়ি। ভাঁড়ারে শব্দ শোনা যায় ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। বঁটিতে বসেছিল রাজেশ্বরী।

আখরোট কাঠের ট্রে বেরিয়েছে কয়েকটা।

অনন্তরাম ট্রে সাজায় রেকাবীতে। একটাতে জলের গেলাস। দাসীদের কে একজন ভিবে বসিয়ে দিয়ে যায়। পান-মশলা। সুর্ত্তি-জর্দ্দা।

অনন্তরাম বললে,—ভুলেই গিয়েছি বলতে। ভাবছি যে কি যেন বলি নাই! মনে প'ড়েছে—

রাজেশ্বরী ভাবে কিছু বুঝি ত্রুটি হয়েছে। ভুল হয়ে গেছে কিছু। ভয়ে ভয়ে বললে,—কি অনন্ত?

কাঁধের ফর্সা তোয়ালেটা প'ড়ে যায়-যায় হয়েছিল। তোয়ালেটা ঠিক করতে করতে বললে অনন্তরাম,—লবঙ্গ-আদা চেয়েছিল। বলতেই ভুলেছি। মনেই নাই।

ঝুড়ি থেকে আদা তুলে কুঁচোতে থাকে রাজেশ্বরী। বলে, ব্রাহ্মণীকে বলে,—দাসীকে লবঙ্গ দিতে বলুন।

অনন্তরাম বললে,—বৌ, দেখো তুমি, বলে যাচ্ছি আমি। পিসীর ছেলে দু'টি চট ক'রে উঠছে না।

রাজেশ্বরী ভাবলে, নাই বা উঠলো। ঘরে থেকে যদি দিন কাটে, ভালই তো। ক্ষণেকের জন্য। রাজেশ্বরী যেন ভাবতে চায় না কিছু। আর ভাববে না, যা ইচ্ছা হোক। আজকে যেন যখন-তখন বুকটা ছাৎ-ছাৎ করে! ঠাগ্‌মাকে মনে পড়ছে ঘন-ঘন। ঠাগ্‌মার বুক-ভরা ডাক শুনছে যেন কানে। দন্তহীন মাড়ি, ডাকছেন যেন অস্ফুট কথায়।

—তুমি খাও বৌ। না খেলে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণী ফিস-ফিস কথা কয়। কথা বলে কত যেন মহলাকাজ্জী। বলে,—মুখে কিছু দাও। কথা শোন ভালমানুষের মেয়ের মত।

রাজেশ্বরী ফ্যাল-ফ্যাল চেয়ে থাকে কাজল-কালো চোখে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন অনুমানে বোঝে ব্রাহ্মণী কি বলতে চায়। বলে,—না বামুনদিদি, আমি আগে নাট-মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

কথা শুনে খানিক থেমে থাকে ব্রাহ্মণী। ভেবে-চিন্তে বলে,—যেতে-আসতেই বেলা কাবার হয়ে যাবে যে বৌ! ও-বেলায় যেও বৌ। মুখে কিছু দাও এখন।

—তা হোক।

বললে রাজেশ্বরী। ভিজে হাত আঁচলে মুছতে মুছতে বললে মিনতির স্বরে,—তা হোক। আমি ঘুরে আসি।

—কি বলবো বলো! বললে ব্রাহ্মণী।

—বিনো, চলো তো আমার সঙ্গে। আমি নাট-মন্দিরে যাবো।

কথা বলতে বলতে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। ভিজে চুলের খোঁপা ছিল মাথায়। খোঁপাটা খুলে দেয়। কেশের রাশি লুটিয়ে পড়ে পিঠে। কণ্ঠে আঁচল বেষ্টন করে ভক্তিভাবে। বলে,—বামুনদি, যদি আর কিছু চেয়ে পাঠায় তো দেবেন।

একটা চাপা কলরোল থেকে থেকে ভেসে আসে।

মঙ্গলগীতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সহাস্য উল্লাস। বর্ষাদিনের হিম-কণাবাহী হাওয়া বইছে এলোমেলো। সুরের ঝঙ্কার লেগে হয়তো মাতাল হয়েছে হাওয়া। শুভ্র প্রাতঃকালের আলোয় গাছে-গাছে ডাকছে পাখী। বুলবুলি আর শালিক। যতই হোক, বাদ্যরত মঙ্গলগীত শুনে মুগ্ধ হ'তে হয়। অর্গ্যান বেজে চলেছে না অন্য কিছু? হয়তো কেউ পিয়ানোফোর্টে বাজাচ্ছে। কে জানে!

দুঃসময়ে কানে যদি কেউ গান-বাজনা শোনায়, তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তবুও নাট-মন্দিরে যেতে যেতে বাজনা শুনে হতচকিতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। শিল্পীর ছেলেরা তবে নেহাৎ অকর্মা নয়, ভাবে

রাজেশ্বরী। কার ভেতর কি আছে কে বলতে পারে? পিসীমা, হেমনলিনী, শ্বশুরদের একমাত্র ভগিনী, তিনিও যে সঙ্গীতরসিক। এখনও ধ'রে বসলে রবিবাবুর গান গাইতে তিনি লজ্জাবোধ করেন না। এখনও সুর আর স্বরলিপি খুলে গান তুলতে দেখা যায়।

প্রণাম-শেষে চলে আসছিল রাজেশ্বরী।

পূজায় রত ব্রাহ্মণ অপরাজিতা পুষ্পে শালগ্রামশিলা স্পর্শ করে। বলে, —মা লক্ষী, চরণের ফুল নিয়ে যাও।

রাজেশ্বরী হাত মেলে। চাঁপার কলির মত আঙুল। যেন অলক্তক মেখেছে করতলে। দু'-আঙুলে দু'টি আঙটি। একটা চুনীর, আরেকটা পলকি হীরের।

পুরোহিত ছিলেন নাট-মন্দিরেই, কোন থামের আড়ালে। গলকম্বল দোলাতে দোলাতে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে। বিড়-বিড় করছেন, —ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ—

পুষ্প আর ধূপ। চন্দন আর অগুরুর সুগন্ধি। গন্ধতৈল।

নাট-মন্দিরে পবিত্র হাওয়া। পবিত্র গন্ধে ভ'রে আছে নাট-মন্দির। বেদীর অন্য পাশে একজন ব্রাহ্মণ। বেদ না উপনিষদ পাঠ করছেন। নয় তো চণ্ডীপাঠ করছেন। চড়াইয়ের ঝাঁক মন্দিরের দালানে। আতপ তণ্ডুল চয়ন করছে।

—বধূমাতা!

পুরোহিত বললেন কম্পিতকণ্ঠে। করে উপবীত ধারণ ক'রে। বললেন, —কিঞ্চিৎ সময় আমি অপব্যয় করাতে চাই। কিছু বক্তব্য ছিল।

ফ্যাল-ফ্যাল চোখ তুলে তাকায় রাজেশ্বরী। চেয়ে থাকে সরল দৃষ্টিতে। চোখের মণিতে আকাশের ছায়া দেখা যায়। অপরাজিতা পুষ্প হাতে পিষ্ট হ'তে থাকে।

পুরোহিত বললেন,—শশীবৌমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তো?

রাজেশ্বরী বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি তো প্রায়ই—

—হ্যাঁ, আমি জানি। বললেন পুরোহিত। কেন কে জানে সামান্য হাসি ফুটে ওঠে ওষ্ঠপ্রান্তে। বলেন,—শশীবৌ ডেকে পাঠিয়েছিলেন কাল। অনেকক্ষণ যাবৎ বাক্য-বিনিময় হয়। কথা বলতে-বলতে শালগ্রামশিলার বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। মুখে সেই মৃদু হাসি। বলেন,—এখন যদি গৃহস্থকর্ম থাকে অন্য সময়ে—

রাজেশ্বরীর সঙ্গে ছিল বিনোদা। বললে,—কচি বৌ, এখনও মুখে কিছু প'ড়লো না। কথা তো পালাচ্ছে না। ডাকলেই বৌ আসবে। চল' বৌ চল'। কথা পালাচ্ছে না।

পূর্ণশশীকে ক'দিন দেখেছে রাজেশ্বরী যে কথা বলবে। রাজেশ্বরী কি জানে। পুরোহিত বললেন,—যথার্থ কথা।

রাজেশ্বরী চললো ক্লান্তপদে। গৃহাভিমুখে চললো।

বিনোদা পেছন-পেছন যায়। বলতে-বলতে যায়,—ঢের দেখেছি আমি। সত্যনারায়ণের পাঁচালী মুখস্থ নেই, পুরোহিত হয়েছে!

বর্ষা-মুখর সকাল। শীত পড়ো-পড়ো হয়েছে। গাছে-গাছে শালিক আর বুলবুলি নাচানাচি করছে। একেক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে থেকে-থেকে। হাওয়ায় শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে।

আঃ। ভাঁড়ারের গুমোট থেকে বেরিয়ে ঘর্মাক্ত কপালে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু রাজেশ্বরীর মাথায় গুণ্ঠন।

অদূরে কাছারীর দালানে জটলা পাকিয়ে বসেছিল মনোহরপুরের এক দল মানুষ। রৌদ্রদগ্ধ রঙ; চোখে-মুখে গ্রাম্য দৃষ্টি। চাষ করে, মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে লাঙল চালায় মাঠে। মাটিকে হয়তো চেনে, মানুষকে চেনে না। কাছারীর দালানে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল প্রজাগণ। কুলবধূকে দেখছিল। দেখছিল কি সুলক্ষণা দেহাকৃতি! কত বিনম্র যেন বধূটি। কত কচি।

রাজেশ্বরীর তখন চোখ ফেটে প্রায় জল নেমেছে।

পিত্রালয়ের জন্ত মনটা অধীর হয়ে উঠেছে যখন-তখন। ঠাগ্‌মাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্রত্যেকটা ঘর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে-ঘর দেখে এসেছে রাজেশ্বরী। ডাকছে যেন রাজেশ্বরীকে। ঠাকুমার আদো-আদো ডাক কানে ভাসছে যেন। পূজা আসছে, কত আমোদ-আহ্লাদ করতো ঠাগ্‌মা। জল নামে রাজেশ্বরীর চোখে।

তুঁতে রঙের আটপৌরে শাড়ী-পরিহিতা ঐ যে যাচ্ছে—মনোহরপুরের প্রজাগণ লক্ষ্য ক'রে দেখে জমিদার-বধূকে। শুদ্ধ-বিস্ময়ে দেখে। কাছারীর দালানে চ্যাটাই বিছিয়ে বসেছে খাজাঞ্চী। মনোহরপুরের মানুষদের নাম ধাম গোত্র লিখছে। খাজনার টাকা জমা করছে। খাজাঞ্চীর চোখে চশমা রূপোর ফ্রেমের, কানে কলম। টাকা বাজিয়ে দেখে নেয় খাজাঞ্চী। দলের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে। বলে,—কি দেখছো কি, অন্নদা? বৌ যা হয়েছে, দেখবারই মত। যাকে বলে তোমার ডানাকাটা পরী।

দলের প্রতিনিধি অন্নদা, কথা শুনে লজ্জা পায়। বোকা-হাসি হাসে। বলে,—হবেই তো মশাই। হবেই তো।

খাজাঞ্চী বললে,—হবে তো বটে, এখন কি খাওয়া হবে বলো। প্রাতর্ভোজন্ কি করবে বলো?

অন্নদা যেন বিনয়ে কেমন হয়ে যায়। বলে,—দু'টি ক'রে মুড়ী দিবে খান না মশাই!

খাজাঞ্চী বলে,—তোমরা দেখছি নেহাতই গেঁয়োভূত! এয়েছো জমিদার-বাড়ী, খেয়ে যাও মনের সুখে। মুড়ী খাবে কি বলছো অন্নদা! ওরে, কে কোথায় গেলি! গোমস্তকে বলে আয় প্রজাদের খাবার দেবে। জল-খাবার দেবে।

পিয়ানোফোন বেজে চ'লেছে না কি! অন্দরে গিয়েও শুনতে পায় রাজেশ্বরী। যন্ত্রসঙ্গীত শুনতে পায়। পিসীর ছেলেদের দলে হয়তো কেউ

আছে কেউ-কেউ। গাইয়ে-বাজিয়ে। ভেতরে পৌঁছুতেই হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হয় অনন্তরাম। বলে,—বৌদিদি, একটা হুকুম ক'রে দাও।

—অনন্ত, কি বলছো বল'। বললে রাজেশ্বরী। বললে ভয়ে-ভয়ে। কোন ত্রুটি হয়ে থাকে যদি।

—বৌদিদি, হুকুম দাও প্রজাদের জল-খাবার দেবে। বেচারীদের খেতে-দেতে দাও বৌদিদি, নাম করবে। আশীর্ব্বাদ করবে। অনন্তরাম কথাগুলি একদমে ব'লে যায়।

রাজেশ্বরী বললে স্তিমিত কণ্ঠে,—অনন্ত, ঠিক হয়েছিলো তো?

জয়ের হাসি হাসলে অনন্তরাম। বললে হাসতে-হাসতে,—পড়তে পেয়েছে কিছু কি বৌদিদি? একটা কেউ কিছু ফেললে না!

—অনন্ত,—কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজেশ্বরী। জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করে। বলে,—অনন্ত,—

দুঃখের হাসি হাসে অনন্তরাম। তাকে সাড়া দেয় না। শব্দহীন হাসি-মাখানো মুখ। কয়েক মুহূর্ত্ত যেতে না যেতেই বললে,—বুঝতে কি আর বাকী আছে বৌদিদি। যা বলতে চাইছো বল' না।

বিনোদা খেঁকিয়ে উঠলো যেন হঠাৎ। ছিল রাজেশ্বরীর পেছনে। বললে,—তুমিই বা কেমন ধারার মানুষ অনন্ত? বলেই দাও না, যা জানতে চায়।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, হুজুরের খাওয়া হয়েছে। খেয়েছে মুখ্যুটা। সদরে মুখ-হাত ধুয়েছে, ধুয়ে খেয়েছে। তুমি ভেবো না বৌদিদি।

মনের কথার উত্তর পায় রাজেশ্বরী।

যা জানতে চায়, জানিয়ে দেয় অনন্তরাম। তবুও মন থেকে কৈ খুশী হয় না তো রাজেশ্বরী। হাসে না, কথাও বলে না। কাজল-কালো চোখ তুলে দেখে শুধু। ক্লান্ত দেহ, রাজেশ্বরী ভাবছিল ঘরে গিয়ে শুয়ে প'ড়বে। ভাবতে ভাবতে এগোয় রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম ডাকে পেছন থেকে। বলে,—চললে যে বৌদিদি!

রাজেশ্বরী ঘুরে দাঁড়ায়। ক্ষণেকের জন্যে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অনন্তরাম। হঠাৎ যেন দেখতে পায় রাজেশ্বরীর রূপৈশ্বর্য্য। কুমোরটুলী থেকে গড়ানো নয় তো? অনন্তরাম ক্ষণেকের জন্য জ্ঞান হারিয়ে দেখে রাজেশ্বরীর কত রঙ। কত অপরূপ মুখাকৃতি। কত লাবণ্য দেহে।

রাজেশ্বরী বললে,—আমি কি বলবো? বিনোদা বল', কি দেবে প্রজাদের?

বিনোদা মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। বললে,—তিলের নাড়ু আছে ঘরে, মোয়া আছে। খাগ্ না কত খাবে। তুমি চল' বৌ। আর দেরী করলে—

রাজেশ্বরী চলে। যন্ত্রের মত চলে।

বিনোদা আগে আগে যায়, রাজেশ্বরী যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

অনন্তরাম শুধু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ক্ষণেকের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে দেখে রাজেশ্বরীর রূপৈশ্বর্য্য। বিমুগ্ধের মত দেখে। টম কুকুরকে হঠাৎ পায়ের কাছে দেখে চমকে ওঠে অনন্তরাম। তুঁতে রঙের শাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায়। টমকে পুতুলের মত বুকে তুলে নেয় অনন্তরাম। বলে, —হুজুরকে না দেখে তুমি ব্যাটা পর্য্যন্ত কেমন হয়ে গেছো দেখছি!

ভাষা নেই, টম নির্ব্বাক্ হয়ে থাকে। প্রজাদের কথা মনে প'ড়ে যায় অনন্তরামের। টমকে ছেড়ে দিয়ে ভাঁড়ারের দিকে যায়। ভাঁড়ার থেকে কাছারীতে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে তিলের নাড়ু আর মোয়া। প্রজাদের প্রাতর্ভোজন।

দাসীদের কে একজন। অনন্তরামকে খুঁজতেই হয়তো আসছিল। ঘোমটার ভেতর থেকে বললে দাসী,—বৌদিদি বললেন অনন্ত, তোমাকে দাদাবাবু ডাকলেই যেন পায়। তুমি গানের ঘরের কাছেই থেকো।

—যথা আজ্ঞা। বললে অনন্তরাম। যেতে যেতে বললে,—তোমাদের বৌদিদি খেলে কিছু?

দাসী বললে,—বৌদিদি খেতে বসলো এ্যাতক্ষণে। তোমাকে দাদাবাবু ডাকলেই যেন পায়।

গানের ঘরে তখন হুল্লোড় চ'লেছে।

জহর আর পান্নাদের সঙ্গে হয়তো গুণী আছে কেউ-কেউ। গাইয়ে-বাজিয়ে। নয় তো এই মধুর বাদ্যযন্ত্র কে বাজাবে? হাওয়ায় সুরের দোলা লাগবে কেন? মার্গ-সঙ্গীতের সুর।

কেউ গায়, কেউ বাজায়।

কেউ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধা-শোয়া হয়ে থাকে। গান-বাজনা শোনে চক্ষু মুদিত ক'রে। তারিফ করে। বলে,—বাহবা, বাহবা!

কখনও খাম্বাজ, কখনও বাহার; কখনও পিলু বারোয়াঁ, কখনও ছায়ানট এবং কখনও ইমন চলতে থাকে। শ্রোতৃবর্গের আশা যেন মিটতে চায় না। একটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ধরা হয়।

অনেক, অনেক দিন বাদে কৃষ্ণকান্তর যন্ত্র-মন্দির বাড়ীতে যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মূক যন্ত্র ভাষা খুঁজে পায় যেন।

কৃষ্ণকিশোর বললে চুপি-চুপি জহরের কানে,—আসছি আমি। দেখি তোদের খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে।

জহর তাকিয়া ছেড়ে বসলো। বললে,—ঝুটা কথা কেন? বল্ না যাচ্ছি বৌ দেখতে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ব'লে না দিলে পাওয়া হবে না তোদের।

জহর বললে,—ডিমের খিচুড়ী করতে বল্।

পান্না বললে,—বাটা মাছ ভাজতে বল্। বেশ ডিমেল বাটা মাছ হওয়া চাই।

জহর বললে,—আমার শুধু খিচুড়ী হ'লেই চলবে।

শুধু খিচুড়ী হ'লেই যদি চ'লতো ভাবনা ছিল না। বাটা মাছ পাওয়া যায় কোথায়। ডিমেল বাটা মাছ। কুমু থাকলে ভাবতে হ'ত? মা কুমুদিনী থাকলে? কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গায়ক গান থামায় না, বাজকার বাজিয়ে চলে।

বর্ষা-দিনের হাওয়া আসে ঘরে। হাওয়ায় যেন শীতের আমেজ। কড়িতে সাদা বেলজিয়াম কাচের ঝুলন্ত আলো। আলোর ঝাড় একটা। একশো আলোর ঝাড়। একশো বাতির। মাঝে মাঝে হাওয়ার বেগে ঝনন্-ঝনন্ শব্দ হয়। পলা-তোলা কাচের টুকরো ঠোকাঠুকি হয়। ঠুং-ঠাং শব্দ মিলিয়ে যায় গান-বাজনার শব্দে। আলোর ঝাড়টা তবুও দুলছিল। লক্ষ লক্ষ হীরা মাণিক জ্বলছিল যেন।

গাছে গাছে ডাকছিল শালিক আর বুলবুলি।

কাছারীর দালানে খাজাঞ্চী খাতায় লিখছিল নাম ধাম গোত্র। জমির মাপ। খাজনার নিরিখ। লিখছিল, মৌজা মনোহরপুর—

রাজেশ্বরী ছিল ভাঁড়ারের সামনের দালানে।

পিঁড়েয় বসেছিল। দাসীদের কে একজন হাতপাখা চালাচ্ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। বৌ যে ঘামছে! কুল-কুল ক'রে ঘামছে। ভিজে গেছে রাজেশ্বরীর জামার বুক-পিঠ। হাতের তালু।

বাম্‌নী দূরে ছিল। ধুচুনীতে চাল ধুচ্ছিল।

প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো এলোকেশী। রাজেশ্বরীর কাছে গিয়ে বললে, —রাজো, ঘরে খোয়ামী গেছে। যা না তুই।

বুকটা যেন ছাঁৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর।

হৃৎপিণ্ডের গতি কত হয় কে জানে! কথা শুনে বলে না কোন কথা। কাজল-কালো চোখ তুলে চেয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল। এলোকেশীর কথা কানে

শুধু বাজে না, বাজে যেন বুকের অন্তস্তলে। এলোকেশী বলে,—উঠলি না যে? ওঠ, ঘরে যা।

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লো যেন রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত পায়ে চললো। সিঁড়ির দিকে চললো। মুখে কোথায় হাসি ফুটবে, রাজেশ্বরীর মুখে যেন বর্ষার মেঘ নেমেছে। ভ্রূ দু'টো ধনুকের আকার হয়েছে।

ঘরে তখন চাবির আলমারীর চাবি খুলেছে কৃষ্ণকিশোর। কোথাকার চাবি চাই। সিন্দুকের চাবি। চাবির আলমারী উন্মুক্ত। ঘরে পা দিয়েই দেখতে পেয়েছে রাজেশ্বরী। মনে মনে বেশ বিস্মিত হয়। হয়তো চুড়ির ঝুন-ঝুন শব্দ শোনা যায়। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি তোমাকে ডাকছিলাম।

এলোকেশী ঘরের দরজার কপাট দু'টো ভেজিয়ে দেয় বাইরে থেকে। কাল থেকে দেখা নেই, ভাবে এলোকেশী। দেখুক, বৌটাকে দেখুক। দিনের আলোয় ভাল ক'রে দেখুক মেয়েটাকে। আহা কত রূপ মেয়েটার! চোখে পড়লো না। ভাবে এলোকেশী।

দরজা ভেজালে কি হবে, জানলা ক'টার পর্দা থাকলেও খোলা জানলা। ঘরে আলো যথেষ্ট। দেখে কৃষ্ণকিশোর। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখে মেয়েটাকে। কচি-কচি মুখ। মোমের মত গঠন। চোখে শিশুর দৃষ্টি। আর কাজল।

—সিন্দুকের চাবি চাই। বললে কৃষ্ণকিশোর।

পায়ের তলা কাঁপতে থাকে যেন। রাজেশ্বরী বলে,—চাবি তো আমি জানি না।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চাবি আমি পেয়েছি। তোমাকেও থাকতে হবে। সিন্দুক খুলবো।

কি উত্তর দেবে রাজেশ্বরী।

তবু ভাল, যা হবে, রাজেশ্বরীর চোখের সমুখে। রাজেশ্বরী তো আছেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কপালের ঘাম মোছে আঁচলে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় ছিলে তুমি? পিসীমার ছেলেদের দেখছি ওঠবার নাম নেই।

—ভাঁড়ারে ছিলাম। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—নাটমন্দিরে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণকিশোর আলমারীতে চাবি দিতে দিতে বললে,—ওদের খাওয়ার জোগাড় করতে হবে। ডিমের খিচুড়ী খেতে চাইছে, ডিমওলা বাটা মাছ খেতে চেয়েছে।

—বেশ। বললে রাজেশ্বরী।—আমি বলে আসি বামুনদিকে। অনন্তকে বাজারে পাঠানো হোক।

একটা চাবির গোছা, লক্ষ্য ক'রে দেখে রাজেশ্বরী। কৃষ্ণকিশোরের হাতে হয়তো সিন্দুকের চাবি। বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে রাজেশ্বরীর। সিন্দুকের চাবি কি হবে!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চল' আমার সঙ্গে যে-ঘরে সিন্দুক আছে।

সাহসে বুক বেঁধে শুধোয় রাজেশ্বরী,—সিন্দুক খুলে কি হবে? কেন খুলবে সিন্দুক? কাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি?

—চল' না দেখবে। বিশেষ দরকার আছে। বললে কৃষ্ণকিশোর। —গান শুনতে গিয়েছিলাম, শেষ হ'তে দেরী হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে থাকে হতাশ মনে। চোখে হতাশ দৃষ্টি ফুটিয়ে। গান শুনতে শুনতে দেরী হয়েছে। কে গান গাইলো। কোথায় গাইলো। কি গান?

গান নয়, কথা। গহরজানের কথা যদি এখন গান হয়।

গানের মতই কানে শোনায় গহরজানের কথা। মিঠি মিঠি কথা।

মুক্তো-ঝরা হাসি আর মিষ্টি মিষ্টি কথা। কিন্তু আরেক রাজেশ্বরী কোথা থেকে এলো? ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় রাজেশ্বরীর। আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে রাজেশ্বরী—যার রূপৈশ্বর্য্য ফিরেও দেখলো না কেউ। যার আরক্ত আঁখিযুগলের মূল্য দিলো না কেউ, যার শুভ্র রঙ শুধু নামেই।

সিন্দুকের চাবি কি হবে! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয় যেন। রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যে-ঘরে সিন্দুক আছে। সারি সারি লোহার সিন্দুক। ——না-হীরা-জহরৎ আছে। ঘড়া-ভর্ত্তি গিনি আর টাকা আছে। চাবিবন্ধ সিন্দুকে। বুকটা ধড়ফড় করে রাজেশ্বরীর। হৃৎপিণ্ডের গতি কত হয় কে জানে।

কৃষ্ণকিশোর ততক্ষণে খুলে ফেলেছে সিন্দুকের কুলুপ।

নীল আর বেগুনী রঙের ভেলভেটের বাক্স বেরিয়েছে কেন? ঐটা তো নেকলেসের বাক্স, ঐটায় আছে গলার কলার, ঐগুলোয় আছে চুড়ি। আর্মলেটের বাক্সটা কি খোলা? মন্দিরের চূড়ার মত বাক্সটায় নিশ্চয় মুকুট আছে।

একটার সাধ মিটতে না মিটতে আরেকটা সিন্দুক খোলার কি প্রয়োজন হচ্ছে! ঘড়া-ভর্ত্তি গিনি কোথায় আছে, খুঁজতে থাকে কৃষ্ণকিশোর। গয়নাগাটির দরকার নেই, ঘড়া-ভর্ত্তি গিনি চাই। বুকটা ধড়ফড় করে রাজেশ্বরীর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে খোলা সিন্দুকের সামনে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়।

বর্ষা-দিনের এলোমেলো হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। শীতল হাওয়ার স্পর্শে রাজেশ্বরীর ঘর্মাক্ত কপালটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু পায়ের তলার মাটি কাঁপছে যে! রাজেশ্বরীর মনে হয়, সে বুঝি প'ড়ে যাবে আচমকা। প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ক্লান্ত দেহটা থেকে থেকে এলিয়ে পড়তে চায়।

—কে তুমি খুঁজছ কোথায়? বললে রাজেশ্বরী।

[illegible] সিন্দুক হাতড়ায়। বলে,—কৈ, না তো। কোথায় শুনী?

—ঐ তো ঢুম-ঢুম শব্দ হচ্ছে। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—সিন্দুক খোলা হচ্ছে বাসি পোষাকে?

—তোমাকে খুব মানাবে।

হঠাৎ যেন কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। কি খুঁজে পেয়েছে কে জানে। বললে,—খুব মানাবে তোমাকে।

শুনে খুশী হ'ল না রাজেশ্বরী। বললে না[illegible] কথা। কৃষ্ণকিশোর একটা নীল [illegible] খোলা বাক্স তুলে ধ'রলো। রাজেশ্বরী হতাশ চোখ মেলে দেখলো। খোলা বাক্সতে দেখলো একটা টায়রা। কুচো হীরের টায়রা। শুধু হীরের টায়রা। আলোর স্বাদ পেয়ে ঝলমল করছে। দেখলে চোখ ঠিকরে যায়।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তোমার টায়রাটা হারিয়ে গেলো যে। এইটে রাখো তোমার কাছে।

রাজেশ্বরী মোমের মত হাত পেতে ধরলো বাক্সটা। [illegible]—সিন্দুকে যা-কিছু আছে আমারই তো। আমাকেই দিতে হচ্ছে?

হাসলো কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীর কথায়। হাসলো [illegible] হাসি। রাজেশ্বরী বললে,—চাবি দিচ্ছো যে? ঘড়াটা যে প'ড়ে রইলো।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঘড়াটা থাকবে। ঘড়াটা তোমার ঘরে যাবে।

—কেন? বললে রাজেশ্বরী।

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—টাকা চাই যে।

—কেন? বললে রাজেশ্বরী।

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—কি জানি কেন, কাছারী থেকে হাজার বারো টাকা চাইছে। বিশেষ প্রয়োজন।

—প্রজাদের টাকা পেয়েছো তো? মনোহরপুরের প্রজাদের টাকা। সাহসে বুক বেঁধে ভয়ে-ভয়ে বললে রাজেশ্বরী।

—তুমি জানলে কোত্থেকে? বললে কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতে বললে,—জমিদারীর কাজকর্ম তুমি যে জানো না। প্রজা যেমন আমাদের খাজনা দেয়, গভর্ণমেন্টকেও আমাদের খাজনা দিতে হয়। না দিলেই সূর্য্যাস্ত আইনে পড়তে হবে। জমিদারী বিকিয়ে যাবে। জমিদারীর কাজকর্ম তুমি যে জানো না। জানলে—

কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরীর কাছে এগিয়ে যায়। দু'বাহুতে জোরে জড়িয়ে ধরে রাজেশ্বরীকে। প্রথমে ছাড়াতে চেয়েছিল রাজেশ্বরী, কিন্তু মুক্তি পায় না। চোখ দু'টো মুদিত ক'রে থাকে। মুখের কাছে মুখ এগিয়ে ধরে কৃষ্ণকিশোর।

কিন্তু জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেয় রাজেশ্বরী। বলে,—ছিঃ, কে কোথায় দেখবে, ছাড়ো!

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ঘড়াটা থাক এখানে। ঘরটায় চাবি দিয়ে চাবিটা আঁচলে রাখো। আমি চাইলে দিও। আমি দেখি জহর পাবার দল কি করছে।

রঙ-মন্দিরে তখন গীত ও বাদ্য থেমে গেছে। হয়তো জিরোচ্ছে গাইয়ে-বাজিয়ে। তাকিয়ায় হেলে পড়েছে সকলে। এখন শুধু টুং-টাং শব্দ। একশো আলোর আলো। বেলোয়ারী কাচের ঝুলন্ত আলোটা হাওয়ার বেগে দুলছিল থেকে থেকে। ঝনন্-ঝনন্ শব্দে। লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলে পড়েছিল সকলে। বলাবলি করছিল যে, শুধু গান ভাল লাগে না। গানের সঙ্গে চাই সুধাপাত্র। নেশা না ক'রে রেওয়াজ হয়? শুধু গান ভাল লাগে না। গানের সঙ্গে চাই নাচ। নাচ-গান চাই। সুরা আর নারীর সঙ্গে চলবে গান। নাচ আর গান।

অন্দর থেকে সদরে যেতে যেতে কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, কতার কত

টাকা আছে। শুধু রুপোর টাকা আছে, না গিনি-মোহরও আছে। রূপালী টাকার সঙ্গে যেন সোনালী গিনিও আছে, দেখেছে কৃষ্ণকিশোর। অব্যবহারে শ্যাওলা ধরে গেছে। তবুও খাঁটি সোনা আর রুপো। গহরজান যদি পায়—

গহরজান যদি পায় তো বিয়ে দেয় ডালিমের। মনের সুখে।

আহা, সুখী হোক গহরজান। মুখে ফুটুক আনন্দের হাসি। ভারি মিষ্টি যেন গহরজানের হাসি, মধুমাখা কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণকিশোর দেখেছে গহরজানকে। কি মোহভরা রূপ! পোষাকের বন্ধন থেকে মুক্ত গহর-জানকেও দেখেছে। মদালস, রক্তচক্ষু, লজ্জাহীন ও বিবস্ত্র গহরজান। আকর্ষণে যেন দগ্ধ ক'রে দেয়।

অন্দর থেকে সদরে যেতে যেতে মানসলোকে উদিত হয় সেই রূপবতী। গহরজান, গহরজান, গহরজান।

—হুজুর, এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করছেন।

গমস্তাদের একজন বিনয় সহকারে বললে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে। সদরে পৌঁছতেই বললে।

—কে? কোথা থেকে আসছে?

—জানি না হুজুর। কখনও লোকটিকে দেখি নাই। বাঙলায় কথা বলছেন, অথচ হুজুর কোট-প্যান্টালুন পরে আছেন। লোকটি [illegible] বলেই মনে হয়।

গমস্তা কথা বলে যেন কত ভয়ে-ভয়ে। হাতে হাত কচলায়। মাটিতে চোখ রেখে কথা বলে। কানে খাগের কলম। চোখে চশমা।

—কে আবার এলো! বললে কৃষ্ণকিশোর। —[illegible] ডাকা হোক, আমি বৈঠকখানায় যাচ্ছি।

আকাশে মেঘ। ঘন কালো রাশি রাশি মেঘ। স্থির, অচঞ্চল মেঘ। শিরশিরে হাওয়া চলেছে থেকে থেকে। অদৃশ্য সূর্যের ক্ষীণ আলো।

গাছে গাছে শালিক আর বুলবুলি। ঘড়ি-ঘরে ঘড়ি বাজলো। ক'টা বাজলো?

—মর্ণিং, মর্ণিং। বলতে বলতে বৈঠকখানায় ঢুকলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় ছিল টুপী, খুলে ফেললেন। বললেন,—I suppose, আমাকে মনে আছে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। শ্রদ্ধা সহকারে কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাথা থেকে টুপী খুলতে চিনেছে কৃষ্ণকিশোর। হ্যাঁ, সেই ব্যক্তিই বটে। লোকটি বসলেন ভেলভেটের এক তীরে, ক্যারামে। বললেন,—পুলিশ তো জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাকে! আজকে search, কালকে জেরা, they are disturbing daily. তোমাকে বলতে এলাম—

কথা শেষ করেন না লোকটি। হাতে ছিল ধূমায়মান পাইপ। মুখে পাইপ তুলে ঘন ঘন ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করতে থাকেন। ধূম্রজাল সৃষ্টি হয় ঘরে। ভদ্রলোক ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছেন। চোখে যেন চিন্তাকুল দৃষ্টি।

ভদ্রলোকের পোষাক নজরাজ্জ্বল। ছাই রঙের ভেলভেটিনের বুক-খোলা কোট আর ট্রাউজার। ফরাসী রেশমের নক্সাকাটা টাই। চকচকে কালো কিডের জুতো পায়ে। ছাই রঙের ফেল্টের টুপী। বুকে সোনার ঘড়ির চেন। ঘড়ির চেনের লকেটে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। কোটের ডান দিকের বুকে একটা চীনা গোলাপ।

—বড় পড়েছি। I am in trouble now.

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন ভদ্রলোক। বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন,—I am not supposed to know what my son does or does not!

অর্থাৎ, আমার ছেলে কি করছে না করছে আমার জানার কথা নয়। কৃষ্ণকিশোর বোঝে ভদ্রলোক কি বলতে চাইছেন। প্রত্যুত্তর দেয় না, শ্রদ্ধা সহকারে শোনে ভদ্রলোকের বক্তব্য। ভদ্রলোক বললেন,—আমি তোমাকে বলতে এলাম। They will disturb you also. পুলিশ যদি আসে তো kick them out.

নর্মাণ বিনয়েন্দ্রর প্রকৃতি অমায়িক। ফিরিঙ্গী হ'লেও বিলাতী আদব-কায়দা জানা আছে। একসঙ্গে কতগুলো লজের সভ্য, কত সঙ্ঘের চরিত্র-প্রশংসাপত্র পেয়েছেন তিনি। ক্রোধের অনলে কখনও জ্বলতে দেখা যায় না নর্মাণ বিনয়েন্দ্রকে। কিন্তু তিনিও যেন বিব্রত হয়েছেন। কথায় ক্রোধের আভাষ। বললেন,—কাজে হয়তো আমাকে ইস্তফা দিতে হবে। Then what shall I do? No earning.

—চা আনতে বলছি আমি। কৃষ্ণকিশোর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠে পড়লো।

—Oh, no, no. I have finished my breakfast, সকালে চায়ের সঙ্গে যা কিছু খাই। খাওয়া হবে after day-break, কথা বলতে বলতে কৃষ্ণকিশোরকে ধ'রে ফেললেন। বললেন,—I will finish my talk. তুমি মানে I mean you will see me soon, মানে, তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে খুব শীঘ্র। At my residence, আমার জীর্ণ কুটীরে। In my thatched cottage.

নর্মাণ বিনয়েন্দ্র মুখে পাইপ তুলে উঠে দাঁড়ালেন। টুপীটা মাথায় চাপালেন। ঘড়িটা দেখলেন চেন টেনে। ফরাসী মেকারের ঘড়ি। বললেন, —কে বাজাচ্ছে বলো তো? I hope মাটাদান বাজানো হচ্ছে। শুনছি তখন থেকে। I am charmed.

মাটাদান। নামই জানে না কৃষ্ণকিশোর। বললে,—পিসীমার ছেলেরা দু'জন আছেন ও ঘরে। কয়েক জন—

—That's right. বললেন নর্মাণ বিনয়েজ।—আমি চললাম। But you meet me must.

মাটালান। নামটা বলতে আশ্চর্য্য হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। মাটালান! নর্মাণ বিনয়েজ জুতো মসমসিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। জোর-কদমে চললেন। মার্চের ভঙ্গীতে। মিলিয়ে গেলেন ফটকে। শুধু পাইপের ধোঁয়া পেছনে ছাড়তে ছাড়তে গেলেন।

নর্মাণ বিনয়েজও যেতে যেতে ভাবছিলেন মাটালান। কবে যেন দেখে-ছিলেন, এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় দেখেছিলেন।

Matalan, a flute of the American-Indians. Matalan is being used with dance, Bayadere.

অর্থাৎ, আমেরিকীয় ইণ্ডীয়দের ফ্লুটবিশেষ। বেয়াডিয়র নামক নৃত্যে ব্যবহৃত হয়।

—এই অনামুখো!

চমকে ওঠে যেন অনন্তরাম। খোদ-কর্ত্তা অর্থাৎ বড়বাবু অর্থাৎ কৃষ্ণচরণ সময়ে অসময়ে যে-নামে ডাকতেন কে ডাকলো সেই নামে। ফিরে দাঁড়ায় অনন্তরাম। বলে,—হুজুর, হুকুম করুন।

—যা, বৌদি যা বলে এনে দে। যা, চট ক'রে যা। বললে,—কৃষ্ণকিশোর। বললে,—কাছারী থেকে টাকা নিয়ে যা।

—কোথায় যেতে হবে? জিজ্ঞেস করে অনন্তরাম।

—বাজারে যাবি! যা যা বলবে এনে দিবি।

অনন্তরাম এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থাকে। বলে,—তা হ'লে দেখছি পিসীর ছেলেদের দল কায়েমী হয়ে বসেছে! কচি খোকা খেটে মরুক। কিন্তু একটা কথা শুধোচ্ছিনুম—

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কি কথা?

অনন্তরাম। —রাত্তিরে কোথায় থাকা হয়েছিল শুনতে পাই?

কৃষ্ণকিশোর হকচকিয়ে যায় যেন। বলে,—গান শুনতে শুনতে দেরী হয়ে গেল যে।

এতক্ষণ মুখে হাসি ছিল অনন্তরামের। হাসি যেন মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। বললে,—শুধু গান শুনেই চ'লে এলে? কে কোথায় গান গাইলে রাতভোর জানতে পারি?

কথা শুনে হকচকিয়ে যায় যেন কৃষ্ণকিশোর। মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন হয়ে যায় চক্ষের নিমেষে। হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে হাসি ফোটে না। বলে,—অনন্তদা,—

—বল' কি ব'লবে? বললে অনন্তরাম।

—অনন্তদা, তোমাকে আমি ব'লবো। তোমাকে লুকিয়ে কি হবে! তোমাকেই ব'লবো অনন্তদা। তোমাকেই—। কৃষ্ণকিশোর কথা বলে অস্ফুট। কি বলতে চায় বোঝা যায় না। মুখে যেন দেখা যায় ভয়ার্ত্ত ভাব।

হেসে ফেললে অনন্তরাম।

স্নেহ আর লজ্জার হাসি হাসলে। কাঁধের গামছাটা মাথায় এক পাকে বাঁধতে বাঁধতে বললে,—হাট, বাজারে যাই। শুনবো ফুরসৎ হ'লে। দেরীতে গেলে কিছু মিলবে না।

হাসতে হাসতেই দ্রুত চ'লে যায় অনন্তরাম।

থামের আড়ালে অন্তর্হিত হয়। বৈঠকখানার দালান থেকে যায় আরেক দালানে। পলকের মধ্যে যেন অদৃশ্য হয়ে যায় হাসতে হাসতে। একটা কালো কষ্টির মূর্ত্তি যেন এতক্ষণ সমুখে দাঁড়িয়ে ভৎর্সনা করছিল। মূর্ত্তিটা দেখলে ভয় হয় না। কিন্তু সম্ভ্রম হয়।

অনন্তরাম চ'লে যেতে আকাশে চোখ তুলে বৃথাই দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। মুখে ফুটে উঠেছিল ভয়ার্ত্ততা। বিবেক যেন বলছিল, দোষ হচ্ছে। গহরজানের কাছে যাওয়া দোষ, টাকা দিয়ে দেওয়া দোষ,

সিন্দুক থেকে ঘড়া নেওয়া দোষ; সূর্য্যাস্ত আইনের আগে জমিদারীর টাকা দিতে হবে। মিথ্যা বলা দোষ। বিবেক যেন শুধু বলছে,—দোষ, দোষ, দোষ।

বর্ষা-দিনের হাওয়া চলেছে থেকে থেকে।

কালো আকাশ। কলকাতায় মধ্যে মধ্যে বারিবর্ষণ হচ্ছে। কলকাতার কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরের বুকে অবিরাম বর্ষণ চ'লেছে। ঝড়ো হাওয়ায় শীত-শীত করছে। শালিক আর বুলবুলি গাছে গাছে। শিষ দিচ্ছে।

—দুনিয়ামে কৈ হ্যায় নেহি। কৈ দোস্ত নেহি, বিলকুল দুষ্‌মন। রূপেয়া তো খুশ দেতা নেহি। হায়ি সুখ চাহি।

কে কথা বলছে চুপি-চুপি। ফিস-ফিস গুঞ্জন। ঘন কালো তমিস্রায় কোন এক অদৃশ্য মূর্ত্তি কথা বলছে। কে বলছে আর কে শুনছে? অত্যন্ত ব্যথাভরা কণ্ঠে বলছে সে বলছে। চোখে দু'ফোঁটা জল টলমল করছে। আকাশে হঠাৎ কে দেখা দেয়। আকাশী রঙের শাড়ীতে দেখা দেয়। উড়ন্ত কেশের বোঝা, উড়ন্ত আঁচল। উদাস চোখে চেয়ে আছে অন্য দিকে। রঙটা খুলেছে না আইভিলতার? ঘোটা হয়েছে?

—হায় সুখ চাহি। ইয়ে তো বিলকুল নোংরা কাজ হ্যায়!

কথাগুলো শুনতে শুনতে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। আরও যেন কি কি বলেছিল গহরজান। উষ্ণ শ্বাস বইছিল তখন গহরজানের। দেহটা তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

বলতে বলতে উঠে গিয়ে দেরাজ থেকে ল্যাভেণ্ডারের শিশি বের ক'রে কপাল আর মাথা চুবিয়েছিল। ফ্রেঞ্চ ল্যাভেণ্ডারের খোশবয়ে ঘর তখন টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল।

গানের ঘরে পৌঁচেছে, এমন সময়ে ডাকলো কে এক ভৃত্য। বললে,—হুজুর, বৌমা ডাকছে।...

কিয়ৎক্ষণের বিশ্রাম গেছে।

গানের ঘরে গান হচ্ছে না যদিও। মাট্টালান শেষ হয়ে গেছে।... টরপ-ডিয়নের বাক্স খোলা হয়েছে। সুমধুর কলকৌশলে কে জানে কে বাজাচ্ছে টরপডিয়ন।

Terpodion, a curious musical instrument like harmonium, made by Buschmann, ব'লেছিলেন ডিউক অব সাকস্ কোবার্গ—Duke of Sax Cobourg. টরপডিয়নের শব্দ সুমধুর। সূক্ষ্ম কলকৌশল।

লোহার তাবুতে খিচুড়ীর ডাল তুলছিল রাজেশ্বরী। ভাঁড়ারের বদ্ধ ঘরে হাওয়া চলে না। ডাল তুলছিল কি। তুলছিল কতক্ষণ ধ'রে। ঘেমে উঠেছিল গলার খাঁজ।

শুনী ছুঁড়লো কে, না দাসী ডাকলো, হাত থেকে ভাজা মুগের ডালের জালায় পড়ে গেল লোহার তাবুটা।

দাসী বললে,—বৌদিদি!

ডাক শুনে চমকে উঠলো আর হাত থেকে আচমকা পড়ে গেল তাবুটা।

দাসী বললে,—দেখোই না কে? ডাকছে যে।

রাজেশ্বরী দেখলে দাসী ঘোমটা টেনেছে মাথায়। ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে দেখলে। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলে।

—ডেকেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ। কি রান্না হবে বললে না? বললে রাজেশ্বরী। শাড়ীর আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে।

ডাকের প্রয়োজন শুনে হাঁফ ছাড়লো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—তুমি যা বলবে।

মুখে হাসি ফুটলো না রাজেশ্বরীর। কাছে গিয়ে বললে,—চল' কথা আছে। ঘরে চল'। ঘড়া আমি দেবো না। কিছুতেই নয়। আমি আড়াল থেকে কথা বলবো কাছারীর লোকের সঙ্গে। টাকা চায় তো দেওয়া যাবে।

কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিতে চায় কৃষ্ণকিশোর। কিন্তু রাজেশ্বরী হাসে না। কথা বলে চ'লে যায়, ভাঁড়ারে গিয়ে ঢোকে।

—বেশ কথা। বেশ কথা। বলে কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতে বলে, —শুনবো তোমার কথা। টরপভিয়ন বাজাচ্ছে এখন। আমি যাচ্ছি শুনতে।

টরপভিয়ন, অপূর্ব্ব কলকৌশলের সঙ্গে বাজাতে হয়। হারমনিয়ম অপেক্ষা শুনতে সুমধুর।

গহরজানকে টাকা দিতে হবে। বেশ কয়েক হাজার। ডালিমের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কি এলোমেলো কথা বলছে রাজেশ্বরী। টরপভিয়ন শুনতে শুনতে মনে তুফান ওঠে। গহরজানকে বিমুখ করা যায় না।

গহরজানের ঘরে তখন অন্য মানুষ।

নেহাৎ বখাটে করছে না, অন্য মানুষ তো। তেলে-ভাজা খাবার খেয়ে মুখে বার্ডসাই ধরিয়ে মাদুরে শুয়েছিল তখন গহরজান। ডালিম ছিল কাছেই। বুকের কাছে। গহরজান ভাবছিল মানুষটা কি বেওকুফ। শুধু শুধু টাকা দিয়ে ম'লো।

কাঁচুলীর ভেতর একশো টাকার নোট বুকে বিঁধছিল থেকে থেকে। বুকে ফুটছিল গহরজানের।

বর্ষা-দিনের এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া চলছিল থেকে থেকে। গাছে গাছে শালিক আর বুলবুলি ডাকছিল। দোকানে দোকানে হল্লা চলেছে।

ডাকের সাজ, সিঁদুর-চুপড়ি আর গিল্টির গয়না বিক্রী হচ্ছে। খেমটা নাচ, যাত্রা, আখড়াই আর আতরওলার ভিড়।

গহরজান ভাবছিল লোকটা কি বেওকুফ। লোকটি তখন চিঠি পড়ছে।

শ্রীরামানন্দ,

মানুষের মত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করিও। তোমাকে অধিক লেখার প্রয়োজন নাই, তথাপি লিখিতেছি। তুমি কাহাকে মন উজারচেতা ছায়

একত্র করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হও। নাইট-স্কুল স্থাপন করো, গ্রন্থাগার নির্মাণ করো, গ্রামে গ্রামে কূপ খনন করাও, পুষ্করিণী পরিষ্কার এবং গ্রামের কুটীর-শিল্প যাহাতে বিনষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দাও। আমি শ্রীমতী—কে মানভূমে পাঠাইয়াছি। অধিবাসীদিগের যাহাতে চারিত্রিক উন্নতি হয় তজ্জন্য ইতোমধ্যে শ্রীমতী—দুইটি বিদ্যালয় এবং—

এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় দরজা কাঁপে। চমকায় ধীরানন্দ।

ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু হোক, কাছারীর কাজ থামে না!

কাছারীটা ঝিমোচ্ছে, কাজ করছে যত বেতনভুক্। প্রাইভেট ষ্টেটের কাছারী, কাজ চলেছে ঠিকঠাক। গলতি নেই কোথাও। খাতায় ভুল পাওয়া যাবে না। ছকে ফেলা কাজ, ছক মিলিয়ে কাজ চলেছে ধীর-মন্থর গতিতে। লেজার মিলিয়ে কাজ। ভাউচার সাঁটেযে। খাজাঞ্চী আছে পেমেণ্ট করছে। ক্যাস-বুকের দুই প্রস্থ রেজিষ্ট্রী আছে। খতিয়ান আছে। তৌজি অনুযায়ী কাজ। নায়েব আছে, খরচার বিল তৈরী ক'রে দেয়। রোকড় খাতা খোলা আছে; কাজ চালায় নায়েব। রিপোর্ট আসছে মফঃস্বল কর্মচারীদের, রিটার্ণ দিচ্ছে হেড-নায়েব। আদায় ওয়াশীল, জমাজমির বন্দোবস্ত, নামপত্তন, নামখারিজ, মামলা-মকদ্দমা—কত হেফাজত! আঁচ চলে কাজের, কাজও চলে। ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু চলুক, কাজ থামে না কাছারীর। কতগুলো বিভাগ কাছারীতে, কত ডিপার্টমেণ্ট। আমিন সেরেস্তা, জমা সেরেস্তা, খাজাঞ্চী সেরেস্তা, মকদ্দমা সেরেস্তা, মহাফেজ সেরেস্তা, মুন্সী সেরেস্তা। বিভাগ কত।

কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় কি না খোদাতালা জানেন, ভাগাভাগি আছে বিভাগে। দলাদলি আছে। টিটকারী আর চিপটেনের বাক্য বয় হাওয়ায়। কাছারীতে কাজ চলে তবু। ছকে ফেলা কাজ।

হঠাৎ বর্ষা। হঠাৎ নেই।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরের পর্দা কেঁপে উঠলো। নেটের পর্দা আকাশী রঙের। ফুল-লতাপাতা আঁকা। খাটের ব্যাটম ধ'রে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছিল চোখে-মুখে।

শাড়ী আর জামা দু'টো বদলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লো রাজেশ্বরী। পা চললো না যেন। মনে মনে ঠিক করলো, বাধা দিতেই হবে,—ঘরের টাকা বাইরে যাবে না,—সিন্দুকের গুড়া থাকবে সিন্দুকে।

—অনন্ত! অনন্ত!

ডাকতে ডাকতে হঠাৎ ঘর থেকে বেরোয় রাজেশ্বরী। ডাকে, জোর-গলায় ডাকে,—অনন্ত! অনন্ত!

ফাঁকা বাড়ী। কোন্ দিক থেকে প্রতিধ্বনি ডাকলে, —অনন্ত! অনন্ত!

—কেন লা রাজো? ডাকছিস কেন অনন্তকে?

কোথা থেকে হাওয়ার মত দেখা দেয় এলোকেশী। বার্দ্ধক্যের জরায় কাঁপতে কাঁপতে এলো।

রাজেশ্বরী দম ছেড়ে বললে,—এলো, আড্ডা থেকে ডাকাতে পারিস অনন্তকে দিয়ে?

—কেন লা? তোকে যেন কেমন মনমরা লাগচে! ডাকছি আমি অনন্তকে। তুই ঘরে যা। স্নেহমাখা কথা এলোকেশীর।

কাঁপতে কাঁপতে কথা বললে এলোকেশী। কুঁজো হয়ে চললো কাঁপতে কাঁপতে।

কত দূর চলে গিয়েছিল এলোকেশী, ডাকলে রাজেশ্বরী। বললে, —আচ্ছা, থাক্ এলো। ডাকতে হবে না তোকে। থাক্।

ফিরে এলো এলোকেশী। বললে,—বলবি না বুঝি আমাকে?

এলোকেশীকে হাত ধ'রে ঘরে টেনে নিয়ে যায় রাজেশ্বরী। চোরকে যেমন টানে মানুষ, এলোকেশীকে ঘরে ধ'রে নিয়ে যায় রাজেশ্বরী। ঘরে গিয়ে ফিস-ফিস কথা বলে,—সিন্দুক থেকে ঘড়া বেরোচ্ছে যে! এলো, কি করি বল্ তো? ঠাগ্‌মাকে ডাকাবো?

এলোকেশী জিব কাটলো। গালে দিলো হাত। ঘোর বিস্ময় প্রকাশ করলো মুখভঙ্গীতে। কথা কইলো না। চোখ পাকিয়ে থাকলো কতক্ষণ।

রাজেশ্বরী বসলে,—চুপ ক'রে আছিস যে?

—ঘরোয়া কথা, ডাকবি ঠাগ্‌মাকে? বললে এলোকেশী, কথায় বিজ্ঞতা ফুটিয়ে।

—তবে? মুখে যেন কথা জোগায় না রাজেশ্বরীর। জানলার বাইরে আকাশে চোখ তুলে তাকায়। মীমাংসা খোঁজে হয়তো। কিংকর্ত্তব্য।

—তোকেও বলি রাজো, তুই যেন কেমন ধারার! বলে এলোকেশী।

আকাশ থেকে চোখ নামায় না রাজেশ্বরী। শুনতে পায় না যেন দাসীর কথা। এলোকেশী বললে,—সোয়ামীদের এ্যাত ধরে না কি মেয়ে মানুষে? একটা একটা পুরুষের যে দু'-দু'টো মাগী থাকে। কত পুরুষ বাড়ীতেই ফেরে না! মাসান্তে আসে কি আসে না।

—অ্যাঁ? হঠাৎ কথার মাঝে শুধোয় রাজেশ্বরী। এলোকেশীর ফিস-ফাস কথায় চমকে ওঠে যেন।

এলোকেশী ইদিক-সিদিক দেখে। দেখে কেউ শুনছে কি না। কেউ দেখলো কি না দেখে। বলে,—সমাজে যা চলন আছে কেউ থামাতে পারে? সমাজ যেমন হবে, তেমনি চলবে তো মানুষ! ঠাগ্‌মা কি করবে তোর? আসবে কেন মাথা গলাতে?

কানে যেন বিষ ঢেলে দেয় এলোকেশীর কথাগুলো। মন থেকে যেন মেনে নিতে পারে না রাজেশ্বরী। তাই ব'লে অন্যায়কে মানতে হবে! সমাজ যদি জাহান্নমে যায় যেতে হবে জাহান্নমে! ন্যায়-অন্যায় থাকবে না? বিচার-বিবেচনা?

রাজেশ্বরী বললে,—দাঁড়িয়ে থাকিস না এলো, ভাঁড়ারে যেয়ে দেখা-শুনো ক'রগে যা। বামুনদিদিকে জোগান দিগে যা।

এলোকেশী প্রত্যুত্তরে বলে,—আমি যাবো, আর তুমি একলাটি ব'সে থাকবে বুঝি?

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী।—মন চাইছে না কোথাও যেতে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে। তুই যা ভাই। শরীরটা আমার ভাল লাগছে না। বুকে কষ্ট হচ্ছে।

—ভেবে ভেবেই মলি যে তুই। বললে এলোকেশী।—

খাটের এক ধারে বসলো রাজেশ্বরী। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। শিমূল তুলোর বালিস। ম্যাকেন্টারের রেশমের আবরণ। নেটের মশারি ঝালর দেওয়া।

রাজেশ্বরী বললে,—এলো, কাছারীতে খোঁজ করাতে পারিস, সিন্দুক থেকে টাকা বেরোচ্ছে কেন? বলছে যে, বাকী খাজনা শোধ করতে হবে।

ঠোঁট ওলটায় এলোকেশী। বিস্ময় প্রকাশ করে। বলে,—কাছারীতে মেয়েমানুষে যাবে কম্‌নে দিয়ে? অনন্তকে বলতে হবে। সুবিধে পেলে খোঁজ করবে।

—হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছিস্। আমিই বলবো অনন্তকে। তুই যা ভাই। বামুনদিদিকে জোগান দিগে যা। আর্তকণ্ঠে কথাগুলি বললে রাজেশ্বরী। যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

সত্যিই বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে রাজেশ্বরীর।

ভেবে ভেবে যেন কূল-কিনারা পায় না। বিপরীত দেওয়ালের গায়ে আলমারী। আলমারীতে সুবৃহৎ আয়না। আয়নায় রাজেশ্বরীর প্রতিবিম্ব। চোখে পড়তেই অভিমানে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী। কি হবে দেখে, যে-রূপের কোন মূল্য দেয় না কেউ। বৃথাই রূপের ডালি। তবুও রাজেশ্বরীর চোখে-মুখে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে ভ্রূযুগল; দ্রুত হয়ে আছে হৃদ্‌গতি। কপাল আর হাতের তালু ঘামছে থেকে-থেকে।

মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী আয়নায় প্রতিমূর্ত্তি দেখে। আয়নার ভেতরেও রাজেশ্বরী। ফরাসডাঙ্গার তাঁতের শাড়ী গেরিমাটি রঙের। ফিকে লাল রঙের অর্গাণ্ডির জামা। শাড়ী আর জামা দু'টো কখন বদলেছে রাজেশ্বরী।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরের জানলার পর্দা কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঘরের ভেতর অপূর্ব্ব এক সুগন্ধ। ক'দিন আগে একটা শিশি খুলেছে রাজেশ্বরী,—একটা সেন্টের শিশি। তত্ত্বে পেয়েছিল বিয়ের। এলিজাবেথ আর্ডেনের তৈরী বোধ করি গার্ডেনিয়ার গন্ধই ভুর-ভুর করছে ঘরে।

মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত অচল হয়ে বসে থাকে রাজেশ্বরী। মাঝে-মাঝে হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে দুলতে থাকে চূর্ণ কুন্তল। গালে হাত দিয়ে বসে থাকে রাজেশ্বরী। পটে আঁকা ছবির মত দেখায় যেন। ভাবে, এলোকেশীর যুক্তিপূর্ণ কথা। ভাবে, সমাজে অন্যায় চলবে তাই ব'লে? সমাজ যদি জাহান্নমে যায়, যেতে হবে জাহান্নমে! দুঃসময়ে অন্য কাকেও মনে পড়ে না রাজেশ্বরীর, মনে পড়ে পিতামহীকে। ঠাগ্‌মাকে। তিন কুলে কেউ নেই রাজেশ্বরীর, আছে ঐ বৃদ্ধা। শোক আর তাপে জর্জ্জরিতা।

—গোলাপী আতর আছে বৌদিদি?

ঘরের বাইরে থেকে হঠাৎ শুধোয় বিনোদা। ভাবনায় মগ্ন ছিল রাজেশ্বরী। কথা শুনে চমকে উঠলো যেন। বললে,—অ্যাঁ, কি বলছো?

ঘরের ভেতর ঢুকলো বিনোদা। বললে,—আতর আছে বৌদিদি? গোলাপী আতর? বামুনদি চাইছে, পায়েসে দিতে হবে।

ব্রাহ্মণী পায়েস তৈরী করছে। চিড়ের পায়েস। পিসীর ছেলেদের সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য প্রস্তুত করছে অমৃত। ছোট এলাচের গুঁড়ো আর আতর চাইছে ব্রাহ্মণী।

দেরাজ খুলে আতরের বাক্স বের করলো রাজেশ্বরী। কত জাতের আতর আছে বাক্সে। চন্দন, খস, মৃগনাভি, বেলা, কত কি। গোলাপী আতরের শিশিটা দেয় বিনোদাকে। বলে,—কাজ মিটলে দিয়ে যেও শিশিটা।

বিলাতী গার্ডেনিয়ার সঙ্গে দেশী আতরের মিশ্রিত সুবাস বইতে থাকে ঘরে। বিনোদা চ'লে গেলে রাজেশ্বরী জানলার ধারে যায়। একদৃষ্টে দেখে দূরের এক গৃহশীর্ষ। সেখানে ছিল হাওয়ার গতি-নির্ণয়ের যন্ত্র। ওয়েদার-কক্। দেখছিল ঘূর্ণায়মান যন্ত্রটা দুরন্ত হাওয়ায় ঘুরছে কত দ্রুতগতিতে।

আর আকাশের অনেক উঁচুতে ছিল এক ঝাঁক চিল। উড়ছে কত ধীরগতিতে। ঘোলাটে মেঘলা আকাশ। গঙ্গাজলের মত রঙ হয়ে আছে আকাশের। রাজেশ্বরী ভাবছিল, কাছারী থেকে খোঁজ পাওয়া যায় কি করলে। কি আছে কাছারীতে, কারা আছে?

কাছারীর কাজে কিন্তু বিরতি পড়ে না।

ঝড়-ঝঞ্ঝা যা-কিছু হোক, কাজ থামে না কাছারীর। কাগজের বুকে কালির আখর পড়ে। দেশী কালিতে লেখার কাজ চ'লেছে। দপ্তর তোলাপাড়া হচ্ছে। কোন্ সালের কোন্ কাগজ কখন প্রয়োজন হয় কে জানে! দলিলের রেজেষ্ট্রী, ম্যানেজারের হুকুমের ফাইল, ব্যাঙ্কের রেজিষ্ট্রী, দাখিলা বইয়ের ইন্ রেজিষ্ট্রী। দপ্তর পাড়তে হয় র‍্যাক থেকে।

প্রাপ্ত ও প্রেরিত পত্রের রেজিষ্ট্রী হাতড়াতে হয়। ডাকঘরের রেজিষ্ট্রী ঘাঁটতে হয়। কাছারীর তক্তপোষে স্তূপীকৃত হয় খতিয়ান, রোকড় ও রেকর্ড। হাত কড়্চা আর দাখিলী কড়চা খোঁজাখুঁজি হয়। বকেয়ায় বাকি উঠানো হয়।

কাছারীর কাজকর্ম রাজেশ্বরী কোত্থেকে জানবে? কখন কি কাজ হয়, কাদের কি কাজ বুঝবে না রাজেশ্বরী। তবুও বুঝতে চায়, জানতে চায় জমা-খরচ। কত জমা পড়লো আর খরচা হ'ল কত। সিন্দুকে কেন হাত পড়লো? ঘড়া কেন বেরিয়েছে!

যত ভাবে তত বুক ধড়ফড় করে রাজেশ্বরীর। ভেবে যেন কূল পায় না! বাকী খাজনা দিতে হবে, কথাটা মিথ্যা নয়তো! মনগড়া কথা যদি হয়? অস্বস্তি বোধ করে রাজেশ্বরী। ব'সে দাঁড়িয়ে সুখ পায় না যেন। খেয়ে ঘুমিয়ে। ঝম-ঝম বৃষ্টি পড়ে হঠাৎ। দাঁড়ো-কাক ডাকে গাছে গাছে। ধীর মেঘগর্জ্জন শোনা যায় দূর-আকাশে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘরের পর্দা কেঁপে ওঠে।

অনেক, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসে যন্ত্রসঙ্গীত। মজলিস্ বসেছে বৈঠকখানায়। গান বাজনার আড্ডা। রাজেশ্বরীর কানে বিষ ছড়িয়ে দেয় ঐ মধুর শব্দ। বিশ্রী লাগছে যেন দিনটা। বসে দাঁড়িয়ে শান্তি পায় না রাজেশ্বরী। ক'দিন থেকে এমন হয়েছে যে, সময় নেই, অসময় নেই যখন-তখন কানে শুনছে মেঘগর্জ্জনের মত শব্দ। কে যেন কোথায় গুলী ছুঁড়ছে। বন্দুক দাগছে। চমকে চমকে উঠছে রাজেশ্বরী। একা একা থেকে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। একটা কথা কওয়ার পর্য্যন্ত লোক পাওয়া যায় না। পুরোহিত মশাই কি বলছিলেন নাট-মন্দিরে, ভাবতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। পূর্ণশশী, শশীবৌ ডেকেছিল পুরোহিত মশাইকে। ডেকে, কি বলেছে গূঢ় কথা। ভেবে পায় না কিছু রাজেশ্বরী। শশীবৌকে মনে পড়ে। বেশ মানুষ তিনি, কেমন চমৎকার কথা বলেন।

কত রূপ শশীবৌয়ের। যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। বামুনদিদি এতক্ষণে কি করছে কে জানে! কত দূর এগিয়েছে রান্নার। কি রাঁধা হল এতক্ষণে!

—বৌদিদি!

ডাক শুনে জানলা থেকে ফিরে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। ঘোমটা টানে মাথায়। বলে,—কে?

—আমি বৌদিদি! অনন্ত।

—কি বলছো? ভয়ে সিঁটকে জিজ্ঞেস করে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম বললে, আমতা আমতা ক'রে বললে,—বৌদিদি, গোটা দুই টাকা আমি চাইছি।

রাজেশ্বরী বললে,—কেন অনন্ত?

অনন্তরাম কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। ব'লে—ভিক্ষে চাইছি বৌদিদি। ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে আছে যে। গামছাটা ছিঁড়ে কুটি-কুটি হয়ে গেছে, জামাটা জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে। একটা গামছা আর একটা ফতুয়া কিনবো। দু'টো টাকা যদি দাও। হুজুরকে বলতেই সাহস হয় না যে।

রাজেশ্বরীর মুখে স্মিতহাস্য ফুটে ওঠে। বলে,—ও, এই কথা? দাঁড়াও, দিচ্ছি আমি টাকা।

অনন্তরাম কথার জের টানে। বলে,—হুজুর তো বৈঠকে বসেছেন। কাছারী থেকে চাইতে মন লাগে না। একশো কৈফিয়ৎ দাও, তবে যদি টাকা মেলে। দেবেও হয়তো টাকা, মাইনে থেকে কেটে দেবে। কিন্তু মাইনে তো পাই আটটি টাকা। তুমি যদি দয়া কর, না হয় কর্জই দাও।

দেরাজ খুলে তখন ক্যাশ-বাক্সটা বের করছে রাজেশ্বরী।

পিত্রালয় থেকে পাওয়া ক্যাশ-বাক্স। লাল আখরে নাম লেখা আছে বাক্সের ডালায়—শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী। বাক্সে আছে একটা

হাতীর দাঁতের কৌটা। বৌভাতে পাওয়া মুখ-দেখানি টাকা আছে কিছু। আছে ক'টা গিনি। কয়েকটা মোহর। প্রীতি-উপহার পেয়েছে রাজেশ্বরী। দিয়েছে কত কে। কৌটা থেকে রূপোর দু'টো চকচকে টাকা বের ক'রে বাক্স তুলে রাখে। দেরাজে চাবি দিতে দিতে বলে,—টাকা তুমি নাও অনন্ত। কর্জ্জ দিচ্ছি না। তোমাকে দিতে হবে না।

—জাতে মোরা নীচু বৌদিদি, আশীর্ব্বাদ কি ফলবে? তবুও প্রার্থনা করছি, মঙ্গল হোক তোমার। ভাল হোক। সিঁদুর অক্ষয় হোক। অনন্তরাম বললে প্রার্থনার সুরে।

রাজেশ্বরী অনন্তরামের কথায় কান দেয় না। রাজেশ্বরী ভাবছিল, অনন্তরামকে বলবে, না, বলবে না। সিন্দুক থেকে ঘড়া বের হওয়ার কথাটা অনন্তরামকে জানিয়ে কাছারীতে খোঁজ করাবে?

—অনন্ত! মুখ থেকে কথাটা যেন অতর্কিতে বেরিয়ে যায়। রাজেশ্বরী বলে,—অনন্ত, কি করা যায় বলতো?

—কি বৌদিদি? শুধোয় অনন্তরাম।

—অনন্ত! রাজেশ্বরীর কণ্ঠ কে যেন চেপে ধরছে। কথা বলতে গিয়ে কথা আসছে না মুখে। তবুও বললে রাজেশ্বরী,—সিন্দুক থেকে একটা ঘড়া বেরিয়েছে শুনেছো?

বিস্মিত হয়ে ওঠে যেন অনন্তরাম। বলে,—না, শুনি নাই তো।

রাজেশ্বরী দীপ্ত কণ্ঠে কথা বলে। বলে,—হ্যাঁ, বেরিয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, জমীদারীর খাজনা বাকী পড়েছে। টাকা চাই।

—এ্যাঁ? অনন্তরামের কথায় বিস্ময়। বলে,—কি বলছো বৌদিদি! খাজনার টাকা বাকী থাকবে কেন? তুমি ভেবো না, তুমি ভেবো না। আমি তল্লাস করছি। ক'রে জানিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে। টাকা দু'টো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে তৎক্ষণাৎ চলে যায় অনন্তরাম। কাছারীর দিকে যায়

তড়িৎ গতিতে। রাজেশ্বরীর মুখের কথাগুলি কানে শুধু শোনে না অনন্তরাম, শুনে যেন অন্তরে ঘা খায়। ঘুরন্ত পৃথিবীটাকে যেন পাক খেতে দেখে। কানে যেন তালা লেগে যায়। পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে। সিন্দুক থেকে ঘড়া বেরিয়েছে, টাকাভর্তি ঘড়া। অনন্তরামের সকল আশা আরেক বার চূর্ণ হয়ে যায়। কাছারীর দিকে যেতে যেতে বিড়-বিড় করতে থাকে। আশাহত মনের অস্ফুট বিকাশ। কচি বৌটার মুখখানা দেখে মায়া হয়, মমতা হয় অনন্তরামের। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়!

রাজেশ্বরী সত্যিই কিন্তু কাঁদে। দর-দর বেগে হঠাৎ জল পড়ে কপোল বেয়ে।

একা-একা ঘরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়ে যেন তপ্ত অশ্রুধারায়। কত কথা মনে পড়ে রাজেশ্বরীর। কাল্পনিক কত কথা। কত অমঙ্গলের কথা। রাত্রে বাড়ীতে না থাকা, টায়রা হারিয়ে যাওয়া, সিন্দুক থেকে ঘড়াভর্তি টাকা বেরিয়েছে—সকল কিছু মিলিয়ে কত দুঃখের কথা মনে উদয় হয় রাজেশ্বরীর। ভাবতে পারে না, ভাবনার জাল ছিঁড়ে যায়। গান-বাজনার মজলিসে এখন কি হচ্ছে কে জানে! কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। যন্ত্রসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে না তো! মজলিস ভেঙেছে হয়তো। বাজনা গেছে থেমে। ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে হয়তো গাইয়ে-বাজিয়ের দল। হয়তো ক্ষণেকের জন্ত বিরতি পড়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা হবে গান। বাজবে বাজনা। কিন্তু কাছারীতে কি হচ্ছে এখন?

ঝড়-ঝঞ্ঝা যা কিছু হোক, ছকে ফেলা কাজ থামে না, কাছারীর। কাছারীতে ঢুকে কা'কে যেন খোঁজে অনন্তরাম। ব্যস্ত-চোখে।

অনন্তরামকে দেখে কর্মরত গমস্তা খাতা থেকে চোখ তোলে। কানে কলম তোলে কেউ কেউ। চোখের চশমা খোলে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কেউ। হেড-নায়েব বলেন,—কিছু বলছো অনন্ত ?

—আজ্ঞে হাঁ, বলছিলাম কিছু। বলে অনন্তরাম বিনম্র কণ্ঠে।—কথাটি সকলের সমক্ষে কিন্তু বলবার নয় নায়েব মশয়।

এক মুহূর্ত্ত চেয়ে থাকেন হেড-নায়েব। অপলক দৃষ্টিতে। বলেন,—অপেক্ষা কর তুমি। আমি উঠছি। বাজারের ফর্দ্দটা কম্প্লিট ক'রেই উঠছি আমি। বাটা মাছ কত দাম ব'লেছিলে অনন্ত ?

—ছ'সিকে হুজুর। বললে অনন্তরাম।

—নেড়ো বিস্কুট ?

—তিন আনা হুজুর। বললে অনন্তরাম ক্ষণেক ভেবে।

—পেঁয়াজ ?

—পাঁচ পো পাঁচ পয়সা।

হেড-নায়েব বললেন,—দু'মিনিট দাঁড়াও, টোটালটা দিয়েই উঠছি আমি।

ঝড়ো-হাওয়ায় গাছের পাতা মর্ম্মর করে। হেলতে-দুলতে থাকে বৃক্ষশীর্ষ। হাওয়ায় যেন জলের রেণু। খানিক আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। দাঁড়-কাক ডাকছে কাছারীর আলসেয়। মজলিসে গান ধ'রেছে কে। বেহাগ ধ'রেছে কে। চাঁটি পড়ছে ঘন-ঘন তবলায়। ক্ল্যারিওনেট না ফ্লুট বেজে চলেছে মিষ্টমধু।

ঘড়ি-ঘরে ঘড়ি বেজে চলেছে ঢং-ঢং। দেখতে দেখতে বেলা হয়ে গেছে। আর, একা-একা ঘরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তখন রাজেশ্বরী। রুদ্ধ আবেগ ফেটে পড়ছে তপ্ত অশ্রুপাতে। কাছারী থেকে ফিরে কি বলবে অনন্তরাম ? বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে রাজেশ্বরীর। কি শুনবে অনন্তরামের মুখ থেকে ? এলিজাবেথ আর্ডেনের গার্ডেনিয়ার সুগন্ধ ঘরে।

এলোমেলো হাওয়ায় দেওয়ালের ছবি কম্পমান হয়। পর্দা উড়তে থাক। থেকে থেকে চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। অনন্তরাম এলো না কি? কতক্ষণ গেছে অনন্ত? রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষায় থাকে বুঝি রাজেশ্বরী। কতক্ষণে দেখা পাওয়া যাবে অনন্তরামের। কি বলবে অনন্ত, কে জানে?

হেড-নায়েব ফর্দের খাতা তুলে উঠে পড়লেন তক্তপোষ থেকে। কাছারী থেকে বেরিয়ে দালানে গিয়ে বললেন,—কি বলছো বল'?

অন্যান্য গমস্তা ও আমলাগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। হেড-নায়েবের পিছু-পিছু যায় অনন্তরাম। বলে,—নায়েব মশয়, কথাটি কি সত্য?

হেড-নায়েব বললেন—আমি তো বুঝতে পারছি না অনন্ত, তোমার বক্তব্যটা?

ইতিউতি দেখে অনন্তরাম। দেখে কেউ দেখছে না তো। শুনছে না তো কেউ। দেওয়ালেরও কান আছে। অনন্তরাম ফিসফিস কথা কয়। বলে,—হুজুর সিন্দুক থেকে একটি ঘড়া বের ক'রেছে। বৌমা খোঁজ করতে বলেছে, জমিদারীর খাজনা বাকী প'ড়েছে? কাছারীতে টাকা নেই, সিন্দুক থেকে টাকা না দিলে চলবে না?

একটি চোখ ঈষৎ মুদ্রিত ক'রে কথাগুলো শুনলেন হেড-নায়েব। খানিক ভেবে বললেন,—বৌমাকে বল' কথাটি ঠিক। টাকা চাই। খাজনা বাকী পড়েছে এক সালের।

অনন্তরামের চোখে বুঝি আনন্দাশ্রু দেখা দেয়।

চোখ দু'টো চিকচিকিয়ে ওঠে। বলে,—তবে আর কথা কি আছে! খাজনা বাকী পড়লে দিতে তো হবেই। ঠিক আছে নায়েব মশয়। মাফ করবেন আমাকে। আমি তবে যাই, যেয়ে বলিগে বৌটাকে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দু'টো রাঙা ক'রে ফেলেছে বৌটা।

হেড-নায়েব বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বল'গে। হুজুর ঠিক কথাই বলেছে। বৌমাকে ভাবতে মানা কর'গে যাও। আমি যখন আছি তখন—

অনন্তরাম কথার মাঝেই কথা বলে,—ঠিক কথাই তো। আপনার মত একজন সুদক্ষ মানুষ থাকতে গণ্ডগোল হয় কখনও! কোন্ দিকে চোখ নেই আপনার? পিঁপড়ে পর্য্যন্ত আপনার চোখ এড়াতে পারে না। তবে মশায়, যাই আমি?

—হ্যাঁ যাও। বৌমাকে ভাবতে মানা কর'গে আমি যখন আছি। হেড-নায়েব কথা বলেন অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে। সত্য কথা যখন, বলতে বাধা কি! হেড-নায়েবের কথার সুরে বিকৃতি নেই। মুখাবয়বের নেই কোন পরিবর্ত্তন।

অনন্তরাম বিনম্র কণ্ঠে বললে,—আপনার মত একজন সুদক্ষ লোক থাকতে—

—তবে? বললেন হেড-নায়েব।

—তবে হুজুর যাচ্ছি আমি। বললে অনন্তরাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও।

অনন্তরাম অনুমতি পেয়ে চ'লে যেতেই পুনরায় একটি চোখ ঈষৎ মুদিত করলেন হেড-নায়েব। হাসলেন যেন ঈষৎ। হাসিতে ফুটে উঠলো কি এক অজানা রহস্য। মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসি যেন মিলায় না। হেড-নায়েব কাছারীতে ঢুকে বললেন,—তামাক সাজো তো বিষ্টু।

বিষ্টু ওরফে বিষ্ণু হেড-নায়েবের সহকারী। হুকুম পেয়ে একটা খেলো হুঁকো এক কোণ থেকে তুললো বিষ্ণু। কলকের পোড়া ছাই ফেললো একটা মাটির গামলায়। উবু হয়ে বসলো তামাক সাজতে।

হেড-নায়েবের মুখের অর্দ্ধস্ফুট হাসি মিলায় না। হাসি লেগে থাকে যেন ওষ্ঠাধরে। মনে মনে কি ভাবতে থাকেন হেড-নায়েব। বলেন,—চটপট নাও বিষ্টু। এক কলকে তামাক খেয়েই যাবো হুজুরের কাছে।

বিষ্টু বললে,—একটু বিলম্ব করুন মশায়। বর্ষায় টিকেগুলান পর্য্যন্ত স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে। ধরতেই চাইছে না।

হেড-নায়েব বললেন,—তবে তামাক থাক এখন। ঘুরে আসি আমি।

বিষ্টু বললে,—ব্যস্ত হন কেন মশায়? আমি কি ঘুমোচ্ছি দেখছেন?

হঠাৎ যেন দমকা হাওয়া কাছারীতে ঢুকে তাণ্ডব-নৃত্য করতে লেগে যায়। কাগজ-পত্র ওড়াওড়ি করতে থাকে। দেওয়ালে আছে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী আর গন্ধেশ্বরীর ছবি। ফ্রেমে বাঁধানো কালীঘাটের রঙীন পট, হাওয়ার বেগে দুলে উঠলো। ঝড়ো-হাওয়া উড়ে এলো কোথা থেকে। কোড়া-ফাইলের আলগা কাগজ ঘন ঘন কাঁপতে লাগলো। আমলাদের সকলে যে যার কাগজ ও খাতা সামলাতে লাগলো। কড়িকাঠের চালিটা দুলছে।—পড়ে যাবে না তো ছিঁড়ে। ঠোঁটের ক্ষীণ হাসি মুছে হেড-নায়েব বললেন,—দেখবেন মশায়গণ, কাগজপত্তর গেলে বিপদের অবশেষ থাকবে না। আচ্ছা বর্ষা লেগেছে বটে। ভিজোতে দেব না।

দিন তো নয়, যেন আঁধার নেমেছে সাঁঝের। ময়লা আকাশে আলো আছে কি নেই।

আকাশের অনেক উঁচুতে এক ঝাঁক চিল, স্থির ডানা মেলে উড়ছে না ভাসছে। রাশি রাশি মেঘ উড়ে আসছে দিক্‌চক্র থেকে। মেঘের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলছে ঝাঁক ঝাঁক চিল। ঝড়ো কাক ডাকছে বৃক্ষশীর্ষে। কাছারীর আলসেয়। শুকনো পাতা নাচছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

হেড-নায়েব ভাবছিলেন হুজুরের সঙ্গে দেখা হবে কতক্ষণে। ভাবছিলেন আর হাসছিলেন মৃদু-মৃদু। দুর্বোধ্য হাসি। ভাবছিলেন, গতকাল ডান হাতের তালু চুলকে উঠেছিল না? টাকা আসবে হয়তো হাতে। কিন্তু কোত্থেকে আসবে? হঠাৎ কথা বললেন হেড-নায়েব। বললেন,—এক ছিলিম তামাক সাজতে যে রাতটা ভোর ক'রে দিলে হে বিষ্টু!

বিন্টু কলকের ফুঁ দিতে দিতে ফিরে তাকায়। বলে,—টিকেগুলান যে ভাঁৎ-ভাঁৎ করছে মশায়! ধরতেই চাইছে না।

হেড-নায়েব বললেন,—উদিকে হুজুরের সঙ্গে এখনই দেখা হওয়া চাই যে! তামাক তবে থাক। আমি ফিরে আসি।

বিন্টু বলে,—ব্যস্ত হন কেন মশায়। নেন ধরেন, তামাকু খেয়ে তবে যান।

হেড-নায়েব বলেন,—তাড়া কি আর শুধু শুধু দিচ্ছি! কাজ আছে, কথা আছে। হুজুরের সঙ্গে জরুরী কথা আছে যে বিন্টু, বোঝ না তুমি?

বিন্টু বললে,—নেন না, খেয়েই তবে যান না। খেয়ে গিয়ে ক'ন না কথা হুজুরের সঙ্গে যত ইচ্ছা।

হুজুর তখন মুগ্ধ চিত্তে গান শুনছিলেন। বেহাগ শুনছিলেন।

লাল ভেলেভেটের তাকিয়ায় হেলে প'ড়ে গান শুনছিলেন। রাত্রে ঘুম ছিল না চোখে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে আছে। গান শুনতে শুনতে চোখে বুঝি ঘুম নামে। ঘুমের জড়তায় আলস্য লাগে হয়তো। গান তো শুনছিলেন, কিন্তু থেকে থেকে মনটা যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোরের। সিন্দুক থেকে ঘড়া বেরিয়েছে দেখে রাজেশ্বরী যে বলেছে খোঁজ করবে। কাছারী থেকে লোক ডাকিয়ে আড়াল থেকে কথা কইবে। খোঁজ করবে, সত্যিই টাকা বাকী পড়েছে কি না খাজনার। শুনে পর্যন্ত মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। অথচ টাকা যে দিতেই হবে গহরজানকে। না দিলে মান-মর্য্যাদা থাকবে না। কিছু না হোক জালিমের বিয়ের খরচাটা তো দিতেই হবে। কোটি কোটি টাকা নয়, লাখো লাখো নয়, কয়েক হাজার টাকা। না দিলে মর্য্যাদার হানি হবে যে! দেখা যাবে না গহরজানের মুখের হাসি।

গহরজান, গহরজান, গহরজান।

কত রূপ গহরজানের। ঠিক যেন বেদুইনদের মত। কধু-কধু চুল গহরজানের। সুর্মা-টানা চোখ। তরমুজ রঙের ঠোঁট, ডালিম-রাঙা দাঁত। মোমের মত নরম যেন দেহ। মুক্তো-ঝরা হাসি। হঠাৎ-পাওয়া গহরজানের হাসি হয়তো মিলিয়ে যাবে। মরীচিকার মতই মিলিয়ে যাবে গহরজান।

দরজায় হেড-নায়েবের আবির্ভাব হতে দেখে কৃষ্ণকিশোর বললে,—কিছু বলছেন?

হাসির ঝিলিক খেলে যায় হেড-নায়েবের মুখে। বলেন,—হ্যাঁ হুজুর, জরুরী কথা ছিল। বিশেষ জরুরী।

মজলিস থেকে উঠে পড়ে কৃষ্ণকিশোর। গান থামে না, বাজনা থামে না। ফুর্ট থামে না। হেড-নায়েবের কাছাকাছি যেতেই তিনি বললেন,—হুজুর, খুব জোর ঘুরিয়ে দিয়েছি বিষয়টা। অতটা বুঝতেই পারিনি আমি!

বিস্ময়ের সঙ্গে বললে কৃষ্ণকিশোর,—কি হয়েছে?

হেড-নায়েবের ওষ্ঠে দুর্বোধ্য হাসির ইঙ্গিত। কথা বলতে চান না যেন। শুধু হাসি ফুটে ওঠে থেকে থেকে ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে। বললেন,—সিন্দুক থেকে হুজুরের ঘড়া নেওয়া হয়েছে কি?

হেড-নায়েবের মুখে অপ্রত্যাশিত কথা শুনে বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—আপনি জানলেন কোত্থেকে? বললে কে?

—হুজুর, খু—ব বাঁচিয়ে দিয়েছি। ব'লে দিয়েছি যে, হ্যাঁ টাকা থাকতি হয়েছে কাছারীতে। দু'টো বাঁধ বাঁধতেই খরচা হয়েছে হাজার চল্লিশ। ক্যাশ টাকা নেই কাছারীতে। খাজনা বাকী প'ড়েছে এক সালের। টাকা চাই যেখান থেকে হোক। হেড-নায়েব কথা বলেন হাসির রেশ টেনে। ক্ষীণ হাসি। কথা বলতে বলতে একটি চোখ মুদিত করেন।

কৃষ্ণকিশোরের মুখে ফুটে ওঠে গাম্ভীর্য। অপমান বোধের কাঠিন্য। কথা বলে না কিছু। চোখে তির্যক দৃষ্টি ফুটিয়ে হেড-নায়েবের কথা শোনে।

হেড-নায়েব কথা না থামিয়ে বলে যান। বলেন,—হুজুর অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাসা করি, টাকার প্রয়োজন হ'ল কেন? কাছারী থেকে টাকা চাইলেই তো পাওয়া যায়। হুকুম করলেই পাওয়া যায়। বিশ, পঁচিশ, দু'শো, পাঁচশো, শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না নায়েব মশাই। দু'শো-পাঁচশো হ'লে চলবে না। টাকা চাই হাজার বিশেক। বিশেষ প্রয়োজন।

মুখ থেকে হাসি মুছে সহজ কণ্ঠে বললেন হেড-নায়েব,—তবে তো কথাই নেই। ঠিক আছে। টাকা যখন চাই তখন,—ঠিক আছে হুজুর, ঠিক আছে। বিষয়টা হুজুর এক কথায় ঘুরিয়ে দিয়েছি আমি। ব'লে দিয়েছি টাকা জরুর চাই, নইলে—

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ থেকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—আপনি পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু কেউ যেন না জানতে পায়। ফাঁস হ'য়ে না যায়। কে খোঁজ করতে এসেছিল?

হেড-নায়েব হাতে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন,—হুজুরের দয়া। তৃতীয় ব্যক্তি যদি কেউ জানতে পায় তখন হুজুর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে দেবেন আমার। যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেবো আমি। আপনাদের পুরাতন ভৃত্য অনন্তরাম খোঁজ ক'রে গেল আমার কাছে।

কৃষ্ণকিশোর কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। মুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে শোনে হেড-নায়েবের কথা। হেড-নায়েব বললেন,—তবে হুজুর যাই আমি?

—হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর—আপনি অনুগ্রহ ক'রে অনন্তকে দেখতে পাঠান গেরস্থের কাছে। আহারাদির কত দূর কি করলে। ভাল লাগছে না আমার। ওদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি আমি।

—হক্ কথা বলেছেন হুজুর। সময় নেই অসময় নেই গান-বাজনা ভাল লাগে কখনও? আমি হুজুর এই মুহূর্তে পাঠাচ্ছি অনন্তকে। জেনেই বলছি।

কথার শেষে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন হেড-নায়েব।

অপলক চোখে কেন কে জানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর। হঠাৎ যেন চোখে পড়ে কুচবরণ এক কন্যা। অদূরের এক গৃহের উপরের এক জানলায়। আইভিলতা দাঁড়িয়ে জানলায়। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে আইভিলতার এলো কেশের বোঝা। যেন দেখতেই পায়নি আইভিলতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে হারিয়ে চলে গেছে যেন অন্য কোথায়। অন্য কোনখানে।

রাজেশ্বরী খোঁজ করিয়েছে অনন্তরামকে পাঠিয়ে।

ভাবতে থাকে কৃষ্ণকিশোর। অপমান বোধ করে মনে মনে। হেড-নায়েবের প্রতি খুশীতে ভ'রে যায় মনটা। বিষয়টা ঘুরিয়ে নিয়েছেন তিনি উপস্থিত বুদ্ধির প্রাখর্য্যে। আইভিলতা বিবাগীর মত চেয়ে আছে দৃষ্টিহীন চোখে। আরও যেন ফর্সা হয়েছে আইভিলতা। মোটা হয়েছে। ছিল শ্বশুরালয়ে, ক'দিনের জন্য এসেছে পিত্রালয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বৈঠকখানায় চ'লে যায়। ফরাসে গিয়ে বসে। লাল ভেলভেটের তাকিয়া টেনে নেয় একটা। ভাবে, রাজেশ্বরী অনন্তরামকে পাঠিয়ে খোঁজ করিয়েছে কাছারীতে। বেহাগ রাগের সুর কানে পৌঁছয় না হয়তো। তবলার বোল শুনতে পায় না। ফ্লুট না ক্ল্যারিওনেটের মিষ্টি আওয়াজ।

—বৌদিদি!

—কে, অনন্ত?

—হ্যাঁ বৌদিদি। তুমি মিথ্যে পাঠিয়েছিলে আমাকে। কাছারীতে খোঁজ করলাম আমি। নায়েব মশাই বললেন, টাকা না পাওয়া গেলে এক সালের খাজনা বাকী পড়বে। অনন্তরাম কথা বলে খাঁব চাপা কণ্ঠে।

কথা ক'টি শুনে চোখে হয়তো আনন্দাশ্রু দেখা দেয়। রাজেশ্বরী কথা শোনে রুদ্ধশ্বাসে। আয়ত আঁখিযুগল বিস্ফারিত ক'রে। শুনে লজ্জিত হয় কি না কে জানে! অশ্রুমাখা মুখে হাসির আভাষ। বলে,— সত্যি অনন্ত?

—হ্যাঁ বৌদিদি। কথাটি নিছক সত্য। খুশীভরা কণ্ঠে উত্তর দেয় অনন্তরাম। বলে, গিয়েছিলাম অন্য কারও কাছে নয়। খোদ নায়েব মশায়ের কাছে। তিনিই বললেন বিস্তারিত। বললেন যে, এক সালের বাকী খাজনা না দিলে মুস্কিল হবে।

দুই চক্ষু মুদিত করে রাজেশ্বরী। গেরিমাটি রঙের শাড়ীতে দেখায় বুঝি তপঃক্লিষ্টার মত। মনে মনে প্রণাম করে রাজেশ্বরী গৃহদেবতাকে। চক্ষু মুদিত ক'রে থাকে কতক্ষণ। ভাবে, পূজা পাঠাবে কি না নাট-মন্দিরে। বলে,—আঃ বাঁচলাম। তুমি যাও অনন্ত। বাঁচালে আমাকে। আমি ভাবছি কত কথা। তুমি যাও, দেখো বামুনদিদি কত দূর কি করলেন।

অনন্তরামের কথাগুলি শুনে মনে মনে হয়তো লজ্জা বোধ করছিল রাজেশ্বরী। মিথ্যা ভেবেছিল কত কথা। মিথ্যা মনের ভুলে। দেরাজের ওপরে ছিল কতগুলো বই। দু'পাশে বুকষ্ট্যাণ্ড, মধ্যিখানে বই। প্রীতি-উপহার পাওয়া বই। বুক-ষ্ট্যাণ্ড দু'টোয় ছিল দু'টো শ্বেত পাথরের প্যাঁচা। লক্ষ্মী প্যাঁচা।

একটা বই টেনে নেয় রাজেশ্বরী। বই হাতে বসে খাটের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার এক পাশে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়তে থাকে রাজেশ্বরী। কাঁটালপাড়ার ছাপা। এতক্ষণে সুস্থির হয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। 'কপালকুণ্ডলা' পড়ে।

"সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসে রাত্রিশেষে একখানি যাত্রির নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল—"

মনের ঝড় থেমে গেছে যেন রাজেশ্বরীর। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এতক্ষণে।

বই খুলে বসতে পেরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বই। উপন্যাস বই। কি একটা গল্প পড়েছিল রাজেশ্বরী, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। প'ড়ে কি ভালই না লেগেছিল। শেষ না ক'রে উঠতে পারেনি। প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিল বঙ্কিমের অন্যান্য গল্প ক'টাও পড়বে একে একে। 'কপালকুণ্ডলা' পড়ছিল রাজেশ্বরী। পড়তে পড়তে ভাবছিল, বাঙলায় এত কথা থাকতে ইংরাজী কথা লিখলেন কেন বঙ্কিমচন্দ্র—যা পড়ে বুঝতে পারে না রাজেশ্বরী। প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ ক'রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভে ইংরাজীতে কি লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র? প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথম কথা ইংরাজীতে কেন? পরিচ্ছেদের আগে আগে বঙ্কিম বাবু জুড়ে দিয়েছেন সেক্সপীয়র, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের একেক পঙ্‌ক্তি। কত চেষ্টা ক'রেও রাজেশ্বরী পড়তে পারে না কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ইংরাজী কথাটি:

"Ingratitude! Thou marble-hearted fiend."

—King Lear.

'কপালকুণ্ডলা' পড়তে পড়তে কান পেতে থাকে রাজেশ্বরী। কোথায় কে কথা বলছে না? মাথায় গুণ্ঠনটা টেনে দেয় রাজেশ্বরী; যদি কেউ আসে। তিনি কথা বলছেন কি? রাজেশ্বরী কান পেতে থাকে। কোথায় কে? মনের ভুল, শুনতে ভুল করেছে। ভয় আর আশঙ্কায় কেমন হয়ে গেছে যেন রাজেশ্বরী। তবুও গুণ্ঠনটা টেনে দেয়। ঘোমটা টেনে পড়তে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কি লালিত্য, ভাবে কত নৈপুণ্য, গল্পের বিষয় কি রোমাঞ্চকর!

কোথায় কে? শুনতে ভুল করে রাজেশ্বরী।

তিনি তো মজলিসে। গানের আড্ডায়। বাজনার ঘরে। লাল ভেলভেটের তাকিয়া ঠেস দিয়ে কৃষ্ণকিশোর গান শুনছে, না ভাবছে কিছু? গহরজানের আকুল মিনতি, কখনও ভুলতে পারে কেউ? ডালিমের বিয়ের টাকাটা হাতে পেলে কত খুশীই না হবে গহরজান। হাসবে কত, মুক্তোঝরা হাসি। লজ্জার বাঁধ ভেঙে যাবে গহরজানের। আর—

হাজার হাজার নয়, একশো টাকার কাগজের নোটটা পেয়ে খুশীভরা মনে তখন সিক্ত কেশের জট ছাড়াতে বসেছিল গহরজান। গঙ্গা থেকে ফিরতেই নোটটা সৌদামিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল,—দেখো মাসী, ওজগার করেছি।

সৌদামিনী আহ্লাদে উপচে প'ড়ে বলেছিল,—কোথেকে পেলি? দিলে কে বল্?

খিল খিল ক'রে হেসে ফেলেছিল গহরজান। হাসতে হাসতে চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। লুটিয়ে প'ড়েছিল। ব'লেছিল,—দেখো না যেয়ে ঘরে, কে ঘুমোচ্ছে!

সৌদামিনী বিরক্ত হয়ে বলেছিল,—হেঁয়ালী ছাড়, বল্ কে দিলে?

হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল গহরজান। বিশ্বাস করে না সৌদামিনী গহরজানের কথা। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গহরজান ব'লেছিল,—ঝুটা বাত আমি বলি না। বেশ তো তুমি যেয়েই দেখো। দরোয়াজা খুলতে মানা ক'রেছে। টাকা দিয়ে শুধু ঘুমোতে চায়।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সৌদামিনী, ঘোলাটে চোখে। বুঝতে পারে না গহরজানের কথা না ঠাট্টা। বিশ্বাস হয় না। শেষে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দু'দরজার ফাঁক থেকে দেখে, সত্যিই ঘরে কে। বিশ্বাস হয় না, ভাল ক'রে দেখে সৌদামিনী। দেখে ঘরের মানুষটিকে।

সৌম্যকান্তি গৈরিকধারী কে ঘুমোচ্ছে ঘরের তক্তপোষে। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে আছে। দরজা থেকে ফিরে গিয়ে বললে সৌদামিনী,—কে বল্ তো গহর?

গহরজান বিরক্ত হয়ে বললে,—কে জানে কে! টাকা হাতে পেয়ে তবে ঢুকতে দিয়েছি ঘরে। এখন তুমি বোঝ। লোকটা চাইলে না কিছু। বললে, আমি ঘুমোতে চাই। ঘুম ভাঙলে রুটি আউর মাংস খেতে চেয়েছে।

দন্তহীন মাড়ি বের ক'রে হেসে ফেললে সৌদামিনী। সৌদামিনীর আপাদ-মস্তক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো হাসির বেগে। হাসতে হাসতে বললে,—কে বল্ তো?

গহরজান বললে,—তুমি চেনো না, আমি চিনবো? কথা বলতে বলতে ডালিমকে বুকে তুলে নেয়। বলে,—আমি চললাম ঘুমোতে। ডেকো না আমাকে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

ঘুম চাই। উপোষী চোখ থাকলে মাথার ভেতরটা যেন কেমন করতে থাকে। দপ্-দপ্ করতে থাকে কপালের দু'পাশ। দিনে না ঘুমোলে রাতে জাগবে কেমন ক'রে? ঘুম চাই। বর্ষাদিনের হিম-শীতলতায় ঘুম-ঘুম পায় গহরজানের। নেশার মত লাগে যেন। চোখ জড়িয়ে আসে। গহরজান যেতে যেতে ভাবে, না যাবে না, লাখো টাকা দিলেও যাবে না অন্য কারও কাছে। থাকবে, বাঁধা হয়ে থাকবে। বারোয়ারী হয়ে যাবে জনের কাছে লুটিয়ে দেবে না নিজেকে। বিকিয়ে দেবে, যে টাকা দিয়েছে, যার কাছে পেয়েছে কিছু সোহাগ।

সোহাগের লোক তখন লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে-ছিল মজলিসে।

হেড-নায়েব দরজায় দেখা দিয়ে ডাকেন,—হুজুর!

আবার কেন ডাকে হেড-নায়েব! চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কিছু বলছেন?

হেড-নায়েব বললেন,—হুজুর, জায়গা হয়ে গেছে। আহারাদি প্রস্তুত হয়ে গেছে।

হয়তো ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিল গাইয়ে-বাজিয়ের দল। বাজনা থেমে যায়। গানও সঙ্গে সঙ্গে থামে। জহর বললে,—ডিমের খিচুড়ী হয়েছে তো?

পান্না বললে,—ডিমের বাটা বলেছিলাম মনে আছে?

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল কতক্ষণে বিদায় হবে পিসীর ছেলেরা আর সাঙ্গো-পাঙ্গরা। বললে,—জানি না, চল্, খাবি চল্।

ঘড়ি-ঘরে ঘন্টা পড়তে থাকে ঢং-ঢং। কলের ভোঁ বাজতে থাকে। গানের ঘর শূন্য হয়ে যায়। অসহায়ের মত প'ড়ে থাকে বাজনা। লাল ভেলভেটের তাকিয়া। গোলাপপাশ। পানের ডিবে।

কলের ভোঁ বাজতে থাকে থমথমে দুপুরের তন্দ্রা টুটে দিয়ে। ঘড়ি-ঘরের ঢং-ঢং শেষ হতে চায় না যেন। কলের ভোঁ থামে না। কতক্ষণ ধ'রে বেজে যায় থমথমে স্তব্ধ দুপুরের তন্দ্রা টুটিয়ে।

লক্ষ্মী-অন্নপূর্ণার দেশে জন্মেছে ব্রাহ্মণী। উদ্বৃত্তের দেশে।

গোলাভরা ধানের দেশ, শস্য-শ্যামলা বাঙলা দেশ। উনুনের আঁচে দগ্ধ হয়েও প্রস্তুত করেছে কত কি। কত আহার্য্য। হিঙের গন্ধ আর জাফরানের রঙে রন্ধন-ঘরের অন্য এক শোভা হয়েছে। দশভুজার মত দশ হাতে বুঝি পলকের মধ্যে তৈয়ারী করেছে এটা-ওটা-সেটা। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, কুমুদিনীর মনের মত সাজানো ভাঁড়ার, যা চাইবে তাই মিলবে। অভাব নেই উপকরণের। একসঙ্গে কতগুলো উনুনে আগুন প'ড়েছে। কোনটায় ডেকচী আর কোনটায় কড়াই চেপেছে। গনগনে আঁচে ঘাম ঝরছে ব্রাহ্মণীর। এক মুহূর্ত্ত অপচয় করলে চলবে না। ধ'রে যাবে ডালের হাঁড়ী, পুড়ে যাবে শাকের তরকারী। চোখে-কানে যেন দেখতে পায় না ব্রাহ্মণী। শাক ফেলে কি না ফেলে। পরিমাণ ভুল হয়ে যায় যদি। নুন বেশী আর ঝাল কম হয় যদি। ভাজা মাছ যদি ধ'রে যায়। ক'রে যায় অম্বল। টক যদি না হয় চাটনি। হাতে-হাতে যোগান দেয় ক'জন দাসী। হাতের কাছে এগিয়ে দেয় বাটনা-মশলা। ফোড়নের উগ্র গন্ধে চোখে জল ঝরে ব্রাহ্মণীর। কখনও হাঁচে, কখনও কাশে। ধাপনির জল চালে গলদা চিংড়ীর সোনাগুড়ে।

ক'বার তাড়া দিয়ে গিয়েছিল অনন্তরাম। বলেছিল,—রাত্রী ভোর করবে না কি তুমি বামুনদি? লোক-জন চ'লে গেলে তখন খাইও বেড়ে কাকে খাওয়াবে! তোমার নষ্টে-চক্কটে বেলা কাবার হয়ে গেল দেখছি।

ঘর্মাক্ত কপাল ভিজে গামছায় মুছতে-মুছতে বলে ব্রাহ্মণী,—অনন্ত, তুমি কানের কাছে এমন আজে-বাজে বকনি বলছি-! পুড়িয়ে মারতে চাও?

অনন্তরাম কথায় দুঃখ ফুটিয়ে বলে,—আগ কর' কেনে, হুজুর যে তাড়া লাগিয়েছে উদিকে। ক্যাতক্ষণ লাগবে তুমিই বল' না?

তখন ইলিশ মাছের দই-মাছ রাঁধছিল ব্রাহ্মণী। আদা-হলুদ ছাড়ছিল কড়াইয়ে। কাঁচা তেল ঢালছিল। বললে,—জায়গা করাওগে না তুমি। ডাকব'খন আমি।

অনন্তরাম বললে,—জায়গা হয়ে গেছে। পাতে দেওয়ার অপিক্ষা শুধু।

ব্রাহ্মণী বললে,—দু' দণ্ড দাঁড়াও। দই-মাছটা হ'লেই—

—এ যে বাবা আশীর্বাদের খাওয়া!

খাওয়ার ঘরে ঢুকেই বললে হেমনলিনীর ছেলেরা। বিস্মিত হয়ে গেল আহারের জোগাড় দেখে। কতগুলো বাটিতে কত কি দেওয়া হয়েছে। বগি থালায় সাজানো কত ব্যঞ্জন। আমিষ্টী পোলাও-কালিয়া থেকে ফকিরী শাকান্ন। গোবিন্দভোগ ভাতের চূড়ায় রূপোর বাটিতে গব্যঘৃত। বগি থালায় উচ্ছে-চচ্চড়ি থেকে আছে হয়তো তপসি মাছের ঘি-তপসি। নটে শাকের বাটি-চচ্চড়ি থেকে বেগুনের কলকি। আর বাটিতে মুগ-ডাক্তা। ডাল, ঝোল, কালিয়া। চিংড়ীর বালুচাও। লাউ দিয়ে কাঁকড়া। কোর্মা-কারি। মিটুলীর দোপেঁয়াজা। শাক দিয়ে মাংস।

ব্রাহ্মণী ভোজনবিলাসী বাঙালী। হাড়-যশে ক'রে খাচ্ছে। প'ড়েছে না শুনেছে হয়তো কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত—কবিকঙ্কণের চণ্ডী—রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন। শিখেছে কার কাছে কে জানে, বেশ পাকাপাকি আয়ত্ত করেছে রন্ধনশিল্প। খুনিখিচুড়ী থেকে শাহীকাবাব পর্যন্ত রাঁধতে জানে। মাছ-মাংস থেকে পুলিপিঠে পর্যন্ত।

—খালি পেটে খাওয়া যায় কখনও?

হেমনলিনীর ছেলেদের দলের মধ্যে থেকে মন্তব্য কাটল কে যেন।

জহর আর পান্না হাসলো একসঙ্গে। জহর বললে,—যথার্থ কথা। এক-আধ পেগ পেটে পড়লে দেখা যেতো খাওয়া কাকে বলে!

—হক্ কথা বললি বটে!

দলের মধ্যে থেকে কে যেন বললে।

হাসির রোল প'ড়ে গেল ঘরে। অট্টহাস্যরোল।

আপ্যায়িত করে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—মা তো নেই, লজ্জা ক'রে খেও না যেন জহর পান্না।

জহর বললে,—তোকে বলতে হবে না! এমন খাবো যে পিঁপড়ে কেঁদে যাবে।

অন্দরের ঘর। এমনিতেই অন্ধকার থাকে। দেওয়ালে দেওয়ালে জ্বলছিল একটা দেওয়াল-গিরি। দিনের বেলাতেও। এক কোণে তাঁবেদার দাঁড়িয়ে রাম-পাখা চালাচ্ছিল। কৃষ্ণকিশোর বললে,—জোরে পাখা করছ না কেন? বাবুদের যে গরম লাগছে!

তাঁবেদারের পাখার গতি দ্রুত হয়ে ওঠে হঠাৎ। ঘরে যেন ঝড় বইতে থাকে। মাছির ঝাঁক উড়ে পালিয়ে যায়। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খানা চলতে থাকে। হাসি-মস্করা চলতে থাকে। উত্তম ব্যঞ্জনের তারিফ করে কেউ কেউ।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে! কলের ভোঁ বাজতে বাজতে কখন থেমে গেছে। পরিচ্ছন্ন আকাশে শরৎ-দিনের ছিন্নভিন্ন শুভ্র রূপালী মেঘের ভিড় জমতে থাকে। অন্দরের ঘর, মধ্যদিনের সূর্যালোকেও বিদূরিত অন্ধকার ঘোচে না। রাম-পাখার হাওয়ায় দেওয়াল-গিরির শিখা কাঁপছে থিকি-থিকি।

মাকে মনে প'ড়ে যায় কৃষ্ণকিশোরের। আশৈশব যার কোলে লালিত-পালিত হয়েছে, যার স্নেহে আর যত্নে দিনে-দিনে গ'ড়ে উঠেছে, সেই কুমুদিনীকে। কুমুদিনীর শান্ত সৌম্য মুখাকৃতি ভেসে ওঠে চোখে; কুমুদিনীর মুখের পবিত্র মৃদু-হাসি। কেন কে জানে, মনটা যেন অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠছে থেকে-থেকে। কোথায় এখন মা। কোথায় কুমু। কুমুদিনী?

কাশীর ঢুণ্‌ঢীরাজ গণেশের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য চাপিয়ে মুদিত-চক্ষে ও করজোড়ে দাঁড়িয়েছিল কে এক যোগিনী—মুখে যাঁর কষ্টভোগের মালিন্য? কোটরগত আঁখির নীচে প'ড়েছে যাঁর কালির লেপন? যাঁর শরীর কৃশ? রুক্ষকেশ? বাহুতে ঝুলছে পেতলের সাজি। সাজিতে ফুল-চন্দন।

—মাজী, বাবাকে দেখবেন না? হাম লে যাবে, ভিড় বহুৎ আছে। বাবাকে দর্শন করবে, মাথা স্পর্শ করবে। চলিয়ে মাজী। কুছ্‌ ডর নেহি।

রুদ্র-তপস্বীর পেছনে কথা বলে মন্দিরের পাণ্ডা। চোখে লোভাতুর দৃষ্টি ফুটিয়ে কথা বলে। কাকুতি-মিনতি করে।

অগুরু ধূপের গন্ধ আসে কোথা থেকে। ফুল আর চন্দনের গন্ধ। কর্পূরের গন্ধ।

কত কথা ব'লে যায় ঐ যোগিনী। কত মন্ত্র আওড়ায়। অশ্রুসিক্ত লোচনে কত অনুরোধ জানায়। মন্দির-পথের কোলাহলে কোন বিরক্তি লাগে না। ধ্যানস্তিমিত চোখে পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে পূজারিণী, বিড়-বিড় ব'কে যায়।

বলে,—হে গৌরীপুত্র, তুমি আমার সকল বিঘ্ন নাশ কর, তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে মহাজ্ঞানী, আমার অজ্ঞান মোচন কর, তোমাকে

আমি প্রণাম করি। হে অভয়, আমার ভয় দূর কর, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

গণপতি গণেশের মুখে কথা ফোটে না। অপলক হতীচক্ষু।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এখনও এক গণ্ডূষ জল পর্যন্ত খাওয়া হয়নি কুমুদিনীর। কখন হবে কে জানে! বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণাকে যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়নি এখনও।

মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে-ফাঁকে পুত্র আর পুত্রবধূকে মনে জাগে। বৌটা কেমন আছে কি জানি, ভাবেন কুমুদিনী। বুকের ভেতরে পাঁজরা ক'টা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। চোখ দু'টো জ্বালা করে কেন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটা। কুমুদিনী মন্দির-পথ ধ'রে ধীরে-ধীরে এগোতে থাকেন। পা দু'টো কাঁপতে থাকে বুঝি। সাজিটা বাহু থেকে প'ড়ে যাবে না তো।

বৌ তখন বঙ্কিম বাবুর 'কপালকুণ্ডলা' পড়তে-পড়তে বিভোর হয়ে প্রায় আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। পড়ছে তো পড়ছেই। রাজেশ্বরী পড়ছিল :

কাননতলে

"—Tender is the night,

And haply the Queen moon is on the throne,

Clustered around by all her starry fays,

But here there is no light." —Keats.

বাঙলায় এত কথা থাকতে বঙ্কিম ইংরাজী কথা জুড়েছেন কেন মরতে! রাজেশ্বরী পড়তে গিয়ে বিরক্ত হয়। বিদেশী ভাষা বুঝতে পারে না যে।

হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব হয় এলোকেশীর।

ঢুকে পড়ে হঠাৎ ঝড়ের মত! এলোকেশীর হাতে কাচা কাপড়। রাজেশ্বরীর ছেড়ে-দেওয়া জামা, কাপড়, সায়া, কাঁচলী। শুকিয়ে গেছে, কোথা থেকে তুলে এনেছে এলোকেশী। আলনায় তুলে রাখবে। এলোকেশী বললে,—ভাখ্ রাঙো, কে এয়েছে ভাখ্।

—কে না, কে এলো?

'কপালকুণ্ডলা' রেখে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। পালঙ থেকে উঠে দাঁড়ায় মেঝেয়। গভীর-নীল রঙের একটা ছোট কার্পেট পাতা ছিল মেঝেয়। উঠে দাঁড়িয়ে ঘোমটা খোঁজে রাজেশ্বরী। বৌ মানুষ, কে না কে এসেছে। বলা নেই কওয়া নেই, এসে পড়েছে খাস-কামরায়।

পায়ে তোড়া। ঝম-ঝম শব্দ বাজে কাছেই। চলনের শব্দ। কে আসছে। তোড়া পায়ে কে আসে? রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা ক'রে থাকে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা, তোড়ার শব্দ শেষে ঘরে পৌঁছয়। একটি কিশোরী। ফুটফুটে মেয়ে একটি। কুমারী, কিশোরী।

অবাক-চোখে চেয়ে থাকলো রাজেশ্বরী।

ফুলের মত মেয়েটিও কাজল-কালো চোখ মেলে আছে। দেখছে না দেখাতে এসেছে? রাজেশ্বরী ভাবলো, না সত্যিই কখনও দেখা পাওয়া যায় না এমনটি। এ যে দুর্লভ! অদৃষ্টপূর্ব্ব!

—বৌদি! ব'লে ফেললে কথা, ঐ কিশোরী। আধো-আধো গলায়।

—বল' ভাই! কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলো রাজেশ্বরী। অচেনা মেয়েটির একটি হাত ধ'রলো সস্নেহে।

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল মেয়েটি। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। আলতা-রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে কথা উঁকি মারে। বলে,—বৌদি, জ্যাঠাইমা বললেন যে—বললেন যে, আজ রেতে তুমি আমাদের বাড়ীতে খাবে। আজ পুণ্যের দিন আমাদের। লোকজন খাবে। জ্যাঠাইমা ব'লে দিলেন—যে—

মেয়েটির মুখে কথা যেন যোগায় না। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে। রাজেশ্বরী মেয়েটির হাত ধ'রে বসালো কার্পেটে। বললে,—তুমি কে? জ্যাঠাইমা কে? আমি তো চিনি না?

কি উত্তর দেবে এ কথার। মেয়েটি পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। দেখে হয়তো রাজেশ্বরীকে।

পুণ্যাহের দিন বড়বাড়ীতে। লোকজন খাবে।

খাবে যত আত্মজন। দূর আর নিকট সম্পর্কের যত আত্মীয় খাবে এই উৎসবে। গমস্তা আর আমলাদের খাওয়ানো হবে। পাড়া-পড়শী-দেরও কেউ কেউ খাবে। পুণ্যাহ—পুণ্যকর্ম্ম করতে হয় যেদিন, জমিদারীর খাতা-পত্তন করতে হয় যেদিন। এক বেলা কলার আর আরেক বেলায় যত ভাল-মন্দ খাওয়া। সমস্ত দিন ধ'রে লোক খাবে বড়বাড়ীতে। ভিয়েন বসেছে ক'দিন আগে থেকে। মেঠাই, দরবেশ, বঁদে আর খাজা তৈরী হয়েছে।

মফঃস্বলের কাছারীতেও উৎসব আজ। কাছারীর ফটকে ভাব-কলসী আর কলাগাছ বসেছে। দড়িতে ঝুলবে আম্র-পল্লব আর সোলার কদম ফুল। প্রজাদের খাওয়ানো হবে। রাধাবল্লভী আর আলুর দম। দই আর মিষ্টি। যে যত পারবে খাবে!

—তুমি বুঝি ঐ বড়বাড়ীর মেয়ে?

মুখে হাসি ফুটিয়ে রাজেশ্বরী শুধোয়।

মেয়েটি বললে,—হ্যাঁ, আমি সেজো বাবুর মেয়ে। আমার নাম মাধবীলতা। জ্যাঠাইমা আমাকে পাঠালেন বলতে। জ্যাঠাইমা বলতে বলেছেন, তুমি যেন বেশ ভাল গয়না-গাটি প'রে যেও। অনেক মেয়ে-বৌ আসবে ও-বেলায়।

—কার সঙ্গে যাবো? বললে রাজেশ্বরী। ফিস-ফিস বললে,—তোমার দাদা যাবে না?

মাধবীলতা বললে,—হ্যাঁ যাবে। দাদাকে ব'লতে এসেছে জ্যাঠাইমার ছেলে। সদরবাড়ীতে বলছে দাদাকে। তুমি যাবে তো বৌদি?

—হ্যাঁ যাবো। জ্যাঠাইমা ব'লে পাঠিয়েছেন, যাবো না? বললে রাজেশ্বরী। বললে,—তুমি একটু বসবে? আমি কাপড়টা কুঁচিয়ে নি আসছি।

মাধবীলতা বলে,—কোথায় যাচ্ছো? আমি যাই এখন। মা বলেছে যাবে আর আসবে। বাড়ীতে অনেক কাজ।

হেসে ফেললে রাজেশ্বরী। শব্দহীন হাসি। বললে,—আমিও যাবো আর আসবো। তুমি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর'।

ঘরে একা মাধবীলতা, দেখে ইতিউতি। দেওয়ালের ছবি দেখে। ঘরের সাজসজ্জা দেখে। জানলার বাইরে আকাশ দেখে। আলমারীর আয়নায় দেখে নিজেকে। ঠোঁট উলটে-উলটে দেখে। ঠোঁটে আলতা আছে না নেই। টুকটুকে রাঙা ঠোঁট! কাচপোকার টিপ কপালে। সত্যস্নাত ঝাঁকড়া চুলে রেশমের ফিতা। লাল রঙের সিল্কের ফিতা, বো ক'রে বাঁধা। পাট-ভাঙা কাপড়, লাল রঙের। পাকা গিন্নীর মত দেখাচ্ছে কি মাধবীলতাকে? না অনাঘ্রাত ফুলের মত? কুমারী কিশোরী মাধবীলতা। শাড়ী, ফিতা আর আলতা, রক্তিম রঙে আরক্ত হয়ে ব'সে থাকে মাধবীলতা।

—দেখলে তো, আমি গেলাম আর এলাম? হাসি-মুখে বললে রাজেশ্বরী। ঘরে ঢুকে বললে,—তুমি ভাই বেশ! বেশ দেখতে তোমাকে।

কথা বলতে-বলতে কার্পেটে এসে ব'সলো। বললে,—তোমার নামটিও বেশ! তুমি কখনও বেড়াতে আসো না কেন এখানে?

—কার সঙ্গে আসবো? জ্যাঠাইমা যে আসতে দেবেন না। কোথাও যেতে দেন না। খুশী-খুশী কণ্ঠে কথা বলে মাধবীলতা। হয়তো রূপ-প্রশংসায় গর্ব্ব হয় মনে মনে।

কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজেশ্বরী।

কে জ্যাঠাইমা, কে মাধবীলতা, কে কার মা, জানে না সে। চেনে না কাকেও। কার সঙ্গে কার কি পরিচয়। কি কথা বলতে কি বুঝবে মাধবীলতা কে জানে, চুপ ক'রে যায় রাজেশ্বরী।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল এলোকেশী।

খোঁপায় আঙুল চালিয়ে উকুন মারছিল মাথার। রাজেশ্বরী কাছাকাছি গিয়ে চুপি-চুপি ব'লে এসেছে,—এক রেকাবী খাবার চাই এলো। বামুনদিকে বল্‌, ভাঁড়ার থেকে দেবে সাজিয়ে। রুপোর ডিস-গেলাসে দিতে বলবি।

মাধবীলতা বললে,—জ্যাঠাইমা ব'লে দিয়েছেন পাল্কী পাঠিয়ে দেবেন। সকাল সকাল যেতে বলেছেন তোমাকে। বিকেলে পাল্কী আসবে।

—তুমি থাকবে তো? শুধোয় রাজেশ্বরী।

—হ্যাঁ, থাকবো। তোমার জন্যে, দাঁড়িয়ে থাকবো আমি। বললে মাধবীলতা।—এখন আমি যাই তবে?

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো এলোকেশী। রেকাবী আর জলপাত্র বসিয়ে দিলে কার্পেটে। রাজেশ্বরী বললে,—যাবে তো, মিষ্টি-মুখ ক'রে তবে তো যাবে? না খেলে আমি যে দুঃখ পাবো মনে।

মিটি-মিটি হাসে মাধবীলতা—মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। টুকটুকে লাল ঠোঁটের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা দেয় শুভ্র দন্তপাঁতি। মাধবীলতা গয়না পরেছে কয়েকটা। হাতে ক'গাছি চুড়ি, কণ্ঠহার, কর্ণফুল। গয়নায় রঙীন রত্ন—চুনী পান্না মুক্তো। নাকে নোলক দুলছে, শিশিরবিন্দুর মত। মাধবী-লতা বললে,—আমি তবে একটা মিষ্টি খাচ্ছি। তুমি মনে কষ্ট পাবে—

—বেশ তো, তুমি যা পারো খাও। কিন্তু না খেলে চলবে না ভাই! ছাড়বো না আমি। রাজেশ্বরী কথা বলে বক্ষের গাম্ভীর্যে বললে,—তুমি এখনই চলে যেতে চাও? থাকো না এখানে কিছুক্ষণ?

মিষ্টি মুখে দেয় মাধবীলতা। মতিচুর না মনোহরা খেতে খেতে বলে,—কত কাজ বৌদি বাড়ীতে! থাকতে পারি আমি? কাজ করতে হবে না আমাকে?

হেসে ফেললে রাজেশ্বরী। কাজের কথা শুনে বিশ্বাস হয় না। মাধবীলতা কি কাজ করবে? বলতে হয় তাই বোধ হয় বলছে। সাজানো কথা বলছে। তৈরী কথা। খিল-খিল হাসতে-হাসতে রাজেশ্বরী বলে,—তুমিকরবে কাজ? কি কাজ ভাই? পেটের ছেলেকে ঘুম পাড়াবে বুঝি?

লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যায় যেন ননদিনীটি। বলে,—যোৎ, তাই বললাম? কত কাজ বলো তো আমার? পাতা মুছবো, পান সাজবো শ'য়ে-শ'য়ে, জ্যাঠাইমা কত ফাই-ফরমাশ করবেন! ব'লবেন যে মাধু, কুটো ভেঙে দু'খানা করলি না? তখন?

নকল গম্ভীর হয় রাজেশ্বরী। চোখ দু'টোকে বড় ক'রে বলে,—তবে আর ভাই ধ'রে রাখবো না। তোমাকে যে হেঁশেল আগলাতে হবে কে জানতো বল'?

মাধবীলতা লজ্জায় কাতর হয়। যা নয় তাই বলছে বৌঠাকরুণ। জল খেয়ে কণ্ঠ ভিজিয়ে নেয়। বলে,—যাঃ, হেঁশেল আগলাবে তো সেজো কাকীমা। আমি শুধু পাতা মুছবো, পান সাজবো।

শাড়ীর আঁচল এগিয়ে দেয় রাজেশ্বরী। বলে,—মুখ মোছ', হাত মোছ'। জ্যাঠাইমাকে ব'ল, হুকুম যদি পাই নিশ্চিত যাবো।

—কে দেবে হুকুম? কুমু জ্যাঠাইমা তো কাশীবাসী হয়েছেন। তবে? কথায় অজ্ঞতা ফুটিয়ে কথা বলে মাধবীলতা।

রাজেশ্বরীর মুখে সহসা আঁধার নামে বুঝি।

হাসি-খুশী মুখ ছিল, পলকের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল হাসি। কি দুর্ভাগ্য, শাশুড়ী থাকতেও রইলো না! চ'লে গেল ধরা-ছোঁওয়ার ঊর্দ্ধে। পুণ্য অর্জন করতে গেল। এখানে ব'সে পুণ্যি হয় না, কাশী

চ'লে যেতে হয় কচি বৌটাকে ফেলে? দয়া-মায়া নেই মনে? পেছন ফিরে দেখতে নেই?

—তবে আমি যাই? বলতে-বলতে উঠে প'ড়লো মাধবীলতা। বললে,—জ্যাঠাইমা ব'লে দিয়েছেন পাল্কী পাঠিয়ে দেবেন, সকাল-সকাল যেও। ভাল-ভাল গয়না গায়ে দিয়ে যেও। কত মেয়ে আসবে, কত কে আসবে!

—বা এলো, পৌঁছে দিয়ে আয় মাধবীলতাকে। সদরে এগিয়ে দিয়ে আয়। বললে রাজেশ্বরী। কথা বলতে-বলতে সে-ও উঠে দাঁড়ালো। বিদায় দিলো হাসিমুখে।

বাইরের দালানে ছিল এলোকেশী। চুলে আঙুল চালিয়ে উকুন বাচছিল। মাধবীলতা তোড়া পায়ে ঝম-ঝম শব্দ তুলে চললো। নর্ত্তকীর মত চললো যেন নাচতে-নাচতে। আবীর-রাঙা শাড়ী মিলিয়ে গেল খিড়কির দরজায়। মৃদু থেকে মৃদুতর হ'ল তোড়ার ঝম-ঝম শব্দ। নর্ত্তকী যেন মঞ্চ থেকে চ'লে গেল নেপথ্যে।

একা-একা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

মন প'ড়ে আছে 'কপালকুণ্ডলা'র। রাজেশ্বরী পুনরায় বই খুলে ব'সলো। কিন্তু মন ব'সলো না পাঠে। খাওয়া-দাওয়ার কত দূর কি হ'লো কে জানে! বামুনদি কি করলে? ঠিক-ঠিক হ'ল, না হ'ল না। হয়তো কম পড়লো।

দেখতে-দেখতে বেলাও এগিয়ে চ'লেছে। সূর্য্যের আলো ম্লানহ'য়ে আসছে। বুকটা যেন শুকিয়ে গেছে রাজেশ্বরীর। ক্ষুধায় তাড়নায়। তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ছিল কত। সময়ে খাওয়া হ'ল না। মন ব'সছে না পড়ায়, তবুও উত্তেজনার বশে প'ড়তে থাকে রাজেশ্বরী।

"কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল সেও যেন দৌড়িল, এমন শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা-বৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন

গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল যেন, প্রাঙ্গণভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিলেন। সে সাগর তীরপ্রবাসী সেই কাপালিক!"

—হ্যাঁ গো বৌ, তুমি কি খাবে-দাবে না?

কথা শুনে চমকে উঠেছিল রাজেশ্বরী। তিমিরান্ধকারাবৃত গহন কাননমধ্যে ধাবমানা কপালকুণ্ডলার পিছু-পিছু রাজেশ্বরীর মনও যেন ছুটে চ'লেছিল। কানে শুনছিল গুরু-গুরু মেঘগর্জন। চোখে দেখছিল বিদ্যুৎ-চকিত আকাশ। বৃষ্টির জলে রাজেশ্বরীর শরীরও কি সিক্ত হয়ে গিয়েছিল?

গ্রীবা বেঁকিয়ে দেখলো রাজেশ্বরী। বললে,—হ্যাঁ, ক্ষুধায় আমার শরীরটা যেন ভেঙে প'ড়েছে বিনো। চল' খাইগে কিছু। যাঁদের খাওয়ার কথা তাঁদের খাওয়া কি শেষ হয়েছে?

বিনোদা বললে,—হ্যাঁ, এ্যাতক্ষণে এই খাওয়া চুকলো। তুমি এখানেই থাকো। সোয়ামী স্ত্রীতে মিলে একসঙ্গে খাও। আমি তোমাদের খাবার পাঠিয়ে দিই এখানে: এলোকে বল' ঢু'টো জায়গা করুক এই ঘরে।

—তিনি কোথায় বিনো দিদি?

লজ্জায় মাথা খেয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—বেলা কত হয়ে গেছে! আর কত বেলা হবে?

বিনোদা বললে,—এ্যাতক্ষণে চান করতে গেছে। ব'লে ব'লে পাঠিয়েছি আমি। পিসীর ছেলেরাও বিদেয় হয়েছে। ওঃ, খেয়ে গেল না তো, যেন তাণ্ডব নেচে গেল দলবল সঙ্গে ক'রে! কেমন বাপের ছেলে দেখতে হবে তো!

—ইয়ার মোসায়েব, দু'টি চক্ষে দেখতে পারি না আমি। বললে রাজেশ্বরী। মনের কথা ব'লে ফেললে।—পিসীমার ছেলেরা ভাল নয়, নয় বিনো দিদি?

—বলবনি বাবা, এ মুখ দিয়ে বলবো না। দেয়ালেরও কান আছে। কোথাকার কথা কোথায় যায় কেউ বলতে পারে? ছেলে দু'টি হতভাগা। মায়ের পোড়া-কপাল আর কি?

এলোকেশী ঘরে ঢোকে, মাধবীলতাকে পাকীতে তুলে দিয়ে আসে। বলে,—এ্যাই যে বিনো দিদি, তোমাকে খুঁজতেছি কত!

—কেন গা এলোকেশী? আমাকে আবার কেন? গুল ফুরিয়েছে বুঝি? বিনোদা কথা বলে সোহাগের স্বরে।

এলোকেশী একমুখ হাসে। বলে,—ঠিক ধ'রেছো দিদি! গুল থাক, দোক্তা আছে কাছে? গা-হাত কামড়াচ্ছে যেন। দাও, দু'টি দোক্তাই দাও।

'কপালকুণ্ডলা' আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে রাজেশ্বরীকে। চোখে দেখতে পায় আকাশের লক্লকে বিদ্যুৎশিখা। কানে শোনে বজ্রপাতের শব্দ। অঝোরে বারি ঝরে গভীর ডম্বিরবে। কপালকুণ্ডলা ছুটছে গহন কাননে বিজলীর ক্ষণপ্রকাশ আলোয়।

—বিনো, খাবার দিতে বল্। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কে কথা বললো? মাথায় ঘোমটা খোঁজে রাজেশ্বরী। না ব'লে-ক'য়ে ঘরে ঢুকে প'ড়েছে? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছে। ভুলে গেছে কপালকুণ্ডলাকে।

দাসী দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ।

বিনোদা আর এলোকেশী। কৃষ্ণকিশোর চিরুণীটা তুলে নেয়।

অস্ট্রেলিয়ার তৈরী চিরুণী। ব্রুশটাও নেয়। এ্যালবার্ট ফ্যাশনের চুলের তদ্বির করতে থাকে। ভিজে চুলে ফুলেল তেলের গন্ধ। ঘরে তখনও আছে এলিজাবেথ আর্ডেনের গার্ডেনিয়ার মোহমাখা সুগন্ধ। ফুলেল তেল হয়তো হবে শিউলী বা চামেলী। উগ্র গন্ধে গার্ডেনিয়াকেও লজ্জা দেয়।

দেওয়ালে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ভাঙা-মনে চেয়ে থাকে জানলার বাইরে। আকাশে রূপালী [illegible], ছিন্নভিন্ন মেঘের কল্লোল। আকাশ নীল।

—মাধু এসেছিল, ব'লে গেছে তোমাকে? বললে কৃষ্ণকিশোর চুলে ব্রুশ চালাতে চালাতে।

রাজেশ্বরী বললে শুষ্ক কণ্ঠে,—হ্যাঁ। নেমন্তন্ন ক'রে গেল। ব'লে গেল বিকেলে পাল্কী পাঠিয়ে দেবেন জ্যাঠাইমা।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—যেতে হবে তোমাকে আমাকে। নয়তো আমাদের পুণ্যের দিনে কেউ আসবে না। মাধুকে খাওয়ালে কিছু?

—মিষ্টি একটা খেয়েছে। খেতে চাইছিলো না কিছু। রাজেশ্বরী কথা বলে ধীরে ধীরে। ক্লান্ত স্বরে। বলে,—খাওয়া হবে না? বেলা কত হয়ে গেল!

—হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেছে। তুমি খেয়েছো?

ভ্রূদ্বয়ে ব্রুশ চালায় কৃষ্ণকিশোর। সূক্ষ্ম গুম্ফরেখায়। বলে,—তুমি এমন মনমরা হয়ে আছো কেন বল' তো? খুব ক্ষুধা পেয়েছে?

অভিমানের আবেগে কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারে না রাজেশ্বরী। সত্যিই যে বুকের ভেতরটা যখন-তখন ধড়ফড় করছে। কষ্ট হচ্ছে মনের গহনে কোথায়। চোখের কোণে জল দেখা দিচ্ছে। কত কথা উদয় হচ্ছে মনে মনে। সিন্দুকের টাকা খাজনা দেওয়ার জন্য চাই জেনে ক্ষণেকের জন্য রাজেশ্বরীর মুখে হাসি ফুটেছিল—কিন্তু সে-হাসি ঐ ক্ষণেকের জন্যই। বর্ষাকালের সূর্য্যের মত হঠাৎ দেখা দিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেছে।

রাজেশ্বরী বললে,—না, শরীলটা ভাল নেই।

বিনোদা কখন আসন পেতে দিয়ে গেছে। বসিয়ে দিয়ে গেছে দু'পাত্র জল। ব্রাহ্মণী খাবারের থালা দিয়ে যাবে। দালানে জায়গা হয়েছে।

—কাছারীতে তুমি খোঁজ পাঠিয়েছিলে?

মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—আমার কথা বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

লজ্জায় অধোবদন হয় রাজেশ্বরী। সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। রাজেশ্বরী ভাবে, বিশ্বাস করতে হয় মানুষকে। অবিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। বিশ্বাস হারাতে নেই। রাজেশ্বরী বললে,—আমাকে ক্ষমা কর'। ভুল ক'রেছি আমি। নানা রকম দেখে-শুনে—

আসল সত্য জানেন শুধু ঈশ্বর। কৃষ্ণকিশোর নকল হাসে। কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বলে,—তুমি কি ভাবলে যে ঘড়ার টাকা আমি চিবিয়ে খাবো?

আরও লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী—নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘামতে থাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। ধরা-পড়া চোরের মত স্তব্ধবাক্ হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণী খাবারের থালা বসিয়ে দিয়ে গেছে দালানে। বিনোদা ঘরে ঢুকে বলে,—আমার মাথা খাও, দু'টি-দু'টি মুখে দিয়ে নাও! দোহাই তোমাদের! জমিদারী চাল-চলন দেখলে হাড় জ্বলে যায়!

হেড-নায়েবের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায় কৃষ্ণকিশোর। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনি। পুরস্কার দিতে হবে তাঁকে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। হাতে রাখতে হবে লোকটিকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি কিন্তু খেয়ে-দেয়ে একঘুম দেবো। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

রাজেশ্বরী বললে,—বেশ তো, আমি জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিই। ঘুমিও তুমি।

—না না, তুমি কেন দেবে? বল' না বিনোদাকে। বলে কৃষ্ণকিশোর।

ঘরে সুগন্ধ। মোহমাখানো বাসি গন্ধ এলিজাবেথ আর্ডেনের গার্ডেনিয়ার। চোখে ঘুম না থাকলেও ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়। চক্ষু মুদিত হয়ে আসে, আলস্য লাগে দেহে। সত্যিই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে কৃষ্ণকিশোরের। রাত্রে ঘুম ছিল না চোখে কতক্ষণ। জাগিয়ে রেখেছিল গহরজান। বিদায় কালে ব'লেছিল, চোখে মিনতি আর কথায় অনুরোধের আবেগ ফুটিয়ে ব'লেছিল,—ভুলো মাৎ।

খেতে ব'সলো দু'জনে। মুখোমুখি ব'সলো।

কত রকমের ব্যঞ্জন আর আহার্য্য দিয়েছে ব্রাহ্মণী। ক্ষুধার তাড়না কেটে গেছে, মুখে কিছু তুলতে ইচ্ছা হয় না রাজেশ্বরীর। খায় কি না খায়। যেমনকার তেমনি পড়ে থাকে ভাত ডাল তরকারী। লজ্জা আর অপমানে কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে রাজেশ্বরীর। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। বিশ্রী লাগে এই পরিস্থিতি। রাজেশ্বরী মনে মনে ভাবে, যার যা খুশী করুক। সে বলতে যাবে না কোন কথা। জানতে চাইবে না কিছু। যেমন মানুষ তেমনি থাকবে।

—খাচ্ছো না তুমি? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী মুখে কিছু তুলছে না দেখে বলে।

—হ্যাঁ, খাচ্ছি তো। বললে রাজেশ্বরী, চাপা গলায় বললে। মিথ্যা কথা বললে। এখনও এক মুষ্টি ভাতও মুখে উঠলো না।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, ডালিমের বিয়ে বাবদ টাকাটা পেলে কি বলবে গহরজান। কত খুশী হবে। কত হাসবে!

—ফুল লিবি না মা?

গহরজানের ঘরের দরজার কড়া ন'ড়ে উঠেছিল তখন। ফুলওয়ালা

এসেছিল। উড়িয়া ফুলওয়ালা। ঝুলিতে ফুল নিয়ে ঘরে-ঘরে ফুল দিয়ে যায়। যে যেমন চায়। যুঁই, রজনীগন্ধা, করবী আর চাঁপা। ফুলওয়ালার ঝুলিতে আছে ফুলের গয়না, তোড়া আর খুচরো ফুল। ফুল দিয়ে যায় যে যেমন চায়, মাসান্তে দাম নিয়ে যায়। নামমাত্র মূল্য।

দরজা খুলতেই বললে ফুলওয়ালা,—ফুল লিবি না মা ?

—হ্যাঁ, জরুর লেবো। আচ্ছা ফুল দেবে আমাকে। বললে গহরজান।

—গয়না দেবো, না তোড়া দেবো ?

—তোড়া দাও। চাঁপা আউর রজনীগন্ধা আর লাল করবী দাও।

—লে না মা কত তুই লিবি। যা চাইবি পাবি।

ফুল তুলে রাখে গহরজান। লুকিয়ে রাখে। জলে ভিজিয়ে রাখে। এখন প্রয়োজন নেই ফুল। রাত্রে ফুল চাই। খোঁপায় জড়াতে হবে রজনীগন্ধার মালা।

ফুলওয়ালা চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার দেখলো গহরজান। একটা ঘরের শেকল-তোলা দরজার ফাঁক থেকে দেখলো। দেখলো ঘরের মধ্যে নিদ্রায় অচেতন মানুষটিকে। না, ঘুমোচ্ছে না তো ! তক্তপোষে ব'সে পড়ছে কি কাগজ। হয়তো চিঠি পড়ছে কিছু।

দরজায় টোকা মারতে থাকে গহরজান। বলে,—আসবো আমি ? ঘুম ভেঙেছে ?

ঘরের মানুষ তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখে চিঠি। গেরুয়া আলখাল্লার ভেতর পুরে ফেলে। বলে,—হ্যাঁ, এসো। ঘুম ভেঙে গেছে।

ভয়ে ভয়ে কথা বলে যেন ধীরানন্দ। আর কেউ এলো না তো ?

অন্য কোন কেউ। কোন পুলিশ, কিংবা পুলিশের কোন কেউ গোয়েন্দা। ধীরানন্দ অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। দরজা খুলে যায় ধীরে-ধীরে। ঘন নীল মেঘের ফাঁক থেকে চন্দ্রোদয় হয় কি ! গহরজান, এই অসামান্যা রূপবতী রমণীকে প্রথম যেন চোখ মেলে দেখলো ধীরানন্দ। দেখে বিস্মিত

হয়ে গেল। গহরজানের হাতে পুষ্পাঞ্জলি কেন? কাকে পূজা করবে? চাঁপা আর রজনীগন্ধা আর লাল করবী গহরজানের করপুটে। ঘরে ঢুকে বোধ করি খোঁজে কোন কিছু। দেরাজের মাথায় ছিল গোছা-গোছা বেলোয়ারী কাচের রেকাবী। নানা রঙের। একটা রেকাবীতে রাখলো হাতের ফুল। শাড়ীর আঁচলে মুখটা চেপে চেপে মুছলো। মুখে মদির হাসি ফুটিয়ে বললে,—রোটি ঔর কাবাব খাওয়া হবে তো?

ধীরানন্দ ঝুলি আর আলখাল্লা সামলায়। বলে,—জরুর খাওয়া হবে। আমার খাওয়ার সময় হয়েছে। দেরী হয়ে গেলে কাকে খাওয়াবে?

কানের ঝুমকো দুলিয়ে বললে গহরজান,—জানোয়ারটাকে ব'লে পাঠিয়েছি কখন! সবুর কর' বাবুজী। চ'লে গেলে দুখ্ পাবো আমি! জখম ক'রে যেও না বাবুজী। জানোয়ারটা আসলে চাবুক লাগাবো, দেখো তুমি। শুনবো না কোন ওজুহাত।

জানোয়ার যে কে বোঝে না ধীরানন্দ। কোন হিন্দু হোটেলের কোন মুসলমান খানসামা। ইচ্ছাকৃত কি না কে জানে, আবরু খসে যায় গহরজানের। শাড়ীর আঁচল বুক থেকে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়। হলুদ রঙের আলপাকার ময়লা কাঁচুলীটা দেখা যায়। বোতামের বালাই নেই, একটা সেফটিপিনে আঁটসাঁট বাঁধা।

—গহর আছিস ঘরে?

সৌদামিনী কথা বললে।

—হ্যাঁ মাসী, আছি।

—ধর্ তবে, ধর্। বড্ড গরম, হাত পুড়ে যাচ্ছে!

গহরজান খুশীর হাসি হাসে। বলে,—দাও মাসী, দাও। উনি বলছেন, চ'লে যাবেন, দেরী হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, দেরী হয়ে গেছে অনেক।

গরাণহাটা থেকে এখন যেতে হবে হাওড়া ষ্টেশনে। দেখা করতে

হবে এক অপরিচিতের সঙ্গে—যাকে ধীরানন্দ দেখিনি কদাচ। চেনে না কস্মিন্ কালেও। হাওড়া ষ্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে লোকটি। ধীরানন্দ শুধু জানে লোকটির পোষাক কেমন—লোকটির গায়ে খাঁকির মিলিটারী সার্ট—মালকোঁচা দেওয়া কাপড়। ধীরানন্দকে লোকটির কাছে যেতে হবে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে,—বেল ফুল?

যদি বলে, 'হ্যাঁ বেল ফুল', তবেই বুঝতে হবে ঠিক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছে। 'বেল ফুল' কথাটি শুনে ধীরানন্দকে দিতে হবে ঝুলিতে লুকানো মাল। একটা বাক্স। গোটা কয়েক রিভলভার আছে বাক্সে আর দু' কুড়ি মানুষ-মারা কার্ত্তুজ আছে!

রুটি-মাংস খেয়ে ঘরের মানুষ গমনোদ্যত হ'লে গহরজান প্রণাম করে, পদধূলি নেয় মাথায়। কয়েক হাত পিছিয়ে ধীরানন্দ বললে,—কেন? এত ভক্তি কেন?

গহরজান বললে,—হ্যাঁ, করতে হয়, পেন্নাম করতে হয় যে। দয়া ক'রে এসেছেন আমার ঘরে।

সত্যিই প্রণাম করে গহরজানের দল। জাত-কুল মানে না। বাচ-বিচার করে না। ঘরের লোককে বিদায় দেওয়ার সময় ভক্তিভরে প্রণাম করে। দেবতা জ্ঞান করে হয়তো আগন্তুকদের।

—গহর, তুই যাবি না কি? আমি তো যাবো ভাবছি।—

লোক চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে বললে সৌদামিনী।

—কোথায় মাসী? চুলে বিনুনী পাকাতে পাকাতে বললে গহরজান।

সৌদামিনী বললে,—আহিরীটোলার ঘাটে। ভাগবত পাঠ করবেন কথক ঠাকুর। যাবি না কি তুই? কাশী থেকে এয়েছে কথক ঠাকুর। ফলকালে আর কখনও শুনতে পাবি না।

গহরজানের মুখে বিরক্তির ছায়া ফুটে ওঠে। বলে,—না মাসী, আমি যাবো না। তুমি যাও।

—কেন রে গহর? আসবে বলেছে বুঝি? সৌদামিনী সামান্য হাসির সঙ্গে কথা বলে।

লজ্জা পায় গহরজান। বলে,—কি জানি! বলেনি কিছু। আমি যাবো না, গা-হাত কেমন যেন কামড়াচ্ছে। চোখ দু'টো জ্বালা করছে।

—তবে থাক্, যেতে হবেনা তোকে। আমিই ঘুরে আসি। কথা বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সৌদামিনী।

আসবে কি আসবে না কে জানে!

শয্যায় শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—দিনটাই মাটি হয়ে যাবে।

রাজেশ্বরী বলে,—কেন?

—যেতে হবেই নেমন্তন্ন, না গেলে বিচ্ছিরি দেখাবে। কথা উঠবে। কৃষ্ণকিশোর কথা বলে দু'চক্ষু মুদিত ক'রে। রাজেশ্বরীর একটা হাত মুঠোয় ধ'রে।

ঘর অন্ধকার। তবুও জানলার ছিদ্র দিয়ে আলো দেখা যায়। রাজেশ্বরীও শুয়ে আছে বাহুতে মাথা রেখে, এলো-কেশ এলিয়ে দিয়ে। কপালকুণ্ডলার কথা ভাবছে মধ্যে মধ্যে। গহন কাননাভ্যন্তরে ছুটছে কপালকুণ্ডলা। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে। বৃষ্টি পড়ছে খরবেগে।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছে দিনটাই নষ্ট হবে মিথ্যা মিথ্যা। যাওয়া হবে না গহরজানের কাছে। সুর্মাটানা চোখ দু'টো গহরজানের, কি যাদু আছে ঐ চোখে।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়ে ঢং-ঢং। তিনটে বাজে।

রাজেশ্বরী ফিস-ফিস কথা বলে।—আমি উঠি। চুল বাঁধি। মাধবীলতা ব'লে গেল, জ্যাঠাইমা বলেছেন অনেক গয়না-গাটি প'রে যেতে হবে। অনেক মেয়ে-বৌ আসবে। বিকেলে পাল্কী পাঠিয়ে দেবেন। আমি উঠি?

—হ্যাঁ ওঠ'।

চক্ষু মুদ্রিত ক'রেই কথা বলে কৃষ্ণকিশোর।

চিরুণী, কাঁটা, ফিতে খুঁজতে ওঠে রাজেশ্বরী। ধীরে ধীরে দরজাটা খোলে। ডাকতে হবে এলোকেশীকে। চালচিত্র খোঁপা বাঁধতে হবে। এলোকেশী ছাড়া কেউ সামলাতে পারবে না রাজেশ্বরীর চুলের বোঝা।

কোথায় এলোকেশী! কোথায় কে।

জন-মনুষ্য নেই যেন বাড়ীতে। রাজেশ্বরী দাসীদের এলাকায় চলে। ভাবতে ভাবতে যায়, কি পোষাকে যাবে। কি কি অলঙ্কারে। কিছু দূর এগিয়ে ধীর কণ্ঠে ডাকে রাজেশ্বরী,—এলোকেশী!

কারও সাড়া পাওয়া যায় না। ডাকের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ভয়-ভয় করে রাজেশ্বরীর। তবুও দ্রুত পদক্ষেপে এগোয় দাসীদের এলাকায়। টম কুকুর ছিল কোথায়। রাজেশ্বরীর পিছু-পিছু চলে। টমের গলায় বকলশে আছে ঘণ্টি। ঝুন-ঝুন শব্দ হয়। রাজেশ্বরীর ভয়-ভয় করে কাকেও কোথাও দেখতে না পেয়ে। দাসীমহল নিদ্রামগ্ন যে।

শুধু পুকুর থেকে শব্দ আসে। পোলাওয়ের ডেকচীতে কে এক দাসী ঝামা ঘসছে হয়তো। পোড়া-দাগ ওঠাচ্ছে কর্কশ শব্দে।

দেখতে দেখতে বেলা অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

ফুলের পাপড়ি খ'সে পড়ে। বর্ষামুখর দিন; নাতিশীতোষ্ণ হাওয়ায় পাপড়ি ওড়ে এলোমেলো। যেন প্রজাপতি উড়ছে। শরৎ-দিনের আকাশে শুভ্র মেঘের ঢেউ, যেন নিরেট রূপো গ'লে যাচ্ছে অবিরাম। মধ্যে মধ্যে হাওয়া থেমে যায়, গুমোট আবহাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মানুষ —দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়। বৃক্ষশাখে কাকের ঝাঁক কা-কা করে। ঘাড়-গলা খোঁচাখুঁচি করে তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে। বেলা শেষে সাড়ে বত্রিশ ভাজা, জলকচুরী আর কাটা-কাপড়ওলার চিৎকার গগন-বিদারক। পূজোর মরসুম, ক্রেতা আর বিক্রেতাদের হাঁক-ডাক আর দরাদরির ভাসা-ভাসা কথা। দোকানগুলো সেজেছে যেন কনে বৌয়ের মত। শিমুল তুলোর অক্ষরে নীলামের নোটীশ-লেখা লাল শালু লটকানো হয়েছে দোকানের মাথায় মাথায়। লেখা হয়েছে,—সেল! সেল!! সেল!!! অর্থাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে বিক্রয় হওয়ার লিখিত ঘোষণা, ষ্টক ফতুর ক'রে দেওয়ার জন্য নামমাত্র মূল্যে। গোলাপজল, কেওড়া আর আতরওলাদের আবির্ভাবে হাওয়ায় থেকে থেকে সুগন্ধের আমেজ। যাত্রা, পাঁচালী, পুতুলনাচ, অপেরা আর বাইজীদের দালালরা বাবুদের মজলিস থেকে কেউ বেরোচ্ছে আর কেউ ঢুকছে। হলুদ আর আসমানী রঙের জরিদার পাগড়ীধারী শেঠেরা বকেয়া টাকা আদায়ের উদ্দেশে দ্রুতপদক্ষেপে চলা-ফেরা করছে। লোকের বাড়ীর দালানে দালানে প্রতিমার গায়ে খড়িগোলা রঙ চাপানো হচ্ছে, কুমোরদের বারেক তামাক খাওয়ার ফুরসৎ পর্যন্ত নেই। বেণের দোকানে পূজোর উপকরণ বিক্রী হচ্ছে। মধুপর্কের বাটি

আর গালার বালা স্তূপীকৃত করা হয়েছে। চাঁদমালা আর শোলার কদম-ফুলের দর-কষাকষি হচ্ছে।

দেরাজের টানায় ছিল সোনার কাঁটা আর পাশ-চিরুণী।

ঘরের রুদ্ধ জানলা। বাইরের আলো থেকে ঘরের অন্ধকারে পৌঁছে চোখে যেন কিছু দেখতে পায় না রাজেশ্বরী। জানলার পাখী খুলে দেখে বেলা কত হ'ল। দেখে পথ লোকে লোকারণ্য; পুজোর মরসুম লেগেছে দিকে দিকে। জানলার পাখী খুলতে যতটুকু আলো হয় ততটুকু আলোতেই দেরাজের টানা খুলে হাতড়ে হাতড়ে কাঁটা আর পাশ-চিরুণী বের করে। চুল বাঁধতে বাঁধতে উঠে এসেছে রাজেশ্বরী। বাইরের দালানে ফিতে হাতে ব'সে আছে এলোকেশী। ভাবছে, কোন্ ধরণে বাঁধবে রাজেশ্বরীর চুলের বোঝা। কোন্ ধরণের খোঁপা বেঁধে দেবে। দিনে দিনে কত রকমফের হচ্ছে।

রাজেশ্বরী ঘর থেকে বেরোতেই বললে এলোকেশী,—কেমন ক'রে যে চুল বেঁধে দিই সেই ভেবে-ভেবেই মরছি আমি।

ঘরে ঘুমন্ত স্বামী। দিবানিদ্রা দিচ্ছে কৃষ্ণকিশোর।

ফিস-ফিস কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—মেয়ে-বৌ অনেক আসবে। ভাল ক'রে সেজেগুজে যেতে অর্ডার হয়েছে। বুঝেসুঝে চুল বেঁধে দাও এলো।

বড়বাড়ীতে পুণ্যাহের খাওয়া-দাওয়া।

দিনভোর লোক খাচ্ছে সকাল থেকে। রাত্রে মেয়েদের নিমন্ত্রণ। পাড়া-পড়শী আত্মীয়া অনাত্মীয়াদের ভিড় হবে। শাড়ী আর গয়না দেখানোর প্রতিযোগিতা চলবে। রূপ দেখানোর হিড়িক লাগবে। কার কত রূপ, দেখাবে কত কে।

—তবে আয় ফিরিঙ্গী-খোঁপা বেঁধে দিই রাজো।

অনেক ভেবে-ভেবে বললে এলোকেশী। বললে,—তোর যা মুখ, মানাবে চমৎকার।

—অত-শত জানি না আমি। যা ভাল বোঝ' দাও চটপট। পাল্কী পাঠাবে ওরা বিকেল হ'তে না হ'তে।

এলোকেশীর দিকে পেছন ফিরে বসতে বসতে বললে রাজেশ্বরী। কাঁটা আর পাশ-চিরুণী রাখলে মেঝেয়। কথা বললে ধীর চাপা কণ্ঠে।

কথা বলতে বলতে ঘড়ি-ঘরে ঘন্টা পড়তে লাগলো। ঢঙ্‌ঢঙিয়ে বাজলো চারটে।

চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে চুপি-চুপি শুধোলে এলোকেশী,—জামা-কাপড় বের করা হয়েছে? চুল বাঁধতে কতক্ষণ আর লাগবে! তোর গা ধুতেই যা সময় লাগবে। গয়নাগাটি বের করেছিস?

—না, না, না। বললে রাজেশ্বরী।—বক-বক না ক'রে চটপট তুই চুলটা বেঁধে দে।

—হুট বলতেই হয়? চুল বাঁধা কি চাট্টিখানি কথা! এলোকেশী কথা বলে কিছু বা বিরক্ত হয়ে। বলে,—আমি কি ফুসমন্তরে এই চুলের বোঝা বেঁধে দেবো? মনে যদি না ধরে তখন? কথার ঠেলা কে সামলাবে?

হেসে ফেললে রাজেশ্বরী। শব্দহীন ক্ষীণ হাসি। বললে,—হ্যাঁ রে এলো, আমি তোকে কবে কথা শোনালুম যে বলছিস?

—যাই বল্‌ তাই বল্‌, আগলে তোর জ্ঞান থাকে না রাজো! আমার তো ভয় করে তোর মুখটা ভার দেখলে। এলোকেশীর কথায় সত্যিকার আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলে সে।

—আচ্ছা এলো, কে কোথায় গুলী ছুঁড়ছে বল্‌ তো?

কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো রাজেশ্বরী। কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল বুড়ী। ভাবলো তারই হয়তো শুনতে ভুল হচ্ছে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, কানে তালা লেগে গেছে হয়তো। খানিক কান খাড়া ক'রে থাকলো এলোকেশী। বললে,—আমি তো বাছা গুলীর আওয়াজ কানে পাচ্ছিনে! কে জানে বাবা, হয়তো হবে। পাখী শিকার করছে না তো কেউ?

—ঐ শোন না, গুম-গুম শব্দ হচ্ছে। থাক্‌গে, দে তুই হাত চালিয়ে দে তাড়াতাড়ি। বললে রাজেশ্বরী। গুলী ছোড়ার শব্দের উৎস জানতে না পেয়ে বললে হতাশ হয়ে।

—হাত কি চালালেই চলে রাজো? বাহারী খোঁপা চাই ইদিকে, অথচ দু'দণ্ড তর সইবে না তোর?

চুলের গোড়ায় ফিতে বাঁধতে বাঁধতে কথা বলে এলোকেশী। বলে,—ধর্, ফিতে দু'টো, কষে ধর্ দাঁতে চেপে। আমি জটটা ছাড়িয়ে দিই।

বিনোদা এলো কোত্থেকে। হাতে জল-খাবারের রেকাবী। বেলা শেষ হয়ে গেছে, জল-খাবার এনেছে তাই। রেকাবীতে মিষ্টি আর ফল। রুপোর ফুলকাটা রেকাবী। আর এক ঘটি জল। বললে,—কিচ্ছু ফেলবে না বৌ, ফেললে রক্ষে রাখবো না আমি।

—এত খাওয়া যায় বিনোদিদি?

দাঁতে ফিতে ধ'রেই বললে রাজেশ্বরী। দাঁতে দাঁত চেপে বললে। বললে,—অবেলায় খেয়ে মোটে ক্ষিদে হয়নি বিনোদিদি। দোহাই তোমায়। ব'ল না আমাকে।

—ছাখো বৌ, ভাবছো যে আমি কিছু দেখতে পাই না? যা খেয়েছো আমি দেখেছি! ব'সেছো আর উঠেছো। যা খেয়েছো ও তোমার না-খাওয়ারই সামিল। আমি কি আর জানি না, খাওয়ায় কি মন আছে তোমার?

সত্যি কথা ব'লেছে বিনোদা।

ভেবে-ভেবে আর সময়ে না খেয়ে খেয়ে কেমন যেন আধমরা হয়ে গেছে রাজেশ্বরী। রঙটা যেন পুড়ে গেছে, সিঁটিয়ে গেছে দেহবল্লরী। চোখের দৃষ্টিতে আর নেই তেমন আগের মত ঔজ্জ্বল্য। হাসিতে জৌলুস। চলতে-ফিরতে মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। ব'সলে উঠতে ইচ্ছা হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে বুঝি। ক্ষুধামান্দ্য হয়েছে। সামান্য ফল খেলেও বুক জ্বালা করতে থাকে। পেট আইঢাই করে।

কথা বলতে বলতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় বিনোদা। রাজেশ্বরী ভাবে, যথার্থ কথাই ব'লে গেল বিনোদা। একটা মিষ্টি হাতে তুলে রেকাবীটা ঠেলে দিয়ে বললে রাজেশ্বরী,—দু'টি পায়ে পড়ি তোর এলো, বিনো যেন না জানতে পারে, খাবারগুলো খেয়ে ফেলিস ভাই !

—আমার তো পেটে ডাইনী ঢোকেনি ! ন্যাকরা করছিস কেন বল্ তো রাজো। যা পারিস্ খা দেখি তুই। ঠিক কথা ব'লেছে বিনোদিদি ! খাওয়া তোর আছে আর ? লুচির ফোস্কা ছিঁড়ে খাওয়া কি খাওয়া ?

এলোকেশীর কথার কোন জবাব দেয় না রাজেশ্বরী। আকাশে চোখ তোলে। শরতের মেঘ আকাশে। বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মত শুভ্র মেঘের দল ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। কাক-চিল উড়ছে। খেয়ালী হাওয়া। কখনও গুমোট হয়ে থাকে। এলোমেলো হাওয়া বয় কখনও। 'কপালকুণ্ডলা' তখনও রাজেশ্বরীর মনটা অধিকার ক'রে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার পরিণাম যে কি হবে সেই কথাই ভাবে। ভাবে যে, কপালকুণ্ডলা শিবিকারোহণে যেতে যেতে সামান্য ভিক্ষুকের কাতর প্রার্থনায় অঙ্গের অলঙ্কার দিয়ে দিতে পারে ? রাজেশ্বরীর মনে পড়ে বঙ্কিমের বর্ণনা, ভাষা এবং লিখিত কথোপকথন।

"কপালকুণ্ডলা শিবিকার দ্বার খুলিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন ; এক জন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব ?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই-একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা-মুক্তা—তোমার কিছুই নাই ?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও ?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল না। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "হই বৈ কি।"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন—"

কি আশ্চর্য্য! কপালকুণ্ডলা তবে কি আর মানুষ নেই? জ্ঞানগম্যি হারিয়েছে? মতিবিবি গয়না রাখতে যে রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠিয়েছিলেন, সেই কৌটাসমেত সকল গয়না ভিক্ষুককে দিয়ে দিলো কপালকুণ্ডলা! পরিচ্ছেদের প্রথমেই বঙ্কিমবাবু বলেছেন,—

শিবিকারোহণে

"—খুলিনু সত্বরে,

কঙ্কন, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,

কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী।"

মেঘনাদ বধ।

ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে যায় রাজেশ্বরী। কপালকুণ্ডলা হীরা-মুক্তাখচিত অলঙ্কারসমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভিক্ষুককে অর্পণ করতে পারে, আর সে, রাজেশ্বরী একটা টায়রা হারানোয় কত আফসোস ক'রেছে। কিন্তু ভিক্ষা দেওয়া আর হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়ায় তফাৎ যে অনেক! রাজেশ্বরী

ভাবে, কিন্তু কে চুরি করলো! কেমন ক'রে হারালো ঘর থেকে! সোনা যে হারাতে নেই। সোনা হারালে যে পাপ হয়, অমঙ্গল হয়।

এলোকেশী বললে,—দে কাঁটাগুলো, এগিয়ে দে। ছাখ্ গিয়ে আয়নায় খোঁপা ঠিক হয়েছে কি না।

—যা হয়েছে, তা হয়েছে বললে রাজেশ্বরী।—তুই ভাই ফল-মিষ্টিগুলো খেয়ে ফেলিস্। বিনো যেন দেখতে না পায়।

দিবানিদ্রা ভেঙ্গে যেতে রাজেশ্বরীকে পাশে দেখতে না পেয়ে খানিক বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। শুয়ে থাকে চুপচাপ।

এলোকেশী বললে,—আলতাটা পরিয়ে দিই?

রাজেশ্বরী বললে,—না, আগে গা ধুয়ে আসি। গা ধুয়ে এলে আলতা পরিয়ে দিস্।

এলোকেশী বলে,—বেশ, তাই হবে। মিষ্টিটা হাতে ধ'রেই থাকব? খাবি না?

রাজেশ্বরী অসহায়ের মত কথা বলে। বলে,—কি পরি বল্‌তো এলো?

কথা শুনে হেসে ফেলে এলোকেশী। বলে,—ভালো নোককে শুধোলি বটে তুই! মোরা গরীব-গরবা, মোরা কি জানি সাজ-পোষাকের? সে যুগ কি আছে? এখন ক্যাত ধরণ-করণ হয়েছে!

—ঠ্যাকরা করিস কেন? বল্ না! বললে রাজেশ্বরী মুখে মিষ্টি তুলে। বললে,—ব'লে পাঠিয়েছে গা-ভর্ত্তি গয়না-গাটি প'রে যেতে। আমি তো কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছি না।

এলোকেশী উঠে পড়লো রাজেশ্বরীর পেছন থেকে। বললে,—অভাব তো কিছুই নেই। যা ভাল বুঝিস গায়ে চাপা না।

হঠাৎ যেন দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল।

মেঘে ঢাকা পড়লো হয়তো সূর্য্য। রৌদ্র যেন মুছে দিলো কে।

হাওয়া বইলো হঠাৎ ঝিরঝিরে। ঘেমে উঠেছিল রাজেশ্বরী, মন্দ-মধুর হাওয়ায় কপালটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ক্ষণিকের মধ্যে। এলোকেশী বললে,—যাবি তো ওঠা গিয়ে সোয়ামীকে। ঘুম থেকে উঠতে বল্। অবেলায় ঘুমোয় না, যা যা ডেকে তোল্ যেয়ে। বেলা কি আর আছে?

রাজেশ্বরী ঘরে ঢুকতেই কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—যাবে না তুমি? কখন যাবে?

রাজেশ্বরী বললে,—যখন হুকুম করবে। যাওয়ার সময় হ'য়ে গেছে। পাল্কী এলেই যেতে হবে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পাল্কী ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের গাড়ী পৌঁছে দেবে তোমাকে।

—তুমি যাবে না? শুধোয় রাজেশ্বরী। বলে,—তোমাকেও তো যেতে ব'লেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থাকে কৃষ্ণকিশোর। ভাবে বুঝি কিছু। বলে,—হ্যাঁ, আমিও যাবো। খাওয়ার সময় গিয়ে খেয়ে আসবো শুধু। ব'লে গেছে, না গেলে ভাল দেখায় না। প্রতি বছরেই তো যাই।

কথা বলতে বলতে পালঙ থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী বললে,—এখন কোথায় চললে তুমি? কি যে পরি, ভেবে পাচ্ছি না।

হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—হাসিও না তুমি। আলমারী-ভর্ত্তি শাড়ী-জামা, বাক্স-ভর্ত্তি গয়না, ভেবে পাচ্ছো না তুমি? আমি যাচ্ছি কাছারীতে, নায়েব মশাইকে ডাকতে।

—কেন? রাজেশ্বরীর কৌতূহলপূর্ণ কথায় যেন অজ্ঞতা ফুটে ওঠে। কেমন যেন ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তিত থেকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—ডাকতে হবে নায়েবকে। ঘড়ার টাকাটা গুণে ফেলতে হবে যে। যদি বেশী হয়ে যায়

তখন? ঘড়াটা তো আর তুলে দিতে পারি না নায়েবের হাতে! গুণে না দিলে—

কথাগুলো শুনে খুশী হয় রাজেশ্বরী। অন্যায় কথা বলেনি, ঠিক কথাই বলেছে কৃষ্ণকিশোর। হিসাবী মানুষের কথা। বিজ্ঞ এবং বিবেচকের কথা। বুদ্ধিমানের কথা। রাজেশ্বরী খুশী হয়ে বলে,—ঠিক কথাই তো। তোমার টাকা, তুমি বুঝে-স্থঝে না চললে কে দেখবে? এখন কিছু খাবে? জল-খাবার খেয়ে কাছারীতে যাও না?

—নাঃ। অবেলায় খেয়েছি। ক্ষিধে হয়নি। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। দালানে পৌছে কেন কে জানে ক্ষীণ হাসি হাসে। লোককে ঠকিয়ে লোকে যেমন হাসে। কার টাকা কে অপব্যয় করছে। হয়তো বিধাতাও হাসলেন অলক্ষ্যে। শুধু হয়তো হাসলেন না কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্বপুরুষ—পিতা, পিতামহ, আর প্রপিতামহ, যাঁদের বুদ্ধি এবং কষ্টার্জ্জিত টাকা, সেই মৃত জনের দল।

স্বামীর বিবেচনা হয়েছে দেখে বেশ খুশী হয়ে ওঠে রাজেশ্বরীর অন্তর।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে হাসি দেখা দেয়। তৃপ্তির স্মিতহাসি ওষ্ঠে ফুটিয়ে ডাকে,—এলো, অ এলোকেশী! গেলি কোথায়?

—যাবো আর কোথায় বল? বলতে বলতে দালান থেকে ঘরের ভেতরে সেঁধোয় দাসী। বলে,—যেতে পারলে তো বাঁচি। মিত্যু কি আর হবে?

—আঁ গেল! কথায় কৃত্রিম ক্রোধ রাজেশ্বরীর। বলে,—কথা দেখ পোড়ামুখীর! নে নে জানলা ক'টা খুলে দে আগে। জানলা খুলে দেখে আয় চানের ঘরে জল আছে না নেই। না থাকে তো ভারীকে ডেকে বল্ গে এক কলসী জল দিয়ে যাবে। গা ধুতে হবে।

জবুথবু বয়োবৃদ্ধা কথা শুনে থতমত খেয়ে যায়। জানলা খুলতে খুলতে বলে,—বুড়ী হয়ে বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পাপ কিছু আছে? এখন মরণ হ'লেই বাঁচি। জ্বালা জুড়োয়।

রাজেশ্বরী উন্মুক্ত জানলার আলোয় তখন ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে খোঁপা দেখছিল মাথার। আলমারীর আয়নায় এলোকেশীর বেঁধে দেওয়া খোঁপা দেখছিল। ফিরিঙ্গী-খোপা। কাঁটা আর পাশ-চিরুণীতে মাথাটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এলোকেশী চুলটা আজ বেঁধেছে খুব ভাল। আয়নায় কবরী-শিল্প দেখতে দেখতে বললে রাজেশ্বরী,—এক্ষুনি তুই ম'রতে যাবি কেন? দাঁড়া, আমি আগে যাই। আমি আগে মরি। তুই না থাকলে কে আমাকে আলতা পরিয়ে দেবে পায়ে?

—বালাই ষাট! বললে এলোকেশী।—বলতে আছে এমন কথা! ছিঃ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

এলোকেশীর কথা শুনে খিল-খিল হেসে উঠলো রাজেশ্বরী। অনেক, অনেক দিন বাদে বুঝি সত্যিকার হাসলো রাজেশ্বরী। তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো দেহ। পরিপূর্ণ-যৌবনা রাজেশ্বরীর রূপশ্রী হঠাৎ যেন চোখে পড়লো এলোকেশীর। দেখলো কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, দেখলো কেমন চমৎকার মানিয়েছে মেয়েটাকে। এলোকেশীর চোখের কণীনিকা স্থির হয়ে আছে—বিমুগ্ধ হয়ে গেছে সে। খোলা জানলা থেকে তেজহীন মিষ্টি আলোর ঝলক ঢুকেছে ঘরে। সেই আলোয় মেয়েটাকে দেখাচ্ছে যেন অপ্সরীর মত।

—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা বললুম শোন, যা, গিয়ে ভারীকে ডাকা। বললে রাজেশ্বরী খোঁপা চাপড়াতে চাপড়াতে।

এলোকেশী যেন চমকে ওঠে কথা শুনে। সম্বিৎ ফিরে পায়। বলে,—চানের ঘরে জল আছে। দেখে এয়েছি আমি। তুই যা না, গা ধুয়ে আয় না।

—বলতে হয় এতক্ষণ! বললে রাজেশ্বরী। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল রাজেশ্বরী। ঘর থেকে বেরিয়ে বললে,—এলো, অপেক্ষা কর তুই। আমি এলাম ব'লে।

কথা বলতে বলতে মুখ তুলতেই দেখলো অনন্তরাম আসছে। মাথায়

ঘোমটা তুললো রাজেশ্বরী। অনন্তরাম বললে,—ঘোমটায় মুখ ঢাকতে গিয়ে আছাড় খেয়ে মরবে কি বৌদিদি? তুমি তো আমার মেয়ের সামিল। আমাকে অত লজ্জা কেন?

কুঁকড়ে-মুকড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাজেশ্বরী। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো,—কিছু বলছিলে তুমি?

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ বলছিলাম। বলছিলাম যে হুজুর চাবি চাইছে ঐ ঘরের। বললে যে, তোমার কাছেই আছে চাবি।

—কোথাকার চাবি বল'তো অনন্ত? কিছু বা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে রাজেশ্বরী। বলে,—কোথাকার চাবি শুধোলে না তুমি?

—হাঁ গো হাঁ। বললে অনন্তরাম।—সিন্দুকের ঘরের চাবি।

তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। লজ্জিত হয়ে বলে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে। দিয়েছিলো রাখতে আমাকে। পালঙের মাথার দিকে তোষকের তলায় আছে। নে যাও তুমি। তাড়া আছে আমার, আমি যাচ্ছি চানের ঘরে।

—এই তো মুস্কিল করলে! ফাঁকা ঘরে যে ঢুকতে চাইনে আমি। বললে অনন্তরাম ক্ষোভের সঙ্গে। বললে,—যদি কিছু চুরি যায় আমাকেই তো দুষবে?

স্মিত হাস্যরেখা দেখা দেয় রাজেশ্বরীর বিম্বাধরে। বললে,—তুমি আর হাসিও না অনন্ত? ঘরে এলোকেশীও আছে। কথা বলতে বলতে চ'লে যায় রাজেশ্বরী। খোঁপা থাপড়াতে থাপড়াতে যায় গাত্র ধৌত করতে।

দিনের আলো যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। সূর্য্য অস্তাচলে নামে।

পশ্চিমাকাশ কখন লালে লাল হয়েছে অস্তরবির রক্তিমালোকে। শরতের আকাশে ছিন্ন মেঘের জটলা। রাশি রাশি পেঁজা তুলো ছড়িয়েছে কে যেন অদৃশ্য থেকে। স্নানের ঘরের জানলা থেকে আকাশ দেখে রাজেশ্বরী।

গায়ে জল ঢালতে ঢালতে গুন্ গুন্ গান গায় রাজেশ্বরী। রবিবাবুর কি একটা গানের কলি।

চাবিটা পেয়েই বললে কৃষ্ণকিশোর—চল' অনন্তদা, টাকাগুলো গুণে ফেলা যাক্। কালকেই খাজনা পাঠাতে হবে। সূর্য্যাস্ত আইন, খাজনা না দিলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

অনন্তরাম বললে,—বেশ তো, চল'। কিন্তু একটা কথা কখন থেকে বলি-বলি ক'রেও বলা হচ্ছে না। বলছি যে, কাছারীতে এমন টাকা নেই যে এক সালের খাজনা দিতে পারে? জমানো টাকায় হাত প'ড়লো শেষে? কে জানে বাবা! আমরা অবিশ্যি আদার ব্যাপারী।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যেন কৃষ্ণকিশোর। কি বলবে ভেবে পায় না। বিমূঢ়ের মত বলে শেষে,—হুগলীর প্রজাদের সঙ্গে মামলা চালাতে চালাতেই ফতুর হয়ে গেছি যে অনন্তদা! হাকিমকে হাত করেছে প্রজাদের দল, ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভেট পাঠিয়ে পাঠিয়ে বশ ক'রেছে। আমাদের পক্ষ থেকে কোন তদ্‌বির হচ্ছে না। উকিলই শুধু টাকা খেয়ে যাচ্ছে।

কথায় কথায় বুঝি মনে পড়ে যায় অনন্তরামের। বলে,—তোমার মনোহরপুরের প্রজাদের ভারী ইচ্ছে যে আমি ওদের দেখাই-শোনাই কলকাতার যা-কিছু দেখাবার আছে। বলছে যে আসছে কাল রোববার আছে, ছুটির দিন, চল' আমাদের নে চল'। যতই হোক গেঁয়ো মানুষ, দেখতে বেরিয়ে যদি হাইরে-টাইরে যায়!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঠিক কথা। তা তুমি যেও কাল ওদের সঙ্গে ক'রে। কোথায় কোথায় যাবে?

—মরা সোসাইটি, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, কালিঘাটের কালীমন্দির, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, ইডেন গার্ডেন, খিদিরপুরের ডক, শিবপুরের কোম্পানীর বাগান ইত্যাদি যা-যা দেখাবার আছে।

কথার শেষে অনন্তরাম দম নেয়। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে হয়তো। বলে,—চল' তবে, যাই, টাকা গুণতে গুণতেই যে বাজীভোর হয়ে যাবে! দু'-চার টাকা হ'লে না হয় কথা ছিল, এক ঘড়া টাকা যে!

কৃষ্ণকিশোর গমনোদ্যত হয়ে বলে,—চল' না দু'জনে গুণে শেষ ক'রে ফেলবো।

অনন্তরাম বললে,—পাল্কী আবার কাদের আসছে?

সত্যিই ফটক পেরিয়ে ঢুকছিলো তখন একটা ঘেরাটোপে ঢাকা পাল্কী। বাহকের দল সোৎসাহে ছড়া কাটতে কাটতে আসছিল। কৃষ্ণকায় ঘর্মাক্ত শরীরের পেশী নাচিয়ে নাচিয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বটঠাকুমা পাঠিয়েছে পাল্কী। বড়বাড়ীতে পুণ্যে খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্ন আজ। বৌ যাবে নেমন্তন্ন খেতে। অনন্তদা, পাল্কী ফেরৎ পাঠাও। বলে দাও, আমাদের গাড়ী যাবে বৌকে পৌঁছতে।

—তুমিও তো যাবে? না বৌ একলা যাবে? শুধোয় অনন্তরাম।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—একলা কেন? সঙ্গে বিনো যাবে'খন। আমি যাবো সেই খাওয়ার সময়, রাত্তিরে। তুমি পাল্কী ফেরৎ পাঠাও। আমি সিন্দুকের ঘরে যাচ্ছি।

অনন্তরাম ইতস্ততঃ করে যেন। অনিচ্ছায় বলে,—তুমি যখন হুকুম করছো, ব'লে আসছি আমি। কিন্তু, পাল্কীটা ফেরৎ দিলে কি ঠিক হবে? ভাববে না তো অপমান করলে? ভেবে-চিন্তে দেখো এখনও।

কোন কিছু না ভেবেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—না, না, কিচ্ছু ভাববে না। যেতে বল তুমি বেয়ারাদের। আমাদের গাড়ী না থাকলে বলতুম না। গাড়ী যখন আছে—। যাও, যাও বল'গে তুমি। আমি যাচ্ছি ঘর খুলতে।

অন্দরে যেতে যেতে হঠাৎ লক্ষ্যে পড়লো অদূরের বাতায়ন-পথ।

হাস্যময়ী কে একজন। বিনা কারণে মুখে হাসি ফুটেছে কেন?

পান-রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে না শুভ্র দন্ত? বৈকালী সূর্য্যের রক্তিমে এমন দেখাচ্ছে, না, সত্যই আরও অনেক ফর্সা হয়েছে আইভিলতা। মুখে যেন ফুটেছে গার্হস্থ্য গাম্ভীর্য্য। তবুও সেই জন্মগত হাসির অভ্যাস যাবে কোথায়। সেই পুরানো হাসি। জাফরাণ রঙের শাড়ীতে আইভিলতাকে মানিয়েছে কি অদ্ভুত! হাসি-খুশী মুখে জানালার গরাদে উর্দ্ধাঙ্গ চেপে ধ'রে দেখছে আর হাসছে।

তখন অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিজাল ছড়িয়ে পড়েছে গৃহশীর্ষে, কৃষ্ণচূড়ায়। মুঠো মুঠো আবীর ছড়ালো কে? পশ্চিম দিগন্তে লাল রঙের বন্যা ছুটলো কখন!

এখন কিন্তু অপেক্ষা করবার ফুরসৎ নেই। আইভিলতাকে দাঁড়িয়ে দেখবার। ঘড়ার টাকা গুণে শেষ করতেই হবে। টাকা গুণলে তবে রূপোর টাকাকে কাছারীতে পাঠিয়ে কাগজের টাকায় পরিণত করাতে হবে। কে বইবে অত রূপোর টাকা!

সিন্দুকের ঘরে যেন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

ঘর খুলতেই ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। রুদ্ধদ্বার বদ্ধ-ঘরের দম-আটকানো আবহাওয়া। দরজা খুলতেই কড়িকাঠে চামচিকাগুলো বোধ করি ন'ড়ে-চ'ড়ে ওঠে। বোঝে হয়তো ঘরে আলো ঢুকলো। আরশুলার ঝাঁক পালায় যত্র-তত্র।

অনন্তরাম ফিরে আসতেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—দেয়াল-গিরিটা জ্বালাও। তাঁবেদারদের ডাকো না কাউকে। জ্বেলে দিয়ে যাক্।

—ওফ্, কদ্দিন বাদে ঘরটায় ঢুকেছি কে জানে! কথা বলতে বলতে ইতিউতি দেখে অনন্তরাম। দেখে, ঘরে ঝুল হয়েছে, চামচিকা ও আরশুলায় ঘর নোংরা করেছে। বললে,—দেয়াল-গিরি জ্বালো বললেই জ্বলবে? সাফ নেই, তেল নেই, জ্বালতে ঢের দেরী হবে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তবে লণ্ঠন-টণ্ঠন যা হয় দিয়ে যেতে বল'। দেরী করলে চলবে না। দাঁড়িয়ে থেকো না অনন্ত, যাও চটপট। বলছি, শুনছো না কেন?

—যাচ্ছি হে যাচ্ছি। বলে অনন্তরাম। বলে,—তোমার যে দেখছি উঠলো বাই তো কটক যাই। দেখছি ঘরটা, কদ্দিন বাদে ঘরটায়—কথা বলতে বলতে অনন্তরাম চ'লে যায় তড়িৎগতিতে।

অন্দরের একতলায় যেতেই দেখতে পায় অনন্তরাম, উঠোনের ধারে উবু হয়ে ব'সে লণ্ঠনের ভূষো পরিষ্কার করছিল দু'জন তাঁবেদার। তাদের তোয়াক্কা না ক'রে না ব'লে-ক'য়ে ঝট ক'রে একটা লণ্ঠন তুলে নেয় অনন্তরাম। বলে,—জ্বেলে দে দেখি। আমি ততক্ষণ গাঁজার কলকেয় দু'টো টান মেরে আসি। লণ্ঠনটা রেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় অনন্তরাম।

বিনোদা কাছাকাছি ছিল কোথায়।

খ্যাঁক ক'রে উঠলো যেন। বললে,—রাখো রাখো! আগে বৌমার ঘরে আলো দিতে হবে। সাজতে-গুজতে হবে তাকে! ব'সে আছে সে আলোর জন্যে।

তাঁবেদার দু'জন হাসাহাসি করে। চকমকি ঘষে দু'টো লণ্ঠনের শিখা জ্বালাতে উদ্যোগী হয় দু'জনেই।

সূর্য্য কি ডুবে গেল তবে?

আঁধার নেমেছে দিকে দিকে। মশা উড়ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। গৃহলগ্ন প্রাঙ্গণের গাছে গাছে কূজন করছে কাক আর চড়াই।

আলোর জন্যে সত্যিই কতক্ষণ ব'সেছিল রাজেশ্বরী।

বিনোদা লণ্ঠনটা ঠক ক'রে বসিয়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। বলে,—নাও বৌ নাও, ব'লে পাঠিয়েছিল সকাল সকাল যেতে। তাড়াতাড়ি নাও।

রাজেশ্বরীও ভাবছিল তো সেই কথাই। ভাবছিল কত দেরী হয়ে গেল। এখনও পায়ে পাঁইজোর এঁটে দেয় এলোকেশী আর রাজেশ্বরী ক্যাশবাক্সে ঝুঁকে প'ড়ে খোঁজে অন্যান্য অলঙ্কার। আরও আছে পদালঙ্কার; আছে গোল মল, আঙট, চরণ-পদ্ম; পাওড়া আছে, ঝাঁকমলও আছে। কিন্তু পা তো আছে দু'টো। হঠাৎ চোখে পড়তেই অঙ্গুরীয়ক কয়েকটা তুলে নেয় রাজেশ্বরী। তিন আঙুলে তিনটে আঙটি দেয়। হলদে পোখরাজ, লাল মুক্তা আর বৈদূর্য্য।

বিনোদা অনেকক্ষণ দেখে-শুনে বললে,—আয়নাটা সামনে দিই বৌ?

রাজেশ্বরী বলে,—হ্যাঁ দাও। কম আলোয় দেরাজের আয়নায় দেখা যায় না কিছু। কথা বলতে বলতে মুকুটের কালো ভেলভেটের বাক্সটা খুলে ফেলে রাজেশ্বরী। হেসে ওঠে যেন ঘরটা। লণ্ঠনের আলো-আঁধারি আর মুকুটের রত্নময় শোভা। মাথায় মুকুট চাপায় রাজেশ্বরী। বিনোদার বসিয়ে দেওয়া আয়নায় দেখতে দেখতে মাথায় মুকুট পরে। মুকুটের দু' পাশে কাঙ্গরা ওঠানো, মধ্যস্থলে উচ্চ চূড়া। চূড়াতে পাখীর সুদৃশ্য পালক। রাজেশ্বরীকে দেখায় ঠিক রাজমহিষীর মত। হীরা আর মুক্তা-খচিত মুকুটটা পাওয়া গেছে শ্বশুরালয় থেকে। রাজেশ্বরীর দিদিশাশুড়ীর মুকুট, কুমুদিনীর শাশুড়ীর। গ্রীবা বাঁকিয়ে একেক কানে পরে কুণ্ডল—যার ধাপে-ধাপে হীরকপংক্তি, আটটা নেমী। দু' কানে কুণ্ডল ঝুলিয়ে আয়নায় দেখে রাজেশ্বরী। দোদুল্যমান কুণ্ডল, যার অন্য নাম কর্ণবেষ্টন?

—গলায় কিছু দিলে না বৌ? দেখতে দেখতে হঠাৎ কথা বললে বিনোদা।

—হ্যাঁ। ভাবছি গলায় কি পরি? বললে রাজেশ্বরী।

—ঐটি তো বেশ। দে না গলায়। বলে এলোকেশী।

রাজেশ্বরী বললে,—আমিও ভেবেছি নক্ষত্রমালার কথা। কালো রঙের শাড়ীতে খু—ব মানাবে।

নক্ষত্রমালাটা গলায় বাঁধে রাজেশ্বরী। সাতাশটি মুক্তায় গ্রথিত একাবলী কণ্ঠভূষণের নাম নক্ষত্রমালা? যার মধ্যে থাকে পদক? চৌদ্দ রত্তির পান্না দেওয়া পদকটা কালো শাড়ীতে দেখায় ঠিক কালো দীঘির জলে সবুজ পদ্মপত্র। আর গলায় ঠিক এঁটে থাকবে ব'লে গলায় জড়ায় সরিকা। মুক্তার সরিকা। বাহুতে পরে কেয়ূর। সিংহমুখাকৃতি ও বিবিধ রত্নখচিত কেয়ূর, যার নামান্তর বাহুবট না অঙ্গদ?

এলোকেশী পরিয়ে দেয় কেয়ূর। রাজেশ্বরী আয়নায় দেখে বাহুযুগল। মুহূর্ত্ত কয়েক দেখে বলয় তুলে নেয়। বলয় দু'টি ব্যাঘ্রমুখাকৃতি। হাতের কব্জায় এঁটে দেয় এলোকেশী। বলয় না বালা? নানা রঙের মিনার কাজ বালা দু'টিতে। মধ্যে মধ্যে পলকি হীরা। রাজেশ্বরীর অজ্ঞাতে রেকাবীতে চুড়ির রাশি দেখে হাত দু'টো টেনে কখন চুড়িগুলি পরিয়ে দিয়েছে বিনোদা। কুঁচো হীরের চুড়ি। আট দু'য়ে ষোলটি চুড়ি। নাকে নোলকটা ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। বলে,—এলো, হয়েছে হয়েছে। বাক্সগুলো তুলে রাখ্ দেরাজে। বিনোদিদি ভোল' না ভাই! আমি কপালে টিপটা—

কপালে সিঁদুর-টিপ দিলেই শাঁখা-নোয়ায় সিঁদুর দিতে হয়। সিঁদুর-কৌটটা রাখতে রাখতে বললে রাজেশ্বরী,—তুমি তো সঙ্গে যাবে বিনোদিদি! ব'লে পাঠাও আমি তৈরী হয়েছি। এলো, ভাল ক'রে ভাখ্ কিছু যেন না প'ড়ে থাকে। গালচেটা তুলে নেড়ে-চেড়ে ভাখ্।

—কিচ্ছু প'ড়ে নেই। খু—ব ভাল ক'রে দেখেছি আমি। বললে এলোকেশী।

বিনোদা দরজার কাছাকাছি এগোতেই দেখলো অনন্তরামকে। বললে, —বৌ তো তৈরী।

অনন্তরাম বললে,—গাড়ীও তো তৈরী। গাড়ীতে যেয়ে উঠলেই হয়।

রাজেশ্বরী বললে চুপি-চুপি,—এলো, তুই রইলি। দেরাজে চাবি দে। চাবি ঠিক থাকবে না ফেলে-ছড়িয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়বি তুই?

—না গো না। আমি কি দিন নেই রাত্তির নেই ঘুমোচ্ছি? এলোকেশী বেশ কুপিত হয়ে কথা বলে।

—চল' তবে বৌ। বললে বিনোদা।

রাজেশ্বরীও চললো অলঙ্কার ও পোষাকে ভারাক্রান্ত দেহে। কাব্যের রূপমাত্রে কোন মূল্য নেই, কেবল বাক্য শুনে কর্ণতৃপ্তি হয় না, যেজন্য কাব্যকে অলঙ্কারে সুশোভিত করে কোবিদের দল। শুধু রূপে নারীদেহও হয়তো অপরূপ বিকশিত হয় না, যেজন্য সেই আদিম যুগ থেকে বোধ করি অলঙ্কারের চল।

ঘন-কালো আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছিল। হঠাৎ সেই চাঁদ মেঘের ফাঁকে লুকিয়ে পড়লো। অলঙ্কারবিভূষিতা রাজেশ্বরী চলে যাওয়ায় চাঁদহীন কালো আকাশের রূপ ধারণ করলো যেন ঘরটি।

রাজেশ্বরী যেতে যেতে শুনলো টাকা বেজে চলেছে অবিরাম। টাকা গোণা হচ্ছে সিন্দুকের ঘরে।

কৃষ্ণকিশোর তখন বলছিল,—কত হ'ল অনন্তদা!

—সাড়ে আট হাজার হ'ল গিয়ে তোমার। বলছিল অনন্তরাম। বলছিল,—আর গিনি তিনশো তেত্রিশ। মোহর দু'শো আট।

টাকা বেজে যায় অবিরাম। যেতে যেতে শোনে রাজেশ্বরী।

বড়বাড়ীতে জনাগম হয়েছে প্রচুর।

বেল-লণ্ঠন জ্বালা হয়েছে; আলোর ঝাড়েও আলো। ভিয়েনে চুল্লী জ্বলছে কতগুলো। লোকজন খাচ্ছে ছাদে। পংক্তিভোজন হচ্ছে। পাড়া-পড়শী আর আত্মজনেরা খাচ্ছে। সদর আর মফঃস্বলের প্রজাদের ভিড়

হয়েছে। পুণ্যাহের শুভদিনের ভূরিভোজ হচ্ছে। অন্দরে মেয়ে-মহলে সাড়া পড়ে গেছে। কথা, ডাকাডাকি আর চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে।

খিড়কিতে গিয়ে ভিড়লো জুড়ী।

বিনোদা বললে,—নাবো বৌ গাড়ী থেকে। গিয়ে সকলকে প্রণাম করবে। বুঝে-সুঝে কথা বলবে।

কোথায় ছিল মাধবীলতা। এলো ছুটতে ছুটতে। রূপকথার রাজকন্যার মত এলো যেন পাখা মেলে, উড়তে উড়তে। হাসতে হাসতে বললে,—কত দেরী করলে বল তো? ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আমি তোমার জন্যে। আমি দূর থেকে ভাবলাম বুঝি কোথাকার বেগম-টেগম এলো। কি চমৎকার দেখাচ্ছে বৌদি তোমাকে! চল'—মা, জ্যাঠাইমা, কাকীমাদের কাছে চল'।

রাজেশ্বরী চললো মাধবীলতার হাত ধ'রে। যেন আত্মজ্ঞান হারিয়ে। অন্দরে যেতেই কেউ কেউ দেখলো। কেউ কেউ ফিরেও তাকালো না। চলে গেল মুখ ঘুরিয়ে।

মাধবীলতা চিৎকার ক'রে বললে,—দেখ' মা, কে এয়েছে!

রাজেশ্বরী নতদৃষ্টি তুলে দেখলো। একজন স্থূলাকৃতি মহিলা। তাঁদের শুভ্রবাস। জামা নেই গায়ে। হাতে গোছা-গোছা জলতরঙ্গ চুড়ি, বাহুতে অনন্ত। গলায় মটরমালা। প্রতিমার মত ঢলঢলে মুখ। তাম্বুলরাগরক্ত অধর। সীঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। সহাস্যে বললেন,—এসো মা এসো। কত দেরী করলে বল'তো! সকাল সকাল আসতে হয়। যাও, বটঠাকুমার সঙ্গে দেখা কর'গে যাও। যা, নে যা মাধবীলতা।

অন্য একজন বৌ কাছাকাছি কোথায় ছিলেন। ছিমছাম দেহের গঠন। লম্বাটে আকৃতি। যুক্ত ভ্রূযুগল কুঁচকে বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে,—ঠাট-ঠমক তো দেখছি খুব বৌয়ের! সিন্দুক উজাড় ক'রে গয়না গায়ে দেওয়া

হয়েছে! সোয়ামী তো ওদিকে এক মুসলমান বাইজীকে বাঁধা রেখেছে! ফিরেও তাকায় না।

অনেক উঁচু থেকে কে বুঝি আচমকা ঠেলা মেরে ফেলে দিলো রাজেশ্বরীকে। বুকে কে বুঝি হাতুড়ীর ঘা মারলো। চোখের সমুখে বুঝি কাঁপতে লাগলো পৃথিবী। রাজেশ্বরীকে ধরলে বোধ করি ভাল হয়। রাজেশ্বরী হয়তো জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যাবে। কুল-কুল ক'রে ঘামতে লাগলো রাজেশ্বরী। মুখ তুলে তাকালো শুধু কাজল-কালো চোখ মেলে। মনে মনে হয়তো ভাবলো,—হে ধরণি, দ্বিধা হও!

ঘন-কালো আকাশে হঠাৎ বুঝি চাঁদ দেখা দেয়।

দেখতে দেখতে মেঘের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ে হঠাৎ। বেল-লণ্ঠনের আলো-আঁধারিতে রাজেশ্বরীকে ঠিক ঐ চাঁদ ব'লেই ভ্রম হয়। মনে হয় চিত্রপটে যেন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অল্প গুণ্ঠনে আবৃত, মুকুট পরিহিত রাজেশ্বরীর চূর্ণ অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। তবুও মেঘবিচ্ছেদে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত চন্দ্ররশ্মির মত অপূর্ব্ব সুন্দর মুখবিম্বের দ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। বিশাল লোচনে কটাক্ষ—অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়। কালো মসলিনের শাড়ীর বেষ্টন থেকে মুক্ত হয় শুভ্র বাহুযুগল, আবার আবৃত হয়ে যায়। মাধবীলতার পেছু পেছু যন্ত্র-চালিতের মত চলে রাজেশ্বরী। বটঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। দেখা দিতে যায়। তপ্তকাঞ্চনের একটি মূর্ত্তি যেন, লজ্জানত হয়ে এগিয়ে চ'লেছে ধীর পদক্ষেপে। তপ্তকাঞ্চনের মতই রঙ যে রাজেশ্বরীর। মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকায় মাধবীলতা। দেখে রাজেশ্বরীর

চোখে কেমন যেন মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! ঘোরারক্ত ওষ্ঠাধর কি কাঁপছে! বর্ষার ভরা নদীর মত বৌটির রূপরাশি টলটল করছে, উছলে পড়ছে! দেখতে দেখতে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায় মাধবীলতা। স্বর্ণমুক্তা ও হীরকাদি শোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা রাজেশ্বরীর। কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র স্বর্ণমধ্য থেকে হীরকাদি রত্ন ঝলসে উঠছে বেল-লণ্ঠনের আলোয়। রাজেশ্বরীর মত মোহনমূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখেছে কি মাধবীলতা!

বড়বাড়ীর কোথাও লণ্ঠন জ্বলছে, কোথাও দুর্ভেদ্য তমসা। নেহাৎ পুণ্যাহের উৎসব, অন্য দিন হ'লে দ্বিগুণ অন্ধকারে ঢেকে থাকে ঘর-দোর। বড়বাড়ীর অন্দরে ঢুকলে যে-কোন অপরিচিত জন অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে। গোলকধাঁধার মতই জটিল বড়বাড়ী। কোথায় সিঁড়ি, কোথায় ঘর, কোথায় দালান, কোথায় উঠোন আর কোথায় যে ছাদ সহজে ধরা যায় না। তদুপরি এখন দিনের আলো নেই, রাত্রির অন্ধকার। পুণ্যাহের জন্য আলো জ্বালানো হয়েছে কতগুলো। দালানে আর উঠোনে। ঘরে আর পরিখায়। নানা রঙের নানা ঢঙের বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠন। কোথাও লাল, কোথাও হলুদ আর কোথাও জাম রঙের আভা ঠিকরোচ্ছে। আজকে দালানের কবুতরের দল হৈ-হল্লা আর চিৎকারে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘুম নেই চোখে, পাখা ঝাপটাচ্ছে থেকে থেকে। পালক ওড়াচ্ছে হাওয়ায়।

যেতে যেতে একটি ঘরের দ্বারমুখে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়লো মাধবীলতা। বললে,—ঠাকুমা, কে এয়েছে দেখো। মা বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করাতে।

বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুত হয় ঘরের ভেতর থেকে।—কে রে মাধু? কে আবার এলো?

—দেখোই না তুমি। দেখো চিনতে পারো কি না। বললে

মাধবীলতা। রাজেশ্বরীর দিকে গ্রীবা বেঁকিয়ে বললে,—যাও বৌদি, ঘরের ভেতরে যাও তুমি।

বটঠাকুমা ব'সেছিলেন ঘরের ভেতরে।

মেদিনীপুরের নক্সা-তোলা একটা মাদুরে উবু হয়ে ব'সে গুড়ুক টানছিলেন। হুঁকোটা ঘরের কোণে ঠেকা দিয়ে রেখে বললেন গলা কাঁপিয়ে,—কে বল্‌তো মাধু? চিনতে পারছি না তো!

রাজেশ্বরী প্রণাম করলে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে। চিবুক স্পর্শ করলেন বটঠাকুমা। বললেন,—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবি হও। কে ভাই তুমি? কি নাম? কাদের বাড়ীর বৌ?

রাজেশ্বরী হতবাক হয়ে থাকে। নতমুখী হয়ে বসে বটঠাকুমার সম্মুখে। মাধবীলতা হাসতে হাসতে বলে,—ব'লবো না আমি। আমি ব'লবো না, কিছুতেই ব'লবো না।

বটঠাকুমার বয়োবৃদ্ধির জন্য দৃষ্টিশক্তি তেমন আর নেই। তবুও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে দেখেন। কিয়ৎক্ষণ দেখে বলেন,—মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কে বল্‌তো মাধু? আরও কয়েক মুহূর্ত্ত দেখে বললেন,—চিনেছি। তুমি কুমুদিনীর ব্যাটার বৌ না?

মাধবীলতা খিল খিল হাসে। বলে,—ঠিক ধ'রেছো ঠাকুমা। কে বলে যে তোমার চোখ গেছে! কি চমৎকার দেখতে বল'তো!

—তুই-ই বল্ মাধু! বললেন বটঠাকুমা। ফুলকুমারী। বললেন,—তুই-ই বল্ মাধু। এক দিন দেখেছি বৈ তো নয়? বৌ ক'রেছে বটে কুমু। আহা, যেন লক্ষ্মীপিতিমে!

হাসি থামিয়ে বললে মাধবীলতা,—গয়নাগুলো দেখো ভাল ক'রে। আমার কিন্তু ঐ মটুক একটা করিয়ে দিতে হবে ঠাকুমা। বাবাকে বলতে হবে তোমাকে।

মটুক কি মুকুটের অপভ্রংশ! হয়তো তাই। মাধবীলতা নাবালিকা

হলে কি হবে, অলঙ্কারের তৃষা যে নারীর বয়স মানে না। ঈশ্বর না করুন, সিঁথির সিঁদুর না মুছলে কোন নারীই দেহ থেকে শুধু নয়, মন থেকেও ত্যাগ করতে পারে না অলঙ্কারপ্রীতি।

মাদুরের একধারে টিম টিম জ্বলছিল একটা বিলিতি লণ্ঠন। পল-তোলা কাচের ষট্‌কোণাকৃতি লণ্ঠন। হয়তো তেল ফুরিয়েছিল। জ্বলন্ত শিখায় তেজ ছিল না তেমন। আর আর কি যেন ছিল ঘরে। থান আর গরদের ধুতি ঝুলছিল আলনায়। দেওয়ালের হুকে ছিল ১০৮ রুদ্রাক্ষর মালা। একটা ষ্টীলের তোরঙ্গ ছিল, তাতে ছিল পুরানো শাড়ী ও গামছা। বৃন্দাবনী চাদর আর কিছু নগদ টাকা ছিল একটা পুঁটলীতে। আরেকটা পুঁটলীতে ছিল কামাখ্যার রক্তিমাকার ন্যাকড়া, পুরীর মন্দিরের চাল, বৃন্দাবনের ধূলো, বৈদ্যনাথধামের ফুল আর বিল্বপত্র, কাশীর বিশ্বনাথের অঙ্গের শুষ্ক চন্দনচূর্ণ আর কালীঘাটের কালীর পায়ে ছোঁয়ানো শুষ্ক অপরাজিতা আর জবা। মামলার জন্য আদালতে গেলে কিংবা কেউ কোন শুভ কাজে গেলে ফুলকুমারী ঐ সকল মহামূল্য দ্রব্য সঙ্গে দিয়ে দেন। আর আছে কালীঘাটের কালীর হাতে-আঁকা পট; রামেশ্বরের মূর্ত্তির পেতলে-খোদা প্রতিলিপি, বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরের ছবি, কাশীর বিশ্বনাথের ছবি, দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালীর ছবি। আর ছিল গঙ্গাজলের কলসী। একটা সাজি। ফুলকুমারী ধার্ম্মিকপ্রকৃতির বর্ষীয়সী নারী, ফুরসৎ পেলেই জপাহ্নিক করেন। উপবাস করেন। শুভদিনে উপবাস করেন। আর থেকে থেকে এখনও কেন জীবিত আছেন সেজন্য ভাগ্যকে দোষেন। দেবদেবীদের গালমন্দ করেন। ফুলকুমারীও স্বামি-বিয়োগ হওয়ায় সহমৃতা হ'তে চেয়েছিলেন। আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের কত কাকুতি মিনতি ক'রেছিলেন, কিন্তু ঐ পুত্রকন্যা থাকার দরুণ ফুল-কুমারীর ইচ্ছায় বাধা প'ড়েছিল। অশাস্ত্রীয় কোন কিছু তো করা উচিত নয়।

মাধবীলতা মুকুট চাইছে শুনে ফুলকুমারী বললেন,—পাবি না পাবি। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? তোর ভাতার তোকে দেবে, ভাবছিস কেন?

—ধ্যেৎ, কি অসভ্য তুমি ঠাকুমা? কথাগুলি ব'লেই তৎক্ষণাৎ ছুটে পালিয়ে যায় মাধবীলতা। ডানা-মেলা পরীর মত উড়ে পালিয়ে যায় যেন।

ফুলকুমারী ফিস ফিস বললেন,—শাউড়ীকে ফেরাতে পারলে না ভাই? কাশীতে গিয়ে ব'সে আছে? ছেলে না হয় অন্যায় ক'রেছে, তাই ব'লে ঘর-দোর ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'তে হবে?

'ছেলে অন্যায় করেছে' কথা ক'টি শুনে রাজেশ্বরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলতে থাকে যেন। তীরের মত গায়ে বিঁধেছে কথা, জ্বলতে থাকে দেহ। লজ্জানত মুখে ব'সে থাকে চুপচাপ। পাষাণমূর্ত্তির মত ব'সে থাকে।

ফুলকুমারী বলে যান,—অন্যায় করে না কে? পুরুষমানুষের মধ্যে দেখাও তো ভাই ক'টা লোক সাঁচ্চা আছে? আছে, থাকবে না কেন, সাধু ফকিরও আছে। তাই ব'লে ঘর-দোর ছেড়ে চ'লে যেতে হয়? আমি ভাই কুমুকেই দোষ দিই।

শুধু কথা নয়, অলঙ্কারগুলিও যে বিদ্ধ করছে দেহকে। কাঁটার মতই বিঁধছে থেকে থেকে। খুলে ফেলতে মন চাইছে বহুমূল্য জড়োয়া অলঙ্কারের রাশি। মাথাটা ধ'রে গেছে, কপালের দুই তীর দপ্‌দপ্ করছে। হাতের কাছে ছোরা কিংবা ভোজালী থাকলে আত্মহত্যা করতো রাজেশ্বরী। কিংবা একটু বিষ থাকলে, খেয়ে সকল জ্বালা জুড়াতো। রাজেশ্বরী ভাবলো, ঠাগ্‌মা কি অন্যায় ক'রেছেন! না জেনেশুনে তুলে দিয়েছেন একটা অপোগণ্ডের হাতে। একটা কুলাঙ্গারের সঙ্গে বে দিয়ে দিয়েছেন বাইরের চাকচিক্য আর নামডাক দেখে। হ'লেই বা বাপের একমাত্র ছেলে, থাকলেই বা সম্পত্তি আর নগদ টাকা। কিন্তু মানুষ যদি বদ হয়, যদি হয় দুশ্চরিত্র, মাতাল, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-হীন, অশিক্ষিত? রাজেশ্বরীর অন্তর থেকে ইচ্ছা হয় পিতামহী অর্থাৎ

ঠাগ্‌মাগে বুকে জড়িয়ে খুব খানিকটা কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে জানায় বুকের ব্যথা। বিনা যৌতুকেও রাজেশ্বরীর বিয়ে হয়নি, খোঁজাখুঁজি করলে কি সুপাত্র মিলতো না? শিক্ষিত, মার্জ্জিত, ভদ্র ও সচ্চরিত্র পাত্র কি নেই আর বাঙলা দেশে? রাজেশ্বরী ভাবে, কিছু যখন র'টেছে, কিছুটা নিশ্চয়ই সত্যি। কিন্তু মুসলমান বাইজীটি কে?

মুসলমান বাইজী!

হঠাৎ-হঠাৎ বুকের মধ্যিখানটা ছাঁৎ ছাঁৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর। যতবার মনে পড়ে ততবার। অতগুলো কথা শুনলে, সেই অত কথার ভিড়ে 'মুসলমান বাইজী' কথা দু'টোই শুধু মধ্যে মধ্যে রাজেশ্বরীর বুকের মধ্যিখানে তুলছে অসহ্য আলোড়ন। রূপ, অলঙ্কার, মিশ-কালো মসলিনের জঙলা শাড়ী—বৃথাই অঙ্গে চাপিয়েছে রাজেশ্বরী! মিথ্যে মিথ্যে সেজেছে আয়না সামনে রেখে। সাজাগোজা ক'রে ক'বার দেখেছিল না দেরাজের আয়নায়? ক্ষণেকের জন্যে দেখেছিল সালঙ্কারা প্রতিমূর্ত্তি। হয়তো মুহূর্ত্তের জন্যে অতি-সামান্য গর্ব্বও বোধ ক'রেছিল মনে মনে। ফুলকুমারী ব'লে চলেছেন আর ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে বৌ হ'লে কি হবে ঐ রাজেশ্বরীই। কি হ'ল রূপের ডালিতে? কি শুনলো কানে? মুসলমান বাইজীটি কে? ভাবলো রাজেশ্বরী।

—আমি ভাই আছি তবুও। পারতেম বৈ কি ঘর-দোর ছেড়ে চ'লে যেতে যে দিকে দু' চোখ যায়। কথার পৃষ্ঠে বললেন ফুলকুমারী। আত্ম-কথার ঝিলিক ফুটলো ফুলকুমারীর মুখভঙ্গীতে। হাঁফ ছেড়ে বললেন,—আমিও ভাই দেখেছি যে! চোখের সমুখে দেখেছি নাতিদের কুকীর্ত্তি। বৌগুলোকে ধ'রে ধ'রে মারে মদ টেনে ফিরে? বল' কি ভাই তুমি! রক্তগঙ্গা ক'রে ছাড়ে। চাবুক মারে।

শেষের কথা ক'টি ফিস ফিস ক'রে বললেন ফুলকুমারী। যেন ভয়ে ভয়ে বললেন।

লণ্ঠনের অল্প আলো। তবুও চোখ তুলে দেখেছিল রাজেশ্বরী। দেখেছিল দেওয়ালে কালীঘাটের পট। সাদা-কালো ছবি।

ফুলকুমারীর পৌত্রদের গুণকীর্ত্তি শুনে মনে সান্ত্বনা পায় না রাজেশ্বরী। ভুলতে পারে না যেন ক্ষণেকের জন্যেও সেই মুসলমান বাইজীকে। হঠাৎ হঠাৎ বুকের মধ্যিখানটা ছাঁৎ ছাঁৎ ক'রে ওঠে। চোখ ফেটে অশ্রুর চাকচিক্য দেখা যায়। লণ্ঠনের অল্প আলোয় দেখতে পান না ফুলকমারী ·

—শুধু গল্প ক'রেই কি চ'লে যাবে? খেতে তো হবে! রাতও কম হ'ল না!

হঠাৎ কথা শুনে চমকে উঠেছিল রাজেশ্বরী। চোখ ফিরিয়ে দেখলো যে নারীটিকে, তাঁরই মুখে শুনেছিল না ঐ দু'টো শব্দ।

হ্যাঁ, যাকে দেখেছিল সেই! যজ্ঞি সামলানোর ঝক্কিতে কিছু যেন ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত। হয়তো বা পরিশ্রম-হেতু কিছুটা রাগত।

রাজেশ্বরী তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে,—আমি উঠি?

ফুলকুমারী বেশ যেন অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়ে বললেন,—হ্যাঁ ভাই ওঠ'। যাও, খাওগে। কুমু ব্যাটার বৌ ক'রেছে দেখো নাতবৌ। একেবারে যাকে বলে তোমার লক্ষ্মীপিতিমে?

মুখরা বৌটি বললেন তৎক্ষণাৎ,—তা হ'লে বটঠাকুমা আমার ভেয়ের বৌকে দেখলে তো ভিরমি খাবেন! যাকে বলে পটে-আঁকা বিবি। মেমেদের রঙও হার মেনে যায়। মোমের মত গা। কি চোখ কান পর্য্যন্ত!

স্মিত হেসে বললেন ফুলকুমারী,—তবে ভাই নাত্‌বৌ, দেখিও না যেন কখনও তোমার ভেয়ের বৌকে! ভিরমি খাই যদি!

মুখরা বৌটির মুখে কথা ফুটে উঠলো। বললেন,—অযথা দাঁড়িয়ে

থাকবার মত সময় আমার নেই। যাবে তো চলো। প্রণাম করা তো আর পালাচ্ছে না! অনেক কাজ আমার। এখনও বাড়ীর ঝি-চাকরদের দাঁড়িয়ে খাওয়াতে হবে আমাকে। ভাঁড়ারে চাবি দিতে হবে।

—যাও ভাই যাও। খাওগে যাও ভাই। ব'ললেন ফুলকুমারী রাজেশ্বরীর চিবুক ধ'রে। ফুলকুমারীর পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করতেই বৌটি ব'লে গেলেন কথাগুলি। যেন তপ্ত কড়াইয়ে খৈ ফুটতে লাগলো।

ঝমাঝম বাজলো পাঁইজোর। বৌটির সঙ্গে সঙ্গে চ'ললো রাজেশ্বরী। কত ঘরের ভেতর দিয়ে ক'টা দালান পেরিয়ে চ'লেছে তো চ'লেছেই। নতদৃষ্টি তুলে কখনও বা দেখছিল রাজেশ্বরী। কোন ঘরে ঘুমিয়ে আছে হয়তো কারও শিশু। কোন ঘরে জটলা পাকিয়েছে হয়তো সমবয়সী মেয়ের দল। কোন ঘরে দেখা যাচ্ছে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। কোন দালানে প'ড়ে আছে কয়েকটা এঁটো পাতা আর শূন্য ভাঁড়। কোন দালানে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে হয়তো কোন দাসী কিংবা কোন দূর-সম্পর্কীয়া দরিদ্র আত্মীয়া।

রাজেশ্বরী ভাবছিল যে আর খাওয়া-দাওয়ার নেই প্রয়োজন। চ'লে যেতে পারলেই বাঁচে। ক্ষুধাতৃষ্ণা কি চিরদিনের মত মিটে গেছে রাজেশ্বরীর! বিনোদা সঙ্গে এলো দেহরক্ষীর মত। ডুব মারলো কোথায়! বিনোদাও যদি কাছে থাকতো! কিংবা থাকতো যদি সঙ্গে ঐ মাধবীলতা নামে মেয়েটি? ভয় ভয় করছিল রাজেশ্বরী। অস্বস্তি বোধ করছিল।

—সিঁড়িতে বড্ড পেছল। দেখো, আছাড় খেও না যেন নামতে নামতে। একটা সিঁড়ির মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন বৌটি।

শুধু কি পিচ্ছিল! কত যে অন্ধকার কে বলবে। বৌটির না হয় অভ্যাস আছে। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধ'রে নামতে থাকে রাজেশ্বরী। ভয়ে সিঁটিয়ে। ক'বার পিছলে প'ড়ে যেতে যেতে বেঁচে যায়। মনে মনে গাল পাড়ে বিনোদাকে। গেল কোথায় আহাম্মুখী?

সিঁড়ি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেল-লণ্ঠনের আলোকরেখা চোখে পড়ে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে রাজেশ্বরী।

বৌটি বললেন,—চল' বৌ, ব'সগে যাও খেতে ঐ ঘরে।

রাজেশ্বরী দেখলো সমুখেই একটি ঘর। ঘরের দু'কোণে জ্বলছে দু'টো সেঁজুতি। পাশাপাশি পঙ্‌ক্তি ভোজনে ব'সেছে কারা। কয়েকজন সধবা আর কয়েকটি কুমারী। খাচ্ছে না, শুধু ব'সেছে মাত্র। হয়তো অপেক্ষা করছে আরও যদি কেউ কেউ আসে। গোটা কয়েক পাতা খালি দেখা যাচ্ছে।

যজ্ঞির কোলাহলে কানে আঙুল দিলেই বুঝি ভাল হয়।

ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, পাতে ব'সে কি হবে, ভাবে রাজেশ্বরী। পালাতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু বিনোদা দাসী গেল কোথায়? দাসীদের দলে ভিড়ে গিয়ে হয়তো আড্ডা মারছে কোথায় কোন্ ঘুপচিতে ব'সে!

পঙ্‌ক্তিতে যারা বসেছিল তাদের কেউ কেউ ঘোরতর বিস্ময়ে চেয়ে আছে। রাজেশ্বরীকেই দেখছে, বেশ বুঝতে পারছে রাজেশ্বরী। জোড়া জোড়া চোখ, কেমন আদেখলার মত চেয়ে আছে। দেখছে রাজেশ্বরীর রূপ আর অলঙ্কার! বেশভূষা?

রাজেশ্বরীও ব'সলো পঙ্‌ক্তিতে। ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, তবুও ব'সলো। বারেকের জন্য মনে উদিত হয়, মুসলমান বাইজীর কথা তো মিথ্যাও হ'তে পারে। দা-দেইজীদের রটনাও তো হ'তে পারে। মন ভাঙ্গাতে বলেছে স্বামীর নামে। কিন্তু স্বামী যে বলেছিল, আসবে? আসলো কি না কে জানে! হতভাগী বিনোদাই বা গেল কোথায়? আহার্য্যের পরিবর্ত্তে সামান্য বিষ পাওয়া যায় না? খেয়ে জ্বালা জুড়োয় রাজেশ্বরী। স্বামী থাকুক মুসলমান বাইজীর সঙ্গে। বিশ্রী লাগে রাজেশ্বরীর আশ-পাশের জোড়া জোড়া চোখ। সেঁজুতির ক্ষীণ আলোয় দেখায় যেন জোড়া জোড়া আগুনের ভাঁটার মতই। রূপ আর অলঙ্কার কখনও

দেখেনি যেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে তাকায় রাজেশ্বরী, আয়ত আঁখিদ্বয়ে দেখে নেয় হয়তো সকলকে। কিন্তু স্বামী আসলো না তো?

সদর আর অন্দর পাশাপাশি হ'লে জানতে কিংবা দেখতে পাওয়া যেতো।

কিন্তু ব্যবধান যে অনেকটা। যেন এ পাড়া আর ও পাড়া। প্রতি বছরেই আসে, যেজন্য কৃষ্ণকিশোর আসতে বাধ্য হয়েছিল। গরদের চুড়িদার বেনিয়ান, রূপালী ধাক্কা-দেওয়া জরিপাড় কোঁচানো দেশী ধুতি আর মাথায় মুর্শিদাবাদী রেশমের কল্কা-তোলা উষ্ণীষ। গলায় মুক্তোর মালা। আঙুলে হীরকাঙ্গুরীয়। লাল ভেলভেটের জরিদার নাগরা পায়ে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখে বড়বাড়ীর কর্তাদের কেউ কেউ মৌখিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। বাড়ীতে উৎসব, এই কারণে মদ্যপায়ীদের মধ্যে তখনও কেউ বোতলের মুখ দেখেননি। লোকজন চ'লে গেলে ধীরে সুস্থে ডিকেণ্টার আর পেগ্ বেরুবে। আর অন্যান্য পুরুষদের মধ্যে যাঁরা সৎ কীর্ত্তিমান, উদ্যমশীল তাঁরা এই কাজের বাড়ীতেও যে যাঁর ডেরা ছাড়েননি। কেউ সংহিতা পড়ছেন, কেউ মূল সংস্কৃতে রামায়ণের ব্যাখ্যা পড়ছেন আবার কেউ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রিকা এশিয়াটিক রিশার্চে-শের কোন খণ্ড খুলে পড়ছেন এবং নোট-বইয়ে নোট লিখছেন। খেয়ালই নেই, বাড়ীতে যজ্ঞি চ'লেছে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে বৈঠকখানা আর হল-ঘরগুলো। সদরের ঘরে ঘরে ঢালোয়া ফরাস বিছানো হয়েছে। তাকিয়া প'ড়েছে কতগুলো। আলবোলা দেওয়া হয়েছে। আর রূপোর ট্রেতে দেওয়া হয়েছে পান। ঘরে ঘরে বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠনে আলো জ্বালানো হয়েছে। হৈ-হল্লায় কারও কথাই কারও শ্রুতিপথে পৌছুচ্ছে না।

হল-ঘরে অতিথিদের মধ্যেই ব'সেছিল কৃষ্ণকিশোর।

কর্ত্তাদের একজন গোঁফে পাক দিতে দিতে একেবারে কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—মা হঠাৎ কাশীবাসী হ'ল কেন?

কৃষ্ণকিশোর থতমত খেয়ে বললে,—কি বলছেন?

গোঁফে পাক দেওয়ায় থামা দিয়ে বক্তা বললেন,—কুমু'কাকী হঠাৎ কাশীবাসী হ'লেন কেন?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার মুখে কিঞ্চিৎ হাসির ঝিলিক মারলো।

কৃষ্ণকিশোর কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বললে,—পুণ্যি অর্জ্জন করতে গেছেন। বুঝতেই তো পারছেন, বাকী দিনগুলো কাশীতেই কাটাতে চান আর কি।

গুম্ফধারী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য মুখে ফুটিয়ে বললেন,—বুঝতে আর পাচ্ছিনে? খুব বুঝতে পাচ্ছি। ধম্মকম্ম করবার সাধ হয়েছে আর কি!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলেছেন।

কিঞ্চিৎ হেসে বললেন বক্তা, গোঁফে পাক দিতে দিতেই বললেন,—আমরা শুনেছিলাম যে—শুনেছিলাম যে ছেলের জন্যেই কুমু'কাকী নাকি দুঃখে কাশী চ'লে গেছে। সত্যি কথা?

ক্ষণেকের জন্য হতভম্ব হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—শোনা কথায় কান দেন কেন? কত লোক তো কত কথা বলে!

বক্তার কানে ছিল আতরের তুলো। কান থেকে তুলোটা নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে বললেন,—আমরা শুনেছি খুব বিশ্বেসী লোকের মুখ থেকে। শুনে তো থ' হয়ে গিয়েছিলাম! কত কথাই শুনেছিলাম!

—শোনা কথায় কান দেন কেন? বলতে বলতে উঠে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—আমি যাচ্ছি এখন।

—খেয়ে যেতে হবে যে! সে কি কথা? বক্তার কথায় ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। হয়তো ভাবেন কথাগুলো উত্থাপিত না করলেই চ'লতো। কৃষ্ণকিশোর ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলে,—না, খাওয়া চ'লবে না। ক'দিন ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছি। আমি এখন যাচ্ছি।

বক্তাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই হল-ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। হন হন ক'রে চ'ললো। পথে যেতেই কিছু দূরে দেখলো আবদুলের জুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। জুড়ীর কাছাকাছি গিয়ে বললো,—চল' আবদুল, পৌছে দাও আমাকে।

আবদুল বললে,—বৌদি যাবে যে!

কৃষ্ণকিশোরের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে আছে। বললে,—ফের আসবে তুমি আমাকে পৌছে।

—ঠিক বাত আছে। চলিয়ে। বললে আবদুল।—উঠিয়ে।

যিনি এত কথা বললেন তাঁরই নাম পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। বড়বাড়ীর ভ্রাতাদের মধ্যে অগ্রজতম। ইচ্ছা ক'রেই হয়তো শুনিয়েছিলেন বা শুধিয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোরকে। ঘোরতম বিদ্বেষী হ'লেও নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে কথাগুলি বলায় এবং কৃষ্ণকিশোর না খেয়ে চ'লে যাওয়ায় হয়তো মনে মনে তাঁর মত জঘন্য চরিত্রের লোকও কিছুটা অনুতপ্ত হন। সদরের দালানে পায়চারী ক'রতে থাকেন। কিছুকাল যাবৎ মদ্যপানে বিরত থাকলেও ভৃত্যকে ডেকে বলেন কানে কানে,—কাছারী থেকে টাকা নিয়ে যা। এক বোতল ভ্যাট কিনে নে আয়। ছুটে যাবি আর দৌড়ে ফিরবি। বুঝলি?

ভৃত্য ভয়ে ভয়ে বলে,—হ্যাঁ হুজুর।

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন,—কেউ যদি জানতে পায়, তোকে গোটা খেয়ে ফেলবো! বুঝলি?

ভৃত্য ভয়ে ভয়ে বলে,—হ্যাঁ হুজুর।

পুণ্যাহের উৎসবে দিল খুশ্ থাকার দরুণ না কতকগুলো অপ্রিয় কথা বলার জন্য অনুতপ্ত হয়ে কে জানে, পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণর সত্যিই জোর নেশা চাগে হঠাৎ। অথচ অতিরিক্ত মদ্যপানে পেটে ব্যামো হওয়ায় মদ্য স্পর্শ ক'রতে পর্য্যন্ত তাঁকে নিষেধ ক'রেছে চিকিৎসক-বৈদ্য। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ পায়চারী ক'রেন ভৃত্যের প্রতীক্ষায়।

রাত্রি গড়াতে থাকে ধীর মন্থর গতিতে। জনাগমও ক'মতে থাকে। যে যার খেয়ে চ'লে যায়। হৈ-হল্লা আর কোলাহলেও ভাঁটা প'ড়তে থাকে।

শুধু ঝাড় আর বেল-লণ্ঠনগুলো ছুটি পায় না। স্তিমিত প্রভায় জ্বলতে থাকে ধিকি ধিকি। কোনটায় হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। নিবু-নিবু হয়েছে কোনটা।

ভিয়েনে উনুন আর চুল্লীগুলো কিছুক্ষণ আগে ছুটি পেয়েছে। এখনও গমগমে আঁচ। হালুইকর বামুনের দল কাজের শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে দোক্তা খাচ্ছে জটলা পাকিয়ে।

বাড়ীতে গাড়ী পৌছতে কৃষ্ণকিশোর গাড়ী থেকে নেমে বললে আবদুলকে,—বৌদিকে ব'লে পাঠাবে চটপট চ'লে আসতে।

—যো হুকুম। বললে আবদুল। বলতে বলতে মোড় ঘুরিয়ে জুড়ী ছোটালো তড়িৎ গতিতে। রাত্রি ঘন হয়েছে। পথ জনহীন। জুড়ী ছুটলো বিদ্যুতের মত। খটাখট শব্দ উঠলো। উত্তরোত্তর মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণর মুখে মাতৃদেবী কুমুদিনীর গৃহত্যাগের মুখ্য উদ্দেশ্য শুনে অত্যধিক বিরক্ত হয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। জুড়ী ফটকের ভেতরে যায়নি, যেজন্য ফটক থেকে সদরের দালানের সিঁড়ি পর্য্যন্ত হেঁটেই যেতে হয়। একশো আটটা সিঁড়িও টপকাতে হয়। দালানে পৌছে বেতের আরাম-কেদারায় ব'সে পড়ে। চক্ষু মুদিত ক'রে এলিয়ে পড়ে। ভাল লাগে না যেন রাত্রির তামসিকতা। দিনের আলো ফুটতে কত দেরী আর? মেজাজ শুধু রুক্ষ আর বিরক্ত হ'লে ক্ষতি ছিল না, লোকনিন্দার জন্য কেন কে জানে কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। অপবাদের ভয়, দোষের ভাগী হওয়ার ভয়। কৃষ্ণকিশোর ভাবে যে, বিষয়টা তা হ'লে আর অজানা নেই কারও।

কুমুদিনীর অভাবে আকর্ষণ জন্মায় না মনে, মার প্রতি বোধ করি ঘোরতম বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ জেগে ওঠে মনের গহনে।

টম্ কুকুরের গলা-বন্ধনীর ঘণ্টির শব্দ পাওয়া যায় দূরে। ঐ তো টম্। দালানের অন্য প্রান্তে লাফালাফি করছে। কি করছে কি টম্ লম্ফ দিয়ে দিয়ে! কয়েকটা আরশুলাকে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে হয়তো। নখর এবং থাবার সাহায্যে আক্রমণ চালিয়েছে। বাগ মানাতে পারছে না। আরশুলার দল উড়ে পালাচ্ছে এখান থেকে সেখানে।

—বৌ এলো না, তুই যে ফিরলি?

পাশ থেকে হঠাৎ কথা বললে অনন্তরাম।

চোখ খুলে চাইলে কৃষ্ণকিশোর। ঠেস দিয়ে ব'সেছিল, উঠে ব'সলো। বললে,—গাড়ী পাঠিয়েছি আমি ফিরে। সঙ্গে তো বিনো' আছে, আসছে তারই সঙ্গে। কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে বললে,—অনন্তদা, বামুনদিকে বলে আয়, আমি খাবো।

—নেমন্তন্ন গেছিলি, খাবো মানে? শুধোয় অনন্তরাম, কথায় কৌতূহল ফুটিয়ে। বলে,—অপমান টপমান করলে বুঝি কেউ?

ঘনান্ধকার আকাশে চোখ মেলে চুপচাপ ব'সে থাকে কৃষ্ণকিশোর। সকালের দিকে কখন বৃষ্টি হয়েছিল, দিনটাই আজ কেমন থমথমে গেছে। এখনও আকাশটা ঘোলাটে রূপ ধারণ ক'রে আছে। কিছুক্ষণ আগে থেকে মধ্যে মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া চ'লেছে। কেমন উত্তরের হাওয়া যেন।

কৃষ্ণকিশোর চেপে গেল বিষয়টা। বললে,—না, দুপুরে অত খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। ভাল লাগলো না ওখানে খেতে। হাজিরা দিয়ে চ'লে এলাম।

—ভাল করলে কি? না খেয়ে চ'লে আসাটা ভাল কাজ হয় নাই। বললে অনন্তরাম। বললে শুভাকাঙ্ক্ষীর মতই।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তোমাকে যা বলছি তুমি শোন' না। বল' গে যাও না বামুনদিকে।

গমনোদ্যত হয়ে বললে অনন্তরাম,—আমার কি! আমি গিয়ে বলছি। বলতে বলেছো, বলছি।

অনন্তরাম চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। চ'ললো অন্দরে। চ'ললো হয়তো খাস-কামরায়, যেখানে শ্বেতশুভ্র শয্যা বিছানো আছে পালঙ্কে। টাকা গুণতে গুণতে উঠে গিয়েছিল সিন্দুকের ঘর থেকে। ঘড়ার অর্দ্ধেক টাকা, মোহর আর গিনিও বোধ হয় গোণা হয়নি। নিমন্ত্রণ রক্ষার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উঠে প'ড়েছিল। সাজাগোজা করতেও সময় লেগেছিল কিয়ৎক্ষণ। যাওয়ার সময় সিন্দুকের ঘরের চাবিটা দিয়ে গিয়েছিল কাছারীতে। হেড-নায়েবের কাছে।

ঘড়া, টাকা, মোহর আর গিনি যেমনকার তেমনি প'ড়েছিল মাটিতে।

অন্দরের মুখে পৌছতেই থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। দৃষ্টি-বিভ্রম হয়নি তো? ভুল দেখছে না? কৃষ্ণকিশোর প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—কে? কে দাঁড়িয়ে আছো?

কৃষ্ণকিশোর অকস্মাৎ অন্দরমধ্যে এইরূপ দৈবী মূর্ত্তির মত কাকে দেখে নিস্পন্দশরীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্দরের মুখে কোন লণ্ঠন নেই। কিছু দূরে দালানের কড়িকাঠে ঝুলছে একটা আলো—একটা বিলিতি লণ্ঠন অসলার কোম্পানীর। যদিও রেড়ির তেলেই জ্বলে। জ্বলছিল ক্ষীণপ্রভ হয়ে। সেই আলোরই আভায় দেখতে পেয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। দেখে যেন বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে গিয়েছিল, স্তব্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল। মূর্ত্তিটি কোন রমণীর ব'লেই বোধ হয়। সত্যিই এক অসামান্যা রূপবতী নারী, বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি কৃষ্ণকিশোরের প্রতি ন্যস্ত ক'রে পাষাণ-মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মানা থাকে। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে কৃষ্ণকিশোরের দৃষ্টি চমকিত

লোকের মত, নারীটির দৃষ্টিতে সেই লক্ষণ কিছুমাত্র নেই, কিন্তু চক্ষুদ্বয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশিত হয়ে আছে।

কৃষ্ণকিশোর নারীটিকে নিরুত্তর দেখে বিস্মিত হয়ে বললে,—কে দাঁড়িয়ে? কথা বলছো না কেন?

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ'লে নারীটি মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আমি। আমার নাম পূর্ণশশী।

—আপনি! এখানে আপনি এমন দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর। পূর্ণশশীর কাছাকাছি গিয়ে বললে,—চলুন, ভেতরে চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

কথা বলতে বলতে লক্ষ্য ক'রলো কৃষ্ণকিশোর। পূর্ণশশী [illegible] শশীবৌদির চোখ দু'টিতে অশ্রু টলমল করছে। মুখাবয়ব ঈষৎ বিষণ্ন। [illegible] হোক পূর্ণশশী অপরূপ রূপের অধিকারিণী, কোন কারণে অত্যন্ত দুঃখিতা হ'লেও রূপপ্রভা যাবে কোথায়! হয়তো সুদর্শনার রূপ সুখে কিংবা দুঃখে বিনষ্ট হয় না।

পূর্ণশশী বললেন,—বৌমাটির জন্যে অপেক্ষা করছি। বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুনলাম, সে গেছে বড়বাড়ীতে পুণ্যের নিমন্ত্রণ রাখতে। ফিরবে তো শীঘ্র। তাই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

—আপনার চোখে জল কেন? জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

কয়েক মুহূর্ত্ত অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে থেকে বললেন পূর্ণশশী,—পুরোহিত মশাই কোন কথা জানিয়েছেন কি তোমাদের? আমি তো জানিয়েছি সকল কথা।

—জানি না তো আমি! বললে কৃষ্ণকিশোর।—কিছুতো বলেন না তিনি!

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন পূর্ণশশী। চোখের কোণে জলের জৌলুশ দেখা যায়। বললেন,—আমার কপাল! কথার শেষে অঞ্চলে চোখ দু'টি মুছলেন।

—ভেতরে চলুন আপনি। দাঁড়িয়ে থাকবেন এখানে?

পূর্ণশশী বললেন,—হ্যাঁ, এখানে বেশ আছি। বৌ আসুক। তাকে জানাই। জানিয়ে ঘরে ফিরে যাবো আমি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বিষয়টা গুরুতর ব'লেই মনে হচ্ছে। আমি জানতে পাই না?

পূর্ণশশী তৎক্ষণাৎ বললেন,—হ্যাঁ, পাবে জানতে। বৌ তোমাকে বলবে। তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করি ব'লেই তো যত বিপদ আমার! তোমার মার জন্যে, তোমাদের জন্যে, বিশেষতঃ ঐ কচি খোটির জন্যে থেকে থেকে বুকটা হু-হু করে ওঠে! থাকতে পারি না চ'লে আসি, তাতেই যত কাল হয়েছে আমার।

বিস্মিত হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর।

কোন কিছু অনুমান করতে পারে না। শুদ্ধবিস্ময়ে শুনে যায় শুধু। আর দেখে পূর্ণশশীর রূপমাধুর্য্য। ঐ উগ্র রূপ দেখতে দেখতে রূপানলে দৃষ্টি বুঝি দগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আলেয়া দেখলে মানুষ কি চক্ষু মুদিত ক'রে থাকতে পারে? দেখে কৃষ্ণকিশোর। অপলক দৃষ্টিতেই দেখে।

কম্পমান কণ্ঠে বললেন পূর্ণশশী,—তুমি যাও, কোথায় যাচ্ছিলে। আমি বৌ না আসা ওবধি এখানেই অপেক্ষা ক'রবো।

—একটা মোড়া কিংবা কেদারা দিতে বলি? বললে কৃষ্ণকিশোর। আপ্যায়িত ক'রলো হয়তো।

পূর্ণশশী বললেন,—না, কিছু দরকার নেই। তুমি শুনেছো তো উনি বিলাতে যাচ্ছেন?

কৃষ্ণকিশোর বিস্মিত হ'লেও খুশীর হাসি মুখে ফুটিয়ে বললে,—কালীকিঙ্করদাদা বিলাত যাচ্ছেন বুঝি? খুব ভাল কথা। শুনে আমি গর্ব্ব বোধ করছি। কিন্তু কেন যাচ্ছেন?

আঁচলে মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বললেন পূর্ণশশী,—ইংলণ্ডে যাবেন প্রথমে। ইংলণ্ড থেকে আরও কোথায় কোথায় যাবেন। গবেষণা করেন তো উনি, সেই কাজেই ডাক প'ড়েছে বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে। পাথেয় খরচ পাচ্ছেন, থাকা খাওয়ার জায়গা পাচ্ছেন, লেখচার দেওয়া, কাগজে আর্টিকেল লেখার জন্যেও প্রচুর টাকা পাচ্ছেন। একটা উপাধিও পাচ্ছেন। উপাধির সঙ্গে পাচ্ছেন সোনার মেডেল আর কিছু নগদ টাকা।

পূর্ণশশীর প্রত্নতাত্ত্বিক স্বামী কালীকিঙ্কর অনেক কাল থেকেই ডাক পেয়েছেন।

কিন্তু সময়াভাবের জন্য কলকাতা ত্যাগ করতে পারেননি। ডাক প'ড়েছে বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও তলব প'ড়েছে। ওরিয়েণ্টাল আর্কিওলজির বিষয়ে তিন মাসে তিন ছ'য়ে আঠারোটি বক্তৃতা দিতে হবে। ইংলণ্ড থেকে যাত্রা করবেন মেক্সিকোয় তিন মাস অতিবাহিত হ'লে। মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হবে উপাধি এবং মানপত্র। সোনার মেডেল আর নগদ টাকা। পথে যেতে যেতে আরও কোন কোন শিক্ষাকেন্দ্রে বক্তৃতা দিতে হবে, যার বিনিময়ে উপার্জ্জন করবেন হাজারে হাজারে টাকা।

পূর্ণশশীর তো ভাগ্যোদয় হয়েছে, তবে কেন, তবে কেন তিনি রোরুদ্যমানা! কেন বিমর্ষ, কেন বিষণ্ণ? শশীবৌদির মুখে পুরোহিতের নামোল্লেখ শুনে কৃষ্ণকিশোরের মনোমধ্যে প্রবল ইচ্ছা হয় অবিলম্বে পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কথা বলে। পূর্ণশশীর বক্তব্যটা এই মুহূর্ত্তে জেনে নেয়। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তবে আপনি অপেক্ষা করুন। আমি আসছি কাছারী থেকে।

—হ্যাঁ, আমি আছি এখানে। বললেন পূর্ণশশী।—আমাকে কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। দোহাই!

—শুনলাম না কিছু। কি বলবো আমি?

বলতে বলতে সদরের দিকে এগোয় কৃষ্ণকিশোর। কাছারীতে যায় না, যায় নাটমন্দিরের দিকে।

রাত্রি কত হয়েছে কে জানে! ঘোলাটে আকাশে কয়েকটা নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অনেক দূরে দূরে। জ্বলছে দপ্ দপ্। কখনও বা চলন্ত মেঘের তরঙ্গাঘাতে লুকিয়ে পড়ছে। দিনভোর থেকে থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছে। উত্তরে হাওয়ায় হিম-শীতলতা। শীত শীত করছে। হিম পড়ছে কি? না গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে! না ভ্রম হচ্ছে?

নাটমন্দিরেই ছিলেন পুরোহিত মশাই।

চোখে চশমা। পুঁথিপাঠ করছিলেন। হস্তলিখিত পুঁথি হলুদ রঙের তুলট কাগজের। কোন্ শাস্ত্র বিষয়ক পুঁথি? শিবায়ন না মহাতন্ত্র? গীতা না চণ্ডী কে জানে?

চশমা কপালে তুলে দেখলেন পুরোহিত মশাই। কে আসছে? পুঁথি পাশে রেখে বললেন,—কি হুকুম শুনতে পাই?

পুরোহিত মশাইয়ের সম্মুখে ব'সে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। ইতিউতি দেখে ফিস ফিস বললে,—শশীবৌদি ডাকিয়েছিলেন আপনাকে, কি বক্তব্য তাঁর বলুন তো?

চোখের চশমার সুতো খুলতে খুলতে বললেন মৃদুহাস্যে,—মিথ্যা কথা নয়। সত্যই ডাকিয়েছিলেন আমাকে। ডাকিয়ে অনেক কথা বললেন।

—যথা? শুধোলে কৃষ্ণকিশোর।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৃদু মৃদু হাসলেন পুরোহিত মশাই। কি ভাবলেন কি জানি হাসতে হাসতেই বললেন,—করকোষ্ঠী দেখালেন। বললেন কতকগুলি কথা। দেখেশুনে বুঝলাম বধূটির মঙ্গল আর শনি ভাল যাচ্ছে না। তথাপি বৃহস্পতির শুভফলের জন্য ক্ষতি হবে না কিছু। অর্থাগম হবে, স্বামীর যথেষ্ট শুভ হবে। মানমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হবে। বধূটির স্বামী শীঘ্র য়ুরোপ যাত্রা করছেন। কিন্তু তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদেরই আত্মীয়

অর্থাৎ ঐ বড়বাড়ীর স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই বধূটির ক্ষতি ক'রতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। দুষ্ট ব্যক্তিদের উৎকোচ দিয়ে ঐ পরিবারটির পিছনে লাগিয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মধ্যপথে পুরোহিত বাক্‌রোধ ক'রলেন। হয়তো কোন মন্ত্র জপ ক'রছেন মনে মনে। নয়তো ঐ শশীবৌদির মুখে বিবৃত বক্তব্যটা স্মৃতিপটে মন্থন ক'রছেন।

পুষ্প, চন্দন আর ধূপের মিশ্রিত সুগন্ধ নাটমন্দিরে।

উত্তরের হাওয়ায় কখনও জোরালো হয়, কখনও স্তিমিত হয় ঐ মিশ্রগন্ধ! আতপ তণ্ডুলেরও গন্ধ পাওয়া যায়। পুরোহিত মশাই কথা বলতে বলতে থামলে কি হবে, উগ্র কৌতূহলে কৃষ্ণকিশোরের শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়। নেহাৎ প্রণম্য ব্যক্তি পুরোহিত মশাই, অন্য কেউ হ'লে হয়তো কেন নিশ্চয়ই ধমক দিতো।

হঠাৎ কথা ধ'রলেন ব্রাহ্মণ,—বধূটির তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত তোমাদের ঐ বড়বাড়ীর আত্মজন বধূটির প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তদুপরি বধূটি সত্যই রূপবতী। কথা বলতে বলতে ব্রাহ্মণের কপালের শিরাগুলি ফুলে ওঠে। চোখে-মুখে দৃঢ়তা দেখা দেয়। বলেন,—তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমাকে বলতেও আমি লজ্জিত হচ্ছি। ওঁরা ঐ পরিবারটির পিছনে দুষ্টব্যক্তিদের লাগিয়েই ক্ষান্ত নেই। বড়বাড়ীর বাবুদের কারও কারও ইচ্ছা বলপ্রয়োগে বধূটিকে হরণ ক'রে—

কথাটি শেষ ক'রলেন না পুরোহিত মশাই। হয়তো কথা বলতে লজ্জানুভব ক'রছেন।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—আশ্চর্য্য মানুষ!

ব্রাহ্মণ মৃদুহাস্যে বললেন,—এখনও কত আশ্চর্য্য মানুষ দেখবে এই দুনিয়ার চিড়িয়াখানায়! তুমি কি জ্ঞাত আছো যে বধূটির স্বামী ম্লেচ্ছদেশে যাত্রা করছেন?

—এইমাত্র শুনেছি শশীবৌদির কাছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—হ্যাঁ। বধূটির স্বামী অশেষগুণসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি। গবেষণায় দিবারাত্র মগ্ন থাকেন। দৃক্‌পাত নেই পার্থিব বিষয়ে। আত্মসমাহিত। বধূটি বলছেন যে, ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করাতে ইচ্ছুক। বলছেন, আমাকেই ক'রতে হ'বে। কি কি করণীয় জানাতে ব'লেছেন। যাত্রার সময় সমুপস্থিত। শীঘ্রই যাচ্ছেন।

কালীকিঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা যেন নত হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোরের। বলে,—শশীবৌদিকে এই অবস্থায় একা রেখে যাবেন?

ব্রাহ্মণ বললেন কটির কষি আঁটতে আঁটতে,—ঐটি তো সমস্যা! স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিংকর্ত্তব্য? সহায়সম্বলহীন হয়ে কি থাকতে পারবে স্বগৃহে?

পট্টবস্ত্র। বৃদ্ধের কটিবাস বেসামাল হয়ে পড়ে যখন তখন। কথার শেষে পুঁথি তুলে নেন হাতে। জানুতে পুঁথি রেখে পার্শ্বস্থিত চশমা চোখে লাগিয়ে মাথার পিছনে সুতো জড়াতে উদ্যোগী হন।

কৃষ্ণকিশোর অনন্যোপায় হয়ে বললে,—পদধূলি দিন। আমি বিদায় গ্রহণ করছি। শশীবৌদি অপেক্ষা করছেন অন্দরের মুখে। আপনার বৌমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে গৃহে ফিরবেন।

—যাও, তুমি যাও। কথা শেষ ক'রে পুঁথিপাঠে রত হ'লেন। বললেন,—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ!

ইতোমধ্যে ফটকের কাছাকাছি জুড়ীর ঘণ্টা বাজলো ঢং-ঢং।

উঠে প'ড়লো কৃষ্ণকিশোর। চ'ললো অন্দরের দিকে। ফটক থেকে জুড়ী সোজা চ'ললো অন্দরের দরজায়। রাজেশ্বরী জুড়ী থেকে অবতীর্ণ হ'তেই এক নিমেষে লক্ষ্য করলো কৃষ্ণকিশোর, বৌ যেন অতি বেশী গম্ভীর। কেমন বিমর্ষ। সমগ্র মুখে দুঃখানুভূতির বিকাশ। কৃষ্ণকিশোরের বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠলো।

রাজেশ্বরী অন্দরে পা দিতেই পূর্ণশশী দ্রুতপদে প্রায় ছুটতে ছুটতে রাজেশ্বরীর কাছাকাছি এগিয়ে বৌকে সাপটে ধরলেন। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন কিয়ৎক্ষণ। বললেন,—বৌ, ব'লে পাঠাও গাড়ী যেন আস্তাবলে তুলে না দেয়। আমাকে পৌছে দেবে। আমি বাড়ী ফিরবো। রাত্রি গভীর, হেঁটে যাওয়া আমার পক্ষে বিপজ্জনক ভাই!

—কাঁদছেন কেন? বললে রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশী হাঁফ ছেড়ে বললেন,—ভেতরে চল', কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কৃষ্ণকিশোর শুধু দাঁড়িয়ে থাকে সদরের প্রাঙ্গণে। আর আকাশে নক্ষত্র, জলছে দপ্ দপ্।

কালো মসলিনের শাড়ী হ'লে কি হবে অঙ্গে অঙ্গে যেন বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দামী-দামী জড়োয়া গয়না, কাঁটার মত বিঁধছে যেন যেখানে-সেখানে। মুকুটের জন্যই কি না কে জানে, কপালের দুই তীর টিপ্-টিপ্ করছে কতক্ষণ ধ'রে। যতক্ষণ শুনেছে ঐ দীর্ঘাঙ্গী বৌটির মুখে দু'টি মাত্র কথা, মুসলমান বাইজী। পায়ের তলায় ভূমি যেন কাঁপছে। চোখে ঝাপসা দেখছে রাজেশ্বরী। বুকের ঠিক মধ্যিখানে দুরু-দুরু করছে। উৎসবে গিয়ে কোথায় খুশী মনে ফিরে আসবে, রাজেশ্বরী ফিরলো ভগ্ন-হৃদয়ে, সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে। কখনও স্তব্ধ হয়ে যায় হতাশায়, কখনও ইচ্ছা হয় ডাক ছেড়ে কাঁদে, কখনও মনে হয় একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা জোগাড় ক'রে সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে ধীরে-ধীরে বসিয়ে দেয় বুকে। খেতে ব'সে কিছু কি মুখে তুলেছে রাজেশ্বরী! কিছু কি দাঁতে

কেটেছে! পঙক্তি ভোজনে ব'সে উঠে পড়তে পারেনি অসামাজিকতা হওয়ার লজ্জায়, নয়তো কখন উঠে প'ড়তো রাজেশ্বরী। নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে, যারা আদর আপ্যায়িত করলে না, বরং কুকথা বর্ষালে কানে, টিটকারী দিলে, চিপটেন কাটলে, তাদের দেওয়া খাদ্য কখনও মুখে তোলা যায়! খেতে ব'সে কান দুটো আগুনে ঝলসে উঠছিল যেন। ঘামছিল রাজেশ্বরী। ভেতরের জামাটা বোধ হয় ঘামে ভিজে গেছে। বাড়ী ফিরে কোথায় বেশভূষা ছেড়ে স্বস্তি পাবে ক্ষণেকের জন্য, পূর্ণশশী হাজির হয়েছেন কাঁদতে-কাঁদতে!

খাস-মহলে অর্থাৎ রাজেশ্বরীর ঘরে পৌছতে পূর্ণশশী চোখের জল আঁচলে মুছে বললেন,—পোষাক-আষাক, গয়না-টয়না ছাড়ো আগে তুমি। বিশ্রাম নাও। ধীরে-সুস্থে কথা হবে। আমাকে কিন্তু ভাই রক্ষা করতে হবে বিপদ থেকে!

রাজেশ্বরী বললে,—অপেক্ষা করুন। ঝিয়েদের ডাকি, গয়নাগুলো খুলে দেবে। কিন্তু কি হয়েছে কি বলুন তো?

পূর্ণশশী ফুঁপিয়ে উঠলেন মুহূর্ত্তের জন্য। বললেন,—বললাম তো, ধীরে-সুস্থে বলবো। এসো আমিই খুলে দিই গয়নাগুলো।

লজ্জা বোধ করে যেন রাজেশ্বরী। বলে,—আসুক না ঝিয়েরা। আমি ওদের ডাকছি। আজকে থাকবেন আমার কাছে? রাত বেশ হয়েছে, নাই বা গেলেন দিদি!

পূর্ণশশী বললেন,—উপায় তো নেই ভাই। ঘরে ছেলেমেয়ে দুটো আছে। তাদের খাইয়ে এলে থাকতাম। তুমি এসো দেখি, গয়নাগুলো একে-একে খুলে দিই। রাখবে কোথায়? বাক্স-টাক্স যা হয় কিছু না হ'লে—

রাজেশ্বরীর কোমরে ঝুলছিল একটা জাফরাণ রঙের রুমাল। বাঙলার রেশমের, রঙীন আর বিচিত্র। বললে,—আপাতত এই রুমালটায় বেঁধে রাখি। কাল তুলবো গয়নার বাক্সে।

মুহূর্ত্ত কয়েক ভেবে বললেন পূর্ণশশী,—না বৌ, তুমি গয়নার বাক্সতেই রাখো। রুমালে বেঁধে রাখলে ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে। মুকুট-টুকুট কি রুমালে বেঁধে রাখা যায়!

সত্যি কথা বলেছেন পূর্ণশশী।

গত্যন্তর না দেখে রাজেশ্বরী দেরাজ খুলতে উদ্যোগী হয়। বলে,—চাবি তো দিদি নেই এখানে। আছে এলোকেশীর কাছে। এলোই তোলাপাড়া ক'রেছে গয়নার বাক্স। অপেক্ষা করুন, আমি ডাকি এলোকেশীকে।

পূর্ণশশী জানলার বাইরে আকাশে চোখ রেখে বললেন,—তবে ভাই, খুব বেশী দেরী হ'লে ছেলে-মেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়বে। খাওয়া হবে না। এমন অভ্যেস হয়েছে যে, ঘুমিয়ে পড়লে কার বাপের সাধ্যি যে তোলে! ঘুম ভাঙায়!

—না না, বেশী দেরী হবে না। আমি ডাকছি ওদের। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রাজেশ্বরী। ঘরের সমুখের দালান থেকে ডাকে,—এলো, ও এলো! কমনে গেলে বল' তো? আমি এলাম আর দেখা নেই তোমার?

কোথা থেকে সাড়া দেয় এলোকেশী। গলা ছেড়ে বলে,—যাই লো যাই। জানবো কেমনে যে এসে গেছো তুমি! যাবো আর কোথায় বল'? যম দয়া না করলে যাওয়ার জায়গা আছে?

এলোকেশী কিয়ৎক্ষণের মধ্যে গজরাতে গজরাতে এসে দেখা দেয়। ঘুম-ঘুম চোখে। আসে হাঁফাতে-হাঁফাতে।

রাজেশ্বরী তাকে দেখেই জ্বলে ওঠে যেন। বলে,—খুব কথা হয়েছে দেখছি! যাও না বিদেয় হয়ে! থেকে তো আমাকে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছো!

—আগ করছিস কেন তুই? ডাকতেই তো হাজিরা দিয়েছি।

এলোকেশী কথা বলে কেমন যেন বিষাদের সুরে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। শহরে থাকলে কি হবে, এলোকেশীর আকৃতি এবং প্রকৃতি যেমন গ্রাম্য ছিল তেমনিই আছে। রাজেশ্বরীর কথায় কখনও এলোকেশী পায়নি ক্রোধের আভাষ। মেয়ের কথা শুনে এলোকেশী বেশ বিস্মিত হয়!

রাজেশ্বরী বললে,—শুধু হাজিরা দিলেই তো চলবে না। দেরাজের চাবি খুলে ক্যাস-বাক্সটা দাও। গয়না-গাঁটি তুলতে হবে না?

পূর্ণশশীও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন। অসময়ে তাঁর উপস্থিতির জন্য কিছু বা লজ্জা বোধ করেন। এক পাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজেশ্বরী ও এলোকেশীর গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তিনিও উপলব্ধি ক'রেছেন, বৌ যেন আজ কেমন অন্য রূপ ধারণ ক'রেছে। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে রাজেশ্বরীর কথায়। হাবে-ভাবে! পূর্ণশশী বললেন,—আয় বৌ, আমি খুলে দিই গয়নাগুলো। এলোকেশী বাক্সে তুলুক।

হঠাৎ যেন অনুভব করে রাজেশ্বরী, সে এতক্ষণ কথা বলেছে বড্ড চড়া সুরে। বৌ-মানুষ হযে ক্রোধ প্রকাশ ক'রেছে বাইরের লোকের সমুখে! হঠাৎ কেমন যেন থ' মেরে যায় রাজেশ্বরী। ঘরের মেঝেয় বিছানো গালচেয় ব'সে পড়ে। পূর্ণশশী অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে একেকটি অলঙ্কার খুলে এলোকেশীর হাতে দিতে থাকেন।

ঘরের কোণে গ্র্যাণ্ড-ফাদার্স ঘড়িটা সহসা জলতরঙ্গের ধ্বনি তোলে। পূর্ণশশী ঘাড় বেঁকিয়ে দেখেন ঘড়ির দিকে। রাত্রি কত হ'ল? পূর্ণশশীর গুণ্ঠন মাথা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। কত চুল পূর্ণশশীর মাথায়! ঘনকালো কেশ! কি অপূর্ব্ব খোঁপা! মাথাটা জুড়ে আছে যেন। কালো চুলের মধ্য থেকে চিক-চিক করছে রূপোর কাঁটা। খোঁপার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চিরুণী। সোনায় বাঁধানো। চিরুণীতে লেখা আছে 'সাবিত্রী সমান হও'।

রাজেশ্বরী আচ্ছন্নের মত হয়ে আছে।

দেরাজের আয়নায় দেখছে পূর্ণশশীকে। যেন ইতোপূর্বে কখনও নজরে পড়েনি পূর্ণশশীর এই কমনীয় কান্তি। আচ্ছন্নের মত চুপচাপ ব'সে থাকে রাজেশ্বরী। মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত দেখায় যেন তাকে। নড়ন-চড়ন নেই। চোখের কোলে কালিমা ফুটেছে। পূর্ণশশী মনে মনে ভাবেন, কি হয়েছে কি বৌটার? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না পেরে বললেন পূর্ণশশী,—বৌ, তোর কোন অসুক-বিসুক করেনি তো? হাত দুটো হিম হয়ে আছে, কেন বল্ তো? চোখের কোলে কালি পড়েছে দেখছি। মুখখানা শুকিয়ে গেছে!

পূর্ণশশী যে জানেন না, কত খুশী মনে গিয়েছিল সে বড়বাড়ীতে। গিয়ে যা শুনলো সে-কথা শুনলে রাজেশ্বরী কেন, যে-কোন নারীই যে দিশাহারা হয়ে পড়বে। স্বামীর নামে অপবাদ! রাজেশ্বরীর কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। আসল বিষয়টা ব্যক্ত করতে পারে না। অপমানিত বোধ করে, লজ্জা পায়। বলে,—না দিদি, কিছু তো নয়। দুপুরে পিসীমার ছেলেরা আর তাদের বন্ধু ক'জন খেলে, মিটতে না মিটতে নেমন্তন্ন যাওয়ার ধকলে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

—তাই বল'। বললেন পূর্ণশশী।

বলতে বলতে পায়ের পাঁইজোর খুলতে যাবেন এমন সময়ে বাধা দেয় রাজেশ্বরী। বলে,—থাক্ দিদি, পায়ে হাত দেবেন না। আমিই খুলছি।

—তাতে কি হয়েছে? বললেন পূর্ণশশী। মৃদু হাসির সঙ্গে।

—না দিদি, না। আমাকে পাপের ভাগী করবেন না। বললে রাজেশ্বরী।—আপনি যে বয়োজ্যেষ্ঠ!

হাতের নোয়া আর ক'গাছা চুড়ি ছাড়া প্রায় সকল অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন পূর্ণশশী। এতক্ষণে শরীরটা তবুও কিছুটা হাঁলকা বোধ হয়

রাজেশ্বরীর। অলঙ্কার তো নয়, যেন কাঁটার গয়না। মুখে হাসি আসে না, তবুও হাসতে হয়। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে রাজেশ্বরী,—এখন বলুন বিপদটা কি হ'ল?

দুঃখের ক্ষীণ হাসি দেখা দেয় পূর্ণশশীর মুখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—জামা আর শাড়ীটাও বদ্‌লে নে না বৌ। লজ্জা করবে? এই আমি দু'হাতে চোখ বন্ধ ক'রে রাখছি। নয়তো বল, আমি ক' দণ্ডের জন্যে দালানে গিয়ে দাঁড়াই।

—না না। লজ্জা করবে না। চোখেও হাত চাপতে হবে না।

ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বললে রাজেশ্বরী। উঠে প'ড়লো কথা বলতে বলতে।

এলোকেশীরও কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণশশী একেকটি অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন আর এলোকেশী তুলেছে ক্যাশ-বাক্সে। এলোকেশী বললে—হ্যাঁ, শাড়ী আর জামা ছেড়ে দিদির সঙ্গে কথা কও। আমি এনে দিচ্ছি আটপৌরে পোষাক। চেঁচামেচি ক'র না যেন তুমি। যাবো আর আসবো। ঘরেই রেখেছিলাম। আজ শনিবার, ধোপা আসতে কাচতে দিয়ে দিয়েছি। ফর্সা শাড়ী আর জামা আছে চানের ঘরে।

রাজেশ্বরী লক্ষ্য করলো এলোকেশীর চোখে আর মুখে যেন দুঃখ ফুটে উঠেছে। দেখে রাজেশ্বরীর মনটাও ব্যথিয়ে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে। ভাবলো, আহা ব্যাচারী! অযথা তাকে কড়া কথা বলা হয়েছে। বুড়ী মানুষ, মনে ব্যথা পেয়েছে কত!

যার দোষ নেই, যে কোন অন্যায় করে না, যার বিরোধ নেই কারও সঙ্গে, তেমন মানুষের মনে ব্যথা দিলে, তাকে তিরস্কার করলে সত্যিই হয়তো মায়া হয় মনে। রাজেশ্বরীও তাই হয়তো মনোকষ্ট পায়। কিন্তু এলোকেশী যদি জানতো কি শুনে এসেছে সে নিমন্ত্রণ

রক্ষা করতে গিয়ে। 'মুসলমান বাইজী', 'মুসলমান বাইজী'—কথা দুটি যত বার মনে পড়ছে তত বার বুকের মধ্যিখানটা দুরু-দুরু ক'রে উঠছে রাজেশ্বরীর। কানে তালা লেগে যাচ্ছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ছে। পায়ের তলায় মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চোখে ঝাপসা দেখছে। রাজেশ্বরী বললে,—দিদি, কে কোথায় বন্দুক ছুঁড়ছে বলুন তো?

পূর্ণশশী তো হতবাক্। কান খাড়া ক'রে খানিক শুনে বললেন,—কৈ, না তো বৌ। আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। তুমি ভুল শুনছো।

—বৌদিদি আছো ঘরে?

ঘরের বাইরে থেকে কথা বললে অনন্তরাম। চমকে উঠলো যেন রাজেশ্বরী। থমকে থাকলো কয়েক মুহূর্ত। পূর্ণশশী তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানলেন। রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ, আছি। কিছু বলছো অনন্ত?

—হ্যাঁ, বৌদিদি। বলছি যে, হুজুর বন্দুকের আলমারীর চাবিটা চাইছে। দেরাজের বাঁ দিকের টানায় একটা রূপোর কৌটয় আছে। বের ক'রে দিতে বললে।

কথাটা শুনে হতচকিত হয়ে গেল রাজেশ্বরী। বললে,—কেন অনন্ত? বন্দুকের আলমারীর চাবি কি হবে?

রাজেশ্বরী ব্যস্ত ও ব্যগ্র হয়ে উঠলো যেন। পূর্ণশশীও বিস্মিত হয়ে পড়লেন। অনন্তরাম বললে,—বলছে যে সাফ করতে দেবে বন্দুক ক'টা।

—কেন অনন্ত? মিনতির স্বরে বললে রাজেশ্বরী। বুকের ভেতরের দুরু-দুরু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগলো।

ক্ষোভের হাসি হাসে অনন্তরাম। হতাশ-হাসি। কত কাল ধ'রে আছে অনন্তরাম! সেই কর্ত্তাদের আমল থেকে। এখনও ক্ষণে ক্ষণে অনন্তরামের চোখে ভেসে ওঠে স্বর্গগত মানুষ দুটিকে—কৃষ্ণচরণ আর

কৃষ্ণকান্তকে। এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মতই। গন্ধহীন সুদৃশ্য পুষ্প হ'লে কথা ছিল না। দুটি ফুলের রূপ আর গন্ধের আকর্ষণে কত লোক মুগ্ধ হয়ে যেতো। রূপে আর গুণে অতুলনীয় ছিলেন তাঁরা দুজনে। অতীত না দেখলে সহ্য করতে পারতো অনন্তরাম। সৎ না দেখলে অসৎকে চিনতে পারতো না। অতীতের সেই দেবতুল্য মানুষ দুটিকে মনে পড়লেই তখন চোখ ফেটে জল আসে অনন্তরামের। ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রাজেশ্বরীর কথার ধরণ শুনে হতাশ-হাসির সঙ্গে বললে অনন্তরাম,—ভয় নাই বৌদিদি। ভয় নাই। বন্দুকগুলো মধ্যে-মধ্যে সাফ না করলে মরচে ধ'রে যায় যে! জং ধ'রে যায়।

অসহায়ের মত ব্যথাতুর কণ্ঠে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—এত রাত্রে সাফ না করলে চলবে না? হাত ফসকে যদি—

হেসে ফেললো অনন্তরাম। হাসতে হাসতেই বললে,—না না, টোটা ভর্ত্তি ক'রে কি সাফ করা যায়? তুমি দেখছি কিচ্ছু জানো না!

রাজেশ্বরী বললে,—তা এত রাত্রে বন্দুক পেড়ে না বসলে চলছে না? তুমি মানা কর' অনন্ত। বল' বৌদিদি বলছে যে, কালকে দিনের আলোয়—

—কি ব'লবো বল'! কথার মাঝেই কথা বললে অনন্তরাম।—আমি তো পৈ-পৈ ক'রে মানা ক'রেছিলাম। না শুনলে আমি কি করতে পারি বল'? কথায় বলে না, নাই কাজ তো খৈ ভাজ্! বলা হয়তো উচিত নয়, তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় যে কথা! তুমি যখন বলছো, আমি গিয়ে বলি গে। শুনছি যে, পুণ্যের নিমন্ত্রণে গিয়ে খেয়ে আসে নাই।

—তোমাকে কে বললে অনন্ত?

—যে বলবার সেই বললে। বামুনদিকে ব'লে পাঠালে আমাকে দিয়ে। বললে অনন্তরাম গমনোদ্যত হয়ে।

—কি ব'লে পাঠালে? বল'ই না খোলসা ক'রে! রাজেশ্বরীর কথায় অদম্য ব্যগ্রতা। স্তব্ধ ও অপলক আঁখিপল্লব।

অনন্তরাম চ'লে যেতে-যেতে বললে,—বামুনদিদিকে বলতে বললে যে, খেয়ে আসি নাই। খানা তৈরী করতে বললে।

হতচেতনের মত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধ'রে। ভাগ্যিস পাল্লাটা ধরেছিল, নয়তো নিশ্চয়ই আচমকা প'ড়ে যেতো রাজেশ্বরী। মুখ থুবড়ে প'ড়তো। অনন্তরাম যা ব'লে গেল, শুনে অনেক কথাই ভাবতে থাকে। ভাবে, বড়বাড়ীতে গিয়ে খাওয়ার কথা ব'লেছিল কৃষ্ণকিশোর। কি হ'ল কি! রাজেশ্বরী ভেবে যেন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না।

—এই নাও জামা আর শাড়ী। বদ্‌লে নাও। পোষাক বদল ক'রে কথা কও দিদির সঙ্গে। এলোকেশী কথা বলে গম্ভীর বদনে। কেমন যেন বীতস্পৃহের মত।

এলোকেশীর কথা শুনে চমক ভাঙ্গে রাজেশ্বরীর।

জ্ঞান ফিরে পায় যেন। লক্ষ্য ক'রে দেখে এলোকেশীর মুখাবয়ব। জামা আর শাড়ীটা নিয়ে দরজায় অর্গল তুলে দিয়ে কালো মসলিনের জরিদার শাড়ীটা ছেড়ে ফেলে। কালো ভেলভেটের জামাটাও খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পালঙ্কে গিয়ে আছড়ে পড়ে জামাটা। এখন গায়ে শুধু কাঁচুলী আর শায়া।

পূর্ণশশী যেন আর থাকতে পারলেন না। বললেন,—কি চমৎকার গড়ন তোর বৌ! ঠিক পাথরের মূর্ত্তির মত! কুঁদে-কুঁদে তৈরী ক'রেছেন হয়তো বিধাতা।

ভাল লাগছে না শুনতে রূপের প্রশংসা। তবুও হাসলো রাজেশ্বরী। সলাজ হাসি। আটপৌরে জামা আর শাড়ীটা অতি দ্রুত গায়ে চাপালো। চাবির গোছাটা দেরাজের পাল্লা থেকে খুলে আঁচলে বেঁধে দরজার অর্গলটা খুলে দিয়ে বসলো গালচেয়। কৃত্রিম হেসে বললে,—বলুন যা বলছিলেন।

পূর্ণশশীও যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ জ্ঞান

ফিরে পেলেন যেন। বললেন,—উনি বিলাত যাচ্ছেন কয়েক দিনের মধ্যে। সামনের তেইশে জাহাজে উঠছেন।

খুশীর হাসি হাসলো রাজেশ্বরী। আন্তরিক খুশী-ভরা হাসি। বললে,—সত্যি? তা আমাকে কি করতে হবে হুকুম করুন। কাঁদলেন কেন?

দম নিয়ে বললেন পূর্ণশশী,—উনি তো যাচ্ছেন। ফিরতে তো সাড়ে চার মাস লাগবেই। কিন্তু আমি তো একা থাকতে পারি না ভাই! উনি ছাড়া অন্য কেউ পুরুষ নেই বাড়ীতে, তুমি তো জানো!

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ।

পূর্ণশশী রাজেশ্বরীর হাত সস্নেহে ধ'রে বললেন,—শুধু হ্যাঁ বললে চলবে না ভাই! একটা উপায় বলতে হবে। বড়বাড়ীর বাবুদের কয়েক জন আমাদের সঙ্গে কি শত্রুতাই চালিয়েছে জানো না তো তুমি?

রাজেশ্বরী ঘাড় নাড়লে। বললে,—না। কিন্তু কেন? কি দোষ আপনাদের?

হতাশ-হাসি হাসলেন পূর্ণশশী। দুঃখপূর্ণ হাসি। বললেন,—তোমা-দের পুরোহিত মশাইকে ডাকিয়ে জানিয়েছি। তিনি কিছু বলেননি? সে ভাই অনেক কিছু। উনি বিলেত যাচ্ছেন, পুরোহিত মশাইকে ডাকিয়ে-ছিলুম প্রায়শ্চিত্তির করাতে। দিন-ক্ষণ দেখে দিতে।

রাজেশ্বরী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বলে,—পুরোহিত মশাই বলতে চেয়েছিলেন। সময় হ'ল না তখন যে। তাড়া ছিল।

পূর্ণশশী বললেন ফিস-ফিস কণ্ঠে,—সে ভাই অনেক কিছু। আমাকে উড়ো চিঠি দেয়। গয়না আর টাকার লোভ দেখায় চিঠিতে। আমাদের পেছনে গুণ্ডা লেলায়। আমাকে হরণ করবার ভয় দেখায়। শেষে কি বুড়ো বয়সে মান-মর্য্যাদা খোয়াবো!

গালে হাত দেয় রাজেশ্বরী। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় যেন। বলে,—সে কি কথা দিদি! আমি কি করতে পারি বলুন?

পূর্ণশশী বললেন,—তা হ'লে বলি ভাই ?

রাজেশ্বরী।—হ্যাঁ।

পূর্ণশশী চিন্তাকুল হয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত্ত। অনন্তরাম আবার ডাক দেয় দরজার বাইরে থেকে। বলে,—বৌদিদি আছো ?

—হ্যাঁ আছি অনন্ত। কিছু বলছো ? ব্যগ্র চিত্তে ফিরে তাকায় রাজেশ্বরী। বললে,—বললে তুমি ?

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ বলেছি। রাজী হয়েছে বৌদিদি। বলছে যে, বেশ আজ থাক, রাত হয়েছে, কাল হবে।

—যাক্, বাঁচা গেল। বললে রাজেশ্বরী।

কথা মিটে গেছে তবুও অনন্তরাম তো কৈ চ'লে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।

পূর্ণশশী বললেন,—অনন্ত বোধ হয় আর কিছু বলছে। দাঁড়িয়ে আছে কেন ? কিছু বলতে চায় যদি শুনে আয় বৌ। হয়তো আমার সামনে বলতে চায় না।

—আর কিছু বলছো অনন্ত ? শুধোলে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ বৌদিদি। বলছিলাম যে, কালকের দিনটা আমাকে ছুটি দিতে হবে।

সহাস্তে বললে রাজেশ্বরী,—বেশ তো। ছুটি নিও তুমি। যাবে কোথায় ?

অনন্তরাম পায়ের নখ মেঝেয় ঘষতে-ঘষতে বললে,—আমার কোন প্রয়োজন নাই। যেতে হবে তোমার মনোহরপুরের প্রজাদের সঙ্গে।

রাজেশ্বরী বললে,—কোথায় যাবে অনন্ত ?

হয়তো পূর্ণশশী ঘরে ছিলেন ব'লে ঈষৎ লজ্জা পায় অনন্তরাম। লজ্জিত হয়েই বলে,—বল' কেন বৌদিদি ! আমাকে দলপতি পাকড়েছে। গেঁয়ো ভূত তো, সাত-পুরুষে কিচ্ছু দেখে নাই ! সঙ্গে যেতে হবে। কলকাতা

শহর চষতে হবে। সঙ্গে গিয়ে দেখাতে হবে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, মরা সোসাইটী, কালীঘাটের কালীর মন্দির, মন্থমেণ্ট, হাইকোর্ট, শিবপুরের কোম্পানীর বাগান, ইডেন গার্ডেন। আর-আর যা আছে দেখবার, দেখাতে হবে। সঙ্গে গিয়ে আমার তো কত সুখ! রোদ্দুরে পোড়া আর ঘুরে-ঘুরে পায়ে বেদনা হওয়া—

হেসে ফেললো রাজেশ্বরী। পূর্ণশশীও হাসলেন। রাজেশ্বরী বললে,—ভাল কথা তো। আহা! গ্রামে থাকে, কলকাতা থেকে কত দূরে থাকে! দেখতে পায় না কখনও কিছু! বেশ তো, তুমি যেও। আমি তোমাকে ছুটি দিচ্ছি।

—ফিরতে কিন্তু দেরী হবে বৌদিদি। সূর্য্যোদয়ের আগেই অবিশ্যি যাত্রা ক'রবো ভেবেছি। বললে অনন্তরাম। বললে,—অবিশ্যি চেষ্টা ক'রবো যত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।

—বেশ, বেশ, তুমি যেও। হুকুমের সুরে কথা বললে রাজেশ্বরী। হয়তো হঠাৎ মনে পড়তেই বললে,—বামুনদিকে ব'লে দিয়েছে তো খাবার তৈরীর কথা।

—তৎক্ষণাৎ ব'লে দিয়েছে বৌদিদি। বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে দিয়েছি। বললে অনন্তরাম।

—আচ্ছা, তুমি যাও। হুকুমের সুরে কথা বললে রাজেশ্বরী। বললে, —অনন্ত, গাড়ী যেন আস্তাবলে তুলে না দেয়। রাত্রি অনেক হয়েছে। দিদিকে বাসায় পৌছে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। জুড়ী অপেক্ষা করছে।

কথার শেষে বিদায় নেয় অনন্তরাম। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিদায় নেয়। বেশী কথা বলতে হয়নি বৌদিদিকে, যাকে বলে এক কথায় রাজি হয়ে গেছে বৌদিদি। যেতে-যেতে ভাবে অনন্তরাম, বৌদিদির মত মানুষ হয় না। যেন মাটির মানুষ! কত মিষ্টি কথা বৌদিদির। যতই হোক, হাঘরের

মেয়ে তো নয়! শুধু হাতেও আসেনি, কত সম্পত্তির মালিক বৌদিদি! রূপে আর গুণে বৌদিদি অতুলনীয়!

—বলুন দিদি, যা বলছিলেন। বললে রাজেশ্বরী। সাগ্রহে।

পূর্ণশশী হয়তো কথাটা পাড়তে সঙ্কোচ বোধ করেন। ইতিউতি ভেবে বললেন,—আমাকে ভাই এই ক'মাস তোমার কাছে থাকতে দাও। আমার অনুরোধ। গত্যন্তর না দেখতে পেয়ে তোমাকেই বলতে হচ্ছে।

হেসে ফেললো রাজেশ্বরী। বললে,—এই কথা? নিশ্চয়ই থাকবেন আমাদের কাছে। যদ্দিন খুশী। এই কথা বলতে এত বাধো-বাধো ঠেকছে আপনার?

পূর্ণশশী আন্তরিক খুশী হ'লেন। ভেবেছিলেন বৌ রাজী হবে না। যতই হোক, অন্য ঘরের মেয়ে। ওজর-আপত্তি তুলবে। রাজেশ্বরীর সম্মতি শুনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। পূর্ণশশী বললেন,—থাকতুম বাপের বাড়ীতে গিয়ে। কিন্তু আমার বাপ-মা তো নেই। ভাইরা আছে ক'জন। তাদের বৌ আর ছেলেপুলে আছে। খুব যত্ন ক'রে রাখতো। কিন্তু ভাই, অন্যের ভার হয়ে থাকতে চাই না। ভিক্ষে ক'রে পথে-পথে গাছের তলায় থাকবো তবুও বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠবো না! তোমাদের শুভেচ্ছায় আমার তো অভাব কিছুর নেই! শুধু লোকবলেরই যা অভাব। তুমি তা হ'লে কথা দিলে তো ভাই?

রাজেশ্বরী হেসে ফেললে। বললে,—হ্যাঁ, কথা দিলাম। যেদিন খুশী চ'লে আসুন। যত তাড়াতাড়ি আসেন ততই ভাল। আমি তো কথা বলবার লোক খুঁজে পাই না। দম আটকে মরবার উপক্রম হয় থেকে-থেকে।

পূর্ণশশী রাজেশ্বরীর চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমা খেয়ে উঠে পড়লেন। বললেন,—তা হ'লে আজ আমি আসি ভাই? তুমি শুধু কিশোরের সঙ্গে কথা ক'য়ে রেখো।

রাজেশ্বরীও উঠে পড়লো। বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, ওঁকে আমি রাজী করাবো। তা ছাড়া আপনি থাকবেন, তাতে কি আপত্তি হবে ?

পূর্ণশশী খুশী মনে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চললেন সদরে। সেখানে গাড়ী অপেক্ষা করছে। দালান আর ঘর-দোর দেখতে দেখতে যেতে-যেতে অনেক দিন পূর্ব্বের অনুভূতি সহসা ফিরে আসে পূর্ণশশীর মনে। সেই যখন কৃষ্ণকান্ত জীবিত ছিলেন তখনকার মনোভাব। সাধু-প্রকৃতির সেই মানুষটি মনোমধ্যে জাগরূক হয় হঠাৎ কেন আজ! পূর্ব্বস্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পূর্ণশশীর মনের সঙ্গোপনে জাগে একটি কথা—বিয়ে না হয় না-ই হয়েছে তাঁর সঙ্গে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত যদি বেঁচে থাকতেন!

কথাগুলি মনে হ'তেই বুকটা যেন ধড়াস্-ধড়াস্ করতে থাকে পূর্ণশশীর। দ্রুতপদে এগিয়ে চলেন তিনি। সিঁড়ি ভাঙেন যন্ত্রচালিতের মত! কৃষ্ণকান্তর জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো যেন হঠাৎ! কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীকে মনে প'ড়ে যায় পূর্ণশশীর। নিরীহ ও আত্ম-ভোলা মানুষটি। কোন দোষ নেই। দিন নেই, রাত্রি নেই, পড়াশুনায় আত্ম-সমাহিত। যেন এক ঝড়ের দোলায় দুলতে-দুলতে গাড়ীতে উঠলেন পূর্ণশশী! সঙ্গে চললো অনন্তরাম। ফিস-ফিস শব্দে অনন্তরামকে বললেন, —আমার জন্যে ব্যাচারীরা কত কষ্ট পেয়েছে এই হিমের রাত্রে।

অনন্তরাম বললে,—না না, বৌদিদি। কি যে তুমি বল'!

চলন্ত গাড়ীর কোচবাক্সে উঠে বসলো অনন্তরাম। রাজেশ্বরীর মুখে সম্মতি পেয়ে খুশী হ'লেও বুকের মধ্যে কোথায় যেন আলোড়ন উঠেছে পূর্ণশশীর। কাঁটার মত খচ্-খচ বিঁধছে একেক সময়ে। গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক থেকে আকাশ দেখলেন পূর্ণশশী। দেখলেন হয়তো রাত্রি কত হয়েছে। কিছু দেখতে পেলেন না। কুয়াশায় ঢেকে আছে দিগ্বিদিক। দু'-একটা জলজলে তারা কচিৎ দেখা যাচ্ছে কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে। পূর্ণশশী

তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। কাশীকিঙ্করের ইংলণ্ড গমনের সময়ে যাই হোক্ ভয়ে-ভয়ে থাকতে হবে না। রাজেশ্বরীর কাছে থাকবেন আর বাসায় কোন লোক থাকবে। চাবি দেওয়া থাকবে ঘরে-ঘরে। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন পূর্ণশশী।

রাত্রির ফাঁকা পথ ধ'রে তড়িৎ গতিতে ছুটলো গাড়ী।

কুমুদিনী যদি থাকতেন আজ!

মনে মনে ভাবলেন পূর্ণশশী। কুমুদিনী থাকলে ভাবতে হ'তো কিছু? তিনি নিজে থেকেই বলতেন থাকবার কথা। কিন্তু কুমুদিনী কোথায় এখন! কাশীবাস করছেন ছেলের প্রতি অভিমান ক'রে।

যখন-তখন বক্ষঃস্থল ছাঁৎ-ছাঁৎ ক'রে ওঠে কুমুদিনীর।

যতই হোক গর্ভধারিণী। কত কষ্টে লালন-পালন ক'রেছেন ছেলেকে। জ্ঞাতিশত্রুদের কত কুটিল চক্রান্তকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে। পুত্র এবং পুত্রবধূকে শুধু মাত্র চোখের দেখা দেখতে মনটা হু-হু করতে থাকে কুমুদিনীর। গুমরে-গুমরে ওঠেন। কচিৎ কখনও ইচ্ছা হয়, ছুটে চ'লে যান কলকাতায়। গিয়ে শুধু মাত্র চোখের দেখা দেখেন পুত্র ও পুত্রবধূকে। সেই ছেলে, যাকে জন্ম থেকে চোখের আড়াল করেননি কদাচ, একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে কখনও খোঁজ নেয় না! ক্ষোভ আর অভিমানের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছেন কুমুদিনী। লজ্জায় মুখ দেখাতে পর্য্যন্ত চান না পরিচিতদের কাছে।

পূর্ণশশীর মনে পড়ে কুমুদিনীকে।

তিনি থাকলে কিছু ভাবতে হ'তো? শুধু বলবার অপেক্ষা। মুখের কথা খসাতে না খসাতে সকল ব্যবস্থা হয়ে যেতো। পূর্ণশশী ভাবেন, কুমুদিনী এখন কোথায়? কাশীতে আছেন কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন কে জানে। কেমন আছেন জানেন শুধু ঈশ্বর।

কুমুদিনী প'ড়েছিলেন ভূকৈলাস রাজবংশজাত ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত কাশী-পরিক্রমা। প'ড়েছিলেন,—

প্রতি শুক্রবারে শুক্রেশ্বর নর সতত পূজিবে।
শনিবারে শনৈশ্চরেশ্বর যাত্রা বিধান করিবে॥

আজ শনিবার, যেজন্ত কুমুদিনী নির্জ্জলা উপবাস ক'রে শনৈশ্চরেশ্বরের পূজার জন্ম অপেক্ষা করছেন। মন্দির ভিড়াক্রান্ত। লোকজনের ভিড়ে কখনও পূজা করা যায়! কুমুদিনী প্রতীক্ষা করছেন, ভিড় কমুক। মাড়োয়ারী নারীদের ভিড়েই মন্দির ভর্ত্তি হয়ে আছে। চাতালের এক পাশে আর দাঁড়াতে না পেরে ব'সে প'ড়েছেন। উপবাসক্লান্ত শরীর বইছে না যেন আর। চুপচাপ ব'সে লক্ষ্য করছেন, মাড়োয়ারী নারীদের বেশভূষা। কত লক্ষপতি ও কোটিপতির ঘরের বৌ আর মেয়ের দল, দল বেঁধে এসেছে। গুণ্ঠনবতী হ'লে কি হবে, মধ্যাঙ্গ উন্মুক্তপ্রায় সকলের। অলঙ্কারগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন কুমুদিনী। দেখছেন পায়ে বাঁকরি বা বেঁকি। বাঁকজোল বা বাঁকমল। নূপুর। ঝমর-ঝমর শব্দ উঠছে। দেখছেন আজট আর ঘুঙুর। রত্নময় সোনার পৈছি। বাজুবন্দ। হীরার চিকা। মোহনমালা। উরুদেশে মুক্তামালার দোলনী। কানে ঢেড়ি আর ঝুমকো। মুক্তার নথ বা নোলক। চুনি, পান্না আর হীরার যেন ছড়াছড়ি। ঝলমল করছে। বেনারসী, শোষণী, নরুণসি, গোলাবী সোহা, গোলালা রঙ্গমবঙ্গী, কির্ম্মিজি আর মট্রদার শাড়ী-পরিহিতাদের ভিড় শুধু। জরির উড়ানি, ডুরিয়া দোদামি জামদানি ও গোটাদার ঝপ্পান-ধারিণীদের যাওয়া-আসা।

অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরের নিকটেই শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দির। সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, শনৈশ্চরেশ্বরের অর্চ্চনা করলে মানুষ দেহান্তে কাশীলোকে সুখভোগ করে। শনৈশ্চর শিবের শিরোভাগ রৌপ্যময় এবং নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছে আবৃত।

কুমুদিনী চুপচাপ ব'সে নেই।

মনে-মনে তিনি [illegible] জপ করছেন। একশো আট থেকে হাজার

আট মন্ত্র-জপ হয়ে গেছে হয়তো। মধ্যে-মধ্যে চোখ দুটি মুদিত হয়ে যাচ্ছে। পরিধানে পট্টবস্ত্র আর গরদের চাদর। হাতে ধ'রে আছেন ফুলের সাজি। কুমুদিনীকে দেখলে এখন চেনা যায় না। শরীর কৃশ হয়ে গেছে। সেই রূপ আর নেই। শুভ্র রঙ ঝলসে গেছে যেন আগুনে। উপবাসে-উপবাসে দেহ ভেঙে প'ড়েছে। আয়ত আঁখিযুগলের কোলে কালির প্রলেপ প'ড়েছে।

পুণ্যার্থীদের চিৎকার আর কলরোল। গগন-বিদারক ধ্বনি। মধ্যে-মধ্যে ঘণ্টা বাজে কোথাও কোথাও। দর্শনার্থীগণ হয়তো বাজায়। কত সহস্র দেব-দেবী আছেন বিশ্বনাথের চত্বরে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দীপের আলো জ্বলছে মন্দিরে। সেঁজুতি জ্বলছে। দেওয়ালগিরি জ্বলছে। বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠন জ্বলছে। সত্যি কিনা কে জানে, হয়তো ভ্রম হচ্ছে—জ্বলন্ত আলোকরেখা প্রতিফলিত হওয়ায় দেব-দেবীদের বিস্ফারিত চোখের মণি কাঁপছে। দেব-দেবীগণ দেখছেন অপলক নেত্রে। দেখছেন যেন দর্শনার্থীদের মধ্যে কে পাপী আর কে পুণ্যবান। শিলাময় মূর্ত্তির জীবন্ত দৃষ্টি দেখে পাপীদের হৃদ্‌পিণ্ড কেঁপে উঠছে থরো-থরো।

হঠাৎ হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনিতে চমকে চমকে ওঠেন কুমুদিনী। উপবাসক্লান্ত দুর্ব্বল শরীর। ইষ্টমন্ত্র জপ্‌তে জপ্‌তে চেতনা হারিয়ে ফেলেন যেন। কোন সাড় থাকে না। চিৎকার আর কোলাহলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু উপায় কি! দেব-দেবী তো কারও একচেটিয়া নয়। যার ইচ্ছা হবে, আসবে। দেখবে। পূজা করবে যতক্ষণ খুশী। পূজা করতে করতে কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে। থেকে-থেকে অগুরু ধূপের গন্ধবাহী হাওয়া বইছে। গাঁদা ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন হাওয়ায়। বিরক্তিকর শব্দে মধ্যে-মধ্যে চোখ মেলে দেখছেন কুমুদিনী। মন্দিরের ভিড় কমুক্তে কত দেরী আর। ভিড় যে ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়ে চ'লেছে। তা হোক, পুণ্যলাভ করতে

হ'লে ধৈর্য্যধারণ করতেই হয়। কোন্ মন্দিরের আঙিনায় কোন' ব্রাহ্মণ কি বেদ অধ্যয়ন করছেন! শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে কোথায়! ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্রের শব্দ-ঝঙ্কারে কেমন যেন মোহ সৃষ্টি করছে! কুমুদিনী চোখ খুলতেই দেখছেন কিংখাব শাড়ীর ছড়াছড়ি। লাল, কমলা, জরদা এবং শুভ্র রঙের বুটিদার, বেলদার, জঙ্লা, মিনা, জালদার ও চসম ফুলের কিংখাব-পরিহিতা নারীদের জমায়েৎ হয়েছে। কিংখাবের শাড়ীর ভেতর থেকে ঝিলিক মারছে সাঙ্লা বা সাঙ্গী। অন্তর্বাস। ধন্নুকপাটা, কারচোব আর ফুলকারী শাড়ীও আছে। নারীদের সঙ্গে পুরুষ। পাগড়ী আর পায়জামা। ধুতির সঙ্গে চাদর।

—আইয়ে মাইজী, আইয়ে। দের মাৎ কবুনা। থোড়া ভিড় আবি কম্‌তি হুয়।

কুমুদিনী চমকে উঠলেন পাণ্ডাজীর কথা শুনে। পাণ্ডাজী ডাকছে। শীঘ্র যেতে বলছে। বলছে যে, ভিড় এখন কমেছে।

শনৈশ্চরেশ্বরের পাদমূলে সাজি উজাড় ক'রে দিলেন কুমুদিনী। কণ্ঠে অঞ্চল বেষ্টন ক'রে কত কথা বললেন। পুত্র এবং পুত্রবধূর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করলেন। পুরোহিত মন্ত্র বললে আর কুমুদিনী পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কুমুদিনীর চোখ জলে ভ'রে যায়। ছেলেকে আর বৌকে মনে পড়ে তাঁর। হু-হু ক'রে জ্বলতে থাকে যেন সকল অঙ্গ। পাঁজরা ক'টা মোচড় দিয়ে ওঠে। মন্ত্র বলতে বলতে ক'বার পড়ে যেতে-যেতে টাল সামলে নেন। উপবাসক্লান্ত দুর্ব্বল শরীর যে! বিষে খেয়ে মৃত্যু হ'লে পাপ হয়, নয়তো কবে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতেন কুমুদিনী। সকল জ্বালা জুড়াতো। বিষ খাওয়ার উপায় নেই, সেই জন্যই কি তিনি উপবাসে-উপবাসে শরীরটাকে বিনষ্ট ক'রে ফেলছেন? আত্মহত্যা করছেন না বটে, আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছেন! কিন্তু ছেলেটা মানুষের মত হ'লে কি ঘর-দোর ছেড়ে কাশীবাসী হ'তেন কুমুদিনী?

কৃষ্ণকিশোরের অপকীর্ত্তির জন্য আত্ম-জনের কাছে মুখ দেখাবেন কোন্ লজ্জায়! একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে পর্য্যন্ত খোঁজ নেয় না যে ছেলে?

কৃষ্ণকিশোর তখন ফিস্‌ফাস্ কথা বলছিল হেড-নায়েবের সঙ্গে।

কাছারীর দালানে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। কৃষ্ণকিশোর বলছিল,—নায়েব মশাই, কেউ জানবে না তো? জান্‌লে বুঝবো যে আপনিই ব'লেছেন।

—কালীঘাটের কালীর দিব্যি গালছি হুজুর, জানলে আমাকে কেটে ফেলবেন। ডালকুত্তার মুখে লেলিয়ে দেবেন। যা শাস্তি দেবেন, মাথা-পেতে নেবো। আপত্তি ক'রবো না হুজুর। হেড-নায়েব কথা বলছেন অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে। বলছেন,—একটা কথা জেনে রাখবেন হুজুর, টাকার মালিক অন্য কেউ তো নয়! হুজুরের টাকা, হুজুর খরচা করবেন, কোন্ শালা কি বলবে হুজুর?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না না, বুঝতে পারছেন না কথাটা! অন্য কেউ জানলে তো ক্ষতি নেই কিচ্ছু, বৌ জানলেই মুশকিল!

হেড-নায়েব পলকের মধ্যে সহসা নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়লেন। কৃষ্ণকিশোরের পায়ে হাত দিয়ে বললেন,—হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে আপনি, পায়ে হাত দিয়ে বলছি হুজুর, কাকপক্ষী পর্য্যন্ত জানতে পাবে না। জানলে আমার ধড়ে মাথা রাখবেন না। আমাকে যা শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেবো।

—আহা হা, করেন কি নায়েব মশাই? ঠিক আছে, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। যে কেউ জানুক ক্ষতি নেই, বৌ যেন না জানে!

বৌ। রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশীর বিদায়-গমনের সঙ্গে-সঙ্গে রাজেশ্বরী পালঙে আছড়ে প'ড়েছে।

বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লেগেছে ডুগরে-ডুগরে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। এলোকেশী মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে,—কি হয়েছে কি রাজো? এমন অঝোরে চোখের জল ফেলছিস কেন? বল্ না আমাকে।

কোন কথার জবাব পায়নি এলোকেশী।

রাজেশ্বরী শুধু মুখটা তুলে তাকিয়েছিল কয়েক বার বিহ্বলের মত। এলোকেশী দেখেছিল, রাজেশ্বরীর কেঁদে-কেঁদে ফুলে-ওঠা চোখ। সিঁদুরের মত রাঙা মুখ। চোখের দৃষ্টি স্থির। কিন্তু কথাটি বলেনি রাজেশ্বরী। শুধু কেঁদেছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, ডুগরে-ডুগরে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে রাজেশ্বরীর, স্বামীকে ডাকতে পাঠায়। স্পষ্টাস্পষ্টি জানায় যা শুনেছে! জিজ্ঞাসাবাদ করে।

কিন্তু অভিমানের আধিক্যে তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে, না, রাজেশ্বরী কিছু বলবে না। ম'রে গেলেও বলবে না। যা ইচ্ছা হয় করুক। যা মন চায় করুক।

—বৌ, তোমাকে হুজুর ডাকছে। খেতে ব'সেছে। ডাকছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে বিনোদা। রাজেশ্বরীকে দেখে বিস্ময় সহকারে বললে,—কি হয়েছে বৌ? কোন অশুক-বিশুক ক'রেছে?

বালিশে চোখের জল মুছে বললে রাজেশ্বরী,—না বিনোদিদি। কিচ্ছু হয়নি। মাথাটা যা ধ'রেছে!

—তাই বল'। বললে বিনোদা।

রাজেশ্বরী বললে,—তুমি বল' গে, যাচ্ছি আমি। কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো।

বিনোদা ঘর থেকে চ'লে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি-ঘরে কি ঘণ্টা পড়তে থাকে! ঢং ঢং ঢং—

ব্রাহ্মণী আয়োজন ক'রেছে কত!

রূপার থালার ধারে ধারে রূপার বাটি সাজিয়ে দিয়ে চ'লে যায় ব্রাহ্মণী। মুখ ফুটে খেতে চেয়েছে মালিক। সোল্লাসে রেঁধেছে কত খাদ্যদ্রব্য। ভেজেছে লুচি। এঁটো হাত ধুয়ে পাক-ঘরের দরজায় চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দেখে খাওয়ার ঘরের দিকে। দেখে, মালিক কৈ খাচ্ছে না তো। সমুখে সাজানো থালা, চুপচাপ ব'সে আছে। ব্রাহ্মণী দেখতে পায়, লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পায়। মালিক খেতে ব'সেছে, কাছাকাছি জ্বলছে একটা অষ্টভুজাকৃতি বিলিতী লণ্ঠন। ঘরের মেঝেয় বসানো আছে তেলের লণ্ঠন। পরিচ্ছন্ন কাচ লণ্ঠনের, ঘর যেন আলোয় আলো হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণী দেখছিল পাক-ঘরের দরজা থেকে, মালিক যেন ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে। গুণ্ঠনে ঢাকা থাকে চোখের দৃষ্টি, কত দিন এত স্পষ্টাস্পষ্টি দেখেনি মালিককে। আড়াল থেকে চুরিয়ে দেখে ব্রাহ্মণী। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না যেন। ব্রাহ্মণী দেখে, মালিকের ফর্সা রঙ, আয়ত চোখে চিন্তিত দৃষ্টি, ভেলভেটের মতই কালো গোঁফের রেখা, মাথায় সাহেবী টেরী। তবুও বেশ বদল ক'রে খেতে ব'সেছে মালিক। নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে যাওয়ার সময় যে-পোষাক ছিল, সেই বেশে দেখলে না-জানি ব্রাহ্মণীর চোখ কপালে উঠতো কি না। দেখতে দেখতে লজ্জা পায় ব্রাহ্মণী। কাঁচা-বয়েসী বিধবা ব্রাহ্মণী। লুকিয়ে দেখার লজ্জায় যেন মরমে ম'রে যায়। লজ্জায় দ্রবীভূত হয় মেয়েমানুষের মন, কিন্তু লজ্জার জ্বালা ধরে কেন ব্রাহ্মণীর বুকের অন্তস্তলে? পলকের মধ্যে দরজা ত্যাগ ক'রে পাক-ঘরের ভেতরে ঢুকে প'ড়লো ব্রাহ্মণী। ছিঃ, বিধবাকে দেখতে

আছে কখনও অন্ত পুরুষকে! ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে! ব্রাহ্মণী উনোনের সামনে পিঁড়েয় ব'সে পড়ে যন্ত্রচালিতের মত। হাতে কোন কাজ নেই, তবুও জলন্ত উনোনের সামনে অভ্যাস মত বসে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, দেখে উনোনে গমগমে আঁচ। লাল আগুন। চোখে-মুখে বুঝি বা আঁচ লাগে, উনোনের উষ্ণ আঁচ। থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে ব্রাহ্মণীর হাত আর পা। কৈ, কোন দিন তো এমনটি হয় না? মনে-মনে হরিনাম জপতে থাকে ব্রাহ্মণী। ক্ষমা চায় দুঃখহারী হরির সমীপে। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবশ হয়ে পড়ে দেহটা। অসাড় হয়ে পড়ে। আর মনে-মনে হরিনাম জপতে থাকে। ব্রাহ্মণী ভাবে, আড়াল থেকে এই লুকিয়ে দেখা কেউ দেখলো না তো? কিন্তু হরির দৃষ্টি কে এড়াবে! তিনি তো দেখলেন। তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো যায়? তিনি যে লুকিয়ে থেকে দেখছেন সকল কিছু।

মূর্ত্তিমতী প্রতিমা এলো না কি!

খেতে-খেতে থালা থেকে মুখ তুলে তাকালো কৃষ্ণকিশোর। চোখ তুলে তাকালো। চুড়ির রিনি-রিনি শুনে না পদক্ষেপের শব্দে কে জানে, কৃষ্ণকিশোর অনুমানে বুঝেছিল যে দরজায় কার আবির্ভাব। চোখ তুলে দেখলো যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিমা একটি। রূপৈশ্বর্য্যে টলমল করছে মূর্ত্তি, সালঙ্কারা মূর্ত্তি। প্রতিমার দীর্ঘ আঁখিযুগলে সজীব দৃষ্টি। যেন অধিকক্ষণ তাকানো যায় না ঐ চোখে চোখ রেখে। কৃষ্ণকিশোর দেখলো মূর্ত্তির মুখে পূর্ব্বের মতই গাম্ভীর্য্য। চোখের দৃষ্টি কেমন আগের মতই স্থির এবং তীক্ষ্ণ। রাজেশ্বরী ধীর ও নম্র কণ্ঠে বললে,—ডাকছিলে?

হঠাৎ কথা বলায় চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। বলে,—হ্যাঁ। ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে তুমি?

রাজেশ্বরী বললে,—কৈ, না তো। ডেকে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো হাজির হয়েছি।

কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীর কথার ভাষা শুনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করে। বলে,—হ্যাঁ, তা এসেছো। চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে দেখে ভেবেছি যে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে।

ক্ষণিকের জন্য দুঃখের হাসি দেখা দেয় রাজেশ্বরীর ওষ্ঠে। সামান্য হাসির সঙ্গে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—পোড়া চোখ আবার ফুললো কেন কখন কে জানে!

রাজেশ্বরীর কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না কৃষ্ণকিশার। দু'-চার মুহূর্ত্ত দেখে চোখ নামিয়ে নেয় থালায়। রাজেশ্বরীর কথার ভাষাটা মনে হয় অশ্রুতপূর্ব্ব। অন্য এক রূপ ধারণ ক'রেছে যেন রাজেশ্বরী! স্নিগ্ধ ও নম্র ভাবটা যেন বিলীন হয়ে গেছে আকৃতি থেকে। কৃষ্ণকিশোর ভেবে পায় না রাজেশ্বরীর রূপান্তরের কারণ। নিমন্ত্রণ থেকে ফিরতেই এই পরিবর্ত্তন চোখে প'ড়েছে—আকৃতি শুধু নয়, রাজেশ্বরীর প্রকৃতিও যেন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে সামান্য ক'ঘণ্টার মধ্যেই। থেকে-থেকে গায়ে যেন বিষ ছড়াচ্ছে যে রাজেশ্বরীর। অঙ্গে-অঙ্গে জ্বালা ধরছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস-ধড়াস করছে যত বার মনে পড়ছে ঐ দু'টি কথা—মুসলমান বাইজী। রাজেশ্বরীর এত রূপ, তবুও কেন এই অবহেলা! সাধ জাগে, স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করবে কথাটা—মুসলমান বাইজীটি কে? কেন প্রয়োজন হ'ল মুসলমান বাইজীকে? কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও কথা ফুটছে না মুখে। হাল ছেড়ে দেয় যেন রাজেশ্বরী, যা ইচ্ছা হয় ক'রে যাক। কথাটি বলবে না সে। হ্যাঁ কিম্বা না, কোন কথাই বলবে না। কিন্তু দা-দেইজীদের কথা, মিথ্যা হ'তে পারে। সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, যা মন চায় করতে পারো, রাজেশ্বরী আর মুখ খুলছে না।

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল, ঘড়ার টাকা, গুনতে-গুনতে উঠে প'ড়েছে।

গহরজান যত টাকা চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী টাকা

আছে ঘড়ায়। বাড়তি টাকায় রাজেশ্বরীকে কোন গয়না গড়িয়ে দেওয়া যায় না! অন্ততঃ যে গয়নাটা কৃষ্ণকিশোর আত্মসাৎ ক'রেছিল সেই ধরণের একটা কিছু?

—দাঁড়িয়ে আছো কেন? ব'স না একটা পিঁড়ে টেনে। হঠাৎ কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। খেতে-খেতেই বললে।

একান্ত অসহায়ের মত হাল ছেড়ে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। মুখে গাম্ভীর্য্য। মোমের মত হাত দু'টি যুক্ত ক'রে পেছনে ধরা। কথা শুনে শিউরে উঠলো যেন রাজেশ্বরী। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে,—না, থাক্। বেশ আছি আমি।

কৃষ্ণকিশোর দেখে-শুনে থাকতে পারলো না যেন। বললে,—হঠাৎ তুমি এমন রূপ ধারণ করলে কেন?

নম্র কণ্ঠে কথা বলে রাজেশ্বরী। শুধোয়,—কেমন রূপ?

হাসতে চেষ্টা করে কৃষ্ণকিশোর, যদি রাজেশ্বরীর মুখে হাসি ফোটে। বললে,—এমন করাল রূপ?

উত্তর শুনে কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ থাকলো রাজেশ্বরী। ভাবলো, পাড়বে না কি কথাটা! করাল রূপ ধারণের সত্যি কারণটা। ভাবলো, না থাক; যা খুশী হয় করে যাক। বললে,—ভগবান আমাকে হয়তো এমনটিই গ'ড়েছেন? আমি কি করতে পারি?

রাজেশ্বরীর কথার কোন জবাব খুঁজে পায় না কৃষ্ণকিশোর। লণ্ঠনের আলোয় বারেক দেখে রাজেশ্বরীর মুখটা। লক্ষ্য ক'রে দেখে। দেখতে পায়, রাজেশ্বরীর চোখ দু'টি ছল-ছল করছে না? কোথায় মুখে হাসি দেখতে পাবে, ভেবেছিল কৃষ্ণকিশোর, দেখলো কি না অশ্রুসিক্ত চোখ। বললে,—ঘুম পেয়েছে তোমার?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা রাজেশ্বরী। বললে,—কৈ, না তো।

বাইরে থেকে কে যেন ডাক দেয়। ফিস-ফিস কথা। ডাকে,—বৌমা আছো?

রাজেশ্বরী বোঝে কে ডাকছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বলে,—কিছু বলছেন বামুনদিদি?

ব্রাহ্মণী ডাকছিল বাইরে থেকে। রাজেশ্বরী কাছে যেতেই বললে,—কিছু দেবো কিনা জিজ্ঞেস কর' না দিদি! লুচি দিই ক'খানা?

ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণীর কথার পুনরুক্তি করতেই কৃষ্ণকিশোর তৎক্ষণাৎ বললে,—কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। আকণ্ঠ হয়ে গেছে আমার।

কথা ক'টি বেশ জোর-গলাতেই বলেছে কৃষ্ণকিশোর, যা শুনে ব্রাহ্মণী চ'লে গেল পাক-ঘরে। হরিনাম জপ্‌তে জপ্‌তে গেল। এ কি হ'ল ব্রাহ্মণীর! মনে কেন জাগলো অসৎ ভাব? শাপ-শাপান্ত ক'রলো নিজেকে। মনে মনে বললে,—রক্ষা কর রক্ষাকর্ত্তা। মন বদ্‌লে দাও হরি হে মধুসূদন!

রাজেশ্বরী কিছুটা কৌতূহল বশতই জিজ্ঞেস ক'রলো,—বড়-বাড়ীতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে খেয়ে এলে না কেন জিজ্ঞেস করতে পারি?

মুখে বিরক্তি প্রকাশ পায় কৃষ্ণকিশোরের। বলে,—নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে যারা অপমান করে তাদের বাড়ীতে খাওয়া যায় কখনও? তুমিই বল' না?

রাজেশ্বরী কথাগুলি শুনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়। বলে,—অপমান! কি অপমান করলে? কেন অপমান করলে?

কথা চেপে যেতে চায় কৃষ্ণকিশোর। বললে,—যাক্, দরকার নেই ও আলোচনায়। আমার চরিত্তির ভাল নয়, আমি ছেলে ভাল নই, ইত্যাদি বলাবলি করলে। যাক্ গে ও প্রসঙ্গ, এখন বল' দেখি শশী বৌদিদির বক্তব্য? কি বলতে চান তিনি? আমার চরিত্তির, আমার চরিত্তির!

রাজেশ্বরী কথা বলতে বোধ করি ইতস্তত করে। বলে,—তোমার শশী বৌদিদি বললেন—

কথা বলতে বলতে কথার মাঝপথে থেমে যায় রাজেশ্বরী। কেন কে জানে!

কৃষ্ণকিশোর কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে বলে,—হ্যাঁ, কি বললেন শশী বৌদিদি?

রাজেশ্বরী বললে ধীরে-ধীরে, বিনম্র স্বরে,—দিদি বললেন, তোমাদের ঐ বড়বাড়ীর বাবুরা ওঁকে উত্যক্ত ক'রে মারছে। উড়ো চিঠি ছাড়ছে, গুণ্ডা লেলাচ্ছে, অপহরণ করাবার ভয় দেখাচ্ছে। দিদির স্বামী বিলেত যাচ্ছেন, যে ক'দিন স্বামী না থাকেন সেই ক'দিনের জন্যে তোমার বাড়ীতে থাকতে চাইছেন, যদি অবিশ্যি তোমার অনুমতি পাওয়া যায়! বাপের বাড়ী আছে দিদির, সেখানে দিদি যেতে চান না। সম্মানের হানি করতে চান না। আর এই ব্যবহার, তিনি তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করেন ব'লেই।

—তুমি কি বললে? বললে কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী থতমত খায় যেন। বলে,—খুব অন্যায় ক'রে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে কথা না ক'য়েই দিদিকে কথা দিয়ে দিয়েছি।

সামান্য হাসলো কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতেই বললে,—কি কথা দিয়েছো?

রাজেশ্বরী ভয়ে-ভয়ে বললে,—ব'লেছি যে, হ্যাঁ, এখানে যখন খুশী চ'লে আসুন। এখানেই থাকুন। দিদিও রাজী হয়েছেন। অন্যায় ক'রেছি?

কৃষ্ণকিশোর গেলাস তুলে জল খায় ঢক-ঢক। গেলাস রেখে বলে,—অন্যায়! কিছু অন্যায় নয়, মানুষ বিপদে পড়লে মানুষকে মানুষ যদি সাহায্য না করে তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো রাজেশ্বরী। বললে,—তবে দিদির স্বামীর যেতে এখনও কিছু দিন দেরী আছে। কি ভাগ্যি দিদির!

বড়বাড়ীর বাবুরা নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে চারিত্রিক দোষ দিয়েছে শুনে ক্ষণেকের জন্য রাজেশ্বরীর মনে হয় মুসলমান বাইজীর কথাটাও হয়তো ভিত্তিহীন। কিন্তু তার প্রতি ঈশ্বরের কি এতটা করুণা হবে! যদি মিথ্যা হয় কথাটা তা হ'লে তো কথাই নেই। কিন্তু ভিত্তি না থাকলে কথা উঠবেই বা কেন ?

—বন্দুকের আলমারীর চাবিটা চেয়ে পাঠালাম, দিলে না কেন ? কথায় বেশ কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে শুধোলে কৃষ্ণকিশোর।

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না রাজেশ্বরী। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বলে, —ভাবলাম যে রাত হয়ে গেছে, এখন বন্দুক নাড়াচাড়া করলে যদি কোন বিপদ-টিপদ হয়! বন্দুককে যে আমার ভীষণ ভয় করে! বন্দুক দেখলে বুক ধড়ফড় করতে থাকে।

—তাই বুঝি ? বললে কৃষ্ণকিশোর।—তা তো জানা ছিল না। কিন্তু কাল চাবিটা দিও সকালেই। সাফ না করলে মরচে ধরে যাবে। কত দিন পরিষ্কার করা হয়নি বন্দুকগুলো। কথা বলতে-বলতে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী মিষ্ট কণ্ঠে বললে,—আঁচিয়ে ঘরে আসছো তো ? আমি তবে ঘরে চলে যাই ?

—হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—তবে কাছারী থেকে ঘুরে আমি যাচ্ছি।

—কাছারী! এখন এত রাত্রে কাছারীতে কেন ? শঙ্কিত কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী।—যেও, কাল সকালে যেও।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না, বিশেষ প্রয়োজন আছে। কাল কখন খাজনার টাকাটা দিতে যাওয়া হবে জিজ্ঞেসাবাদ ক'রে আসি। একটা ভাল সময় দেখে যেতে হবে তো!

রাজেশ্বরী বললে,—তোমাকেও যেতে হবে ?

—যেতে হবে না! আমাকেই তো যেতে হবে। সাবালক হয়েছি আমি। মালিক না গেলে টাকা জমা নেবে না। কথা বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর।

খাস-মহলে চলেছিল রাজেশ্বরী।

ভগ্ন-হৃদয় আর ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছিল কেমন যেন আচ্ছন্নের মত। ভয়ে-ভয়ে। কে কোথায় আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, অন্ধকারে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চ'লেছিল। সামান্য কিছু দিনের পরিচয়ে যা যতটুকু জানা আছে, সেই ধারণাতেই ঘর আর চাতাল পেরিয়ে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। কি অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার! যেদিকে তাকাও সেদিকে। আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না। কোথাও থেকে দেখা পাওয়া যায় আলোর রেখা, কোথায় হয়তো জ্বলছে বেল-লণ্ঠন। উঁকি-ঝুঁকি মারছে আলো। সেই আলো দেখে আরও ভয়-ভয় করছে। রাত্রির তামসিক অন্ধকার অসহ্য মনে হয় রাজেশ্বরীর। মনে-মনে বলে, ঈশ্বর, শেষ ক'রে দাও, রাত্রি—দিনের আলো ফোটাও। মুখে হাসি-মাখানো সূর্য্যকে পাঠাও, যার শুচিশুভ্র কান্তির ছটায় দিগ্বিদিক আলোকময় হয়ে উঠবে!

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

বিনিদ্র রজনী যে বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়। শেষ হ'তেই চায় না। রাজেশ্বরী যেন আর চলতে পারে না। টলতে-টলতে চলে আচ্ছন্নের মত। আরেক ভাবনায় রাজেশ্বরী এখন আকুল হয়ে উঠেছে, বন্দুকের আলমারীর চাবি চাইলো যে! বন্দুককে ভীষণ ভয় করে রাজেশ্বরী। দেখা দূরের কথা, বন্দুকের নাম শুনলেই তার বুক ধড়ফড় করতে থাকে। এমনিতেই দিবা-রাত্রি বন্দুকের কাল্পনিক আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে আছে রাজেশ্বরী। সেই কল্পনা কি সত্যে রূপান্তরিত হ'তে চ'ললো! ক্লান্ত পা

দু'টি আর যেন চলতে চায় না। সিঁড়ি ভাঙায় কত কষ্ট! কোন কায়িক পরিশ্রম নেই, তবুও ভেবে-ভেবে রাজেশ্বরীর দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে। কোন কাজই করতে হয় না, তবুও পা যেন চলতে চায় না। চোখ দু'টি কি জলে ভ'রে গেছে! চোখে ঝাপসা দেখছে কেন রাজেশ্বরী তবে!

ঐ তো খাস-মহলের আলো দেখা যাচ্ছে না?

রাজেশ্বরী চোখে ভুল দেখছে না তো! আলেয়ার আলো নয় তো!

রাত্রি কত এখন কে জানে! কানে তালা লেগেছে, না সত্যই ঝিঁঝি ডাকছে। হাতের তালু ঘেমে উঠেছে রাজেশ্বরীর। হৃদ্গতি বেজে চ'লেছে দ্রুত। সিঁড়ির শেষে আলোর আভা দেখে প্রায় ছুটতে-ছুটতে খাস-মহলের দিকে এগোয় রাজেশ্বরী।

খাস-মহলের দরজার মুখে ব'সেছিল এলোকেশী। ঘর আগ্‌লে ব'সে-ছিল। বোধ করি ঢুলছিল ঘুমের জড়তায়। রাজেশ্বরীর পদশব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠলো। আচমকা দেখে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠছিল আর কি রাজেশ্বরী। অনেক কষ্টে সামলে ব'লে উঠলো,—ও মা!

এলোকেশী ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে। রাজেশ্বরী ততোধিক ভয় পায়। বলে,—তুমি কে এখানে? তুমি কে?

—আমি লা আমি। বললে এলোকেশী। হাসতে-হাসতে বললে,—শোন' কথা মেয়ের! আমি যে তোর এলোকেশী। ভয় পেয়েছিস বুঝি?

দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে রাজেশ্বরী,—থাক, ঢের হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না তোমাকে!

এলোকেশী থতমত খেয়ে যায় যেন। বলে,—হ'ল কি মেয়ের! দোষটা কি করনু যে এত রোষ?

চক্ষু মুদিত ক'রে থাকে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত। চোখ মেলে দেখে ইদিক-সিদিক। বলে,—ওখানে কে ও? চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে!

এলোকেশী উঠে প'ড়লো। বললে,—কে আবার দাঁইড়ে থাকবে! ওটা তো ঘড়াঞ্চি! কড়িকাঠের লণ্ঠন মুছতে এনেছিল তাঁবেদারেরা।

—তাই বল'। ছাঁৎ ক'রে উঠেছিল বুকের ভেতরটা! বললে রাজেশ্বরী। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে। কথার শেষে ঢুকলো খাস-মহলে। আলো দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেও কি স্বস্তি আছে? আলো দেখেও?

দেরাজের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ক্রোধের মাত্রা বর্দ্ধিত হ'তে থাকে উত্তরোত্তর। ইচ্ছা হয়, একটা ভারী কিছু ছুঁড়ে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয় আয়নাটা। অনন্যোপায় হয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। কিচ্ছু দেখা যায় না; শুধু দূরে-দূরে আলোকবিন্দু। জ্বলছে কাদের কাদের বাড়ীতে। আর অসীম আকাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা নক্ষত্র। হিমার্ত্ত কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে। কোথায় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদ? না লুকিয়ে নেই, মধ্যাকাশে বিরাজ করছে ঘষা-কাচের মত স্তিমিতপ্রভ চাঁদ। তীরগতিতে একটা প্যাঁচা উড়ে গেল না? প্যাঁচা না অন্য কোন রাত্রিচর! হয়তো বাদুড়ই হবে। ঘরের কোণে গ্র্যাণ্ড-ফাদার্স ঘড়িটা হঠাৎ শব্দ তুললো জল-তরঙ্গের স্বরে। বেশ লাগে শুনতে ঐ ঘড়িটার সুমিষ্ট আওয়াজ। সময়ের নিশানা। ক্ষণেকের জন্য রাজেশ্বরী তৃপ্তি পায় ঘড়ির শব্দ-ঝঙ্কারে। মনটা কোথায় উড়ে যায় ঐ শব্দ শুনে।

কিন্তু এতক্ষণ ধ'রে কি করছে কি কাছারীতে? রাজেশ্বরী ভাবে।

মিথ্যা কথা ব'লেছে কৃষ্ণকিশোর। ডাহা মিথ্যা কথা। কাছারীর ধারে-কাছেও নেই, ছিল বৈঠকখানায়। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত ক'রে, তবে যাবে খাস-মহলে। মিথ্যা কথা ব'লেছে রাজেশ্বরীর কাছে। খাজনার টাকা জমা দিতে যাওয়ার কথাটা। ঘড়া থেকে হাজার কুড়িক টাকা নিয়ে যাবে গহরজানকে দিতে। যাওয়ায় যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাই ব'লেছে যত মনগড়া কথা। মালিক না গেলে টাকা জমা

পড়বে না, ইত্যাদি। আর তাই বিশ্বাস ক'রেছে রাজেশ্বরী। অবিশ্বাস করবে কোত্থেকে! অনন্তরামকে পাঠিয়ে খোঁজ করিয়েছে পর্য্যন্ত হেড-নায়েবের কাছে। লুকিয়ে জেনেছে কথাটা সত্যি না মিথ্যা। শুনে অন্তর থেকে বিশ্বাস ক'রেছে।

থোক কুড়িটি হাজার টাকা, হাতে-হাতে পেয়ে না জানি কত খুশীই হবে গহরজান। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভ'রে যাবে গহরজানের অন্তঃকরণ। মনের সুখে বিয়ে দেবে ডালিমের, ঘটা ক'রে বিয়ে দেবে। ঢি-ঢি প'ড়ে যাবে না গরাণহাটার পল্লীতে! কত লোকের চোখ টাটাবে। চৌঘুড়ীতে চেপে বিয়ে করতে যাবে ডালিম। গ্যাসবাতির আলোয় গরাণহাটা হেসে উঠবে ক'টা দিনের জন্য! দিকে-দিকে সাড়া প'ড়ে যাবে। কত লোকের পাত পড়বে গহরজানের পোষা ডালিমের বিয়েতে। নাম ছড়িয়ে পড়বে শুধু গহরজানের নয়, গহরজানের—

মুখে মুখে শুনে জেনে যাবে কত শত সহস্র মানুষ, কে খরচা জোগালে!

গ্যাসবাতির আলোর সারি দেখে জানবে, চৌঘুড়ী আর ব্যাণ্ডের শব্দ শুনে জানবে গহরজানের পোষা ডালিমের বিয়েতে খরচা জুগিয়েছে কে। সানাই আর কাড়া-নাকাড়ার গগনবিদারক ধ্বনি পৌঁছবে কত দূরের মানুষের শ্রুতিপথে! আতসবাজী ফুটবে আকাশে। ছুটবে হাউই। ফাটবে তুবড়ী। জলবে রঙমশাল—যার আলোয় রাত্রি দিন হয়ে যাবে। পুড়বে কত পয়সা। লোকে জানবে না, গহরজানের পোষা ডালিমের বিয়েতে খরচা দিলে কে? নাম করবে কত কে। খাতির করবে কত লোক। সেলাম ঠুকবে না গহরজান? পোষা বাঁদীর মতই জড়ি-জড়ানো বিনুনি ঝুলিয়ে ঈষৎ নত হয়ে একাধিকসহস্র সেলাম ঠুকবে গহরজান। কেনা হয়ে থাকবে না গহরজান বাধ্যবাধকতায়! আজ্ঞাবহ দাসীর মত বশীভূত হয়ে থাকবে যে। চুক্তিপত্রে টিপসই দিয়ে কবুল করবে গহরজান,

যত দিন যাবৎ বাঁচিয়া থাকিব তত দিন ধরিয়া একান্ত অনুগত দাসীর ন্যায় হুজুরের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিব। বিনিময়ে হুজুরের নিকট হইতে শুধু প্রেম এবং খোরপোষ প্রার্থনা করিব।'

হুজুর বৈঠকখানায়। ক'জন তাঁবেদার বাইরে অপেক্ষা করছিল সম্ভ্রমের সঙ্গে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—কে আছে?

—হুকুম হুজুর। সাড়া দেয় তাঁবেদার।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ডাকো হেড-নায়েবকে। বল', জরুরী কাজ আছে। দেরী হয় না যেন।

—যো হুকুম। হুকুম শুনেই ছুটলো তাঁবেদার।

হেড-নায়েব দিনের কাজ মিটিয়ে তামাকু খাওয়ার উদ্যোগে তখন লোক খুঁজছিলেন। কেউ যদি দু'টো টিকেয় আগুন ধরিয়ে দেয় কলকেয়। ফুঁ দিয়ে দেয়। ডাক শুনে আত্মারাম যেন খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম হয় হেড-নায়েবের। কাছারীর দালানে একটা থামের পাশে কলকেটা নামিয়ে রেখে হন্তদন্ত হয়ে চললেন। বললেন,—অসময়ে ডাক পড়লো কেন কে জানে! ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে বাঁচি।

প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন হেড-নায়েব। কেশে ধ'রেছে পাক। জরা নামেনি বটে দেহে, তবে পূর্ব্বের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বেশী খাটা-খাটুনি ও চলা-ফেরা সহ্য হয় না। তবু দ্রুত চললেন তিনি। বৈঠকখানার দ্বারে পৌঁছে বললেন,—আজ্ঞা হোক্।

একটা তাকিয়ায় হেলে প'ড়েছিল কৃষ্ণকিশোর। হেড-নায়েবের কথা শুনে বললে,—বলছিলাম যে—

বলতে গিয়েও বলে না কৃষ্ণকিশোর। কথার মধ্যিখানে থেমে যায়। হেড-নায়েব ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কি হুকুম হয় কে জানে! মৃদু হাসি হেসে বললে কৃষ্ণকিশোর,—মশায় তো মেয়ে-মানুষ নন। তবে অত দূরে কেন? প্রাইভেট কথা আছে যে!

—তাই বলুন হুজুর ! বললেন হেড-নায়েব।—বলতে হয় !

কথা বলতে বলতে তিনি ঢুকলেন ঘরে। দরজার বাইরে খুলে রাখলেন তালতলার চটি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—যা কথা ছিল, ঠিক আছে তো ?

হেড-নায়েব বললেন,—কথা কারা বদ্‌লায় হুজুর ? আমাকে কি তাই ঠাওরাচ্ছেন ? অত ক'রে দিব্যি গাইলুম, শপথ করলুম, বিশ্বাস করছেন না হুজুর ?

—তাই বলছি। বললে কৃষ্ণকিশোর। কথা বলতে বলতে উঠে প'ড়লো তাকিয়া ঠেলে। ফিস-ফিস বললে,—তবে ঐ কথাই থাকলো। আমি টাকা সমেত যাবো গাড়ীতে। মশায়ও সঙ্গে যাবেন। আদালতের কাছাকাছি গিয়ে জুড়ী ছেড়ে দেবো। দিয়ে একটা ভাড়াগাড়ীতে উঠে টাকা যেখানে দেওয়ার কথা সেখানে পৌঁছিয়ে দেব্রো। মশায় গাড়ীতে অপেক্ষা করবেন। বাড়ীতে ফিরে মশায়ের প্রাপ্য বক্‌শিশ দেওয়া যাবে। কি বলেন ?

—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না হুজুর ! বললেন হেড-নায়েব। হাতে হাত কচলাতে কচলাতে। বললেন,—কথার হের-ফের হ'লে হুজুর আমার নামে কুকুর পুষ—

—ছি ছি ! বললে কৃষ্ণকিশোর। হেড-নায়েবের কথা শেষ হ'তে না দিয়েই বললে,—কি যে বলেন মশায় ! যান, বিশ্রাম করুন গে। কাল বেলা বারোটার মধ্যে কিন্তু যাওয়া হবে। ভুল হয় না যেন !

—মুখস্থ ক'রে রাখবো হুজুর। স্মৃতিপটে লিখে রাখবো। বললেন হেড-নায়েব।

কৃষ্ণকিশোর চ'ললো খাস-মহলে।

তাঁবেদারের দল বৈঠকখানায় কুলুপ আঁটতে লাগলো আলো নিবিয়ে। একশো আট বাতির কাটা-কাচের ঝাড়-লণ্ঠন নয়, দেওয়ালে জ্বলছিল

দেওয়াল-গিরি। হাতের ঝাপটায় আলো নিবিয়ে দেয় তাঁবেদার। দরজায় কুলুপ আঁটে।

শরৎ আর হেমন্তে পার্থক্য নেই ঋতুমধ্যে।

আকাশ থেকে হয়তো হিম পড়ছিল ঝির-ঝির। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রাত্রির আকাশ। ঘষা-কাচের মত সোনালী চাঁদের রেখা দেখা যায় শুধু। শুক্লপক্ষশেষের প্রায় অস্তমিত চাঁদ, কুয়াশায় হারিয়ে যায় থেকে-থেকে। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। হিমার্ত্ত হাওয়া বইতে থাকে মধ্যে মধ্যে। স্তব্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে শুধু ঝিল্লীর ডাক চলতে থাকে। একটানা কোরাশ গানের মত।

—কোথায় গেলে ?

হঠাৎ কথা শুনে শিউরে উঠলো যেন। ডাক শুনে চমকে উঠলো। জানলায় দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো আয়ত চোখ মেলে। বললে,—এই যে আমি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঠাণ্ডা লাগবে যে! খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে আছো?

ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয় রাজেশ্বরীর। নাসিকামূল লাল কেন? চোখ কেন জলসিক্ত? কথা ভারী হয়ে উঠেছে কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে না কাঁদছিল রাজেশ্বরী! চোখ দু'টো ফুলো-ফুলো। বললে,—এ পোড়া শরীরে ঠাণ্ডা লাগবে না। যা হয় একটা হ'লেও তো বুঝি! শেষ হয়ে যাই।

কৃষ্ণকিশোর বিস্মিত হয়ে যায় রাজেশ্বরীর মুখাকৃতি দেখে। কথা শুনে। মুখে আর কথায় এত গাম্ভীর্য্য কেন? রাজেশ্বরীর মতি-গতি বোঝা দায়। আশাহত ও বিষণ্ন আকৃতি। মুখে হাসি নেই। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে কোথায়।

কথা বলতে গিয়ে যদি কথার উত্তর শুনতে হয় সকল সময়ে বিরক্তিপূর্ণ, তা হ'লে তো কথা বলাই চলে না। কৃষ্ণকিশোর ক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবে, সময় নেই অসময় নেই, রাজেশ্বরীর ভাবভঙ্গী হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয় কেন? ক্ষণেকের জন্ত কৃষ্ণকিশোরের মুখেও দুঃখের ছায়া নামে। জানলা ছেড়ে পালঙের ব্যাটম ধ'রে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। ব্যাটমে গাল ঠেকিয়ে। যদি মিথ্যা হয় বড়বাড়ীর সেই দীর্ঘাঙ্গী বৌটির কথা, যদি বানানো কথা হয়, কৃষ্ণকিশোরের বিষাদমাখা মুখ দেখে মায়া হয় রাজেশ্বরীর। কিন্তু যদি সত্যি হয় মিথ্যা না হয়ে! সত্য আর মিথ্যার টানাপোড়েনে আর কাঁহাতক থাকবে রাজেশ্বরী! কত বার মনে হয়েছে, যা খুশী করুক, ফিরেও তাকাবে না রাজেশ্বরী। কিন্তু স্বামীর অধিকার কি ছাড়তে চায় নারী জাতি!

দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর,—দাঁড়িয়ে থাকবে? শুয়ে পড়'। লণ্ঠনটা নিব্যে আমিও শুয়ে প'ড়বো। বড্ড ধকল গেছে দিনভোর। জহর আর পান্নাদের দলবল গেছে, অবেলায় খাওয়া হয়েছে, ব'সে ব'সে টাকা শুনেছি, নেমন্তন্ন রাখতে গেছি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

সত্যিই মায়া হয় রাজেশ্বরীর, কৃষ্ণকিশোরের মুখটা দেখে। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী,—তুমি শুয়ে পড়', আমি আলোটা—

রাজেশ্বরীর কথা শেষ হ'তে দেয় না কৃষ্ণকিশোর। বললে,—না, না, তুমি শোও। হাঁতে ছ্যাকা-ফ্যাকা লাগিয়ে ফেলবে শেষে! তুমি শুয়ে পড়'।

অগত্যা বাধ্য হয়ে ধীরে-ধীরে পালঙে বসে রাজেশ্বরী। শুয়ে পড়ে না, কোমরের তলায় বালিশ টেনে আধা-শোয়া হয়ে থাকে।

ঘর অন্ধকার হয়ে যায় সহসা।

নিশুতি রাত্রির স্তব্ধতায় রাজেশ্বরী শুনতে পায় কৃষ্ণকিশোরের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ। শব্দটা রাজেশ্বরীর বুকের ভেতরে গিয়ে বিঁধতে থাকে বুঝি। মায়া হয়, মমতা হয়। বড়বাড়ীর সেই দীর্ঘাঙ্গী বৌটির কথা তো হ'তে পারে শুধু কথা!

—শুলে না তুমি ? জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরীর মুখে কোন কথা নেই। কোন জবাব নেই।

কৃষ্ণকিশোর শায়িতা রাজেশ্বরীর বাম হাতটি মুঠোর মধ্যে ধরতেই রাজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ কাছে এগিয়ে আসে। কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে টেনে নেয় বুকের কাছে। বুকে মুখ রেখে আচম্বিতে কাঁদতে থাকে রাজেশ্বরী। ডুগরে ডুগরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ফুলে-ফুলে। আঝোর ধারায় জল ঝরতে থাকে রাজেশ্বরীর চোখ থেকে।

কৃষ্ণকিশোর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে,—কাঁদছো তুমি ? বৌ, কাঁদছো তুমি ? কি হয়েছে বল' তো ?

ক্রন্দনের বেগ সামলে রাজেশ্বরী বললে,—না, না। তুমি ঘুমিয়ে পড়'। কত ক্লান্ত হয়ে আছো তুমি !

কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে আরও জোরে বক্ষে চেপে ধ'রলো। বললে,—কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন না বললে ঘুমোই কোত্থেকে ?

রাজেশ্বরী বললে,—ও কিছু নয়। তুমি ঘুমিয়ে পড়'। হঠাৎ কথার সুর বদলে যায় রাজেশ্বরীর। বলে,—আমাকে শুধু এইখানে থাকতে দিও। আমাকে শুধু—

—কোথায় ? শুধোলে কৃষ্ণকিশোর।

—এইখানে, তোমার বুকে। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিও না তুমি। না, না, ওখানে নয়, ভুল ব'লেছি আমি। তোমার পায়ে আমাকে থাকতে দিও। আমি আর কিচ্ছু চাই না।

—ছিঃ, পায়ে থাকবে তুমি ? তুমি বুকেই আছো, বুকেই থাকবে। বাহুর বেষ্টনে বেঁধে [illegible] কৃষ্ণকিশোর। মুখের কাছে রাজেশ্বরীর মুখটা টানলো।

ঘড়ি-ঘরে তখন ঘণ্টা [illegible]ছে ঢং-ঢং [illegible] নিশানা তরঙ্গায়িত হচ্ছে আকাশে।

মধ্য রাত্রে তন্দ্রা টুটে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর।

একটা বেশ সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল রাজেশ্বরীর দেহ আর মন। মৃদু মৃদু শৈত্যে পা থেকে বুক পর্য্যন্ত একটি সুদৃশ্য বালাপোষে আবৃত ক'রে রাজেশ্বরী শুয়েছিল চুপচাপ। ভাবছিল, কৃষ্ণকিশোরের প্রেমালাপের ধরণ-করণ, মিলনের প্রস্তুতি, লতাবেষ্টিতক জড়াজড়ি আর পরম প্রীতির মধু-মুহূর্ত্ত। পায়ে থাকতে চেয়েছিল রাজেশ্বরী, কাতর স্বরে পায়ে থাকতে দেওয়ার কথা ক'টি ব্যক্ত ক'রেছিল, কিন্তু কৃষ্ণকিশোর বাতিল ক'রে দিয়েছে রাজেশ্বরীর প্রার্থনা। ব'লেছে, বুকে রাখবে তাকে। বুকে জড়িয়েই ব'লেছে। প্রেমালাপে আর মিলনের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গে জ্ব'লে উঠেছে আগুনের লেলিহান শিখা। লজ্জা আর ব্রীড়া জলাঞ্জলি দিয়ে রাজেশ্বরী হ'য়ে উঠেছিল অন্য এক ধরণের। আবেগ আর উত্তেজনায় হারিয়ে ফেলেছিল বা বিচারবুদ্ধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ঠিক হিমের মতই শীতল হ'য়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরী। বালাপোষটা টেনে আবক্ষ ঢেকে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল কখন।

মধ্য রাত্রে আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে যায় হঠাৎ। বেশ ভাল লাগে বিনিদ্র রাত্রি। উন্মুক্ত জানলার ফাঁক থেকে আকাশে চোখ মেলে থাকে আর রোমন্থন করে যেন কিছুক্ষণ আগের অতীত স্মৃতি। ভাবতেও ভাল লাগে যে! ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম ঘণ্টা বাজে কোথায়? অনেক, অনেক দূর থেকে শুনতে পায় রাজেশ্বরী। নির্জ্জন রাত্রি, তাই হয়তো শুনতে পায়। তরঙ্গায়িত শব্দের ছন্দ আছে—ক্রমে ক্রমে শুধু বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম ধ্বনি এই যা। রাজেশ্বরী জানে না, গভীর ও নির্জ্জন অন্ধকার

ভেদ ক'রে দ্রুতগতিতে ছুটে চ'লেছে ডাক-হরকরা। ভয়ের পথ, চোর আর দস্যুর পথ। ডাক-হরকরা না ডাক-বেহারা? পিঠে ঝুলছে পাটের থলিয়া, এক হাতে একটা বল্লম। বল্লমের শীর্ষে বাঁধা আছে স্তূপীকৃত ঘণ্টা, পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বাজতে থাকে ঝুম-ঝুম-ঝুম। অন্য হাতে একটা জলন্ত লণ্ঠন। পথ-প্রদর্শক। হয়তো কারও কোন জরুরী খবর আছে। গভীর অন্ধকারকে উপেক্ষা ক'রে ছুটছে ডাক-হরকরা। বিলীয়মান ঝুম-ঝুম শব্দ শুনে অবাক-চোখে তাকিয়ে আছে রাজেশ্বরী। আকাশ দেখছে জানলার ফাঁক থেকে। এই কিছুক্ষণ আগে শৃগালের ডাক শেষ হয়েছে। গঙ্গাতীর থেকে ডেকে উঠেছিল শৃগালের পাল। নিমতলা শ্মশানের আশ-পাশ থেকে ডেকেছিল। অর্দ্ধদগ্ধ, পরিত্যক্ত ও বেওয়ারিস শব-ভক্ষণকারী শৃগালের দল। তখন ভয়ে আর ত্রাসে রাজেশ্বরীর দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হয়তো। চোখ দু'টো মুদে ফেলেছিল জোর ক'রে। বুকের ধুকপুকুনি বর্দ্ধিত হয়েছিল! শরীরটা হিম হয়ে গিয়েছিল ধীরে-ধীরে। ক্ষণেকের জন্য কুপিত হয়েছিল রাজেশ্বরী—কৃষ্ণকিশোরের প্রতি। এমন অসময়ে, যখন রাজেশ্বরী ভয়ে কাঁপছে ঠকঠকিয়ে, তখন কি না কৃষ্ণকিশোর ঘুমোচ্ছে অঘোরে! যদিও ক্ষণেকের মধ্যে অভিমান মিলিয়ে যায় মন থেকে, রাজেশ্বরীর মায়া হয় কৃষ্ণকিশোরের জন্য। কোন দোষ নেই কৃষ্ণকিশোরের, ঘুম না হ'লে কাটবে কোথা থেকে কায়িক গ্লানি? ক্লান্তি যায় কখনও বিনিদ্রায়! বালাপোষটা আবক্ষ টেনে আকাশে চোখ মেলে শুয়ে থাকে রাজেশ্বরী। আকাশে হাসছে নক্ষত্র ইতস্তত ছড়িয়ে, মিটি-মিটি হাসছে, হাসছে আর জলছে দপ্ দপ্।

—বৌ, উঠবে না?

ডাক শুনে ঘুম ভাঙে না রাজেশ্বরীর। নিদ্রায় অচেতন হয়ে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বৌ, উঠে পড়'। বেলা যে অনেক হয়ে গেছে! কথা বলতে বলতে রাজেশ্বরীকে ঠেলা দেয় মৃদু মৃদু।

ঘুমের ঘোরে বলে রাজেশ্বরী,—উঁ?

কৃষ্ণকিশোর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললে,—বলছি যে বেলা কত হয়ে গেল জানো? উঠবে না?

চোখ মেলে তাকায় রাজেশ্বরী। বালাপোষের ফাঁক থেকে তাকায়। আচ্ছন্নের মত বলে,—উঁ, কি বলছো?

কৃষ্ণকিশোর সহাস্যে বললে,—আচ্ছা মেয়ে বটে! একটা কথা, ব'লে ব'লে যে মুখে ব্যথা ধ'রে গেল! বলছি, বেলা হয়েছে অনেক। উঠে পড়' তুমি। বালাপোষটা টেনে খুলে দিই?

হয়তো আলগা ছিল পোষাক। লাজুক হাসি হাসলো রাজেশ্বরী। বললে,—ধ্যেৎ!

কৃষ্ণকিশোর চ'লে পড়লো রাজেশ্বরীর পিঠে। বললে,—বালাপোষটা খুলে না দিলে দেখছি তুমি উঠবে না।

তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়,—না, না। তুমি ঘর থেকে যাও, আমি উঠছি। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। বালাপোষটা দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। কৃষ্ণকিশোর দেখে রাজেশ্বরীকে। ঘুম-ঘুম চোখে অপূর্ব্ব দেখায় তাকে। ফুলে-ওঠা আঁখি-পল্লবে।

—আমি যাচ্ছি। তুমি উঠবে তো? শুধোয় কৃষ্ণকিশোর। পালঙ্ক থেকে উঠে পড়ে। বলে,—আমি চ'লে গেলে ফের ঘুমিয়ে প'ড়বে না তো?

—না, না, সত্যি বলছি। বললে রাজেশ্বরী।—আমি কি বুঝতে পেরেছি যে এত বেলা হয়ে গেছে! তুমি যাও, মুখ-হাত ধু'তে যাও। ছিঃ, দাসী, তাঁবেদার, ব্রাহ্মণী কি ভাববে বল' তো? বলাবলি করবে না বৌ কত বেলায় উঠলো! ছিঃ! তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও, লক্ষ্মীটি!

কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালাপোষ খু'লে উঠে ব'সলো রাজেশ্বরী। সত্যিই বেলা অনেক হয়ে গেছে,— শীতের সকাল, তাই বোঝা যায়নি। জানলা ভেদ ক'রে ঘরে ছড়িয়ে প'ড়েছে খটখটে রৌদ্র। পালঙ্কের বিপরীত দিকে দেরাজের আয়নায় দেখতে পায় রাজেশ্বরী। দেখে স্বীয় প্রতিবিম্ব। দেখে রূপচ্ছটা। মোমের মত গড়ন। ডিমের মত রঙ। পত্রবহুল আয়ত আঁখিদ্বয়। রাজেশ্বরী প্রথমে খুলে-যাওয়া খোঁপাটা জড়িয়ে বাঁধে দু'বাহু তু'লে। বালিশের তলায় রেখে-দেওয়া সোনার কাঁটাগুলো একটি একটি খোঁপায় বিঁধে দেয়। খোঁপা বাঁধা শেষ হ'লে জামার বোতাম ক'টা আঁটে একে একে। ভেতরের জামার বোতাম। ব্লাউসটা আর গায়ে চাপায় না। স্নানের ঘরে যাবে, নাই বা আর ব্লাউসটা চাপালো! শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে পালঙ্ক ছেড়ে তড়িৎ গতিতে চ'ললো স্নানের ঘরের দিকে। দরজা খুলতেই দেখলো এলোকেশীকে। শাড়ী, জামা আর সায়া হাতে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। রাজেশ্বরী এক পলকে লক্ষ্য ক'রলো এলোকেশীর মুখাকৃতি। এলোকেশীর মুখটা গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজেশ্বরী বুঝলো, গত রাত্রির তিরস্কারের মৌখিক অভিব্যক্তি। স্নানের ঘরে পোষাক-আষাক রেখে এলোকেশী বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে দয়ার্দ্র-চিত্তে বললে রাজেশ্বরী,—হ্যাঁ লো এলো, কালকের কথায় বুঝি তোর দুঃখু হয়েছে?

এলোকেশী কোন প্রত্যুত্তর দেয় না।

ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে নতমুখী হয়ে। লোলচর্ম্মা বৃদ্ধার মুখাবয়বে গাম্ভীর্য্যের স্পষ্ট চিহ্ন। রাজেশ্বরী বললে,—কথা বলছিস্ নে কেন?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে এলোকেশী,—আমাকে মাইনে চুকিয়ে ছেড়ে দাও। ঢের হয়েছে। বিনি কারণে আমাকে যাচ্ছেতাই করবে তুমি? আমি সহ্যি করতে পারবো না। হাতে ক'রে মানুষ করলাম, তারই পুরস্কার।

রাজেশ্বরী মৃদু হেসে বললে,—রাগ করিস্ নে ভাই! মন-মেজাজ ভাল

ছিল না, দু'টো কটু কথা ব'লে ফেলেছি। আর কখনও হবে না। এই মার্জনা চাইছি জোড়হাত ক'রে।

তবুও এলোকেশীর অভিমান যেমনকার তেমনি থাকে। বলে,—না রাজো, এক-বাড়ী লোকের সমুখে তুই অযথা এত কথা বলবি আর আমি সহ্যি ক'রে যাবো? দোষ করলে না হয় কথা ছিল! আমাকে মাইনে চুকিয়ে ছেড়ে দে। ভিক্ষে মেগে খাবো, সেও ভাল। বিনি কারণে অপমান সহ্যি করবো না!

—পায়ে মাথা খুঁড়বো? বাধ্য হয়ে বলতে হয় রাজেশ্বরীকে। বলে,—পায়ে মাথা খুঁড়লে যদি রাগ পড়ে তো বল্, পায়ে মাথা খুঁড়ছি।

এলোকেশীর অভিমান হয়তো দ্রবীভূত হয়। বললে,—মিথ্যে কেন আমাকে পাপের ভাগী করবি? নে নে, খুব হয়েছে। বেলা কত ঘড়ি দেখেছিস? নে, তাড়াতাড়ি নে। তুই না গেলে তোর সোয়ামীর জলখাবার দেওয়া যাবে না। কি কি করবে বলবি?

ভেবে-চিন্তে বললে রাজেশ্বরী,—কড়াইশুঁটির কচুরি করতে বল্ না! মিষ্টির মধ্যে বাদাম-চাকতি আর ঘিওর ঘরেই আছে। ভাবনা কি? ক' গণ্ডা কচুরি করতে কতক্ষণ লাগবে আর! তাও বেলা-কচুরি। যা, তুই ব্রাহ্মণীকে ব'লে আয় শীঘ্রি।

—ভাল কথা। কথা বলতে বলতে পা বাড়ায় এলোকেশী।

রাজেশ্বরী স্নান-ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দেয়। মৃদু কণ্ঠে কি একটা গান ধরে। রবিবাবুর কি একটা গান কে জানে!

শীতের সকাল।

অনেক দূরে দূরে, আকাশস্পর্শী তাল আর নারকেল গাছের মাথায়

মাথায়, স্থির আর অচঞ্চল হয়ে আছে ছাই রঙের পাতলা কুয়াসা। গৃহস্থের উনুনের ধোঁয়া না কুয়াসা কে জানে, থমকে আছে জড়বস্তুর মত। কোন কোন বৃক্ষশীর্ষে বা স্পর্শ ক'রেছে অরুণাভা। তেজহীন, দীপ্তিহীন মিষ্টি রৌদ্রালোক। চিৎপুরের মসজিদের মিনারের ফাঁক থেকে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারছেন আদিত্য। রক্তিমাকার, আবীরের মত রঙ দিবাকরের, সুগোল আকৃতি, যেন একটা বৃহৎ রক্তপিণ্ড। ধীরে, অতি ধীরে দিক্‌চক্র ত্যাগ ক'রে উদিত হচ্ছেন, আকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করবেন। সমগ্র আকাশ অতিক্রম ক'রে ডুবে যাবেন দিগ্বলয়ে। দিনের শেষে।

গাছে-গাছে ডাকছে নানা জাতের পাখী।

শিষ দিচ্ছে সুমধুর কণ্ঠে। শিমুল গাছে বুলবুলি আর কাঠ-ঠোকরার নাচানাচি। শালিখ আর টিয়ার ঝাঁক। মনিয়া পাখী উড়ে ব'সছে এ-গাছ থেকে ও-গাছে। খঞ্জনের লাফালাফি চ'লেছে। মাঝে-মিশেলে কাকের কর্কশ ডাক যেন তাল কেটে দিচ্ছে অন্যান্য আকাশ-চারীর রাগ-রাগিণীর। মৌমাছি, ভীমরুল, কাচপোকা আর প্রজাপতি সোনালী রৌদ্রে ঝিলিক তুলে ফুলের রেণু ওড়াচ্ছে, হুল ফুটিয়ে মধু খাচ্ছে মৌসুমী ফুলের। সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। মৌমাছির ভারে থেকে-থেকে নুয়ে পড়ছে। সদ্য-প্রস্ফুটিত জবা ঘোর-সবুজতা ভেদ ক'রে মানুষের দৃষ্টিপথে দেখা দিয়েছে। ঘন-হলুদ গাঁদায় ভীমরুল বিরাম-বিহীন চুমা খায়। ক্যানা, ডালিয়া আর ক্রিসিন্থিমাম্ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা শিশির চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ে। কখনও কখনও দেখা দিয়ে লুকিয়ে পড়ে দু'-চারটে দোয়েল আর চন্দনা। কোথায় কাদের পোষা তিতির থেকে থেকে ডাকতে থাকে।

সদরের স্নানাগার থেকে মুখ-হাত ধুয়ে বেরোতেই আমলাদের একজন বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মস্তকাবনত হয়ে নমস্কার জানিয়ে বললে,—হুজুর, আসতে হুকুম হয়।

প্রথমটায় বিস্মিত হয়ে প'ড়েছিল কৃষ্ণকিশোর।

ঘুম-ভাঙ্গা চোখে ভুল দেখছে না তো! কিয়ৎক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কিছু বলবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! নিবেদন ছিল কিছু।

কৃষ্ণকিশোর তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে বললে,—বলুন, কি ব'লবেন?

আমলাটি এগিয়ে আসে সসম্ভ্রমে। বলে,—হুজুর, হেড-নায়েব মশাই সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়েছেন। হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। বলছেন যে, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। হুজুরের হুকুম মিল্‌লেই—

—কোথায় তিনি? প্রশ্ন করলো কৃষ্ণকিশোর। পাশেই দাঁড়িয়েছিল একজন তাঁবেদার। তোয়ালের প্রয়োজন মিটে গেলে তোয়ালেটা নেবে হুজুরের কাছ থেকে। তাঁবেদারের হাতে ছিল সংবাদপত্র। তোয়ালে নিয়ে দেবে কাগজটা।

আমলাটি বললে,—হুজুর, তিনি কাছারীতে খাতা লিখছেন। হুকুম হ'লেই সাক্ষাৎ করবেন হুজুরের সঙ্গে।

সদর-বাড়ীতে দালান একাধিক।

এক দালানের মধ্যিখানে ছিল বেতের কয়েকটা কেদারা আর গোলাকার টেবিল। টেবিলে ছিল চীনা মাটির নক্সা-কাটা ফুলদানি। পুষ্পশোভিত। টাটকা ফুলের একটা তোড়া। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ আর মৌসুমী কয়েক জাতের। কয়েকটা ঝাউ-পাতা।

বেতের একটা কেদারা টেনে বসে কৃষ্ণকিশোর।

তোয়ালেটা দিয়ে কাগজটা নেয় তাঁবেদারের হাত থেকে। বলে,—তাঁকে পাঠিয়ে দিন। আমি আছি এখানে।

—যথাজ্ঞা হুজুর!

কথা দু'টি বলেই বিদায় গ্রহণ করে আমলাটি।

ইতোমধ্যে অনন্তরামের দেখা পাওয়া যায়। অনন্তরাম বললে,—বৌদি এই আলোয়ানটা গায়ে দিতে বললে। বললে যে, ঠাণ্ডা হাওয়া চ'লেছে, শীতও বেশ প'ড়েছে হঠাৎ। আলোয়ানটা গায়ে চাপাও।

অনন্তরামের হাতে ছিল একটা পশমী আলোয়ান। ভাঁজ-করা। হালকা-আগুন রঙের। সত্যি শীত-শীত করছিল এলোমেলো হিমার্ত্ত হাওয়ায়। আলোয়ানটা খুলে গায়ে জড়ালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—অনন্তদা, বল' গিয়ে, ক্ষিধে লেগেছে। যা হয় কিছু দিতে।

অনন্তরাম তৎক্ষণাৎ বললে,—সে তোমাকে বলতে হবে না। দেখলাম, বৌদিই যোগাড় করতে লেগে গেছে। দু'দণ্ড অপেক্ষা কর' তুমি আমিই নে আসছি!

কাগজে কত বিচিত্র খবর, দেশ-বিদেশের?

মুক্তিকামী গণজনের মুক্তিলাভের আকুল ও অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা। সেই সঙ্গে রক্তলোলুপ শাসকের শোষণের কাহিনী। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত-সরকার জারী ক'রেছেন "ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট", ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে—যার উদ্দেশ্য, দেশজ ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহকে নিরঙ্কুশ করা। রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কত কাগজের আত্মপ্রকাশ স্থগিত আছে। সর্ব্বজনাদৃত 'সোমপ্রকাশ' পড়তে পায় না বাঙালী। সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় 'সোমপ্রকাশ'। লাহোরের সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট হাজার টাকা ডিপোজিট ও মুচলকা চাওয়ায় সম্পাদক তদ্দানে সমর্থ না হওয়ায় 'সোমপ্রকাশ' প্রচার স্থগিত রেখেছেন। যশোরের শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিও সরকার মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার এক কৌশল অবলম্বনে ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ২১শে মার্চ্চের মধ্যে 'অমৃতবাজার'কে রীতিমত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করলেন।

'অমৃতবাজার' ইংরাজী হওয়ায় উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষগণের প্রতিজ্ঞা মতে 'আনন্দবাজার' প্রবর্তিত করলেন। কৃষ্ণকিশোর কি কাগজ পড়ছিল? শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'সমালোচক', কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালকবন্ধু' না 'আনন্দবাজার পত্রিকা'? শাসকদের প্রজাপীড়ন, ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও রাজদ্রোহের বিপ্লবাত্মক কাহিনী, মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের কথা, ব্রাহ্মধর্মসম্প্রদায়ে ভাঙনের ইতিবৃত্ত, সাম্রাজ্যবাদী কূট-কৌশলকে ব্যর্থ ক'রে শোষিত ভারতবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রূপ গ্রহণ করে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়! ভারতহিতৈষী হিউম সাহেবের অন্তহীন চেষ্টায় ভারত-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

—একটা নিবেদন ছিল হুজুর!

হঠাৎ কথা শুনে কাগজ থেকে মুখ তুললো কৃষ্ণকিশোর। কাগজ টেবিলে রেখে বললে,—কি, বলুন?

—চুপিচুপি ব'লবো হুজুর। বললেন হেড-নায়েব।

ব্যাকুল কণ্ঠে কথা বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—বেশ তো, তাই বলুন! কি হয়েছে কি? ফাঁস হয়ে গেছে না কি?

হেড-নায়েব কাছে এগিয়ে আসেন। বলেন,—না হুজুর, আমি আছি যখন, তখন ফাঁস হবে কোত্থেকে? তবে হুজুর, চালে একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের।

—কেন? সাগ্রহে জিজ্ঞেস ক'রলো কৃষ্ণকিশোর।

হেড-নায়েব ইতিউতি তাকিয়ে বললেন ফিসফিসিয়ে,—আজকে যে রবিবার, কথাটা হুজুর আমার মনেই ছিল না। সুতরাং আদালতে যাওয়ার নাম ক'রে বেরোলে সকলেই তো হুজুর বুঝে ফেলবে। ধ'রে ফেলবে। এখন উপায়? কাল মাঝ রাতে হুজুর কথাটা আমার মনে প'ড়লো। মনে পড়া পর্য্যন্ত হুজুর, এক দণ্ড আর চোখে-পাতায় করতে পারলাম না। ঘুমই এলো না! মনে মনে হুজুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম,

কি করা যায় তাই ভেবে-ভেবে। সকাল না হ'লে তো হুজুরকে বলা যাবে না কথাটা। এখন উপায় হুজুর?

—ঠিক ব'লেছেন। ঠিক ব'লেছেন। আজ তো রবিবার বটে। বললে কৃষ্ণকিশোর। চিন্তিত দৃষ্টিতে চেয়ে কথাগুলি বললে। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত বললে,—তবে আর কি হবে! কালকেই যাওয়া হবে। তবে আমাকে বেরোতেই হবে আজ। কিছুক্ষণের জন্তে। গৃহস্থকে ব'লবো যে, উকিল-বাড়ী যাচ্ছি। আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও বলবেন, কেমন? বলবেন, উকিল-বাড়ী যাচ্ছি পরামর্শ করতে।

—নিশ্চয় হুজুর, নিশ্চয়। বললেন হেড-নায়েব।—দু'বার বলতে হবে না হুজুর আমাকে। আমি তো বাপের ব্যাটা হুজুর। নয় কিনা বলুন?

—কি যে বলেন মশায়? বললে কৃষ্ণকিশোর।—যা নয় তাই বলবেন?

—যাই হোক, হুজুর যান, ঘুরে আসুন। ভালয় ভালয় ঘুরে আসুন! বললেন হেড-নায়েব।—দুগ্‌গা ব'লে ঘুরে আসুন। তবে এই কথা রইলো, কালকে যাওয়া হবে। আপনার প্রাতর্ভোজন এনেছে অনন্ত। ঐ যে আসছে।

মনে মনে হেড-নায়েবের বুদ্ধির তারিফ করে কৃষ্ণকিশোর। সত্যিই তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়তে হ'ত শেষ পর্য্যন্ত! রবিবারে আদালত খোলা থাকে না, মনেই ছিল না কথাটা। ক্রীশ্চান রবিবার, স্যাবাত্‌ ডে—এই বিশেষ দিনটিতে যে ইজ্‌রায়েলে গিয়ে বিশ্রাম করতে হয়। এই দিনে কোন কাজ নয়, শুধু ধার্ম্মিক বিশ্রাম গ্রহণ। সপ্তাহের ছ'দিন কাজ আর কাজ—আর একটি দিন শুধু খ্রীষ্টের ভজনা কর' আর ছুটি উপভোগ কর'। রবিবারে কাজে বিরতি, বাঙলা তথা ভারতবর্ষে হয়তো এই প্রথাটি চালু করে ইংরাজ। গির্জ্জার দ্বার ব্যতীত আর সকল কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার বন্ধ থাকে রবিবারে। বৈদিক যুগে গ্রহাধিপতি সূর্য্যের উপাসনার জন্ত যে-রবিবার ধার্য্য ছিল?

হোক রবিবার, আদালত নাই বা খোলা থাকলো, তবুও বেরোতে হবেই কিছুক্ষণের জন্য। যেন কত কত যুগ দেখা মেলেনি! ক'দিনের অদেখায় মনে হয় বুঝি বা কত শত দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শুধু চোখের দেখা দেখলেই হয়তো স্থির হয়ে যাবে চঞ্চলচিত্ত। মানসপটে গহরজানের মুখটি ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে। গতিশীল মেঘের মধ্য থেকে যেমন হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয় শুক্লপক্ষের পূর্ণাকার চাঁদ। কিম্বা ঝড়ের বেগে দোদুল্যমান গাছে পত্রবাহুল্যে লুকিয়ে-পড়া গন্ধরাজের দেখা-দেওয়ার মত।

শীতের সকালের হিমার্ত্ত হাওয়া, গাঁদার সুদূরবাহী গন্ধ আর গাছে গাছে নানা পাখীর কূজনে মন যেন কোথাও উড়ে চ'লে যায়। কাঁচা হলুদ রঙের একজোড়া পাখী, যাদের কণ্ঠে কৃষ্ণরেখা, শিষ দিতে দিতে উড়ে আসে কোথা থেকে, কনকচাঁপা গাছের ছায়ায় বসে। লাফালাফি করে। মাটি ঠুকরোয়। ভ্রমরের গুঞ্জরণ, হয়তো কান পেতে শোনা যায়। ফুল থেকে ফুলে উড়ে যায় —ক্রিসিন্থিমামের ঘন পাপড়ি ভেদ ক'রে অনুপ্রবেশ করে ফুলের অভ্যন্তরে। ফুলরেণুর স্পর্শে ভ্রমরের গায়ের রঙ সোনালী হয়ে গেছে। বাতাসে দুলছিল বৃক্ষশীর্ষ, বিশেষতঃ প্রাঙ্গণের প্রাচীর-স্পর্শী সুপারী গাছের প্রাচুর্য্য।

বেশ লাগে যেন এই শীতের সকাল।

প্রিয়সঙ্গসুখে লোলুপ হয়ে কি ওঠে যুব-মন! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কৃষ্ণকিশোর, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য যেতে হবে গহরজানের কাছে। বসিরুদ্দীন মিঞা কেন যে দেখিয়ে দিয়ে গেল গহরকে, কেন যে ব'লে গেল ঠিকানা! বেশ ছিল কৃষ্ণকিশোর! ছিল না কোন ভাবনা। গহরজানের রূপলাবণ্য ছিল অদৃষ্ট। মিঞা যে কি ফ্যাচাঙ বাধিয়ে দিয়ে গেল! উৎকণ্ঠায় বিশ্রী লাগে কখনও কখনও।

—এই নাও, খাও। আমাকে আবার যেতে হবে এক্ষুনি।

কথা শুনে সম্বিৎ ফিরে পায় যেন কৃষ্ণকিশোর। অনন্তরাম সকালের প্রাতর্ভোজন বসিয়ে দেয় টেবিলে। বেতের টেবিল। একটা স্ফটিকের

রেকাবীতে আহার্য্য—কড়াইশুঁটির বেলা কচুরী, ঘিওর আর দু'টো আমলকী। আচারের আমলকী। এক গেলাস জল—রূপোর গেলাস।

—কোথায় যাবে অনন্তদা? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে,—সে কি, তুমি শোন' নাই? তোমার প্রজাদের নে যেতে হবে যে। কলকাতায় যা যা আছে, দেখাতে হবে যে! বৌদির কাছ থেকে ছুটি মিলেছে, এখন তুমি হুকুম দিলেই দুগ্‌গা ব'লে যাত্রা করি ওদের সঙ্গে।

একটা আমলকী দাঁতে কামড়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—কোথায় যাবে অনন্তদা?

—সে কি তুমি শোন' নাই? বললুম তো কালকে, তোমার প্রজাদের সঙ্গে ক'রে ওদের দেখাতে হবে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, কালীঘাটের কালী, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, আর-আর যা আছে।

হঠাৎ আজ আমলকীর আচার পাঠালো রাজেশ্বরী!

আমলকী তো বলকারক আর—ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাসে কৃষ্ণকিশোর। অনন্তরাম প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে শুনে বললে,—আহা, ওরা থাকে বিদেশ-বিভুঁয়ে, দেখতে পায় না কিছু! যেও অনন্তদা, দেখিও কলকাতায় যা যা দেখবার আছে। প্রয়োজন হয়তো কাছারী থেকে গোটা কয়েক টাকা নে যেও তুমি।

—তুই তা হ'লে খা। আমি আসি? ভাল কথা ব'লেছিস, কাছারী থেকে কিছু টাকা নিয়ে যাবো। তাতে তোরও মান ওদের কাছে অনেকটা বেড়ে যাবে। কথার শেষে বিদায় নেয় অনন্তরাম। দ্রুতপদে চ'লে যায়।

গহরজানের ধমনীতে উঁচু জাতের রক্ত প্রবাহিত, যেজন্য ক'দিনের অদর্শনে সেও ব্যাকুল হয়ে আছে।

জাত-বারাঙ্গনা নয় গহরজান। হয়তো সেই কারণেই তার মনে

দস্তুরমুআফিক রেখা পড়েছে। সৌদামিনীর জন্ম মুখে কিছু বলতে না পারলেও যখন-তখন গহরজানেরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হচ্ছে। পুরাপুরি দেহবিক্রেতা হ'লে, যে-কেউ আসে আর যায় তাতে কোন' কথা থাকে না। কালকে কে এলো, আজ আর মনে থাকে না। মালদার মানুষকে হাতের নাগালে পাওয়া গেলে কিছুটা বেশী নকল হাসি আর অত্যধিক প্রেম-নিবেদন করতে দেখা যায়, যাতে পুনরায় আসে এই উদ্দেশে—কিন্তু গহরজানের দেহে আছে যে ভদ্র-রক্ত! টাকা না দিয়ে যদি সৌদামিনীর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে গহরজানকে নিয়ে যায় অন্যত্র, তাতেও তার কোন' আপত্তি নেই। শুধু এই অসহ্য পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়া হোক গহরজানকে। আর বেশী কিছু সে আকাঙ্ক্ষা করে না। আলাহিদা থাকবে গহরজান, ইয়ারদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে থাকবে, এমারতে বাস না ক'রে থাকবে বস্তীতে, কিংখাপ বাতিল ক'রে গায়ে চাপাবে অতি নগণ্য সূতীর পোষাক, আঙুর ফল আর মেওয়া না খেয়ে খাবে শাক্-ভাত—কিন্তু খালাস চায় গহরজান। দম-আটকানো এই ঠাট-ঠমক ছেড়ে থাকতে চায় স্বস্তি ও শান্তির নীড়ে। চড়াই পাখী না হয়ে, হ'তে চায় গহরজান বাবুই পাখী। রৌদ্র, ঝড় ও বৃষ্টি হোক সহ্য করতে, তবুও সে মুক্তি চায়।

ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে 'হা আল্লা' 'হা আল্লা' করছে গহরজান।

আল্লাকে মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে, আজকে যেন আসে বাঙালী বাবুটি। নেহাৎ ছোকরা, তবুও তাকে দেখলে গহরজানের মনের সকল জ্বালা মুহূর্ত্ত মধ্যে উবে যায়।

চোখে জলের ধারা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। ভারাক্রান্ত মন।

তবুও গহরজান ঘর সাজাতে লেগে গেছে সকাল হ'তে না হ'তেই। রোদ্দুর ফুটতে না ফুটতেই। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। গহরজানের পক্ষে

সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছে সৌদামিনীর অত্যাচার। পাছে কৃষ্ণকিশোর হঠাৎ গিয়ে হাজির হয় সেই ভয়ে সৌদামিনী সিঁড়ির দরজায় খাড়া দাঁড়িয়ে থেকেছে। নগদানগদি টাকা হাতে পেয়ে শনিবারের মরসুমে দিন আর রাত্রির মধ্যে ধ'রে ধ'রে ডেকে এনেছে ঠিকা মানুষদের জনাকয়েককে। সৌদামিনীর ভাবগতিক দেখে মুষড়ে প'ড়েছে গহরজান। আপত্তি জানিয়েছে শারীরিক অসুস্থতা জানিয়ে, কিন্তু কোন' ফল হয়নি। নিহায়ৎ যখন ভেঙ্গে প'ড়েছে গহরজান, তখন পেঁয়াজী আর ফুলুরীর সঙ্গে নির্জলা দেশী মদ গিলিয়ে বেহুঁশ ক'রে দিয়েছে মেয়েটাকে।

গহরজান দুঃখ-কাতর স্বরে ব'লেছে,—মাসী, আর যে পারি না আমি! ক্ষেমা দাও আমায়। নয়তো বিষ দাও খানিকটা। ম'রে বাঁচি আমি।

সৌদামিনী হিংস্র জানোয়ারের মত খিঁচিয়ে উঠেছে। ব'লেছে,—বড্ড যে বাড় হয়েছে তোর দেখছি! যা ব'লবো তোকে শুনতে হবে। নয়তো মুখে খ্যাংরা মেরে বিদেয় ক'রে দেবো।

টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেনি গহরজান। চোখ দু'টো শুধু তার ছলছলিয়ে উঠেছে। সৌদামিনীর কথার কোন' জওয়াব দেয়নি। ঠিক মানুষগুলির অসহ্য কায়িক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রে গেছে। নগদ টাকা দিয়েছে তারা, খিমচে কামড়ে অর্দ্ধমৃত ক'রে তবে ছেড়ে গেছে গহরজানকে। শরীরের কত জায়গায় কালশিটে পড়েছে। ব্যথা হয়েছে!

গত কালের অত্যাচারের ঘটনা মনে প'ড়েছে আজ।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর সাফ করতে লেগে গেছে গহরজান। একেকটি মানুষ যেন তাণ্ডবলীলা ক'রে গেছে ঘরে। মদ আর সোডার বোতলের ছিপি, পোড়া বার্ডসাই আর শালপাতায় ঘরের মেঝে ভ'রে গেছে।

গহরজানের চোখের জল টপ-টপ পড়ছে ঠিক বুকে।

তবুও সকল কিছু উপেক্ষা ক'রে ঘর সাফ করছে। ঝাঁট দিচ্ছে মেঝেয়। আল্লার কাছে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানাচ্ছে মনে মনে, আজ যেন আসে।

আর যদি আসে, গহরজান খোলাখুলি জানাবে তাকে সকল পরিস্থিতি। জানিয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে পায়ে। বলবে,—দোহাই তোমার, আমাকে বাঁচাও, উদ্ধার কর' আমাকে।

ঘর সাফ করতে করতে দেওয়ালের আয়নায় নিজের মুখটা দেখে গহরজান। দেখে যে, মুখেও কতক কতক জায়গায় কালশিটে প'ড়েছে। ওষ্ঠাধর ফুলে উঠেছে। গাল দু'টোতে কালো কালো দাগ। দেখতে দেখতে চোখ দু'টো জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেঁদে কেঁদে না কে জানে, চোখ দু'টো রাঙা হয়ে উঠেছে। রাত্রে ঘুমও ভাল হয়নি। ঠিকা মানুষের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে শুয়েছে যখন, তখন প্রায় রাত্রি আড়াইটে। গত কাল মদের নেশায় বুঝতে পারেনি গহরজান, আজকে চলতে-ফিরতে ব্যথিয়ে উঠছে শরীরের কত জায়গা!

মধ্যে মধ্যে হিমার্ত্ত হাওয়ার বেগ জানলা ভেদ ক'রে ঘরে আসে।

ঘরের পর্দ্দা ক'টা কাঁপে আর গহরজানের চূর্ণকুন্তল দু'লে ওঠে। শাড়ীর স্খলিত আঁচলটা বুকে-পিঠে জড়ায় গহরজান। শরীরটা যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। নড়তে-চড়তে কষ্ট হচ্ছে। আয়না থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় গহরজান। রুক্ষ কেশের বিনুনীটা বুকের 'পরে ঝুলে প'ড়েছিল। পরম আক্রোশে বিনুনীটা সজোরে পিঠে ছুঁড়ে দেয়। ভাল লাগে না ঘর ঝাড়-পোঁচ করতে। পায়ের কাছাকাছি চুপটি ক'রে ডালিম ব'সেছিল। ডালিমকে বুকে তুলে ফরাসে ব'সে দেহ এলিয়ে দেয় গহরজান। একটা তালিকায় এলায়িত হয়ে ডালিমকে বলে,—কোন্ আঙুলটা কামড়াবি, কামড়া ডালিম। দেখি, ঠিক হয় কি না?

গহরজান দু'টো আঙুল ডালিমের মুখের কাছে ধরে। একটা আঙুল কামড়ায় ডালিম। তুক করে গহরজান। জোর কামড় নয়, খুব আস্তে কামড়ায়। লাফিয়ে ওঠে যেন গহরজান। বলে,—ডালিম, ডালিম, মেরা ডালিম! ঠিক পাকড়া হায় তুম।

হাসি আর উল্লাসে গহরজানের মুখাকৃতিতে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। তুক ক'রেছিল গহরজান। দু'টো আঙুল কামড়াতে দিয়েছিল ডালিমকে। আসবে কি আসবে না—তাই জানতে চেয়ে তুক ক'রেছিল। ডালিম যেটি কামড়েছিল সেটিতে প্রমাণিত হ'ল যে আসবে। শরীরের সকল ব্যথা ও যন্ত্রণা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলে যায় গহরজান! ডালিমকে বুকে জাপটে ধরে। চুমা খায়।

—কে আছিস?

প্রাতর্ভোজন সমাপনান্তে ডাক দেয় কৃষ্ণকিশোর। অদূরে দাঁড়িয়েছিল একজন তাঁবেদার। হুজুর যদি কোন ফাইফরমাইশী করেন। তাঁবেদার সেলাম জানিয়ে বললে,—হুকুম হুজুর!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—অন্দরে বৌদিকে ব'লে পাঠাও যে বন্দুকের আলমারীর চাবিটা পাঠাতে।

—যো হুকুম হুজুর! বললে তাঁবেদার। সেলাম জানিয়ে চ'লে গেল।

অনেক দিন ধ'রেই মনে প'ড়েছিল কৃষ্ণকিশোরের, বন্দুকের আলমারী খুলে বন্দুকগুলো সাফ করাতেই হবে। সব ক'টা আজ হ'য়ে উঠুক আর না উঠুক, অন্ততঃ কয়েকটা তো হবে।

—রাজো, ওলো রাজো!

এলোকেশী ডাকে রাজেশ্বরীকে। বলে,—তোর সোয়ামী বন্দুকের আলমারীর চাবি চাইতে পাঠিয়েছে।

কুটনো কুটতে ব'সেছিল রাজেশ্বরী। আজকের তরিতরকারী আর শাক-শব্জী কুটতে ব'সেছিল। আরেকটু হ'লে বঁটিতে হাতটা কেটে

যাচ্ছিলো আর কি! বন্দুকের আলমারীর চাবি চাই? বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর। ইচ্ছা না থাকলেও বলে,—অপেক্ষা করতে বল্ এলো। দোতলায় যাবো, গিয়ে তবে দেবো। ক'টা আলু আর আছে? কুটে দিয়েই যাচ্ছি। এলো, জিজ্ঞেস কর্‌তো, বাবু কোথায়, কি করছে?

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁবেদারকে জিজ্ঞেস ক'রে এলোকেশী বললে,—ব'সে আছে সদরে। জলখাবার খেয়ে ব'সে আছে।

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল, কয়েকটা বন্দুক সাফ করা শেষ হ'লে বেরুবে। বাড়ীতে ব'লে যাবে যে, যাচ্ছে উকিল-বাড়ী।

কিন্তু যাবে উকিল-বাড়ীতে নয়।

সাজাগোজা ক'রে যাবে গহরজানের কাছে। যাওয়ার নামেও মনটা কৃষ্ণকিশোরের খুশীতে পূর্ণ হয়ে যায়।

ডালিমের আঙুল কামড়ানো তবে সত্যে পরিণত হচ্ছে! কৃষ্ণকিশোর তবে যাচ্ছে গহরজানের কাছে! কিন্তু কতক্ষণের মধ্যে? গহরজান যে ওদিকে অধীর প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে আছে! অশ্রুপ্লাবিত চোখে!

যত দেরী হয় ততই ভাল।

কুটনো কুটতে ব'সেছিল রাজেশ্বরী, আজকের তরি-তরকারী আর শাক-শব্জী কুটতে ব'সেছিল। বন্দুকের আলমারীর চাবি চাইতে পাঠিয়েছেন উনি, উঠতে যেন মন চায় না। বুকটা দুরু-দুরু করছে যে! বন্দুকের নাম শুনলেই ভয়ে আর ত্রাসে রাজেশ্বরী কেমন যেন আত্ম-বিহ্বল হয়ে পড়ে। হাত ফস্‌কে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ! কার কপালে কি লিখন আছে কে বলতে পারে! সুতরাং যত দেরী হয় ততই ভাল। রাজেশ্বরীর হাত আর পদদ্বয় হিম হয়ে যায়। সর্ব্বাঙ্গ ঘামতে থাকে এই শীতের দিনেও। আর যা কিছু চাক্ না, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে দিচ্ছে রাজেশ্বরী। কিন্তু পৃথিবীতে এত বস্তু থাকতে বন্দুকের আলমারীর চাবীর প্রয়োজন হয়ে পড়লো, দরকার হ'ল বন্দুকের! বেশ ছিল এতক্ষণ রাজেশ্বরী, ছিল বেশ খুশীমনেই। এলোকেশীর মুখে তাঁবেদারের কথার পুনরুক্তি শোনা পর্য্যন্ত হঠাৎ যেন স্থির আর অচঞ্চল হয়ে প'ড়লো। শেষকালে সত্যিই দিতে হবে চাবী? না দিলেই নয়? আধ-কোটা আলু যেমনকার তেমনি ধরা থাকে হাতে। রাজেশ্বরী ভেবে ভেবে যেন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না কিছুর। বড্ড যে জেদী উনি, যেটি হুকুম হবে সেটি প্রতিপালিত না হ'লেই তুল-কালাম করবেন। তিষ্ঠোতে দেবেন না কাউকে। এই ক'টা দিনেই চিনেছে রাজেশ্বরী, জেনেছে স্বামীর প্রকৃতি। শেষ পর্য্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী। দুরু-দুরু বক্ষে ঢু'কলো খাস-কামরায়। রাজেশ্বরীর দেহের রোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে কোন্ এক ভয়ের রোমাঞ্চে। মেঝেয়

লুটিয়ে-পড়া আঁচলটা সজোরে ছুঁড়লো পিঠে। একরাশ চাবী আঁচলে-বাঁধা। রূপোর রিঙে রাশি রাশি চাবী। শব্দায়িত হ'ল চাবীর ঝঙ্কার। হয়তো পিঠে দাগ প'ড়ে গেছে রাশি রাশি চাবীর আঘাতে। কোমল দেহ যে রাজেশ্বরীর। ক্ষুব্ধচিত্তে ও কম্পমান পদে চ'ললো খাস-কামরায়। জিদ্ যখন ধ'রেছেন, তখন পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেলেও দিতে হবে বন্দুকের আলমারীর চাবী। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে ধীরে ধীরে চলে রাজেশ্বরী। অন্তঃপুরিকাগণ দেখে-শুনে অবাক মানে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখে রাজেশ্বরীর চাল-চলন। দেখে দূর থেকে, দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রাজেশ্বরী কি আত্ম-সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে! চ'লেছে যন্ত্রচালিতের মতই। চ'লেছে টলতে টলতে। নেহাৎ চেনা-জানা আছে পথটুকু, চোখের দৃষ্টি বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রাজেশ্বরী। ভুলে গেছে কে কোথায় আছে। ভুলে গেছে ঘোমটা টানতে। কত লজ্জা রাজেশ্বরীর, লজ্জার বালাই পর্য্যন্ত নেই!

রাজেশ্বরীর পিছু-পিছু চ'লেছে এলোকেশী।

চাবী চাইতেই লক্ষ্য ক'রেছে এলোকেশী, মেয়েটার মুখাকৃতি বদলে গেছে মুহূর্ত্তের মধ্যে। বিরক্তি ফুটে উঠেছে মুখে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখটা। পাণ্ডুর হয়ে গেছে। অবশ হয়ে গেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। রাজেশ্বরী বিরক্ত কণ্ঠে বললে,—আয় এলো, চাবী নে যা। আর ব'লে দে তাঁবেদারকে যে বন্দুকের আলমারীর চাবীটা কাছারীতে রাখতে। আমি রাখতে-টাখতে চাই না ও-আলমারীর চাবী!

নিরুত্তর থাকে এলোকেশী।

রাজেশ্বরীর চাল-চলন, মুখাকৃতি আর কথার স্বর শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে যেন। মুখে তার কথা জোগায় না। এলোকেশীও কাঁপছে ঠকঠকিয়ে। একে শীতের এলোমেলো হাওয়া, তায় মেয়েটার হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখে কাঁপছে থরোথরো। বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছে এলোকেশী, কোন কিছু

উত্তেজনা ধাতে আর সহ্য হয় না। রাজেশ্বরীর স্বামীকে শাপ-শাপান্ত করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবে, ও যে রাজেশ্বরীর স্বামী! শাপ-শাপান্ত করলে রাজেশ্বরীকে তার ফল ভুগতে হবে যে! কি হ'তে কি হবে কে জানে! কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে রাজেশ্বরীকে। মেয়েটা ভাগ্যহীনা হ'লে আর বাঁচবে না এলোকেশী। শুধু মেয়েটার জন্য নয়, রাজেশ্বরীর মূর্খ স্বামীটার প্রতিও মায়া হয় এলোকেশীর। কৃষ্ণকিশোরের আদব-কায়দা আর ধরণ-করণ দেখে বেশ বুঝে নিয়েছে এলোকেশী যে, ছেলেটা অকাল-কুষ্মাণ্ড, কাণ্ডজ্ঞানহীন আর মূর্খতম।

মূর্খ ও অকাল-কুষ্মাণ্ড কৃষ্ণকিশোর, দালানের কেদারা থেকে উঠে গিয়ে দেখছিল গান্-কেশ্‌টা। মেহগনি কাঠের গান্-কেশ। বন্দুকের আলমারী। আলমারী তো নয়, যেন বন্দুকের একটা শো-কেশ। কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্ব-পুরুষদের দ্বারা ক্রীত ঐ বন্দুকগুলো। ডবল-ব্যারেল্, সট্-গান্ আর নানা ধরণের রাইফেল্। ইংরাজদের তৈরী। বড়া কোম্পানীর দোকান থেকে কেনা। বিলেতে অর্ডার দিয়ে কিনেছিলেন কৃষ্ণচরণ। কিনেছিলেন, কিন্তু একটি দিনের তরেও কোন' একটি আগ্নেয়াস্ত্রে গুলী দাগেননি। কৃষ্ণচরণ প'ড়েছিলেন হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থে কি কি অসৎ কর্ম্ম করলে কি কি পাপ হয়, তারই বিস্তারিত ফিরিস্তি। শাস্ত্র পাঠ ক'রে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণচরণ। শপথ ক'রেছিলেন যে, কখনও কোন' জীবহত্যা করবেন না। কিন্তু তখন যে আগ্নেয়াস্ত্র বিলাত থেকে জাহাজযোগে পৌঁছে গিয়েছিল কলকাতায়। হাসিল-দপ্তর মাল পাওয়া মাত্র পৌঁছে দিয়েছিল কৃষ্ণচরণের গৃহে। কৃষ্ণচরণ ঐ মেহগনির আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র। পাঠান্তে কদাচ কোন' একটা বন্দুকে গুলীদাগা দূরের কথা, স্পর্শ পর্য্যন্ত করেননি ঐ বন্দুকের আলমারী। কৃষ্ণচরণ প'ড়েছিলেন অসৎ কর্ম্মের

পরিণাম। প'ড়েছিলেন, 'কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্মমূলকস্ত বিপাকঃ পরিণামঃ।' শুভ কর্ম্মের ফল মোক্ষ ও স্বর্গলাভ, ঐশ্বর্য্য ভোগ, সুখের উপকরণ লাভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফল রোগভোগ ও নরকগমন। জীবহত্যার ফলভোগ প'ড়েছিলেন—ছাগহত্যায় অধিকাঙ্গ, অশ্বহত্যায় বক্রমুখ, মেষহত্যায় পাণ্ডুরোগ, হস্তিহত্যায় সকল কার্য্যে অসিদ্ধি, গোহত্যায় কুষ্ঠ, মহিষহত্যায় কৃষ্ণগুল্ম, বকহত্যায় দীর্ঘনাসিকা, শুক-শারিহত্যায় স্খলিতবাক্য, মৃগহত্যায় খঞ্জ।

পড়তে পড়তে কৃষ্ণচরণের মত দৃঢ়চিত্তের মানুষ পর্য্যন্ত শিউরে শিউরে উঠেছিলেন। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন আগ্নেয়াস্ত্রগুলোয় কখনও হাত দেবেন না। গমস্তা আর আমলাদের কেউ কেউ মাঝে-মিশেলে কৃষ্ণচরণের আদেশানুযায়ী বন্দুক আর রাইফেলগুলো সাফ ক'রতো। নয় তো মরচে ধ'রে যাবে যে!

আর্মস্ এ্যাক্টের ধারায় আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে হ'লে লাইসেন্স করাতে হবে—ইংরাজ কর্ত্তৃক এই নিয়মটি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রতি উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। ইচ্ছা করলে তাঁরা কামান পর্য্যন্ত রাখতে পারতেন, বন্দুক তো ছাই! কৃষ্ণচরণ ভ্রাতৃদ্বয় তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বংশানুক্রমে কৃষ্ণচরণের উত্তরাধিকারিগণ বিনা লাইসেন্সে যত খুশী আগ্নেয়াস্ত্র ঘরে রাখতে পারেন।

কৃষ্ণকিশোর ভাবে, তাঁবেদারটা এত দেরী করছে কেন?

চাবি কি তবে পাওয়া যাচ্ছে না বন্দুকের আলমারীর? যাবে নাকি কৃষ্ণকিশোর? গিয়ে খুঁজবে, যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়? ইতোমধ্যে তাঁবেদার চাবি এনে দেয়। বলে,—বৌমা ব'লে পাঠালেন যে, আদালতে যেতে হবে, ভুলে যাবেন না যেন হুজুর!

কৃষ্ণকিশোর চাবি ছিনিয়ে নেয় প্রায়।

বলে,—হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

তাঁবেদার সেলাম ঠুকে বিদায় নেয়।

কৃষ্ণকিশোর তৎক্ষণাৎ বন্দুকের আলমারীর কুলুপটা খুলে ফেলে। আলমারীটা মেহগনির, ভেতরটা কালো বনাতে মোড়া, সারি সারি সাজানো বন্দুক আর তলায় প'ড়ে আছে কতকগুলো রিভল্‌ভার। সট্‌-গান একটা টেনে নেয় কৃষ্ণকিশোর। আজ এইটেই শেষ হোক। অতঃপর দেখা যাবে অন্যান্যগুলো। আর নেয় রড, জগ, তেল—বন্দুক পরিষ্কারের ঐ তিনটি প্রধান উপকরণের সঙ্গে আরও কি কি যেন নেয়। কুপো, তামার তারের ব্রুস, পালখ, কম্বলের টুকরো, পশম, ওক গাছের কাষ্ঠখণ্ড। শিশিতে ভর্ত্তি তেলের গন্ধ ঠিক সুগন্ধ নয়, তবুও যেন গন্ধে পাওয়া যায় বিশেষ উগ্র আমেজ। তারপিন্ তেল যে!

বন্দুক দাগতে জানতো না কৃষ্ণকিশোর।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ম্যানেজারবাবু শিখিয়েছিলেন, বন্দুক ধরার কায়দা, পরিষ্কারের প্রণালী, কি ধরণের বন্দুক কোন্ ধরণে দাগতে হয়, গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতে বন্দুকের ব্যবহার কোন্ ধারায় করতে হয় লক্ষ্যভেদ করবার জন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে অভ্যাস করিয়েছিলেন,—প্রাঙ্গণের গাছে গোলাকৃতি পেলেট্ সেঁটে প্র্যাক্‌টিস করিয়েছিলেন দিনের পর দিন। দূর আর নিকট থেকে বন্দুক দাগবার প্রক্রিয়া শিখিয়েছিলেন। কত শত-সহস্র কার্ত্তুজ শুধু শিখতেই বিনষ্ট হয়েছিল। ডবল ব্যারেল, সট্‌-গান আর রাইফেল দাগতে শিখিয়েছিলেন। পাকাপোক্ত না ক'রে দিলেও, আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু অর্জ্জন করিয়েছিলেন। সেই জ্ঞানেই যা যতটুকু শিক্ষালাভ ক'রেছে কৃষ্ণকিশোর।

বন্দুক সাফ করতে করতে কৃষ্ণকিশোর দেখছিল আকাশ পানে।

বেলা কত হয়েছে কে জানে! মন লাগছিল না, তবুও বন্দুকের ব্যারেলের মধ্যে আর কল-কব্জায় তেল ঢালে কৃষ্ণকিশোর। ব্যারেলের মুখের কুপোয় তেল দেয়। কতক্ষণে দেখতে পাওয়া যাবে গহরজানের মুখ।

এক অদম্য আকাঙ্ক্ষায় থেকে থেকে ব্যস্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। মন জুড়ে আছে গহরজান, কয়েকদিনের অসাক্ষাতে সকল ভাবনায় শুধু জেগে উঠছে গহরজানের স্মৃতি। গহরজানের রূপ, কথা আর আরও অনেক কিছু।

বন্দুকের ব্যারেলের মধ্যে তামার ব্রুস চালাতে চালাতে কৃষ্ণকিশোর দেখছিল প্রাঙ্গণের গাছে গাছে কত ফুলের মেলা। সূর্য্যের হলুদ-রৌদ্রে হাসছে যেন ঐ টাটকা ফুলের রাশি! কত বিচিত্র রঙ এককে জাতের ফুলের! ডালিয়া, কেনা আর হরেক রকমের মৌসুমী ফুল। ঘোর সবুজের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য ফুল। উতলা হাওয়ায় কাঁপছে কুঁড়ি। কত রঙের, কত ঢঙের ফুল, দেখলে যেন চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

ঐ লালচে কেনার স্তবকটা কি মনে জাগিয়ে তোলে গহরজানের মুখ? ঐ আকাশী-রঙের ডালিয়াটা? ঐ শ্বেতশুভ্র চন্দ্রমল্লিকার দল?

একটা ফুলের তোড়া গহরজানকে উপহার দিলে কেমন হয়!

তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ে তাঁবেদারের। কৃষ্ণকিশোর ডাকে,—সুদামা! সুদামা!

কোন' তাঁবেদারের নাম হয়তো সুদামা।

সুদামা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। করজোড়ে দাঁড়িয়ে বলে,—হুজুর, কিছু বলছেন?

কৃষ্ণবিশোর বন্দুকের তৈলাক্ত ট্রিগার দাগতে দাগতে বললে,—মালীদের কাউকে ডাক্‌তো সুদামা।

সুদামা পালিয়ে বাঁচে যেন।

হুজুরের হাতে বন্দুক। হুজুর বন্দুক নাড়াচাড়া করছেন! হাত ফস্‌কে যদি একটা গুলি ছুটে আসে! সুদামা পালিয়ে বাঁচে জানের ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে। হুজুরের ডাক শুনে তো প্রথমেই সুদামার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। সুদামা ভেবেছিল, হুজুর হয়তো তার প্রতি তাগ ক'রেই বন্দুক পরীক্ষা করবেন! ডাক শুনে তাই সুদামা প্রায় কাঁপতে শুরু ক'রেছিল। হুজুরের

কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয় সুদামা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে। মালীদের ডেকে দিয়ে সুদামা কেটে পড়বে ভেবেছিল। মালীদের ওপর দিয়েই পরীক্ষাটা হয়ে যাক, সুদামা দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে, দূর থেকে—অনেক দূর থেকে।

মালী বললে,—হুজুর, আইচি আমি। ডাকছিলা তুমি? হুকুম করবি কিছু?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—খু—ব ভাল একটা তোড়া বানিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

বাঙলা আর উড়িষ্যার সীমান্তের অধিবাসী মালী। কথার ভাষা বাঙলা, কিন্তু ঠিক বাঙলা নয়! কথায় টান আছে কেমন যেন। মালীর মুখাবয়বে গ্রাম্য ছাপ পরিস্ফুট। কথার স্বরে সারল্য। পরম তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে মালী বললে,—এখনই দিচ্ছি হুজুর! একটুক সবুর কর্।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—এক্ষুণি প্রয়োজন নেই। দেরী হ'লেও চলবে। তবে বেশী দেরী না হয় যেন। আমি খেয়ে-দেয়ে যখন বেরুবো তখন দিও। একজনকে ভেট্ দিতে হবে।

মালী বললে,—বেশ কথা। তাই দিবো। খুব ভাল তোড়া দিবো হুজুরকে। দেখে অবাক্ হয়ে যাবি হুজুর। সায়েব-সুবোকে পর্য্যন্ত দিতে পারবি। কথার শেষে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে জিজ্ঞেস করলো মালী,—তবে আমি যাই হুজুর? আর কিছু বলবি? হুকুম করবি?

—না, না, আর কিছু ব'লবো না। ঐ কথা ব'লতেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। যাও, তুমি যাও। বললে কৃষ্ণকিশোর। বন্দুকের ব্যারেলের অন্তর্ভাগ দেখতে দেখতে বললে। এক চক্ষু মুদিত ক'রে দেখতে দেখতে। ব্যারেলের ভেতর কোন মরচে কিংবা ময়লা আছে কিনা দেখতে দেখতে।

তাঁবেদারদের একজন পেছন থেকে কথা বলে হঠাৎ। বলে,—হুজুর, বৌমা ব'লে পাঠিয়েছেন চান-খাওয়া করতে। আদালতে যেতে হবে যে।

বন্দুকের কল-কব্জা আলগা করছিল কৃষ্ণকিশোর। বন্দুকটা সাফ করা হয়ে গেছে, তুলে রাখতে হবে এখন আলমারীতে। কল-কব্জা যে আলগা ক'রে রাখতে হয়, যখন বন্দুক ব্যবহার করা হয় না! কৃষ্ণকিশোর বললে,—বল' গে যাচ্ছি আমি।

—যথাজ্ঞা হুজুর। কথার শেষে বিদায় নেয় তাঁবেদার।

মনে মনে মায়া হয় কৃষ্ণকিশোরের।

আহা, রাজেশ্বরী অতশত কি বোঝে! জানেও না যে রবিবারে আদালত খোলা থাকে না। একজনের প্রতি মায়া আর আরেক জনের প্রতি আকর্ষণের দ্বন্দ্বে কৃষ্ণকিশোরের মন দুলতে থাকে। রাজেশ্বরীর প্রতি মায়া আর গহরজানের প্রতি দয়া। রাজেশ্বরীর ব'লে-পাঠানো কথাগুলো শুনে মনে মনে হাসে কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী জানতো যদি, কোথায় যাবে আজ দুপুরে কৃষ্ণকিশোর! যাবে কার কাছে। উকীল-বাড়ীতে যাবে না, যাবে গহরজানের কাছে। গহরজানের সান্নিধ্যে।

অন্দরে রাজেশ্বরী তখন পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে বিভিন্ন দেব-দেবীর পায়ের ফুল জোগাড় ক'রে রাখছিল। ৺কামাক্ষ্যা দেবীর রক্তিমাকার বস্ত্রাংশ। পূর্ণ-কলস ঘট। স্বামী আদালতে যাবে—কাজ-কর্ম চুকিয়ে ভালয় ভালয় ফিরলে সে বাঁচে। স্বস্তিলাভ করে। বন্দুকের মতই ঠিক আদালতের নাম শুনলে যে গাঁয়ে কাঁটা দেয় রাজেশ্বরীর!

দেখে-শুনে তো হতবাক্ হয়ে যায় এলোকেশী। রাজেশ্বরীর গোছ-ব্যবস্থা দেখে।

শুধু এলোকেশী নয়, অন্দরের আরও অনেকেই বিস্মিত হয়ে পড়ে। এলোকেশী ভাবছিল, সেদিনের কচি ফুটফুটে মেয়েটা, যাকে খাইয়ে না দিলে খেতো না, ঘুম থেকে না জাগালে যার ঘুম ভাঙ্তো না, সাত চড়েও যে

মেয়েটার মুখে কথা ফুটতো না;—সে কোথা থেকে শিখলো সংসারের অত খুঁটিনাটি! পট্টবস্ত্রপরিহিতা রাজেশ্বরীকে দেখে এলোকেশীর যেন বিশ্বাস হয় না যে, তার হাতে-মানুষ-হওয়া এই সেই রাজেশ্বরী! স্বামী আদালতে যাবে ব'লে কিছু কি আর বাকী রাখলো! ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর পায়ের ফুল, সর্প-মৈথুনের কালে তাদের গাত্রে স্পর্শীকৃত উড়ুনী, ৺কামাক্ষ্যা দেবীর রক্তাভ বস্ত্রাংশ, দূর্ব্বা, দধি আর সিদ্ধি—কিচ্ছু বাকী রইলো না? পূর্ণকলস পর্যন্ত —যা দেখে যাত্রা করবে স্বামী। যত সব শুভ বস্তু—সকল কিছু একে-একে জোগাড় ক'রে রাখলো রাজেশ্বরী। পুরোহিতকে ব'লে পাঠানো হয়েছে, যাত্রাকালে যেন স্বয়ং উপস্থিত থাকেন! মন্ত্র প'ড়ে দেবেন। আশীর্ব্বাদ করবেন, কপালে দধির ফোঁটা দিয়ে দেবেন।

রাজেশ্বরী বললে,—চল্ এলো, গরদখানা ছেড়ে আসি। কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর পারছি না। গলাটা টা-টা করছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে! উপোস করে আছি যে।

এলোকেশী স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললে,—আহা, বাছা রে! যা, তুই ঘরে যা। আমি জল-খাবার নে যাচ্ছি। সোয়ামীকে ডাকতে পাঠাবি না? বেলা যে অনেক হয়ে গেছে!

রাজেশ্বরী দোতলার সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে বললে,—আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রেছি। সময় বুঝে ঠিক আসবেন। তুই ভাবছিস্ কেন?

আহা, রাজেশ্বরী যদি জানতো যে আজ রবিবার! আদালত খোলা নেই!

অত-শত বোঝে না সে। বুদ্ধিবিহীনা বালিকা-বধূ যদি জানতো যে, স্বামী কোথায় যাবে আজ! কার কাছে যাবে! পরিশ্রম বৃথাই ক'রেছে রাজেশ্বরী! মিথ্যা হয়েছে যত খাটাখুটি।

খাস-কামরায় গিয়ে দেরাজের আর্শীতে আকৃতিটা একবার দেখে রাজেশ্বরী। গরদে কেমন মানিয়েছে দেখে হয়তো। চওড়া লাল পাড়ের

গরদে। আটপৌরে আর দামী পোষাকে কেমন দেখায় দেখেছে, জড়োয়া অলঙ্কারে কেমন দেখায় তাও দেখেছে। কিন্তু পট্টবস্ত্রে কেমন মানায় দেখে আজ। দেখে সকলের অলক্ষ্যে। সদ্যঃস্নাত আলুলায়িত কেশ, সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর, চওড়া লাল পাড়ের গরদ—দেখতে দেখতে হয়তো বিমুগ্ধ হয়ে যায় রাজেশ্বরী। সমুখ থেকে দেখে। পাশ ফিরে আড়-চোখে দেখে। কিন্তু সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। গলাটা যে টা-টা করছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এলোকেশীটাও এলো না এখনও!

ঘরের কোণে গ্র্যাণ্ড-ফাদার্স্ ঘড়িটা হঠাৎ বেজে ওঠে।

চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। আচমকা শব্দ শুনে চমকে ওঠে। জল-তরঙ্গের মত বেজে যায় ঘড়িটা। সুমিষ্ট সুরে। কৃষ্ণকিশোরের কথা মনে পড়ছিল রাজেশ্বরীর। গত রাত্রির কথা। ভাবতেও লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। হাসিও পায়, লজ্জাও পায়। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গরদের শাড়ীটা খুলে ফেলে দেয়। রেশমের জ্যাকেটটাও খুলে ফেলে। মাত্র একটা জ্যাকেট-জামা আর সায়া ছিল গায়ে। আর্শীতে দেখতে পায় রাজেশ্বরী, প্রায় বিবস্ত্র দেহ। পলকের জন্য নজরে পড়ে। পলকের জন্যই দেখে নেয় রূপ আর রঙ। দুধের মত রঙ আর মোমের মত গড়ন। দেখতে দেখতে মুহূর্ত্তের জন্য অহঙ্কার হয় হয়তো। কিন্তু তক্ষুনি অবদমিত ক'রে নেয় জাগ্রত অহঙ্কার। রূপের অহঙ্কার কি করতে আছে! ছিঃ!

বাইরে থেকে দরজায় টোকা মারে এলোকেশী।

বলে,—ওলো, কিছু মুখে দিবি নে? তোর জল-খাবার এনেছি যে।

প্রায় বিবস্ত্রা যে রাজেশ্বরী!

নিম্নাঙ্গে আছে শুধু একটা সায়া। রেশমী সায়া।

অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে বললে রাজেশ্বরী,—দাঁড়া এলো, দু'দণ্ড দাঁড়া। শাড়ী আর জামাটা বদলাচ্ছি।

এলোকেশী কম্পমান কণ্ঠে বলে,—আমাকে আবার নজ্জা কি রে তোর? এ্যাতটুকু বেলা থেকে মানুষ করনু! হাত যে কাঁপতে নেগেছে ঠক্‌ঠকিয়ে! ভেরে গেছে হাত দু'টো! বলিস তো যাই ভিতরে, যাবো?

রাজেশ্বরী ততক্ষণে একটা ব্রেসারী, জ্যাকেট আর শাড়ী কোন রকমে সাত্‌তাড়াতাড়ি গায়ে চাপিয়েছে। বললে,—আয় এলো, আয়।

দরজা ঠেলে এলোকেশী ঘরে ঢুকতেই রাজেশ্বরী তো হতভম্ব হয়ে পড়ে। ফাঁসির খাওয়া এনেছে যে এলোকেশী! দু'হাতে তিন-তিনটে রেকাবী। রূপোর ফুল-কাটা রেকাবী। একটায় ফল আর মেওয়া, একটায় মিষ্টান্ন আর আরেকটায় নোনতা। কোন্ এক কায়দায় ব'য়ে এনেছে দু'হাতে তিন-তিনটে রেকাবী। রাজেশ্বরী থাকতে পারে না আর। বলে,—তুই কি বল্ তো এলো? এই অবেলায় খাওয়া যায় কখনও এত খাবার!

এলোকেশী অতি কষ্টে রেকাবীগুলো নামিয়ে রাখে। নামিয়ে রাখে মেঝেয়। দম নেয়। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে,—তুই খা রাজো। আমি দুধটা নে আসি।

রাজেশ্বরী বলে,—রক্ষে কর'! দুধ খেলে ম'রে যাবো আমি। আমাকে কি মেরে ফেলবি তুই?

কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বললে,—আমি বাবা জানি না। বামুনদি যা-যা দিয়েছে আমি এনেছি। দুধ জ্বাল দিচ্ছে। এক বল্‌কা হ'লেই দুধটা নে আসবো। এতক্ষণে মনে হয় হয়ে গেছে। যা পারো খাও না। তোকে তো বলবার কেউ নেই। জোর ক'রে খাওয়াবার পর্য্যন্ত কেউ নেই। তোমার শাউড়ী পর্য্যন্ত নেই। আহা, তেনা থাকলে কিছু কি দেখতে হ'তো? তোকে উঠে ব'সতে হ'তো? দম নেয় এলোকেশী। বলে,—রাজো, তুই একটা চিঠি দে না, যদি তেনাকে ফেরাতে পারিস্!

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। যেন একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি! ভাবে হয়তো আকাশ-পাতাল। ভাবতে থাকে, কুমু, কুমুদিনী কি শুনবেন

রাজেশ্বরীর কথা? রাজেশ্বরীর প্রস্তাব? শাশুড়ীর ঘরে কুমুদিনীর ছবিটা দেখা পর্য্যন্ত তাঁকে দেখতে বাসনা হয় রাজেশ্বরীর। কত সুন্দর দেখতে কুমুদিনীকে। যেন প্রতিমার মত। ছবিটা দেখলেই মনে হয় কুমুদিনীর চোখ দু'টি অশ্রুসজল। আঁখির কোণে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে। চোখে জল, কিন্তু ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে আছে হাসির আভাষ। রাণীর মত আকৃতি, রাজার ঘরের রাণী কুমুদিনী—তাঁর দুঃখ কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে কত কথাই না মনে জাগে রাজেশ্বরীর। কুমুদিনী এখন কোথায়, কি করছেন কে জানে!

কুমুদিনী তখন কালভৈরবের মন্দিরে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন যুক্তকরে। মন্দির লোকে লোকারণ্য। পুণ্যার্থীর দল আসা-যাওয়া করছে। মন্ত্র বলছে, মনস্কামনা জানাচ্ছে, পুষ্পার্ঘ্য ছুঁড়ে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু কুমুদিনীর পূজা কি শেষ হ'তে নেই! চক্ষু মুদিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন অবিচলের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দু'টি ধ'রে গেছে, খেয়ালই নেই। কুমুদিনীর কি সমাধি হ'য়ে গেছে! মনে মনে ডাকছেন কালভৈরবকে।

ভৈরব কত জন আছেন কাশীতে? ভৈরব-বেতাল?

অসিতাঙ্গ-ভৈরব আছেন সূর্য্যকুণ্ডের সম্মুখে—যাঁকে অঙ্গহীন ক'রেছিলেন ঔরঙ্গজেব। আনন্দভৈরব আর বটুকভৈরব আছেন। ভীমভৈরব আর আদিভৈরব অর্থাৎ ভূতভৈরব আছেন। আর আছেন কালভৈরব, যাঁর নাম ভৈরবনাথ। পঞ্চক্রোশী বারাণসীর কোতোয়াল? বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে কপালমোচন তীর্থের সম্মুখে আছেন কালভৈরব। ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করণের জন্য মহেশ্বর নিজ কোপ হ'তে এক ভৈরব পুরুষ সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষই না কালভৈরব? কালভৈরবের ঘন নীল মূর্ত্তি। তাঁর পশ্চাতে কুক্কুরমূর্ত্তি। কালভৈরবের মন্দিরের দ্বারদেশে আছে দু'জন দ্বারপালেশ্বরের মূর্ত্তি এবং মন্দিরগাত্রে আছে বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র।

মন্দিরের গর্ভগৃহটি ক্ষুদ্র। মন্দিরের সংলগ্ন তাম্রনির্ম্মিত গর্ভগৃহে আছেন চতুর্হস্তবিশিষ্ট কালভৈরব। মূর্ত্তিটি মর্ম্মরের হ'লেও কালভৈরবের মুখমণ্ডল রৌপ্যের। মহাদেব ও সূর্য্যমূর্ত্তি আছে কালভৈরবের মন্দিরে। মন্দির-চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে আছে শীতলার মন্দির। শীতলা-মন্দিরের গর্ভে প্রাচীরগাত্রে আছেন সপ্ত মাতৃকার মূর্ত্তি। পেশোয়ারের বাজীরাও প্রস্তুত ক'রে দেন কালভৈরবের মন্দির। কোথায় যেন প'ড়েছিলেন কুমুদিনী যে, "শুদ্ধ রবিতে কালভৈরব যাত্রা নিত্য সাম্বাদিত্য"—যেজন্য আজ রবিবারে ভোর হ'তে না হ'তেই কালভৈরবের দ্বারে গেছেন কুমুদিনী। কিন্তু কুমুদিনী কি দোষ করেছেন! কালভৈরবের দর্শনে সকল দুষ্কৃতি দূরীভূত হয়। কালভৈরবের পূজান্তে যে যা কামনা করে তার সেই কামনাই সিদ্ধ হয়। কুমুদিনীর একমাত্র কামনা যে, তাঁর গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। তাঁর এক-মাত্র পুত্র যেন বিপথে না যায়। পুত্র আর পুত্রবধূর আয়ু যেন বর্দ্ধিত হয়।

*

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়ে ঢং ঢং। ঝনন্-ঝনন্ শব্দের তরঙ্গ বইতে থাকে বাতাসে। একটি একটি শব্দ শোনে কৃষ্ণকিশোর। শব্দ গোণে। এগারোটা বাজলো। কৃষ্ণকিশোর তখন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে গহর-জানের রূপাকর্ষণে। রূপ আর রঙের। কৃষ্ণকিশোর মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করে যে, রাজেশ্বরীকে বলবে খাজনা দেওয়ার জন্য যেতে হবে আগামী কাল। আজকে যেতে হবে উকিল-বাড়ী, জরুরী দরকার আছে। আদালত আজ বন্ধ, আজ যে রবিবার! কৃষ্ণকিশোর আরও সিদ্ধান্ত করে যে, হেড-নায়েবের সঙ্গে গতকল্য কথা ব'লে যা ঠিক হয়েছিল তা আর রক্ষা করা যাবে না। খাজনার টাকা আগামী কালই জমা দেবে। শুধু শতখানেক টাকা আজ সঙ্গে নেবে উকিলকে দেওয়ার অজুহাতে।

কুমুদিনী এদিকে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছেন ছেলে যাতে বিপথে না যায়, আর ছেলে যাচ্ছে কোথায়! কার কাছে যাচ্ছে! আজ রবিবার,

আদালত বন্ধ—জানেও না রাজেশ্বরী। কৃষ্ণকিশোরের মায়া হয় রাজেশ্বরীর প্রতি। চালাক-চতুর মেয়ে হ'লে কি করত্তো কে জানে! রাজেশ্বরী সহজ-সরল,—কূটবুদ্ধি নেই তার মনে।

স্নান-ঘরে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল কৃষ্ণকিশোর।

নায়েবদের একজন বললে,—হুজুর, মাঠাকুরণ একখানি পত্র দিয়েছেন।

—কাকে লিখেছেন? শুধোয় কৃষ্ণকিশোর।

নায়েব বললে বিনয় সহকারে,—হুজুর, কাছারীতে দিয়েছেন। আপনাকে দেখানো প্রয়োজন বোধ করলাম। তাই দেখাতে এনেছি।

কৃষ্ণকিশোর বেশ বিরক্ত হয়।

বলে,—পত্রটির বক্তব্য কি?

নায়েব বললে,—হুজুর, প'ড়ে শোনাই যদি হুকুম করেন।

নবাবী কায়দায় পেছনে দু'হাত যুক্ত ক'রে পায়চারী করতে করতে বললে,—হ্যাঁ, পড়ুন। কিন্তু সময় আমার বেশী নেই। যেতে হবে উকিল-বাড়ী। টাইম দেওয়া আছে।

নায়েব গড়-গড় ক'রে পড়তে থাকে।

কাশীধাম

তাং...... ......

সবিনয় নিবেদন,

নায়েব মহাশয়,

আমার পত্রে এই নিবেদন যে, আমি কয়েক মাস যাবৎ আমার খোর-পোশ পাইতেছি না। আমি কি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে চালাইব? যথাশীঘ্র আমার প্রাপ্য অর্থাদি পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নাই। টাকা না পাঠাইলে আমাকে অভুক্ত অবস্থায়

দিনযাপন করিতে হইবে। অত্রস্থ কুশল। প্রার্থনা করি, আপনাদিগের হুজুর এবং বৌমাতা ঠাকুরাণী শারীরিক কুশলে আছেন। আমি ভালই আছি। আমার আশীষ গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীতা

কুমুদিনী দেব্যা

দোয়েল, বুলবুলি ও আর আর কি জাতের পাখী যেন ডাকছিল গাছের শাখে-শাখে। যেন ঐকতান বাদ্য করছিল। উদ্যানে বৃক্ষরাজি। ঘন বিন্যস্ত, কোমল শ্যাম, পল্লবদলে আচ্ছন্ন, পাতায় ঠেসাঠেসি ও মিশামিশি। শ্যামরূপের রাশি। কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প—উদ্যানের শোভা দেখে কৃষ্ণকিশোরের মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বলে, ধমকানির সুরে বলে,—মা'র টাকা যায়নি কেন? এ জন্য দায়ী ক'রবো কাকে? বলুন, বলুন স্পষ্টাস্পষ্টি। সত্যি কথা বললে আমি ক্ষমা করবো। তিনি টাকা না পেয়ে কত কথা ভাবছেন! ভাবছেন হয়তো, ছেলে টাকা পাঠাতে নিষেধ ক'রেছে! কাকে দোষী ক'রবো ব'লে তবে যেতে পাবেন।

অগত্যা নায়েব বললে,—হুজুর, দোষ আমাগোর কারও নয়। দোষ যদি বলতে হয়, তবে হেড-নায়েবের।

কৃষ্ণকিশোর কপালে করাঘাত করতে করতে বললে,—হেড-নায়েবের পাঁচ টাকা জরিমানা করলুম। আর আজই কাছারীতে অর্ডার দিন, যেন আজই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে মা'র প্রাপ্য টাকা পাঠানো হয়। নচেৎ হেড-নায়েবের আরও পাঁচ টাকা জরিমানা হবে। বরং আগাম দু'-এক মাসের প্রাপ্য টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দিতে বলুন।

—যে আজ্ঞে হুজুর। নায়েব ভয়ে ভয়ে গমনোদ্যত হয়।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—দাঁড়ান, কাছারী থেকে আমাকে একশো টাকা

দিতে বলুন। খরচা লেখাবেন হাত-খরচের খাতায়। যত গর্দ্দভের আড্ডা হয়েছে এখানে! ঝেঁটিয়ে না বিদেয় করলে চলবে না দেখছি?

—যে আজ্ঞে হুজুর। নায়েব ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গমনোদ্যত হয়।

কৃষ্ণকিশোর পুনরায় বলে,—দাঁড়ান, যাচ্ছেন কোথায়?

—যাইনি কোথাও হুজুর। বিনম্র কণ্ঠে বললে নায়েব।—হুকুম করুন হুজুর। আমি অপেক্ষা করছি।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবতে থাকে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কাছারী থেকে মা'র কাছে আজই যেন একটি চিঠি ছাড়া হয়। চিঠিতে যেন লেখা হয় যে, 'যাহাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের জন্য চিন্তিত হইবার কি প্রয়োজন? মহাশয়ার পুত্রের আদেশানুযায়ী পত্রটি দিতেছি। মহাশয়ার পুত্র মহাশয়াকে জানাইতে বলিয়াছেন যে, মহাশয়া জানিবেন, যাহাদের তিনি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহারা মৃত বলিয়া জানিয়া রাখিবেন। তাহাদের সমাচার লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার প্রাপ্য অর্থ বাবদ অগ্রিম কিছু পাঠাইতেছি।'

—যথাজ্ঞা হুজুর। নায়েব করজোড়ে বললে কথা দু'টি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চিঠি লেখা হ'লে আমাকে দেখিয়ে যেন ডাকে ছাড়া হয়। নতুবা নয়।

—যা বলেন হুজুর, তাই পালিত হবে। ভীত ও ত্রস্ত হয়ে বললে নায়েব।

কৃষ্ণকিশোর বললে হুকুমের সুরে,—আমাকে একশো টাকা অবিলম্বে দিয়ে যাওয়া হোক। আমি অপেক্ষায় থাকছি।

—যা বলেন হুজুর। টাকাটা দু'মিনিটের মধ্যে নে আসছি। নায়েব বললে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে। কথার শেষে দালান ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল কাছারীর দিকে। গেল দ্রুতপদে। উর্দ্ধশ্বাসে।

চোখ ফেটে জল আসে কৃষ্ণকিশোরের।

কুমু, কুমুদিনীর জন্ম মনে ব্যথা পায়। যেন মাতৃবিয়োগের কষ্ট পায়। কত দিন কুমুদিনীর দেখা মেলেনি। কত দিন থেকে কুমুদিনীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে কৃষ্ণকিশোর। কোন' দিনের জন্ম চোখ থেকে জল পড়ে না। কিন্তু আজ চোখ দু'টো কেন কে জানে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। চোখের সমুখে যেন দেখতে পায় কুমুদিনীকে। চোখ থেকে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে গণ্ডদেশে। পাছে কেউ দেখে ফেলে, সে জন্ম কৃষ্ণকিশোর মুছে ফেলে কোঁচার প্রান্তে চোখ দু'টো।

কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হ'তে না হ'তেই নায়েব পুনরায় আসে হন্তদন্ত হয়ে। বলে,—হুজুর, টাকাটা এনেছি।

কৃষ্ণকিশোর বিহ্বলের মত বললে,—টাকা! কি টাকা?

নায়েব বললে,—হুজুর একশো টাকা যে চাইলেন! বললেন যে, এখনই দিতে হবে।

—ও, হ্যাঁ। টাকা দিন। আর মাকে লেখা চিঠিটা? প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর।

নায়েব হতভম্বের মত বললে,—চিঠিটা এখনও লেখা শেষ হয়নি হুজুর। স্নানাহার শেষ ক'রে বেরুবেন শুনছি, চিঠিটা তখন দেওয়া যাবে, যদি হুকুম করেন।

—বেশ, তাই হবে। বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে কথায় গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে আকাশে চোখ রেখে।

—হুজুর, বৌমা ডাকছেন। বললে তাঁবেদারদের একজন।

—চল' যাই। প্রত্যুত্তর দেয় কৃষ্ণকিশোর।

দেখতে দেখতে বেলা চ'লে যায়। শীতের বেলা।

মধ্য-গগনে সূর্য্যের স্থিতি। তেজোদীপ্ত রৌদ্রে হাসছে যেন দিগ্বিদিক। স্নান এবং খাওয়া শেষ ক'রে বেশ পরিবর্ত্তন করতে যায় কৃষ্ণকিশোর। যা-তা লোক হ'লে না হয় কথা ছিল, কিন্তু জমিদার উকিল-বাড়ীতে কখনও ম্লান-বেশে যেতে পারে!

ফরাসডাঙ্গার ধাক্কা-দেওয়া তাঁতের ধুতি, সিল্কের গেঞ্জী, আর সাদা রেশমের বুটিদার বেনিয়ান পরিধান করে কৃষ্ণকিশোর। পায়ে কিংখাবের নপেটা। এ্যালবার্ট ফ্যাশনের টেরী। বিলাতী সিল্কের রুমালে বিলাতি সুগন্ধি ঢেলে দেয়। অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ। সমগ্র বাড়ীটা বুঝি বা সুগন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে। বেশ পরিবর্ত্তন শেষ হ'লে চোখে দেয় মিহি সুর্ম্মার রেখা।

—করেছো কি তুমি বৌ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো কৃষ্ণকিশোর।—যাচ্ছি তো উকিল-বাড়ী, তার জন্য এই তোড়জোড়!

—আদালতে যাচ্ছো না? তবে যে ব'লেছিলে খাজনার টাকা জমা দিতে যাবে আজ? মৃদু কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী।

—না, না, আমি ভুল বলেছি কাল। আজকে যে রবিবার, আদালত বন্ধ থাকে। তবে, উকিল-বাড়ী না গেলেই চলবে না। উকিলের কিছু কিছু মতামত দরকার।

ক্ষণেকের জন্য বিস্ময় মানে রাজেশ্বরী। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ক'রে থাকে। সেখানে কেউ ছিল না। পট্টবস্ত্র পরিহিতা রাজেশ্বরী ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। মিষ্টি কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী,—তা হোক। উকিল-বাড়ীতে যেতে হ'লেও সিদ্ধি আর ফুল সঙ্গে না রাখলে চলে না। কোঁচার খুঁটে বেঁধে নাও দেখি তুমি। আর যা-যা দিচ্ছি সেগুলো যে কি, তা তুমি জিজ্ঞেস করতে পাবে না।

শেষের কথাগুলো রাজেশ্বরী বললে মৃদু হাসির সঙ্গে। সর্পমৈথুনের সময়ে সর্পযুগলের অঙ্গে স্পর্শীকৃত উড়ুনীর টুকরো আর ৺কামাক্ষ্যা দেবীর রক্তিম বস্ত্রাংশ।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বেশ, বেশ, জিজ্ঞেস করবো না আমি। কিন্তু ফিরে এগুলো কি তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে?

—নিশ্চয়ই দিতে হবে। ও-সব কি আজ আর পাওয়া যায় লাখ টাকা দিলেও! এক কলসী জল রাখিয়েছি সদরের দালানে। দেখে যেও তুমি। ভুলে যেও না যেন। পরম বিজ্ঞের মত কথা বলে রাজেশ্বরী।

সদরের দালানে রক্ষিত আছে একটি গঙ্গোদক-পূর্ণ কলস।

রাজেশ্বরী বললে,—এই সকল বিষয় প্রতিপালিত হ'লে, ভক্তির সঙ্গে পালন করলে অবিশ্যি অবিশ্যি কৃতকার্য্য হবে। আর পুরোহিতের কাছ থেকে আশীর্ব্বাদী ফুল নে যেও। ঠাকুরবাড়ীতে পেন্নাম ক'রে যেও। কেমন?

—আচ্ছা। যা হুকুম ক'রছো সব কথা শুনবো। কিন্তু তুমি এসো আমার কাছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—ছিঃ, তুমি ভারী অসভ্য! এখন কখনও কাছে যাওয়া যায়? আমি যে পাটের শাড়ী প'রে আছি। শাড়ীটা নষ্ট হবে না? প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললে।

—না, না, আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি এসো আমার কাছে। বিনয় সহকারে কথা বলে কৃষ্ণকিশোর। কথায় মিনতি ফুটে ওঠে। বলে,—তোমার চেয়ে সুলক্ষণ আর কিছু আছে!

ভাগ্য ভাল যে, সেখানে কেউ ছিল না।

রাজেশ্বরী ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে যায়। বলে,—বল' কি বলবে? তোমার দেরী হয়ে যাবে না তো?

—না না, দেরী হবে কেন? টাকা দেবো একুনে যা, উকিলের বাপ-ঠাকুর্দ্দা কখনও চোখে তা দেখেনি। উকিল আমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে। বুঝলে কি না? বললে কৃষ্ণকিশোর।

—বুঝলাম তো। বললে রাজেশ্বরী।—তবে তাড়াতাড়ি গেলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে, আমি তাই মনে ক'রে বলছি।

—কখন ফিরবো বলতে পারছি না। তবে চেষ্টা করবো যাতে শীঘ্রি ফিরতে পারি। তুমি কাছে এসো তো এখন। বললে কৃষ্ণকিশোর।—তুমিই তো দেরী করিয়ে দিচ্ছ। নয় তো কখন বেরিয়ে পড়তুম! কথার শেষে রাজেশ্বরীর মুখে মুখ রাখে।

ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসে রাজেশ্বরী।

বাহু-বন্ধনে বেঁধে ফেলে কৃষ্ণকিশোর। বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধ'রে থাকে। অতঃপর চিবুক ধ'রে রাজেশ্বরীর মুখটি তুলে ধ'রে থাকে। মুখটি দেখে কিছুক্ষণ। অতঃপর ওষ্ঠসুধা পান করে অনেকক্ষণ ধ'রে। দেহ এলিয়ে দেয় রাজেশ্বরী।

—কে কোথায় দেখবে! বলতে বলতে হঠাৎ সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় বৌ।

—আমি তবে আসি বৌ?

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ, এসো। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা!

শিষ দিতে দিতে প্রসন্নচিত্তে কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে প'ড়লো। ভাবলো, কত মিথ্যাই না বলতে হয়! মিথ্যা কথার প্রায়শ্চিত্ত কি! ভাবতে ভাবতে জুড়ীতে গিয়ে উঠলো। যাত্রাকালে টাকাটা আছে কি না দেখে নিয়েছে। কোচম্যান আবদুলকে বললে,—আবদুল, আজকে তোকে বেশ কিছু টাকা বকশিস্ দেবো। তাড়াতাড়ি হাঁকা দেখি!

আবদুল সেলাম ঠুকে বলে,—হুজুর, কোথায় যাওয়া হবে?

মিহি কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর,—গরাণহাটায়।

—যো হুকুম হুজুর! বললে আবদুল।

নায়েব প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়ীর দরজার কাছে আসে। বলে,—হুজুর, কাছারী থেকে দেওয়া মাতৃদেবীর চিঠিটা দেখলেন না?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না, না, না। সময় নেই, আমি যাচ্ছি উকিল-বাড়ী। কালকে দেখবো। কাল চিঠি ছাড়বেন। আবদুল, গাড়ী হাঁকাও।

—যা বলেন হুজুর। বললে নায়েব।

দুর্গা পূজার মরশুমের ভীড়ে পথ লোকে লোকারণ্য হ'লেও আবদুলের ঘণ্টা শুনে পথিকজন পথ ছেড়ে দেয়। সামনের গাড়ীগুলিও পথ ছাড়ে।

গহরজানের যেন কেমন ক্লান্ত শরীর। রুক্ষ কেশ। কৃষ্ণকিশোর বললে, —এই নাও টাকা। আশীটা টাকা নিও। বাদ-বাকী ফেরৎ দিও। আর ডালিমের বিয়ের টাকা কাল পাবে।

একটা একশো টাকার নোট কৃষ্ণকিশোর দেয় গহরজানের হাতে।

গহরজান গম্ভীরকণ্ঠে বলে,—ফরাস মে বৈঠ্ যাও! হাম্ আব্বি আসছি।

সত্যিই গহরজান ফিরে এলো তৎক্ষণাৎ। বললে,—মাসী টাকা লে আসবে।

মাসীর আসতেও বিলম্ব হয় না বেশী। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আসে; বাকী কুড়িটা টাকা দিয়ে বললে,—নাও, এখন ফূর্ত্তি কর'।

মাসী ঘর থেকে চ'লে যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'তে না হ'তেই গহরজান হঠাৎ কাঁদতে থাকে। কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কি, হয়েছে কি ?

কোন উত্তর পাওয়া যায় না। গহরজান কাঁদে, কাঁদে আর কাঁদে।

তখন দিনের শেষ।

কে ডাকলো নাম ধ'রে, না দরজায় করাঘাত ক'রলো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রাজেশ্বরী। ঠাওরাতে পারলো না। ঘরের বৌ, দিন নেই রাত্রি নেই, প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবে—শুধু এই লজ্জাটাই সহসা রাজেশ্বরীকে সজাগ ক'রে তোলে হয়তো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে। তাকায় ইদিক-সিদিক। আয়ত চোখ দু'টিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দ্দিক। দরজা কিংবা জানলাগুলোর ফাঁক-ফোকর থেকে কৈ দেখা যায় না তো দিনের আলো? ঘরের ভেতরে না হয় অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু ঘরের বাইরের পৃথিবীতেও কি তমসা নেমেছে! তবে কি দিন শেষ হয়ে গিয়ে রাত্রি নামলো? না রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো-আঁধারি দেখা দিয়েছে! ঠিক ঠাওর করতে পারে না যেন রাজেশ্বরী। ঘুমে অচেতন ছিল কতক্ষণ। চেতনা ফিরে পেয়েছে, কিন্তু ঘুমের জড়তা যে এখনো বিলুপ্ত হয়নি। ঠিক যন্ত্রচালিতের মতই পালঙ্ক ছেড়ে মেঝেয় নেমে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। ঠিকঠাক ক'রে নেয় বেশভূষা? কি লজ্জার কথা? বলবে কি শ্বশুরবাড়ীর লোকজন? বৌ-মানুষ হয়ে এই অবেলা পর্য্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আছে কখনও? ঘরের ভেজিয়ে-দেওয়া দরজাটা এক টানে খুলে ফেললে রাজেশ্বরী। দেখলো, ঘরের সামনের দালানে চুপচাপ উবু হয়ে ব'সে আছে এলোকেশী। দুই হাঁটুর মধ্যিখানে এলোকেশীর মুখ। দালানে আলো জ্বালানোর পালা পর্য্যন্ত চুকে গেছে? রাত তবে কত এখন! লজ্জায় কিংকর্ত্তব্য বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত্ত পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। দরজার একটা পাল্লা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। লজ্জায় না কেন কে জানে, চোখ ফেটে জল আসে

রাজেশ্বরীর। বলবে কি বৌকে শ্বশুরবাড়ীর জনমানুষ! বলবে না, লক্ষ্মীছাড়ী? দিন নেই রাত্তির নেই নাক ডাকিয়ে যখন-তখন।

বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হ'লে ধীরে ধীরে মনে পড়ে রাজেশ্বরীর।

সেই দুপুর থাকতে স্বামী তার গেছে আদালতে, বকেয়া খাজনার টাকা জমা দিতে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে রাজেশ্বরীর, না আদালতে তো নয়! আজকে যে আদালত বন্ধ। আজ যে রবিবার, ছুটির দিন; তবে কোথায় গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে রাজেশ্বরীর—এতক্ষণে ভেবে পেয়েছে। কৃষ্ণকিশোর গেছে আদালতে নয়, উকিল-বাড়ী। উকিলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে। উকিলের মতামত জানতে চাইতে। কিন্তু রাত্রি হয়ে গেছে কত, এখনও মতামত নেওয়া শেষ হ'ল না? চিন্তিত মনের সকল ভাবনার জেরটা গিয়ে পড়ে এলোকেশীর 'পরে। রাজেশ্বরী কথা বলে বেশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে। বলে,—তুই কি ধরণের মানুষ বল্ তো এলো?

এলোকেশীর বয়স হয়েছে কত! হয়তো চার কুড়ির বেশী। একবার ব'সলে তাই আর চট ক'রে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তবুও অনেক কষ্টে উঠলো এলোকেশী। বললে,—কেন লা, আমি আবার কি করতে গেনু!

—আমাকে তো ঘুম থেকে ডেকে দিতে হয়! লোকজন কি ব'লবে বল্ তো? ধীরে ধীরে বললে রাজেশ্বরী। কথা থেকে ক্রোধের স্বর মুছে নিয়ে বললে।—রাগ ক'রে আর কি হবে! দে তুই, গানের ঘরে কাপড়-জামা দে। কথার শেষে স্বর নত ক'রে নেয় রাজেশ্বরী। বলে,—আমার লজ্জায় তোর লজ্জা হবে না এলো? আমার অপমান হ'লে তোরও যে অপমান।

এলোকেশী ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসে। বলে,—খুব যে দেখি শিক্ষে দিচ্ছিস্! এ্যাতক্ষণ কেন ডাকি নাই বল্ তো দেখি? আমার কি আর মনে হয় নাই কথাটা! তোকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার কথাটা! কিন্তু কেন ডাকি নাই বল্ তো?

রাজেশ্বরী বললে,—তাও ব'লে দিতে হবে আমাকে? ইচ্ছা ক'রেই ডেকে দেওয়া হয়নি। যাতে আমার অপমান হয় সেই জন্যে।

—না লো না। চাকরী করতে গেলে কি আর অত ইচ্ছের প্রাধান্য চলে! তবে শুনে তুই যৎপরোনাস্তি খুশী হবি। এলোকেশী শেষের কথা ক'টা বলে মৃদু হাসির সঙ্গে।

রাজেশ্বরী ব্যগ্র কণ্ঠে বললে,—তবে?

এলোকেশী বললে,—তোর ঠাগ্‌মা এয়েছে যে! দেখতে এয়েছে তোকে।

রাজেশ্বরীর মুখে খুশীর হাসি ফুটে ওঠে সহসা। বলে,—ঠাগ্‌মা এয়েছে? কখন? কোথায় বসিয়ে রাখলি ঠাগ্‌মাকে? ডাকলি না কেন আমাকে?

এলোকেশী বললে,—ঠিক আছে তোর ঠাগ্‌মা। জলে তো আর পড়ে নাই। নীচে ব'সে আছে। তুই ঘুমোচ্ছিস্ শুনে তোকে ডাকতে মানা করলে। রান্না-বাড়ীতে ব'সে ব'সে গপ্প করছে।

—কার সঙ্গে? শুধোয় রাজেশ্বরী। সহাস্যে শুধোয়।

এলোকেশী বললে,—বামুনদিদি আছে, বাড়ীর আর আর ঝিয়েরা আছে। আর আছে তোদের শশীবৌ। সে এসেছে এই কিছুক্ষণ। তোকে দেখতে এসে ঠাগ্‌মার সঙ্গে কথা কইতে ব'সে গেছে। কথা কইছে সুখ-দুঃখের।

রাজেশ্বরী যেন আর থাকতে পারে না। ঠাগ্‌মাকে দেখবার জন্য মনটা তার আনচান করতে থাকে। কত দিন দেখা পাওয়া যায়নি ঠাগ্‌মার। রাজেশ্বরী বললে,—তুই চানের ঘরে শাড়ী-জামা দে। একটা আলো দে। আমি এক্ষুনি আসছি।

এলোকেশী বললে,—যা না, চানের ঘরে গিয়ে দেখে আয় না। রেখে এয়েছি শাড়ী, জামা, আলো।

স্নানের ঘরের দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রাজেশ্বরী। বললে,—হ্যাঁ রে এলো, শোন্, একটা কথা বলি।

রাজেশ্বরীর পিছু-পিছু এগোচ্ছিল এলোকেশী। বললে,—বল্, কি বল্‌ছিস ?

রাজেশ্বরী চুপি-চুপি কথাগুলি বলে। এলোকেশীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে,—হ্যাঁ রে এলো, উকিল-বাড়ী থেকে ফিরেছে ? সদরে আছে বুঝি ?

ঠোঁট ওলটায় এলোকেশী।

বলে,—কোথায় কে! ঠাগ্‌মা পৌঁছেই তো নাত-জামায়ের খোঁজ ক'রেছে। একবার আধবার নয়, অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ দফায়।

যতটা খুশী হয়েছিল রাজেশ্বরী এতক্ষণে, কথা ক'টা শোনা মাত্রই খুশীর মাত্রা ততটা যেন আর থাকলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'ললো স্নান-ঘরের দিকে। অবশ পদক্ষেপে। ভাবতে ভাবতে গেল, গেছে কি এখন ? কতক্ষণ! সেই দুপুর বেলায়। ঠাগ্‌মা যে ব'সে ব'সে শশীবৌয়ের সঙ্গে গল্প করছে, সেই কথাটি শুনে যেন মুহূর্ত্তের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচে রাজেশ্বরী। যাক্, একা তো আর ব'সে নেই ঠাগ্‌মা। শশীদিদির অজানা নেই, কার সঙ্গে কি ভাষায় কথা কইতে হয়। কার কাছে দেখাতে হয় কতটা সামাজিকতা। এখন স্বামী ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচে রাজেশ্বরী। ফিরে যদি লোক-হাসানো কিছু একটা করে, তখন ? ভাবতেও শিউরে ওঠে রাজেশ্বরী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অবশ হ'তে থাকে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

এলোকেশী বললে,—দেরী করিস্ না বেশী। ঠাগ্‌মা তোর জন্যে কত খাবার-দাবার এনেছে, দেখবি আয়।

সত্যিই প্রচুর মণ্ডা-মেঠাই তৈরী ক'রে এনেছেন রাজেশ্বরীর ঠাগ্‌মা। আরও কত কি এনেছেন, যা-যা ভালবাসে রাজেশ্বরী। নিজহাতে প্রস্তুত ক'রে এনেছেন। কয়েকটা পেতলের থালা ভর্ত্তি ক'রে এনেছেন। এক জনের বদলে হয়তো খেতে পারে একশো জন মানুষ।

স্নান-ঘরে ঢুকে ভাঙা মনে দরজার পাল্লা দু'টো ভেতর থেকে ভেজিয়ে দেয় রাজেশ্বরী। অর্গল তুলে দেয় দরজার।

—বেশী দেরী হয় না যেন রাজো! বাইরে থেকে কথা বলে এলোকেশী। বলে,—এই রেতের বেলায় ঠাগ্‌মাকে আবার ফিরতে হবে মনে থাকে যেন! ব্যাচারী বুড়ী মানুষ!

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী। শান্ত কণ্ঠে বললে শুধু মাত্র ঐ একটি কথা।

বাইরে থেকে সাবধান ক'রে দেয় এলোকেশী। বলে,—বেশী জল-ঘাঁটাঘাঁটি করিস্ না বাছা! নতুন হিম পড়ছে!

এ কথার উত্তর রাজেশ্বরী দেয় মাত্র একটি কথার জবাবে। বলে,—না।

বেশী কথা বলতে ইচ্ছা হয় না যেন রাজেশ্বরীর। স্বামী এখনও এলো না ফিরে—ঐ একটি কল্পনার অতীত বিষয় কানে পৌঁছতেই ঠাগ্‌মাকে দেখার যত আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে মন থেকে উবে যায় যেন। স্নান-ঘরে ঢুকে, দ্বারে অর্গল তুলে দিয়েও চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ভাবে আকাশ-পাতাল। এতক্ষণ ধ'রে কি এমন শলা-পরামর্শ করছে উকিল! ভেবে কিছু কূল-কিনারা খুঁজে পায় না রাজেশ্বরী। দন্তচূর্ণ দাঁতে ঘষতে থাকে। রুপোর জিব-ছোলাটা খুঁজতে থাকে। ঐ তো আলনায় ঝুলছে। লণ্ঠনের আলোয় ঝিলিক মারছে ক্ষণে-ক্ষণে। রুপালী রঙের ঝিলিক। দেখে দেখে আজকের দিনে এলোকেশীও আলনা সাজিয়ে দিয়েছে জ্যাকেট আর শাড়ীতে। রেশমের অন্তর্বাসে। শান্তিপুরী তাঁতের ঘন-লাল ডুরে শাড়ী। মিহি কালো রঙের পাড়। আসমানী রঙের বিলাতী রেশমের জ্যাকেট।

যতই যা হোক, অনেক দিন বাদে ঠাগ্‌মার পদার্পণ হয়েছে রাজেশ্বরীর শ্বশুরালয়ে।

রাজেশ্বরী হাত চালিয়ে নেয়। কতক্ষণ বৃদ্ধা ব'সে আছেন রাজেশ্বরীকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে। রাজেশ্বরীর সঙ্গে দু'টো কথা কইতে।

চোখের দেখা আর মুখের কথাতেই খুশী হয়ে চ'লে যাবেন ঠাগ্‌মা। নাতনীর বিরহ-বেদনায় যে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন ঐ বৃদ্ধা পিতামহী। বহুদিন অপেক্ষা ক'রেছেন সময়ে অসময়ে কেঁদে-কেঁদে। কিন্তু আর বোধ হয় প্রতীক্ষার কাতরতা সহ্য হয়নি তাঁর। রাজেশ্বরীকে দেখতে আসবেন, সেই জন্য ভোর হ'তে না হ'তেই উনুনের ধারে গিয়ে ব'সেছেন। তাঁর অতি আদরের নাতনীটি যা-যা খেতে ভালবাসে নিজহাতে প্রস্তুত ক'রে এনেছেন। ঘি আর মশলার সুগন্ধে রান্না-বাড়ী পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

রাজেশ্বরীর দেখা মিলছে না দেখে শেষ পর্য্যন্ত ব'লে ফেললেন ঠাগ্‌মা—হ্যাঁ দিদি, রাজো আসতে কেন এত দেরী করছে ভাই? ডাকাও না তাকে ভাই। দু'টো কথা ব'লে চলে যাই। উদিগে রাত হয়ে এলো যে ভাই।

বৃদ্ধা কথা বলেন কম্পিত কণ্ঠে। হয়তো তাঁর জপ আর আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হ'তে চ'লেছে। পূর্ণশশী সমুখেই ব'সেছিলেন। বললেন,—ঘুমোচ্ছিল, আপনি ডাকতে মানা করলেন যে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই উঠেছে। বামুনদিদি একবার দেখুন না ভাই।

বৃদ্ধা দন্তহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসলেন ফিক-ফিক।

বললেন,—বুঝলে না ভাই, নতুন বে হয়েছে। হয়তো রাত-টাত জেগেছে। সেই জন্যে বলছিলাম, আহা, ঘুম ভাঙ্গিও না। কিন্তু ভর্-সন্ধ্যেয় বেশী ঘুমোলে যে শরীর খারাপ করবে। অসময়ে কি ঘুমোতে আছে ভাই। আহা, নাতনী যে আমার ভীষণ ঘুম-কাতুরে! একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম থেকে ওঠায় কার সাধ্যি?

ব্রাহ্মণী কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা থেকে ঘুরে এসে বললে,—বৌ উঠেছে। আসছে এখুনি। ঘুম থেকে উঠেছে, পোষাক বদলেই আসছে। ঠাগ্‌মা এসেছে শুনেছে। এই এলো ব'লে।

সত্যিই দেখতে দেখতে রক্তাম্বরা এক কিশোরীর হঠাৎ আবির্ভাব হয়।

দুই পায়ে হয়তো ছিল রূপোর তোড়া। ঝমা-ঝম্ শব্দ তুলতে তুলতে রাজেশ্বরী আসে। ঠাগ্‌মাকে দেখে একগাল হেসে তাঁর পাদস্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রণাম করে। সমুখে ছিলেন শশীবৌ, তাঁকেও প্রণাম করে।

ঠাগ্‌মা রাজেশ্বরীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—আয় ভাই, আয়। কতদিন তোকে দেখতে পাই না বল্ তো! তাই আর থাকতে না পেরে চ'লে এলাম। দেখতে না পেয়ে পেয়ে দম যেন আমার বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল।

দাসীরা কে কোথায় ছিল কে জানে!

একজন এসে একটা আসন পেতে দিয়ে যায়। রাজেশ্বরীকে বসতে দিয়ে যায়। পশমের নক্সা-তোলা আসন।

পূর্ণশশী বললেন,—ত্থাখ্ ভাই বৌ, কেমন দিনে আমিও এসে প'ড়েছি! ঠাগ্‌মার দর্শন তো পেলাম। প্রণাম করলাম ঠাগ্‌মাকে।

বৃদ্ধা বললেন,—তুই ঘুমোচ্ছিস্ শুনে তোর দিদির সঙ্গেই ঠায় ব'সে-ব'সে গল্প করছি। হ্যাঁ রে রাজো, আমার নাতজামাই কোথায়? তাকে তো দেখছি না!

অধোমুখী হয়ে যায় রাজেশ্বরী। হয়তো লজ্জায়।

নত কণ্ঠে বললে,—উকিল-বাড়ী গেছে জমিদারীর কাজে। কিন্তু ফেরবার সময় তো হয়ে গেছে।

ঠাগ্‌মা বললেন স্নেহমাখা কণ্ঠে,—কতক্ষণ ঘুমোলি দিদিভাই? নাত-জামাইও বেরিয়েছে, তুইও গিয়ে শুয়েছিস্ তো?

লজ্জায় অধোবদন হয় রাজেশ্বরী। ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যায় ওষ্ঠাধরে। বলে,—না, তারপর আমি খাওয়া-দাওয়া করেছি। খেয়ে-দেয়ে শুয়েছি।

—তা বেশ। তা বেশ। বললেন ঠাগ্‌মা। পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন।—আচ্ছা দিদিভাই, এখন নিশ্চয়ই ক্ষিধে হয়েছে বেশ। তা আমি

তোমার জন্যে দু'-চার রকম খাবার তৈরী ক'রে এনেছি। অধিকাংশ তুই যা যা ভালবাসিস। তুই বোনে এখন আমার সামনে কিছু-কিছু মুখে দাও, দেখি আমি। দেখে খুশী মনে ঘরে ফিরে যাই। আমার জপ্-তপ্ সব বাকী এখন। গেলে তবে হবে।

পূর্ণশশী মৃদু মৃদু হাসেন। বৃদ্ধার প্রস্তাব শুনেই হয়তো হাসেন। ঠাগ্‌মা বললেন,—ডাক্ না দিদিভাই তোদের ব্রাহ্মণীকে। দু'খানা রেকাবী দে' যেতে বল্ না।

ব্রাহ্মণী কোথায় ছিল কাছাকাছি। কোন্ থামের আড়ালে। নয় তো কোন্ দরজার পাশে। বৃদ্ধার কথা হয়তো শুনতে পেয়েছিল। ক্ষণেকের মধ্যে দু'খানি রেকাবী এনে ব্রাহ্মণী বসিয়ে দেয়। বলে,—ঠিক বলেছেন ঠাকুমা। বৌকে আমাদের খেতে দিন। আজ বিকেলের জলখাবার যেমন সাজানো তেমনি প'ড়ে আছে।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ঠাগ্‌মা পেয়ে ব'সলেন যেন।

হাসতে হাসতেই বললেন বৃদ্ধা,—ছাখ্, তোদের ঘরের কথা কিনা ব'লে দিচ্ছে আমাকে! যাক্, ব'লে ভাই ভালই করলে ব্রাহ্মণী। নয় তো নাতনী আমার ব'লতো হয়তো, আজেবাজে কি যে ছাই এনেছো তুমি! কত ভালমন্দ খেয়ে পেট আমার আই-ঢাই করছে। কি বল্ রাজো?

রাজেশ্বরী কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না।

মুখটি তুলে শুধু হাসে মৃদু-মৃদু। কৌতুকপূর্ণ হাসি। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর উদ্দেশে বললেন,—তুমি ভাই, দাও তো তুলে সব একটি একটি ক'রে। দু'টো রেকাবীতেই সাজিয়ে দাও।

হেসে ফেললেন পূর্ণশশী। বললেন,—এখন এত সব খেলে রাতে আর খাওয়া যাবে না যে!

ঠাগ্‌মা তৎক্ষণাৎ বললেন,—নেই বা খেলে ভাই। একটা রাত এই বুড়ীটার তৈরী খাবারই খাও না। ঘরে যা আছে সোয়ামীকে খাইয়ে দিও।

এইবার নতমুখী হ'লেন পূর্ণশশী।

মুখ থেকে তাঁর আর কথা বেরুলো না। ঠোঁটের কোণে হাসি মাখিয়ে ব'সে রইলেন চুপচাপ। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় রাজেশ্বরী আর পূর্ণশশীর রূপের ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে ঠিকরে পড়তে থাকে বুঝি। যেমন রঙ তেমনি দৈহিক গঠন দু'জনেরই। এ বলে আমাকে দেখো, ও বলে আমাকে। একজন লাল আর অন্যজন ঘন-নীল রঙের জরিপাড় নীলাম্বরী প'রেছে। যেজন্য পূর্ণশশীর রূপপ্রভা কিঞ্চিদধিক প্রকাশ পাচ্ছে যেন। শাড়ীর রঙ নীল হ'লে কি হবে লণ্ঠনের আলোয় রঙটা কালো ব'লেই ভ্রম হয় যে!

পূর্ণশশী পেতলের থালা ক'টায় কি কি আছে, তাই লক্ষ্য করছিলেন। আছে মিষ্টান্ন কয়েক রকমের আর নোনতা খাবার। রাজেশ্বরী যা-যা খেতে ভালবাসে। পূর্ণশশী বললেন,—ঠাগ্‌মা, কত কষ্ট ক'রেছেন আপনি? এত খাবার ব'সে ব'সে তৈরী করলেন কখন? দোকানের খাবারের সঙ্গে দেখতে কোন' তফাৎ নেই!

পাক-প্রশংসা শুনলে হয়তো নারীজাতি সহজেই খুশী হয়।

রাজেশ্বরীর পিতামহী বৃদ্ধা হ'লে কি হবে, পূর্ণশশীর কথা শুনে গ'লে পড়লেন যেন। বললেন,—মিষ্টিগুলো দিদি কাল ক'রে রেখেছি, আর আজকে নোনতাগুলো তৈরী করেছি, সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত করতে লেগেছে। নাও ভাই, খাও এখন তোমরা দু'জনে। দেখে চোখ দু'টো জুড়িয়ে যাক আমার।

পূর্ণশশী বললেন,—দ্যাখ্ তো বৌ, কোথা থেকে উড়ে এসে তোর ভাগের খাবার খেতে জুড়ে বসলাম!

রাজেশ্বরী বললে,—আমি একা কখনও এত খাবার একলা খেতে পারি? খান না দিদি, খান। ছিঃ, ও সব কথা বলতে আছে কখনও! আপনি কি আমাদের কাছে ভিন্ন কেউ? বল' তো ঠাগ্‌মা?

বৃদ্ধা বললেন,—তাই না তাই। আমার কাছে তোমাতে আর

রাজেশ্বরীতে কি কিছু পার্থক্য আছে? আর তা ছাড়া, আমার তো উচিত তোমাকে একদিন রাজোর বাপের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে পোলাও-কালিয়া খাওয়ানো। তুমিই তো প্রথম রাজোর বিয়ের কথা আমার কাছে পেড়েছিলে। মনে আছে দিদিভাই? দক্ষিণেশ্বরে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। সে তো এই সেদিনের কথা। বললেন পূর্ণশশী। ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ টেনে বললেন,—তবে কি ঠাকুমা ঘটকালী না দিয়ে শুধু পোলাও-কালিয়া খাইয়েই নাতনীর বিয়েটা চুকিয়ে নিতে চান? কথাটা যখন উঠলো, তখন আমিই বা না বলি কেন!

—তবে কি বল' দিদি, নগদ টাকা দিয়ে রাজোর শ্বশুরঘরে তোমার অপমান করা হোক, সেইটেই চাও তুমি? কি বল্ রাজো?

রেকাবীতে আহার্য্য সাজাতে সাজাতে ক্ষণিকের জন্য বিরত হ'লেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। কথা বলতে থামলেন।

আয়ত আঁখি মেলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। কার পক্ষে হয়ে কথা বলবে! কার কথায় সায় দেবে আর কার কথা ফেলবে! তবুও কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—আমাকে আবার টানছো কেন? আমি বাবা জানি না।

—এই তো কেমন বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা! বলুন তো ঠাকুমা? সহাস্যে বললেন পূর্ণশশী। মুক্তার মত দাঁতের সারি দেখিয়ে বললেন,—ও যে এখন আমাদের মেয়ে হয়ে গেছে। ও কি এখন আর আপনাদের বাড়ীর মেয়ে আছে? ওর ভোল পালটে গেছে।

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তখন অসহায় বৃদ্ধা।

রাজেশ্বরী আর পূর্ণশশী দু'জনের কথা শুনেই যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। বললেন,—আচ্ছা ভাই, আচ্ছা। হার মানছি দু'জনের কাছেই। কয়েক দণ্ড থেমে পুনরায় বললেন,—তার চেয়ে এক কাজ কর' না দিদি, যার বে দিয়েছো তার কাছ থেকেই আদায় কর' না যা

মন চায়। এখন রেকাবী দু'টি দু'জনে শেষ কর' দেখি, দেখে আমার মনটা জুড়োক্।

পূর্ণশশী বললেন,—রেকাবী শেষ ক'রতে হবে, তা হ'লেই হয়েছে!

—না ভাই, ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। না খেলে আমি মনে খুব কষ্ট পাবো কিন্তু। বললেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। বললেন,—গল্প করতে করতে খাও না, কি আর এমন দেওয়া হয়েছে!

পূর্ণশশী মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন,—এদিকে রাত কত হয়েছে জানেন? বোধ হয় আটটা বাজতে চ'ললো। অসময় যে ঠাকুমা! এখন কি খাওয়া যায় এই রেকাবী-ভর্ত্তি খাবার?

বুকের ভেতরটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর।

আটটা প্রায় বাজলো যে, এখনও ফিরলো না উকিল-বাড়ী থেকে! আশ্চর্য্য! ঘর থেকে জানলার বাইরে আকাশ দেখতে প্রয়াস পায় রাজেশ্বরী। কিন্তু কিচ্ছু দেখা যায় না। শুধু কালো আকাশ, ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। একটা নক্ষত্র পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। দিনের আকাশ তো নয় যে, দেখেই বোঝা যাবে সময়ের গতি? ক'টা বাজলো? রাত্রির আকাশ দেখে কি বুঝবে রাজেশ্বরী। যত ভাবে ততই যেন ঐ কালো আকাশের মতই রাজেশ্বরীর চিন্তিত মন নানা ভাবনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খেতে থাকে। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে, পলকহীন দৃষ্টিতে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে রাজেশ্বরী।

—খাও ভাই। বললেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। বললেন,—না খেলে আমি উঠছি না কিন্তু।

—কে আপনাকে ব'লেছে উঠতে? বললেন পূর্ণশশী।—বসুন না। কখনও তো নাতনীর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন না।

বৃদ্ধা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—এও রাজেশ্বরীর, সেও রাজেশ্বরীর। আমি তো সেখানে শুধু বাড়ী আগ্‌লাবার জন্যে আছি দিদি।

রাজোর বাপ তো রাজোকেই দিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে রাজো আমাকে যখন খুশী তাড়িয়ে দিতে পারে।

পূর্ণশশী বললেন,—কি যে বলেন ঠাকুমা!

রাজেশ্বরী বললে,—কিসে এয়েছে? কার সঙ্গে?

—না খেলে আমি আর একটি কথাও বলছি না। এই আমি মুখে তালা দিচ্ছি। তোমরা খাও, খেতে-খেতে কথা বল'। বললেন বৃদ্ধা। নকল তিরস্কারের স্বরে।

শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হ'য়ে দু'জনকেই খাবারে হাত দিতে হয়। পূর্ণশশী ব্রাহ্মণীর উদ্দেশে বললেন,—বামুনদি, খাবারের থালা ক'টা তুলে ভাঁড়ারে রাখো।

কিচ্ছু ভাল লাগছে না রাজেশ্বরীর।

ভাল লাগছে না এই পরিস্থিতি। রাত্রি কত হয়ে গেল; কখন বেরিয়েছে; এখনও ফিরলো না উকিল-বাড়ী থেকে! ভাল লাগছে না বুড়ী পিতামহী আর পূর্ণশশীকে। ভাল লাগছে না মানুষের চোখের সমুখে থাকতে। ইচ্ছা না থাকলেও একেকটা আহার্য্য মুখে তোলে রাজেশ্বরী। কারও কথা শুনতে ভাল লাগে না পর্য্যন্ত। এখন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে দোতলায় গিয়ে খাস-কামরায় বসতে পারলে হয়তো কিছুটা মনস্থির হয়। কিন্তু উপায় নেই যে কোন'। বলবে কি বাড়ীর লোকজন! ঠাগ্‌মাই বা কি মনে করবে!

বৃদ্ধার কথায় কেন কে জানে আজ যেন মধ্যে মধ্যে দুঃখের আভাষ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—কার সঙ্গে আর আসবো ভাই! এয়েছি তোমাদের ঘরের গাড়ীতে। সঙ্গে কেউ নেই। তোমাদের পুরানো কোচুয়ান আছে, আবার কি?

রাজেশ্বরীর মৃত পিতৃদেবেরও আছে একটা ঘোড়ার গাড়ী।

কৃষ্ণকিশোরদের গাড়ীর মত তত দামী না হ'লেও বিলিতী কোম্পানীর

তৈয়ারী। জুড়ীর ঘোড়া দুটোর বয়স হ'লেও একেবারে বেতো ঘোড়া নয়। অক্স-ব্লাড অর্থাৎ ষাঁড়ের-রক্ত-রঙের একটি ফীটন। পুরানো হ'লেও নতুনের মতই মজবুত গাড়ীটা।

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে রাজেশ্বরী। হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়।

ব্রাহ্মণী খাবারের থালা তুলতে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। রাজেশ্বরী বললে,—শুনুন বামুনদিদি।

ব্রাহ্মণী কান বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

কানে কানেই চুপি-চুপি কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—কাউকে ব'লে দিন না, কাছারীতে ব'লে আসবে যে গাড়ীর কোচুয়ান আর সইসদের বক্‌শিস্ দেওয়া হয় যেন। আর আপনি একটা মাটির মালসায় ওদের কিছু জল-খাবার পাঠিয়ে দিন। নইলে ভাল দেখাবে না।

—ঠিক ব'লেছো বৌ। বললে ব্রাহ্মণী।—থালা ক'টা ভাঁড়ারে তুলে দিয়েই আমি ব্যবস্থা করছি। হাঁ বৌ, থালাগুলো আজ আর আজাড় করতে হবে না তো?

রাজেশ্বরী বললে,—না, না। আজকে থাক্। পরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। আপনি ভাই কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।

—এই যে এখনই ব্যবস্থা করছি।

কথার শেষে আহার্য্যে পরিপূর্ণ একটা থালা তুলে নিয়ে চলে যায় ব্রাহ্মণী। যায় দ্রুতপদে। হাতে ভার থাকলে যেমন দ্রুত যায় মানুষ। ব্রাহ্মণী যেন অনুমানে বুঝতে পারে, রাজেশ্বরী কেন এত তাড়া করছে। ব্রাহ্মণী ভাবে, বৌ নিশ্চয়ই মনে করছে, স্বামী কোন্ রূপে আসে কে জানে। তার আগে ঠাগ্‌মা মানে-মানে চ'লে গেলে ভাল হয়। মাতাল অবস্থায় স্বামী ফিরে কোন' একটা কেলেঙ্কারী করলে ঠাগ্‌মাকে আর মুখ দেখাতে পারবে রাজেশ্বরী!

পিতামহী সেই শৈশব থেকে লালন পালন ক'রেছেন।

বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছেন বলা চলে। অনেকক্ষণ দেখে দেখে বললেন,—হ্যাঁ লা রাজো, তোর মুখে হাসি নেই কেন? তোকে কেন কি জানি মনমরা মনে হচ্ছে আমার। খাচ্ছিস তো খাচ্ছিস, নে না সাপটে খেয়ে।

কৃত্রিম হাসি হেসে পিতামহীর কথাগুলিকে লঘু ক'রে দিতে চায় রাজেশ্বরী। পূর্ণশশী বলেন,—ঘুম থেকে উঠেছে অবেলায়। হয়তো সেই জন্যে।

উপরোধে মানুষ ঢেঁকিও গেলে।

সুখাদ্য আহার্য্য তো দূরের কথা। যতগুলো পারে, পূর্ণশশী আর রাজেশ্বরী দু'জনেই খেতে চেষ্টা করে। দাসীদের কে একজন রেকাবীর কাছাকাছি দু'পাত্র পানীয় জল বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। রাজেশ্বরী বাম হাতে জলের পাত্র তুলে ডান হাত ধুয়ে জল খায় কিছুটা।

বৃদ্ধা বললেন,—আর খাবি না কিছু?

রাজেশ্বরী বললে,—না, আর আমি পারছি না।

পূর্ণশশীও বললেন,—আমি আর পারছি না। ক্ষমা করুন ঠাকুমা।

—থাক্ ভাই, থাক্। না পারো কি হবে! আমাদের রাজোর নোলা কি আর আগের মত আছে! কত ভাল-মন্দ খেয়ে এখন নোলা বদ্‌লে গেছে। কিন্তু আমার নাতজামাইয়ের সঙ্গে তো দেখা হ'ল না!

পূর্ণশশী বললেন,—বসুন না একটু। এখুনি হয়তো ফিরে আসবে!

বৃদ্ধা দুঃখের হাসি হেসে ব'ললেন,—বেশ, তাই বসি। আসা তো আর হয় না। এয়েছি যখন তখন দেখেই যাই। আহা, বাছাকে অনেক দিন দেখিনি আমি।

বেশ চ'লে যাচ্ছিলেন ঠাগ্‌মা, দিদি আবার এ কি ফ্যাঁসাদ করলেন! মনে মনে ভাবে রাজেশ্বরী। তবুও সে বললে,—তার চেয়ে এক কাজ কর' না। আমি না হয় ওকে একদিন পাঠিয়ে দেবো তোমার কাছে।

গিয়ে দেখা ক'রে আসবে। আজকে ফিরতে যদি রাত হয়! কতক্ষণ বসবে তুমি! খাওয়া-দাওয়াও তো এখানে করবে না।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন বৃদ্ধা।

সত্যিই বৃদ্ধা স্বপাক অন্ন ব্যতীত অন্যের হাতে কিছু গ্রহণ করেন না। প্রায় একাহারী হয়ে থাকেন বললেই হয়। রাত্রে সামান্য কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আর দু'টো কি একটা ফল খেয়ে থাকেন। যা খাওয়ার ঐ মধ্যাহ্নের মধ্যেই খান।

পূর্ণশশীও হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পারেন রাজেশ্বরীর মনোভাব। তাঁর নিজের বলা কথার জন্য মনে মনে লজ্জানুভব করেন। কি বলতে কি বললেন তিনি। কি ভাবলো রাজেশ্বরী? পূর্ণশশী বললেন,—নাত্‌নীর সঙ্গে আপনি কথা বলুন, আমি দু'টো পান সেজে খেয়ে আসি।

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লেন পূর্ণশশী।

বৃদ্ধা অনন্যোপায় হ'য়ে বললেন,—আমিও তবে যাই ভাই! সেই বরং ভাল, একদিন নাতজামাইকে পাঠিয়ে দিও। কি ক'রবো বল্ রাজো?

এমন সময়ে দাসীদের একজন কথার মধ্যে কথা বললে,—এই তো দেখে এনু, হুজুর ফিরেছে, সদরে আছে। অনুমান করি, অন্দরে আসতেছে।

মিথ্যা কথা বলেনি দাসী।

জুড়ী কিছুক্ষণ আগে ভিড়েছে ফটকের মুখে। কৃষ্ণকিশোর ফিরেছে উকিল-বাড়ী থেকে না অন্য কোথাও থেকে জানেন শুধু ঈশ্বর, যাঁর চোখে ধূলো দিয়ে না কি কারও কিছু করবার নেই। দেখলে কিন্তু কে বলবে যে, হুজুর কোথায় ছিলেন এতক্ষণ। উকিল-বাড়ীতে না গহরজানের কাছে?

অন্যান্য দিনের মত গহরজান সত্যিই আজ কোন বেয়াদপি করেনি। স্ফূর্তি আর আহ্লাদে ডুবে না থেকে, কথায় কথায় কারণে অকারণে হাসির ঢেউ না তুলে অশ্রুসজল চোখে থেকেছে। কেঁদেছে কতক্ষণ? কোন

বন্দোবস্তি করেনি। গরাণহাটার পল্লীতে ভাল ভাল মুখরোচক খানা-খাবারের অর্ডার পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করেছে তৃপ্তিকর আহার্য্য-সামগ্রীর। কিছু বরফ আনিয়ে নিয়ে আর খাবারের পাত্রগুলো ঘরে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে দরজাটা। আজে-বাজে খাবার নয়, নবাবী খানা অর্ডার দিয়েছিল গহরজান। পাঁঠার সামি-কাবাব, দুম্বার চর্বির ঝোল, মুরগী-ডিমের পোলাও আর গোটা কয়েক সিদ্ধ পেঁয়াজ আনিয়েছে গহরজান। ক'খানা ঘিয়ে-ভেজা পরোটা। পেস্তা আর বাদামের চাকতি। কয়েক গণ্ডা তবক দেওয়া আমীরী পান আর কয়েক বোতল জলসোডা।

গহরজানের ঘরের একটা কোণ ভ'রে গিয়েছিল এই সকল খাদ্যদ্রব্যে। ঘরের এক দেওয়ালে ভেড়ানো এক আবলুস কাঠের দেরাজের মাথায় জলসোডার বোতল আর কয়েকটা বেলোয়ারী কাচের রঙীন নক্সা-কাটা গেলাস সাজিয়ে রেখে ফরাসে গিয়ে ব'সেছে নিশ্চিন্ত হয়ে। হ্যাঁ, দেরাজের মাথায় সযত্নে রেখেছে কি একটা বোতল, যেটার দাম নাকি অনেক। জাত বিলিতী। কড়া আর উগ্র পানীয় নয়, হয়তো বিলিতী দ্রাক্ষাসুধা। কিংবা হয়তো শ্যাম্পেন্ কিংবা শেরী; ইটালীর পুরানো পোর্ট কিংবা ফরাসী ভারমুথ্ হয়তো—যা খেলে নেশা হয় কিন্তু মাতাল হওয়া যায় না। এই ভরা দুপুরে কি হবে নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে। তার চেয়ে বরং গল্প-গুজব ক'রে সময় কাটানো যাবে—ভেবেছিল গহরজান। গল্প করতে করতে মাঝে মিশেলে খাওয়া যাবে একটু একটু, চুকু-চুকু। পরিধানের জামাটা যাতে লাট হয়ে না যায় সেই কথা ভেবে কথায় কথায় কৃষ্ণকিশোরের অঙ্গ থেকে গহরজান সাদা রেশমের বুটিদার বেনিয়ানটা সাদরে খুলে নিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিল ঘরের দেওয়াল-আনলায়।

নেশাও উগ্র হয়নি আর জামাটাও লাট হয়ে যায়নি।

যা লক্ষ্য ক'রে সত্যিই মন থেকে খুশী হয় রাজেশ্বরী। কৃষ্ণকিশোর অন্দরে আসতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে রাজেশ্বরী। লক্ষ্য করে আর ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সে। যদি কিছু অশোভনীয় চোখে পড়ে। যদি কোন অন্যায় দেখা যায়। দেখা যায় যদি নেশায় টলটলায়মান মূর্ত্তি আর লাট হয়ে যাওয়া জামা, তা হ'লে কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাবে রাজেশ্বরী! স্বামীকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেললে রাজেশ্বরী।

কৃষ্ণকিশোর দিদিশাশুড়ীকে দেখতে পেয়ে, অর্থাৎ রাজেশ্বরীর বৃদ্ধা পিতামহীকে দেখে তাঁর পায়ে করস্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রমাণ করে। বলে,—কখন এলেন?

—এসেছি ভাই বহুৎ ক্ষণ। যাবো যাবো করছি। তোমার জন্যেই ভাই ব'সে আছি। তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো ভেবেছি। উকিল-বাড়ী গিয়েছিলে? কাজ মিটলো? স্নেহসিক্ত স্বরে কথা বললেন রাজেশ্বরীর পিতামহী।

কৃষ্ণকিশোর প্রণাম ক'রে বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আইন যেমন আছে, তেমনি আইনের ফাঁকও তো আছে। জমিদারীর একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম। কাজ মিটেছে। তা এখুনি আপনি চ'লে যাবেন কেন? থাকুক না আজ রাতটা আমাদের এখানে।

কৃষ্ণকিশোরের প্রকৃতিস্থ কথাগুলি শুনে রাজেশ্বরী তৃপ্ত যেমন হয় তেমনি খুশীও হয়। বুড়ীর গলা জড়িয়ে বলে আবদারের স্বরে,—হ্যাঁ ঠাগ্‌মা, আজকে তুমি থাকো। কালকে খেয়ে-দেয়ে সেই দুপুরে যেও।

বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বলেন,—সে কি কথা ভাই? ঘর-দোর যে আলগা ফেলে এয়েছি! কে দেখবে?

রাজেশ্বরী বললে,—দেখবার লোক যথেষ্ট আছে। তোমাকে আজ ছাড়ছি না আমি। চল' ঠাগ্‌মা, এখান থেকে চল'। দোতলায় চল'। মেয়েদের বৈঠকখানা আছে কেমন, দেখবে। চলুন দিদি, আপনিও চলুন।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে পূর্ণশশী দেখছিলেন পিতামহী আর নাতনীকে। শুনছিলেন তাদের কথা-বার্ত্তা। একজন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধা আর অন্ত জন যৌবনে টলমল কিশোরী। যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত একটি ফুল, রঙে আর গন্ধে পরিপূর্ণ। পূর্ণশশী সহাস্যে বললেন,—হ্যাঁ বৌ, ছেড়ো না ঠাকুমাকে। তোমাদের গাড়ীকে আজ ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। ব'লে পাঠাও, আগামী কাল দুপুরে ঠাকুমাকে নিতে আসবে।

একান্ত অসহায়ের মত বৃদ্ধা বললেন,—তুমিও দিদি যোগ দিলে ঐ পাগলীটার সঙ্গে? না ভাই রাজো, আর একদিন আসবো আমি। থাকবো যতদিন ব'লবি। আজকে আমি যাই। কোথায় খাবো, কোথায় শোবো, কোথায় কি ক'রবো ভাই!

মুক্তার সারির মত দাঁত দেখিয়ে খিল-খিল শব্দে হাসতে লাগলেন পূর্ণশশী। হাসতে হাসতেই বললেন,—নাতনীকে এমন ঘরে দিলেন কেন, যাদের বাড়ীতে থাকবার শোবার ঘর পর্য্যন্ত নেই?

—বালাই ষাট! ছিঃ, এমন কথা মুখে আনতে আছে কখনও! আমি কি তাই বলেছি? তুমি দিদিভাই দেখছি, সাংঘাতিক মেয়ে তো! কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন।

খিল-খিল শব্দে হাসি যেন পূর্ণশশীর থামতেই চায় না। হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন,—বললেন না আপনি? তবে, তবে না ব'লে থাকেন তো ভালই, নাতনীর কথাটি রক্ষা করুন!

কি যেন ভাবতে থাকেন বৃদ্ধা। কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে বললেন,—তবে, তুমিও থাকো দিদি। সবাই মিলে আজ আনন্দ করা যাক্। ছাড়বেই না যখন, তখন—

পূর্ণশশী বললেন,—আমার বাসায় যে ঠাকুমা দু'টো বাচ্ছা আছে। একটি ছেলে আর আরেকটি মেয়ে। আমাকে তো শীঘ্রি আপনার নাতনীর কাছে

এসেই থাকতে হবে।. কিছুদিনের মধ্যেই এসে থাকবো। আপনার নাতনী আর নাতজামাই অনুমতি দিয়েছেন।

এতক্ষণ কৃষ্ণকিশোর কোন' কথা বলেনি।

পূর্ণশশীর কথায় থাকতে না পেরেই যেন কৃষ্ণকিশোর বললে,—শশীবৌদিকে থাকবার জন্যে আমাদের অনুমতি দিতে হবে? নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন শশীবৌদি আপনি।

বৃদ্ধা হতাশার শ্বাস ফেলে বললেন,—পোড়া কপাল যেমন আমার! আমার বাসায় তো দিদি ব্যাটারা নেই! ব্যাটা আমারও ছিল ভাই, রত্নের মতই ছিল রাজোর বাপ! এই পোড়া-কপালীর দোষে চ'লে গেল, বড় অসময়ে স্বর্গে চ'লে গেল! রাজোর বাপও গেল, মাও গেল। রাজোর মা বোধ হয় বৈধব্যের কঠোর জ্বালা সহ্যি করতে পারলো না। স্বামী যাওয়ার এক বছরের মধ্যে সেও স্বামীর কাছে চ'লে গেল। বাইরে থেকেই দেখছো আমাকে, তোমাদের সঙ্গে হাসছি, কথা কচ্ছি। ভেতরটা আমার সদাক্ষণ জ্বলে-পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে সকল সময়ে। শোকে আর তাপে।

যারা শুনছিল তাদের সকলের মুখেই যেন মুহূর্তের মধ্যে বিষাদের ছায়া নামলো। সহানুভূতির করুণতা। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধার চোখের কোণগুলি চিক-চিক করতে থাকে। হয়তো অবাধ্য চক্ষুর্দ্বয় বাধা না মেনে দু-এক বিন্দু উষ্ণ জলবিন্দু উগ্‌রে দেয়। শোক আর তাপের পার্থিব বিকাশ হয়তো!

তবুও খুশীতে উছলে ওঠে রাজেশ্বরীর দেহ ও মন।

স্বামী ভাল হ'লে নারীর কত সুখ, তা হয়তো কেবল মাত্র অনুভব করতে সক্ষম হয় নারীগণ,—মনের মত মনের সাথী পেয়ে সমস্ত কিছু দুঃখকে হয়তো উপেক্ষা করতে পারে।

কৃষ্ণকিশোরের কাছাকাছি এগিয়ে পূর্ণশশী স্বর নত ক'রে বললেন,—ওঁদের গাড়ী তুমি ফিরে যেতে ব'লে দাও। আহা, বুড়ীর কত কষ্ট দেখছো!

—যে আজ্ঞে। বললে কৃষ্ণকিশোর।—আমি এখনই সদরে গিয়ে ব'লে আসছি। আপনিও কিন্তু এখন যেতে পাবেন না, শশীবৌদি। খেয়ে-দেয়ে যাবেন।

সে-কথার কোন' প্রত্যুত্তর দিলেন না পূর্ণশশী। হাসলেন শুধু সামান্য। আপত্তি করতে পারলেন না যেন। কথা ঠেলতে পারলেন না। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বলেন তো আমি ব'লে পাঠাই আপনার বাসায়।

এই মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললেন পূর্ণশশী,—তাই ব'লে পাঠাও ভাই! ওঁকে একবার ব'লে আসবে। তা হ'লে আর অপেক্ষা না ক'রে উনি খেয়ে নেবেন। বাচ্ছা দু'টোকে খাইয়ে নেবেন। আমি রাত্রির খাওয়া তৈরী ক'রে দিয়েই আসছি।

—বেশ, ভাল কথা। বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—এই তো কেমন লক্ষ্মী মেয়ের কাজ!

সে-কথার কোন' প্রত্যুত্তর দেন না পূর্ণশশী।

এই গৃহটির প্রতি পূর্ণশশীর মনোমধ্যে আছে যে কেমন আন্তরিক এক আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণ কি আজকের, কবে থেকে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে এই গৃহের! পূর্ণশশী তখন বালিকা বেলায়, যখন কৃষ্ণকান্ত জীবিত ছিলেন। বাসায় থাকতে থাকতে সামান্য দু'খানা ঘরে যখন মন তাঁর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখনই যেন এই গৃহ পূর্ণশশীকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। কত দিন পূর্ব্বের সেই সকল হারাণো দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে পূর্ণশশীর মানসপটে! পূর্ণশশী আর কৃষ্ণকান্ত যখন ছিলেন একে অন্যের প্রতি—

—চলুন ঠাকুমা, দোতলায় চলুন। মেয়েদের বৈঠকখানা দেখাবে আপনাকে আপনার নাতনী। বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন পূর্ণশশী। ভাঙা-মনে আর কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে চ'ললেন। কি একটা পুরানো ছায়াছবি যেন দেখতে পেয়েছেন পূর্ণশশী। সকলের আগে আগে গিয়ে তাই হয়তো চোখের জল লুকাতে ব্যস্ত ছিলেন। নারী সত্যিই হয়তো

শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলতে পারে না প্রথম প্রেমের গোপন কথা। ভুলতে পারে না ফেলে-আসা দিনের একেকটি মধু-মুহূর্ত্ত! পেছন পেছন উঠছিলেন বৃদ্ধা আর রাজেশ্বরী। পূর্ণশশী বললেন,—বৌ, ডাক্ একজন দাসীকে। বল্, ঘরটা খুলে দিক্। আমি ততক্ষণ ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলি, তুই স্বামীকে ডাকিয়ে স্বামীর কাছে যা। কিশোর হয়তো এখনও কিছু খায়নি। বেরিয়েছিল তো কতক্ষণ হয়ে গেছে!

লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় রাজেশ্বরীর মুখটি।

রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, আপনি তবে ঠাগ্‌মাকে সঙ্গে নে যান। আমি দাসীদের কাকেও ডেকে দিই। ঘর খুলে দিক্।

বৃদ্ধা বললেন,—হ্যাঁ ভাই, সেই বেশ কথা। দিদিভাই, তুমি যাও একটিবারের জন্যে, খোঁজ-টোজ নাও আমার নাতজামাই যদি জল-টল কিছু খায়। তবে আমার তো মনে হয়, কিচ্ছু খেতে হবে না। আমার নাতনীর মুখের হাসি দেখলেই ছেলের পেট ভ'রে যাবে। কি বল' শশীদিদি?

পূর্ণশশী কিছু বলেন না। বৃদ্ধার একটি হাত ধ'রে শুধু মৃদু মৃদু হাসেন। রাজেশ্বরী বলে,—ধেৎ, ঠাগ্‌মা যেন কি!

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকেন আর রাজেশ্বরী নেমে যায় একতলায়। পূর্ণশশী বললেন,—বড্ড অন্ধকার, নয় ঠাকুমা? আপনি আমার হাত ধ'রে সাবধানে উঠুন। কোন ভয় নেই।

বৃদ্ধা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ভাঙেন। বলেন,—কিন্তু, তখন তো দিদি কথাটা শুনে বুঝলাম না কিছু?

—কি কথা বলুন তো ঠাকুমা? শুধোলেন পূর্ণশশী।

—ঐ যে তখন বললে, তুমি শীঘ্রি আসছো এই বাড়ীতে, থাকছো আমার নাতনীটির কাছে? খুব ভাল কথা। শুনে আমি কত যে খুশী হয়েছি! রাজোর তো কথা বলবার মত একটি কেউ নেই। শুনে খুব আহ্লাদ হ'ল। কিন্তু কেন ভাই? বৃদ্ধা কৌতুহলী স্বরে কথাগুলি বললেন।

পূর্ণশশী বললেন,—উনি বেশ কিছুদিনের জন্ত সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছেন। ইউরোপ যাত্রা করছেন। মাষ্টার মানুষ তো, তাই বিলেত-টিলেত থেকে লেকচার দেওয়ার ডাক প'ড়েছে। তাদেরই খরচায় যাচ্ছেন। সেখানে লেকচার দিয়ে টাকা উপার্জ্জন করবেন। অন্ততঃ মাস ছ'য়েক লাগবে ফিরতে।

বৃদ্ধা বললেন,—ম্লেচ্ছ দেশে যাচ্ছেন সোয়ামী? তা ফিরে ভাল ক'রে একটা প্রায়শ্চিত্তির করালেই চলবে। শুনে ভাই বড় আহ্লাদ হ'ল। ভাগ্যি বটে তোমার!

পথ চলতে চলতে কখনও কখনও পূর্ণশশীর বক্ষস্থল চমকে চমকে ওঠে কেন?

সে অনেক দিন আগের কথা। এই সিঁড়িতে একদিন তাঁদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনেক, অনেক দিন আগে এক সন্ধ্যায়, পূর্ণশশীর চোখে ঠিক ছবির মতই ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য, কৃষ্ণকান্ত যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলেন আর পূর্ণশশী বাড়ীর বড়বৌ কুমুদিনীর আহ্বানে দোতলায় চলেছিলেন তখন দেখা হয়েছিল দু'জনে। দেখেই প্রথম কারও মুখে কোন কথা ফুটলো না। একে অন্যকে দেখলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিলেন দু'জনেই। কল্পনাতীতের দেখা পাওয়া গিয়েছিল যেন দু'জনের চোখেই। অনেকক্ষণ অতীত হ'লে কৃষ্ণকান্ত ব'লেছিলেন,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

পূর্ণশশী দৃষ্টি নত ক'রে বলেছিলেন,—যাচ্ছি, কুমু বৌঠানের কাছে। চুল বাঁধতে ডেকেছিলেন।

কৃষ্ণকান্তর বিশাল চক্ষুর অপলক দৃষ্টি যেন সহ্য করা যায় না বেশীক্ষণ। কে কোথায় দেখবে, দেখে কে কি ভাববে এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পূর্ণশশী ব'লেছিলেন—আমাকে পথ ছেড়ে দিন। যেতে দিন। ডাকছেন আমাকে কুমু বৌঠান।

সিঁড়ির দ্বারে কৃষ্ণকান্ত দণ্ডায়মান। তাঁর বিশাল বপু।

তাঁকে পাশ কাটিয়ে যায় এমন পথ নেই। হাসতে হাসতে ধীর কণ্ঠে কৃষ্ণকান্ত ব'লেছিলেন,—যেতে নাহি দিব।

তখন ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে প'ড়েছিলেন পূর্ণশশী। কে কোথায় দেখলো, দেখে কে কি ভাবলো, এই ভাবনায় শরীরটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল তাঁর। ভালই লাগছিল দৃষ্টি-বিনিময়ের খেলা খেলতে, কিন্তু লোকলজ্জা আছে তো! যদি কেউ দেখে কোথাও থেকে, তখন?

আদো-আদো স্বরে মিনতি করেছিলেন পূর্ণশশী,—আমাকে পথ ছেড়ে দিন। কেউ যদি দেখে তখন কি হবে? না না, আমাকে যেতে দিন। ঐ শুনুন কুমু বৌঠান ডাকছেন।

কথাগুলি শুনে হো-হো শব্দে হেসে উঠেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন,—কৈ না তো, বৌঠান তো তোমাকে ডাকেনি। মৃষা মা বদেৎ!

শেষ কথাটার অর্থ বোধগম্য হয়নি পূর্ণশশীর। সেই দৃশ্য আজও যেন ছবির মত ভেসে ওঠে পূর্ণশশীর মানস-পটে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মধ্যে মধ্যে তাই চমকে চমকে ওঠে পূর্ণশশীর বক্ষস্থল। কিন্তু বিবাহিতা নারীর যে অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করাই পাপ! আর সেই পুরুষ যখন ইহলোকে নেই, কবে কোন্ কালে চ'লে গেছেন স্বর্গে!

একজন দাসী ছুটতে ছুটতে আসে। বৈঠকখানার কুলুপ খুলে দিতে আসে। একজন তাঁবেদারও আসে জলন্ত লণ্ঠন হাতে। ঘরের আলো জ্বালাতে আসে। বেলোয়ারী কাচের দেওয়াল-গিরি আছে ঘরে। জ্বেলে দিয়ে যাবে তাঁবেদার।

পূর্ণশশী বললেন দাস আর দাসীকে,—একটু তাড়া ক'রে নাও। বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ভেঙে উঠেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো। বৃদ্ধার হাত

ধ'রে ঘরের মধ্যে ফরাসে বসিয়ে দেন পূর্ণশশী। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ইদিক-সিদিক দেখতে থাকেন বৃদ্ধা। চমৎকার সাজানো ঘর। পূর্ণশশীও ব'সে পড়লেন ফরাসে।

এমন সময়ে একগাল হেসে ঘরে ঢুকলো রাজেশ্বরী।

ইশারায় ডাকলো পূর্ণশশীকে। দু'পোঁছ রঙ, লাল আর কালো; না, না, লাল আর নীল। ঘন নীল জলে টকটকে লাল পদ্ম? রাজেশ্বরী আর পূর্ণশশীর শাড়ীর রঙ আলোর আভায় বিচিত্র দেখায়।

পূর্ণশশী ঘরের বাইরে আসতেই রাজেশ্বরী বললে ফিসফিস,—দিদি, একটা অনুরোধ করছি। ঠাগ্‌মার জন্যে কিছু যদি খাওয়ার জোগাড় ক'রে দেন। যার-তার হাতে ঠাগ্‌মা তো খাবে না। আমি একটা গরদের শাড়ী এনে দিচ্ছি। সেইটে প'রে যদি—

পূর্ণশশী লক্ষ্য করছিলেন রাজেশ্বরীর মুখাকৃতি। বৌয়ের কথার স্বরে কত কাকুতি আর মিনতি। বললেন,—বেশ কথা। আমি এক্ষুনি ক'রে দিচ্ছি। তুই স্বামীর কাছে গিছলি? কিছু খাবে-দাবে না?

রাজেশ্বরী বললে,—বেশ খুশীভরা মুখে হাসতে হাসতে বললে,—বললাম খেতে। খাবে না এখন। একেবারে রাতের খাওয়া খাবে।

পূর্ণশশী বললেন,—তা ভালো কথা তো। আমি যাচ্ছি, তুই দাসীদের ব'লে দে, আমাকে জোগাড় দিক্। কি খাবেন কি ঠাকুমা?

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তিত থেকে বললে রাজেশ্বরী,—কিছু ফল, পোয়াটাক দুধ আর দু'টো-একটা মিষ্টি।

—তা আর এমন বেশী কথা কি? আমি এখনই যাচ্ছি। ফলটা কেটে দেবো। দুধটা জাল দিয়ে দেবো আর একটু ছানা কাটিয়ে দু'টো মিষ্টি তৈরী ক'রে দেবো'খন। তুই গরদের শাড়ীটা আমাকে তোদের ভাঁড়ারে পাঠিয়ে দে। কথার শেষে পূর্ণশশী ত্বরায় চললেন রান্না-বাড়ীতে।

আর রাজেশ্বরী চ'ললো দেরাজ থেকে গরদ বের করতে।

কৃষ্ণকিশোর পালঙ্কে শুয়েছিল হয়তো ক্লান্তি মোচনের নিমিত্তে। চক্ষু মুদিত ক'রে শুয়েছিল। গরদখানা এলোকেশী মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ে রাজেশ্বরী প্রায় ছুটতে ছুটতে যায়। বৃদ্ধা পিতামহীর কাছে যায়। বৃদ্ধাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে রাজেশ্বরী বললে,—ঠাগ্‌মা, ঠাগ্‌মা, ঠাগ্‌মা।

দন্তহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধা। নাতনীকে জড়িয়ে ধরলেন সস্নেহে।

—বিদ্যাপতি প'ড়েছো? বিদ্যাপতির পদাবলী?

কণ্ঠে মাধুর্য্য ফুটিয়ে সহাস্য বদনে প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বিদগ্ধ-চিত্ত, মৃদুহাস্যময় মানুষটির বিশাল আঁখি দুটিতে ক্ষণেকের জন্য যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। কবি বিদ্যাপতির মাত্র নামস্মরণেই বক্তার বিমুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছিল কথা বলার ভঙ্গীতে। পরিধানে মিহি লাল-পাড় গরদের ধুতি। লোমশ বক্ষে দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালাটি ধ'রে শিশুর মত খেলা করতে করতে সেদিন কথা বলেছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা। মানুষের হৃদয়াবেগ প্রকাশের অন্যতম বাহন কাব্য—বৈষ্ণব-কাব্যের পার্থিব প্রেমের মাধ্যমে হয়তো ঈশ্বরানুভূতি হয়েছিল তাঁর। সমগ্র মুখমণ্ডল আর বক্ষদেশ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। শরীরে হয়তো শিহরণ জেগেছিল। তাঁর বাহুর সোনার কবচটা চিক-চিক ক'রে উঠছিল থেকে-থেকে। অচেনা মানুষ তখন সহসা তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই ভীত হয়ে প'ড়তো।

—মিথিলার কবি বিদ্যাপতি?

অস্ফুট নারীকণ্ঠ বাতাসে ভাসতে থাকে। মধুকণ্ঠী কে একজন নারী কথা বলে সসম্ভ্রমে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে। ভয়ে-ভয়ে।

—হ্যাঁ, পঞ্চদশ শতকের মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

চতুষ্কোণ ঘরটা যেন গুমরে গুমরে ওঠে। কোন্ এক সবল ও দৃঢ় পুরুষকণ্ঠস্বর। ঘরের মধ্যেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সুদীর্ঘ এক শয়নকক্ষ। ঘরের দেওয়াল-গাত্রে দশমহাবিদ্যার বিচিত্র রঙীন চিত্র। একান্ত দুষ্প্রাপ্য, অত্যন্ত দুর্লভ। কালীঘাটের পটুয়াদের হস্তশিল্প। বিশেষ ব্যবস্থায় দশখানি ছবিই আঁকানো হয়েছিল। প্রচুর অনুসন্ধানে শিল্পীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কক্ষস্বামী। অসামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে লাভ করেছিলেন এই দশমহাবিদ্যাকে—চিত্রাকারে। প্রতিটি ছবিতে মাল্যদান করা হয়েছে। রাঙা জবার মালা। দক্ষিণা-বাতাসে দুলছিল মালাগুলি।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। শুধু বিদ্যাপতি?

পঞ্চদশ শতকের আরেক জন? বড়ু চণ্ডীদাস?

বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। মথুরার সেই কৃষ্ণ আর রাধার প্রণয়-লীলা ছিল যাঁদের পদাবলীর বিষয়-বস্তু—যাঁরা কানু বৈ অন্য কারেও জানতেন না, তাঁদের সঙ্গে অপরিচয়?

প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় বললেন,—বড়ু চণ্ডীদাসের পদ জানো? তুমি গান গাইতে জানো না?

—পদ জানি না। জানবার মত জ্ঞান আমার কোথায়? নাম শুনেছি চণ্ডীদাসের। আর গানও আমি জানি না। পদ গাইতে হ'লে যে একতারা চাই। কোথায় পাবো একতারা?

কিঞ্চিৎ সাহস সহকারে কথা বলে নারীকণ্ঠ। যেন রাশ আগলা ক'রে কথা বলে। একসঙ্গে সকল প্রশ্নের উত্তরদান।

দেহটা দগ্ধ ক'রে দেয় বুঝি। কড়াইয়ে ছানা। নরম পাকের মণ্ডা তৈরী হচ্ছে দন্তহীন বৃদ্ধার জন্যে। আরেকটা চুল্লীতে খাঁটি দুধ চাপানো হয়েছে। ফুটছে টগবগ। দু'দিক সামলাতে গিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছেন পূর্ণশশী। পিঠের কাপড়টুকু ভিজে সপ-সপ করছে। পূর্ণশশীর শুভ্র রঙ ফুটে উঠেছে। গায়ে জামা নেই। কর্ম্মব্যস্ততায় লজ্জামোচনের জন্য আঁচলের পাড়ের একাংশ দাঁতে ধ'রে আছেন পূর্ণশশী। গুণ্ঠন খুলে গেছে। মাথায় সুগোল খোঁপা ঘন কৃষ্ণ-কেশের। তৈলাক্ত কেশ। খোঁপায় চিরুণী, স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে 'সাবিত্রী সমান হও'। রূপার কাঁটা। মাথার সম্মুখ-ভাগে পাতা-কাটা চুলের বাঁকা-সিঁথি। টকটকে লাল সিঁদুর-রেখা সীমন্তে। কপালে সিঁদুর-টিপ। উনুনের তপ্ত আগুনে ঘেমে উঠেছিলেন পূর্ণশশী। তাঁর প্রায়-আকর্ণবিস্তৃত আঁখিদ্বয়ে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। উনুনের প্রতিবিম্ব। পূর্ণশশী ডাকলেন সুমিষ্ট কণ্ঠে,—বামুনদিদি! বামুনদিদি আছেন?

কাছাকাছি কোন' একটা ঘর থেকে সাড়া দেয় ব্রাহ্মণী। বলে,—আসছি গো আসছি।

উনুন থেকে শাড়ীর আঁচলের সাহায্যে সন্দেশের কড়াইটা নামিয়ে ফেললেন পূর্ণশশী। ব্রাহ্মণী বললে,—কিছু বলতেছিলে বৌ?

পূর্ণশশী বললেন,—হ্যাঁ। সুগন্ধি একটা কিছু দাও। সন্দেশে দিই।

ব্রাহ্মণী বললে,—আমি দিতে পারবনি বৌ। তুমিই উঠে নাও। আছে ঐ তেকাটায়। ঐ যে গন্ধের শিশি। দেখো বৌ, বেশী দিওনি যেন। বিস্বাদ হয়ে যাবে। বড্ড কড়া কি না!

পূর্ণশশী কড়াইয়ে কাঠের খুন্তি চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করলেন,—আপনার কাপড় ভাল নয় বুঝি?

ব্রাহ্মণী ঘরের বাইরে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। বললে,—হ্যাঁ বৌ। আমি যে আঁস রাঁধছি। রাতের খাওয়া তৈরী করছি তোমাদের। যাই আমি, মাছের ঝালটা বুঝি পুড়ে যায়!

পোয়া দুয়েক ছানার সন্দেশ।

শুধু ছিটিয়ে দিলেই চলবে। নয়তো তিক্ত হয়ে যাবে বেশী আতর ছিটালে। তেকাটা থেকে সোনালী চিত্তির কাটা আতরের শিশিটা পাড়েন পূর্ণশশী। আঙুলের এক কোণে আতর নেন কি না নেন। ছিটিয়ে দেন গরম সন্দেশের নরক পাকে। ঘরটা পর্য্যন্ত গন্ধে ভরপুর হয়ে যায়। একটা শাদা পাথরের রেকাবীতে সন্দেশ তুলে চুপচাপ ব'সে থাকেন পূর্ণশশী। তাঁর মুখাকৃতিতে চিন্তার প্রলেপ পড়ে যেন। কি যেন ভাবেন তিনি। কপালের কয়েকটা রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

উনুনের আগুনের আভায় পূর্ণশশীর হলুদ শুভ্র সুপুষ্ট বাহু দু'টি স্পষ্ট নজরে পড়ে। স্বর্ণালঙ্কার বাহুতে। বাজুবন্ধ আর বলয়। মিছরিদানা চুড়ি। কম্পমান অগ্নিশিখায় চিক-চিক করে অলঙ্কার। উনুনের আগুনে একদৃষ্টে তাকিয়ে পূর্ণশশী চলে-যাওয়া দিনগুলিকে ভাবছিলেন। হয়তো হ'তে পারতো এমন যে, পূর্ণশশীই হয়তো আসতেন এই গৃহের বধূরূপে। কে জানে, এই সংসারের সকল ভার আর দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে পড়তো কি না। বড় বৌ কুমুদিনী যেমন স্নেহ করতেন পূর্ণশশীকে তাতে এমনটি হওয়া বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে যে পৃথিবীতে ধ'রে রাখা গেল না। সংসারের মায়া কাটিয়ে অতি অসময়ে চ'লে গেলেন তিনি। চোখ ফেটে জল আসে কি পূর্ণশশীর! কত চেষ্টাতেও পূর্ণশশী ভুলতে পারেন না কৃষ্ণকান্তকে। উনুনের প্রতি অপলক চোখ রেখে কত কথা ভাবতে থাকেন পূর্ণশশী।

—হ্যাঁ বৌ, হয়ে গেছে তোমার? ব্রাহ্মণী কথা বলে দরজার বাইরে থেকে।—ও মা, দেখছি তো হয়ে গেছে। তবে তুমি ব'সে কেন বৌ?

হঠাৎ ব্রাহ্মণীর কথা শুনে চমকে ওঠেন পূর্ণশশী। দু'-এক মুহূর্ত্ত চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে থাকেন। না, না, এ কি ভাবছেন পূর্ণশশী!

কেন এত দিন বাদে মনে জাগছে সেই পুরাতন দিনের স্মৃতি! নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় পূর্ণশশীর। মন কেন বাধা মানে না! কেন এত চেষ্টাতেও ভুলে যান না তিনি! এ সকল চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে যে। ভুলতেই হবে পূর্ণশশীকে। কত দিন আর কত রাত্রি এই চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন তিনি! সকলের অলক্ষ্যে কষ্ট পেয়েছেন কত! কিন্তু আর নয়। একবার চলে গেলে লোকান্তরে, কেউ কি আর ফিরে আসে! যাদের পেছনে ফেলে যাওয়া, তাদের কি আর দেখতে আসে কেউ? না, না, আর একদিন কেন, এক মুহূর্ত্ত ভাববেন না পূর্ণশশী।

কথার জবাব না পেয়ে ব্রাহ্মণী বলে,—হ'ল কি বৌয়ের! কথা ক'য় না কেন?

—বামুনদিদি? কথা বললেন পূর্ণশশী। কাঁপতে কাঁপতে। বললেন,—হয়ে গেছে দিদি। উনুনের তাতে ব'সে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। দম আটকে আসছে যেন।

—উঠে পড়' না বৌ। হয়ে গেছে যখন, তখন আর মিথ্যে উনুন-তাতে ব'সে কেন? বললে ব্রাহ্মণী।—আর তাতও কি যেমন-তেমন! উনুন তো নয়, যেন আগুনের ভাঁটা।

উঠে পড়লেন পূর্ণশশী। আঁচলে ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছে বললেন,—বামুনদিদি ভাই, বৌকে ব'লে পাঠান না। বলুন যে ঠাকুমার খাবার প্রস্তুত। কথা বলতে বলতে অন্য উনুন থেকে আঁচলের সাহায্যে ফুটন্ত দুধের আধারটা নামিয়ে ফেললেন।

ব্রাহ্মণী বললে সহানুভূতির সুরে,—তুমি ঘর থেকে বেইরে পড়' আগে। বাইরে হাওয়ায় এসো। গায়ের কাপড়খানা ভিজে গেছে যে ঘামে!

সত্যিই পূর্ণশশীর দেহের গরদখানা ভিজে সপ-সপ করছে। মুখটি তাঁর লাল হয়ে গেছে। পূর্ণশশী বাটিতে দুধ তুলে বাইরে গিয়ে

দাঁড়ালেন। খোলা উঠানে। ওপরে রাত্রির আকাশ। জ্বল-জ্বল করছে অজস্র তারা। প্রেতাত্মার চোখের মত। মানুষের মৃত্যু হ'লে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত আকাশের নক্ষত্র হয় না? নক্ষত্র হয়ে আকাশ থেকে দেখে মানুষ—দেখে না কি যাদের পিছনে ছেড়ে গেছে তাদের?

ঠাগ্‌মা তখন নাতনীর সঙ্গে গল্পে মশগুল।

ঠাকুমার ঝুলি থেকে ঠাগ্‌মা অফুরন্ত গল্প শোনাচ্ছেন আর রাজেশ্বরী শুনছে মুগ্ধ নয়নে, বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঠাগ্‌মা যা-যা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, রাজেশ্বরী উত্তর দিচ্ছে। বৃদ্ধার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসে ব'সে। আবদারের ভঙ্গীতে বলছিল রাজেশ্বরী,—কিন্তুক, আমার যে ভীষণ মন কেমন করে তোমার জন্যে। কিচ্ছু ভাল লাগে না তখন। মনে হয়, ছুটে চ'লে যাই আমার সেই পুতুলটার কাছে! পুতুলটা কেমন আছে ঠাগ্‌মা?

বৃদ্ধা বললেন স্নেহসিক্ত কণ্ঠে,—ঠিক যেমনটি সাজিয়ে রেখে এসেছিলে ভাই ঠিক তেমনটি আছে। কেউ কি হাত দেয় তোমার পুতুলের আলমারীতে? তা তোদের তো ভাই ঘরের গাড়ী আছে, যেতে পারিস তো যখন-তখন।

রাজেশ্বরী ড্যাবা-ড্যাবা চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো ইদিক-সিদিক। দেখলো কে কোথায় শুনছে। কাকেও দেখতে না পেয়ে ফিস-ফিস করলো,—বললুম না তোমায় তখন? তুমি যে কান ক'রে শুনলে না।

—কি বললি তুই? কি শুনলুম না? অবাক হয়ে শুধোলেন বুড়ী।

আবার চোখ ফেরালো রাজেশ্বরী। দেখলো অন্য কেউ আছে না নেই। বললে,—বললাম না, আমাকে যে এখন যেতে নেই?

—কেন না? যেতে নেই কেন?

—আহা, তুমি যেন জানো না! জেনে-শুনে ন্যাকা সাজো কেন?

—বল্ না, শুনি আগে। সত্যি বলছি ভাই, আমি তো কিছুই জানি না।

রাজেশ্বরী ফিক-ফিক হাসে আর বলে,—আমি তোমার কাছে পেলে যদি কোথাও চ'লে যায়! যদি আর না আসে! যদি মদ খেয়ে—

কয়েকটা 'যদি' শুনে আশ্বস্ত হ'লেন বৃদ্ধা। দন্তহীন মুখবিবরে হাসির আনন্দোল্লাস তুলে বললেন,—তবে লা বেহায়া মেয়ে! দাঁড়া, আমি নাতজামাইকে সঙ্গে ক'রে ভাগলবা হচ্ছি। দেখি তুই যাস কি না। ওমা, কোথায় যাবো মা? মেয়ের কথা শোন'।

শেষের কথা কয়েকটি কোন্ মা'র উদ্দেশে বলেন, কে জানে! রাজেশ্বরী লজ্জানত মুখে ব'সে থাকে। সে যেন শুধু ব'লেই খালাস। রাজেশ্বরী যে বোঝে না, কোন্ কথা কাকে বলতে হয়। কোন্ কথা কাকে। রাজেশ্বরীর মুখে এমন দিল্‌খোলা কথা শুনে ঠাকুমা বিস্ময়ের সঙ্গে খুশীও হন অপর্য্যাপ্ত। মনে মনে নিশ্চিন্ত হন এই ভেবে যে, তবু মনটা রাজোর বাঁধা পড়েছে বাঁধনে। বৃদ্ধা ভাবেন আর দর-দর বেগে অশ্রুপাত করেন।

রাজেশ্বরী বললে,—তুমি কাঁদছো ঠাগ্‌মা?

ঠাগ্‌মা বললেন,—যাঃ, কাঁদবো ক্যান্ লা? আমি তো হাসছি। দেখছিস্ না, আমি তো হাসছি।

—তোমার চোখে যে জল? শুধোয় রাজেশ্বরী। ঘরে এমন উজ্জ্বল লণ্ঠনের আলো, চোখে ভুল দেখবে রাজেশ্বরী! অন্দরের সুসজ্জিত বৈঠক-খানায় জোরালো বাতির আলো। মুঘল আমলের বেলোয়ারী কাচের ঝুলানো আলোর গোলাকার কাচের আবরণে কাচের নবরত্ন। পল্‌কি-তোলা রঙীন কাচের নক্ষত্র একেকটি। আলো জ্বালতেই নানা রঙ ঠিকরোচ্ছে।

ঠাগ্‌মা বললেন,—বয়েসটা কত হ'ল জানিস তুই? চোখ ব'লে কোন'

পদার্থ আছে আমার শরীলে? চোখের মাথা যে খেয়ে ব'সে আছি। দিন রাত্তির জল পড়ছে চোখ বেয়ে-বেয়ে।

মিথ্যা কথা বললেন বৃদ্ধা। তিনি ব্যথাহত মনে কেঁদেছেন। রাজেশ্বরীর মুখের কথা শুনে। এমন কথা, যা কখনও তিনি কানে শুনবেন কল্পনা করেননি। যে অনাথাকে বুক দিয়ে প্রতিপালন করলেন শৈশব থেকে, সে এমন বেইমান হ'তে পারে! এমন অকৃতজ্ঞ! এমন লাজ-লজ্জাহীন! ভাবছিলেন বৃদ্ধা। রাজেশ্বরীর মুখের কথা শুনে। পরম দুঃখে অশ্রুপাত করছিলেন।

বৃদ্ধা বললেন,—এখন ভাই একটা বিষয়-সংক্রান্ত কথা ক'য়ে নিই।

রাজেশ্বরী বললে,—কি আবার বিষয়-সংক্রান্ত কথা?

—শোন' ভাই, মন দিয়ে শোন'। তোমার বাড়ীটা এবার তুমি দখল নাও। ঠাগ্‌মা বিষয়ী কথা ফাঁদেন।—আমাকেও ছুটি ক'রে দাও। আমি চ'লে যাই বিন্দাবনে। আমার খোরাকীর টাকাটা মাসান্তে একবার পেলেই থাকতে পারবো আমি।

—সে কি ঠাগ্‌মা? আকাশ থেকে প'ড়লো যেন রাজেশ্বরী।—তুমি আবার বিন্দাবনে যেতে যাবে কেন? সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে তোমাকে?

ঠাগ্‌মা বললেন,—ঢের হয়েছে ভাই, আমার সুখের আর দরকার নেই। আমাকে ছুটি দাও।

—তুমি কি ব'লছো ঠাগ্‌মা? বললে রাজেশ্বরী।

—ঠিক বলেছি ভাই। আর নয়। বললেন বৃদ্ধা। দুঃখ-কাতর কণ্ঠে।

—বৌদিদি, ঠাকুমার দুধ-মিষ্টি তৈরী। ব'লে পাঠালেন শশীবৌদিদি।

ঘরের একটা দরজায় ব্রাহ্মণী এসে হাজির হয়। কথা বলে নাতিউচ্চ কণ্ঠে।

রাজেশ্বরী উঠে পড়লো তৎক্ষণাৎ। বললে,—আনতে বলুন দিদিকে। আমি একটা জায়গা ক'রে দিই। আমার ঘরের আনলায় একটা পশমের আসন আছে, নিয়ে আসুন না বামুনদি! আর দিদিকে গিয়ে বলবেন যে একঘটি গঙ্গাজল যেন নিয়ে আসে! তা নয়তো আবার যেতে হবে এতটা কষ্ট ক'রে।

কাছাকাছি ছিল রাজেশ্বরীর খাস-কামরা।

আলো, আসবাবপত্র আর শয়নের মহার্ঘ সরঞ্জাম। খাট-আলমারী আর ভেলভেটের বিছানা। ব্রাহ্মণী লক্ষ্য ক'রে দেখে বাইরে থেকে ঘরের মধ্যেটা। দেখে পালঙে কে শুয়ে আছে না! শুধু শুয়ে আছে, না ঘুমোচ্ছে!

ব্রাহ্মণী বাইরে থেকে মিহি কণ্ঠে কথা বললে। —বৌদিদি বললেন ঘরের আনলা থেকে আসন নে যেতে।

ঘরের মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ নেই। নিদ্রায় অচেতন কৃষ্ণকিশোর পালঙে শুয়ে।

টেবিলের 'পরে টেবিল-আলোর শিখাটা শুধু কাঁপছে ধিকি-ধিকি। পূবালী বাতাসে। তবে কি ঘুমোচ্ছেন? শ্বাস রুদ্ধ ক'রে ঘরে সিঁদোয় ব্রাহ্মণী। ঘরটা তার খুব পরিচিত নয়, যেজন্য খুঁজতে হয় কোথায় আনলা। থতমত খেয়ে দেখে ব্রাহ্মণী, কোথায় আনলা।

খাস-কামরার কোলের দালানে আসন পেতে দেয় রাজেশ্বরী। ব্রাহ্মণী বলে,—এসো ঠাগ্‌মা! খাবে এসো।

—কি খাবো ভাই? খাওয়া-দাওয়া কি আর আছে? কি খাওয়াবে দিদি? ঠাগ্‌মা কথা বলেন, কেমন যেন দুঃখভার স্বরে। কেমন যেন নিস্পৃহের মত।

—তুমি যা খাও। বলে রাজেশ্বরী। বলে—দুধ আর মিষ্টি। পোলাও-কালিয়া নয়।

বৃদ্ধাও অতি কষ্টে উঠলেন। আসনের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

—তা বেশ। তা বেশ। আর তো কিছু খাই না ভাই আমি। তোর কি আর অজানা আছে আমার খাওয়া? ঠাগ্‌মা কথার শেষে নিশ্বাস নিয়ে আবার কথা বলেন। বলেন,—বিষয়-সংক্রান্ত কথাটা তো ভাই বলা হ'ল না! তোর বাড়ীটা দখল নিয়ে আমাকে ভাই মুক্তি দে।

অভিমানের আমেজ মাখিয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—তা হ'লে আমি কাঁদবো ঠাগ্‌মা। যা-তা কথা বললে খিড়কির পুকুরে গিয়ে ডুব দেবো। অপঘাতে মরবো তাই চাও তুমি?

—বালাই ষাট! বালাই ষাট! বললেন ঠাগ্‌মা।—মুখের কি তোর কোন আখ্‌ঢাখ্‌ নেই? যা মুখে আসে বলবি?

এমন সময়ে দমকা হাওয়ার একটা বেগ উড়ে আসে কোথাও থেকে। গা-কাঁপানো, হিমবাহী হাওয়া। কোথায় কি একটা পড়ে ঝনন-ঝনন শব্দে। চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। শিউরে উঠে। কাছে কোথায় শব্দটা হয়েছে। কাছের কোন' দালানে। কাচের একটা ঝুলন্ত লণ্ঠনের শিকলি টুটে গেছে দমকা বাতাসে। বহুদিনের পুরানো লণ্ঠন। শিকলি কেটে গেছে সহসা। কাচের লণ্ঠনটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে ভূমিস্পর্শে।

অপঘাতে মৃত্যুর কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিকট ঝনৎকারের শব্দে বৃদ্ধা কেমন হতচকিত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—ভাখ্‌ রাজো, কোথায় কি পড়লো! কি ভাঙলো কে, কে জানে!

বৃদ্ধা কথা বলেন, কিন্তু তাঁর বক্ষ দুরু-দুরু করতে থাকে। থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে সর্ব্বাঙ্গ। বলেন,—কারও সর্ব্বনাশ হ'ল কিনা ভাখ্‌ রাজো! তুই যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলি?

বৃদ্ধা কথা বলতে বলতে একটা জানলার গরাদ ধ'রে ফেললেন। হয়তো টলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় কম্পমান দেহটা। নিশ্বাস টানতে পারেন না যেন। বুকে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। রাজেশ্বরীর অপঘাতে মৃত্যুর কথা আর ঐ শব্দ শোনা পর্য্যন্ত বুড়ী সাড় হারিয়ে ফেলেছেন। বললেন,—রাজো,

ওলো রাজো, তুই কোথায় যাচ্ছিস? তুই আমার কাছ থেকে যাস নে। তুই আমার কাছে আয়।

রাজেশ্বরী সাবধানী পদক্ষেপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল যেদিক থেকে শব্দ আসে সেই দিকে। রাজেশ্বরী বললে,—তুমি ভয় পাও কেন? আমি লোকজনকে ডাকাই। কি হ'ল দেখুক।

ঠাগ্‌মা বললেন,—তোমাকে ডাকাডাকি করতে যেতে হবে না ভাই! তোমার স্বোয়ামীকে ডেকে দাও না, সে দেখবে'খন। স্বোয়ামীটি কোথায়?

রাজেশ্বরী বললে বিনম্র কণ্ঠে,—ঘরে ঘুমোচ্ছে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গালে যদি রাগ করেন!

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চোখ বড় ক'রে বললেন ঠাগ্‌মা,—সে কি কথা লা! ওলট-পালট হয়ে গেলেও উঠবে না ঘুম থেকে? এমন অসময়ে ঘুমই বা কেন?

ঘুম কেন অসময়ে? রাজেশ্বরী ভাবে দিনটার কথা।

কত শ্রান্ত এখন কৃষ্ণকিশোর! কত ক্লান্ত! কত পরিশ্রম গেছে সকাল থেকে দিনভোর! পরিপূর্ণ আহার হয়নি পর্য্যন্ত কৃষ্ণকিশোরের। নাকে-মুখে গুঁজে গিয়েছিল উকিল-বাড়ীতে। যাওয়ার আগে—

—তা ব'লে তুই যেতে পাবি না রাজো। আমার মাথা খাস্‌। হিতে বিপরীত হবে শেষকালে? কাচ ফুঁটিয়ে খোঁড়া হয়ে ব'সে থাকবি? ঠাগ্‌মার কথায় যেন উষ্মা।

—তুমি ঘরকে যাওতো বৌদিদি!

হঠাৎ পুরুষ-কণ্ঠ শুনে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয় রাজেশ্বরী। বলে,—কখন ফিরলে অনন্ত?

অনন্তরাম শব্দ শুনে অন্দরে এসেছিল। বললে,—খানিক আগে ফিরেছি। তুমি এখান থেকে যাও দেখি। তোমার ঠাকুমা ঠিক ব'লেছেন। শেষকালে

কি একটা কাণ্ড করবে? একটা কাচের লণ্ঠন্ কড়া ছিঁড়ে প'ড়ে চুরমার হয়ে গেছে। একে বেলোয়ারী কাচ, পায়ে বিঁধলে আর রক্ষে আছে? বিষিয়ে যাবে না? দাঁড়াও, আমি আগে লোকজনাকে ডেকে সাফ করাই। তারপর তুমি ঘর থেকে বেরুবে।

রাজেশ্বরী বললে,—প্রজাদের সঙ্গে ক'রে কোথায় কোথায় গেলে অনন্ত?

অনন্তরাম বলে,—গেছি অনেক কোথায়। দেখিয়েছিও অনেক। অজ্ঞ মুখ্যু তো একেকটা! বোঝাতেই আমার জান নিকলে গেছে। ফুরসৎ পেলে বিস্তারিত বলব। এখন তুমি যাও এখান থেকে।

রাজেশ্বরী কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবে। বলে,—আমি যাচ্ছি এখান থেকে, বিদেয় হচ্ছি। অনন্ত, শশীদিদি গেছেন ঠাগ্‌মার দুধ-মিষ্টি তৈরী করতে। কা'কেও পাঠাও না তাঁকে ডাকতে। ব'সে আছে ঠাগ্‌মা। রাত হচ্ছে কত! আর ব'লে দিও, যেন ঘোরানো-সিঁড়ি ধ'রে ওপরে ওঠেন। কাচ ফুটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত—

পূর্ণশশী তখনও রান্না-বাড়ীর খোলা উঠানে। আকাশে চোখ তুলে অন্যমনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পূর্ণশশীর মুখটি কেন কে জানে ব্যথাভরা! চোখে শূন্যদৃষ্টি। ঘরে-ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে রান্না-বাড়ীতে। লণ্ঠনের অল্প অল্প আলোয় বেশী কিছু দেখা যায় না, শুধু পূর্ণশশীর ধবধবে ফর্সা মুখ আর বাহুযুগল। গরদ শাড়ীর বেষ্টনে পূর্ণশশীর আঁটসাঁট নিটোল দেহ। দূর থেকে মনে হয় যেন একজন ষোড়শী, বিরহী যক্ষের পাঠানো সমাচার পড়ছেন আকাশের চলন্ত মেঘে। পূর্ণশশী উর্দ্ধমুখী হয়ে ছিলেন কতক্ষণ। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥

হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ—তুহুঁ দোহা হোয়॥

জলদগম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে পূর্ণশশী মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে গিয়েছিলেন। আবৃত্তি শেষ হওয়ার বহুক্ষণ পরে প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—এ কবিতার অর্থ কি? আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

পূর্ণশশীর কথা শুনে কৃষ্ণকান্ত অট্টহাস্য হেসেছিলেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন,—সে কি কথা, এমন সহজ সরল কথাগুলো পর্য্যন্ত বুঝলে না?

—না। আমি যে লেখাপড়া বেশী জানি না।

—মিথিলার কবি, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কবি, কীর্ত্তিলতা-প্রণেতা মহাকবি বিদ্যাপতির রচনা যে এই কবিতা। মৈথিলী ভাষায় রচনা, বাঙলা ভাষায় নয়। লোমশ বক্ষ থেকে রুদ্রাক্ষের মালা তুলে ধ'রে শিশুর মত খেলা করতে করতে কথা বলতেন কৃষ্ণকান্ত। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসি।

পূর্ণশশী লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—কিছু অর্থ বুঝতে পারিনি। কবিতাটির অর্থ কি?

কৃষ্ণকান্ত শিশুর মতই সহাস্যে কথা বলেন,—অর্থ বুঝতে হ'লে ব্রাহ্মণের সেবায় কিছু দান করতে হয়!

—আমার সামর্থ্যে যা কুলায় আমি দেবো। পূর্ণশশী সহজ মনে কথার উত্তর দিয়েছিলেন।

—তথাস্তু। তুমি আত্মদানে প্রস্তুত? প্রশ্নকর্ত্তার কথায় গাম্ভীর্য্য।

প্রস্তাব শুনে চমকে চমকে উঠেছিলেন পূর্ণশশী। হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলতে পারেননি। পলকহীন চোখে তাকিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্তের পানে।

সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছিল পূর্ণশশীর। এমন সময়ে ঘড়ি-ঘরে ঝনন ঝনন শব্দে ঘণ্টা পড়েছিল। সময় উত্তীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত শুনে ভয়, লজ্জা আর সঙ্কোচ অধিকার করেছিল পূর্ণশশীর মন আর দেহ। ঘর থেকে চ'লে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। বিদায় গ্রহণের জন্য উসখুস করতে দেখে কৃষ্ণকান্ত বললেন,—য়ুরোপের নারীজাতি জ্ঞানলাভের বিনিময়ে আত্মবিসর্জ্জন করতেও কুণ্ঠিত নয়। আর তুমি? ধিক্, ধিক্ তোমাকে!

কথার শেষে আর গম্ভীর থাকতে সক্ষম হননি কৃষ্ণকান্ত। হেসে ফেলেছিলেন লজ্জা-ভীরু পূর্ণশশীর অবস্থা দেখে। সত্যি ভয় আর আশঙ্কায় সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণশশী। যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—আত্মবিসর্জ্জন মানে যদি মৃত্যুবরণ হয় তাতে আমি প্রস্তুত। আপনি কবিতাটির অর্থ আমাকে শীঘ্রি শীঘ্রি বলুন। সময় বেশী নাই।

কথাগুলি শুনে অট্টহাসি হেসেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পেশীবহুল শরীরটা তাঁর হাসির সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকে। হাসতে হাসতে ব'লেছিলেন,—তুমি কাপুরুষ। তুমি একটা পয়লা নম্বরের কাপুরুষ। আত্মদান অর্থে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া কাপুরুষতা। আমি অন্য অর্থে বলেছি। আত্ম-দান অর্থে দেহ-দান।

শেষ কথাটি কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠেন পূর্ণশশী। মাথা নত ক'রে ফেলেন তৎক্ষণাৎ। ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়! পায়ের অঙ্গুলিস্পর্শে ঘরের মেঝেয় অদৃশ্য রেখাপাত করেন। মুখে তাঁর কথা জোগায় না। তবুও অতি কষ্টে বলেছিলেন,—না, না, না। আমি এখন যাই?

যাওয়ার প্রস্তাবে কৃষ্ণকান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কি না কে জানে! প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে বললেন,—তোমাকে দেখছি তুমি অত্যন্ত ভীত হয়েছো। অন্য একদিন বলা যাবে কবিতাটির ভাবার্থ। আজকে এখন আসতে পারো তুমি।

যাত্রাকালে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন পূর্ণশশী। কৃষ্ণকান্ত তাঁর শুধু মাথাটি স্পর্শ করেন। বলেন,—সতী সাবিত্রী হও। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক্ তোমার। আমার কথাগুলি জানিও আন্তরিক নয়। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করবার নিমিত্তই বলা।

—তবে! তবে? মিথ্যা কেন আমাকে উত্তেজিত করছেন? আমি আসি এখন। বাজলো কত! কত দেরী হয়ে গেছে! আমাকে এখন ঘরে ফিরতে হবে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি যাই।

—হাসিমুখে বিদায় লও তো অনুমতি দেব, নচেৎ নয়।

শুষ্ক হাসি হেসেছিলেন পূর্ণশশী। অন্তরের হাসি নয়। দুঃখের হাসি। রক্তাভ ওষ্ঠে হাসির মৃদু রেখা ফুটিয়ে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন ঘর থেকে।

তারপর আর সাক্ষাৎ হয়নি পরস্পরে।

কৃষ্ণকান্ত সহসা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছিলেন মরজগৎ থেকে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। কবিতাটির অর্থ পূর্ণশশীর অশ্রুতেই থাকে। কৃষ্ণকান্তর মৃত্যুতে তাঁর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়।

এই শশীবৌ? ভাবনা রাখো এখন। ঠাকুমার দুধ-মিষ্টি নিয়ে যেতে ডাকছে যে তোমাকে বৌমা।

—এ্যাঁ! কে? এই যে যাই। কে? অনন্ত? অন্ধকারে থেকে কথা বলেন পূর্ণশশী।

—হাঁ গো হাঁ, বৌদিদি। একলাটি দাঁড়িয়ে কেন এমন? অনন্তরামের কথায় কৌতূহল।

পূর্ণশশী উঠান থেকে দালানে উঠে বললেন,—দুধ-মিষ্টি প্রস্তুত। বামুনদি আঁস-রান্নাঘরে ঢুকেছেন। আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি। ডাক পড়লেই যাবো।

অনন্তরাম বললে,—ডাক পড়েছে। যাও! তবে ঘোরানো সিঁড়ি ধ'রে ওপরে যেও। ওদিকের সিঁড়ির সামনের দালানে একটা কাঁচের লণ্ঠন হাওয়ায় পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। ছড়ানো কাচ চতুর্দ্দিকে।

দু'হাতে দু'টি পাত্র ধ'রে পূর্ণশশী চললেন। মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়। পূর্ণশশী ভাবছিলেন, এই গৃহে এলেই যত পুরানো দিনের স্মৃতি মনে জাগে। স্বগৃহে থাকলে কাজে-কর্ম্মে বেশ ভুলে থাকেন তিনি। কেবল এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখলে আর বিস্মৃত হয়ে থাকতে পারেন না তিনি। দুঃখভারাক্রান্ত মন তাঁর বিরক্ত হয়। কে জানে, পূর্ণশশীই হয়তো হ'তেন এই গৃহের কুলবধূ। তাঁকেই হয়তো এই সংসার দেখা-শুনা করতে হ'ত।

—কত কষ্ট দিলুম ভাই তোমাকে। ভাবছো না, যে রাজ্যের ঠাগ্‌মা এসে জ্বালাতন-পোড়াতন ক'রে গেল?

আসনে ব'সে কথা বলেন বৃদ্ধা। পূর্ণশশীকে আসতে দেখে বলেন। পাত্র দু'টি বৃদ্ধার সমুখে নামিয়ে রেখে বললেন পূর্ণশশী,—আপনি রাজ্যের ঠাকুমা, আমার কেউ নয় তো? আমারও যে ঠাকুমা আপনি।

বৃদ্ধা ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললেন,—তা বেশ। তা বেশ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। শুধু গায়ে গরদ প'রে কি চমৎকার মানিয়েছে ভাই তোমাকে! যে বলে কুড়িতে মেয়েজাত বুড়ী হয়ে যায়, সে দেখে যাক আমার শশীদিদি-ভাইকে। দেখে চক্ষু সার্থক করুক।

পূর্ণশশীর লজ্জারাঙা মুখে হাস্যরেখা ফুটে ওঠে। হাতের পাত্র দু'টি নামিয়ে রাখতে গিয়ে উর্দ্ধাঙ্গের বাস বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। শাড়ীর আঁচল যথাস্থানে টানতে টানতে পূর্ণশশী সহাস্যে বললেন,—আপনি আর বাজে বকবেন না ঠাকুমা! আমার যে ইদিকে মরবার বয়েস হ'ল।

—আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই। তোমার যদি মরণের দিন

ঘনিয়ে থাকে, আমার তবে এ্যাদ্দিনে ম'রে ভূত হয়ে থাকা উচিত ছিল। বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বললেন।

রাজেশ্বরী এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল দু'জনের বাক্য-বিনিময়। শুনছিল আর হাসছিল ফিক-ফিক মুখে আঁচল চেপে। চন্দ্রালোকে যেন একটি লাল পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ধীরে ধীরে রাজেশ্বরীর হাসিতে। এলো-মেলো বাতাসে দুলছিল রাজেশ্বরীর টকটকে লাল শাড়ী।

কৌতুক সহকারে অস্ফুট হাসির সঙ্গে পূর্ণশশী বললেন,—আপনার ঠাকুমা একশো বছর পরমায়ু হোক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

এক মুহূর্ত্ত নীরবে তাকিয়ে বললেন বৃদ্ধা,—আর জ্বালিও না দিদি! প্রার্থনা কর' তোমাদের এই বুড়ী ঠাগ্‌মা এক্ষুনি যাক্। আর বাঁচবার সাধ নেই। যেদিন আমার ব্যাটা আর বৌ গেছে সেদিন-থেকে—

কথায় কথায় দুঃখের প্রসঙ্গের অবতারণা হ'তে দেখে পূর্ণশশী কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পান। পূর্ণশশী বলেন,—বলুন না ঠাগ্‌মা আপনার নাতনীকে, যাক্ বরের কাছে গিয়ে একটু বসুক। আহা ব্যাচারী, ফিরেছে সারা দিন বাদে। আমি আপনার খাওয়া দেখছি।

ঠাগ্‌মা যেন পেয়ে বসলেন। ওপরে নীচে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন,—ঠিক বলেছে আমার শশীদিদি-ভাই। যা না লা, গিয়ে দু'দণ্ড থাক্ না কাছে। ঘুমোচ্ছে, তা কি হয়েছে? কপালে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেনা। তোর বরের যা ভাল লাগে করগে না। আমি তো আর জানি না বর কি চায় না চায়।

—ধ্যেৎ ঠাগ্‌মা, তুমি যেন কি! গেছলাম তো আমি। দিদি, আপনি বুঝি চান যে আমি অপ্রস্তুত হই? বেশ লোক আপনি। সলজ্জ কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী। পত্রবহুল আয়ত চোখে তিরস্কার ফুটিয়ে। কথার শেষে আঁচলে মুখ ঢাকলো।

ঠাগ্‌মা হেসে ফেললেন রাজেশ্বরীর অপ্রস্তুততায়। পূর্ণশশীও হাসলেন। হাসতে হাসতে পূর্ণশশী দুটি চোখ মুদিত ক'রে ফেলেন! শব্দহীন হাসির সঙ্গে।

কথা বলতে বলতে আরও কতক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায়। জানলার বাইরে রাত্রি ঘন হ'তে দেখে বুড়ীকে দোতলার একঘরে বসিয়ে রেখে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে রাজেশ্বরী রান্নাবাড়ী যায়। ভয়ে ভয়ে, সন্ত্রাসে। রাত্রির গভীর অন্ধকার যে দিকে দু'চোখ যায়। ঘন কালো আকাশ। থেকে থেকে বইছে শুধু এলোমেলো বাতাস। ত্রস্তপদে এগোয় রাজেশ্বরী। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন সাবধানের সঙ্গে।

শিবাকুল ডাকছে দল বেঁধে। নিমতলার শ্মশান-ঘাটে।

নিস্তব্ধ রাত্রির তমসা ভেদ ক'রে শিবাকুলের আর্ত্ত আর্ত্তনাদ দূরে, বহুদূরে ভেসে যায়। নিমতলার শ্মশানের কার একটা অর্দ্ধদগ্ধ বেওয়ারিশ শব গঙ্গাতীরে প'ড়েছিল, জলে পা ডুবিয়ে। হিংস্র-কুটিল শৃগালের পাল শবটির একটি পা থেকে এঁটেসেঁটে জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা দাঁত আর নখরের সাহায্যে খোলাখুলি করে। আর ডাক ছাড়ে থেকে থেকে উর্দ্ধগগনে চোখ তুলে। তির্য্যক্ চোখ।

গঙ্গা-সাগর থেকে ফেরতা একটি সদাগরী জাহাজ, মাঝগঙ্গা ধ'রে চ'লেছিল। হঠাৎ সার্টিং করলো বিকট শব্দে। জাহাজী-ডাক শুনে শব ছেড়ে পালাতে উদ্যোগী হ'ল শিবাকুল।

গঙ্গাতীরের হাওয়ায় দগ্ধশব আর টিংচার আইওডিনের বিশ্রী মিশ্রগন্ধ।

আরেকটু হ'লে পা পিছলে আলুর দম হয়ে যেতো।

রান্না-বাড়ীতে একটা কলার খোসায় পা প'ড়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর।

দেওয়াল ধ'রে টাল সামলে নিয়েছিল। একটা সজোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চললো রাজেশ্বরী। ডাকলে,—বামুনদিদি আছেন?

আঁস-রান্নার ঘর থেকে উঁকি মারলে ব্রাহ্মণী।

এঁটো হাত। হাতের কব্জির সাহায্যে মাথার ঘোমটা টানলে। কপালটা ঢাকলে। পোড়া-কপাল। সিঁদুরহীন সিঁথি। বললে,—ডাকছো বৌ?

—হ্যাঁ। আমাদের তিন জনের জায়গা করতে বলুন দাসীকে। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—আমি, শশীদিদি আর—

কথা শেষ করতে পারলে না রাজেশ্বরী। লজ্জায় বাধা দেয়।

ব্রাহ্মণী বললে,—আমারও রান্না-বান্না প্রস্তুত। দাসী, ও দাসী!

প্রায়-অন্ধকারে ব'সে একজন স্থূলকায়া দাসী সুপারী কুঁচিয়ে রাখছিল বেতের একটা ছোট ধামায়। সাত্‌ তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়লো দাসী। বললে,—বল' গো বল'। হেথায় আছি আমি।

ব্রাহ্মণী বললে,—হোথায় থাকলে চলবে না! দেখছো না, খেতে এসেছেন হুজুরনী? জায়গা কর'। জল আর আসন দাও।

—বল্‌ না ভাই, বল্‌। লজ্জা পাচ্ছিস কেন?

খিল-খিল হাসতে হাসতে কথা বলে কোন' নারীকণ্ঠ। ফাঁকা বাড়ী। রাত্রির আঁধারে চলতে-ফিরতেই ভয় পায় রাজেশ্বরী। প্রথমে ভীত হ'লেও ঐ কণ্ঠস্বর রাজেশ্বরীর পরিচিত। গ্রীবা বেঁকিয়ে দেখলো, পেছনে পেছনে এসে পূর্ণশশীও কখন হাজির হয়েছেন। দেখতে পায়নি বৌ। পূর্ণশশীকে দেখে হাসিমুখ করলে রাজেশ্বরী। জিভ কাটলে দাঁতে। লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়লো যেন।

পূর্ণশশী তখন গরদ ছেড়ে পুনরায় জরিদার নীলাম্বরী চড়িয়েছেন। গায়ে মার্কিন ছিটের জামা। বিচিত্র নক্সা-তোলা। পূর্ণশশী হাসির রেশ টেনে বললেন,—বামুনদি, তোমাদের বৌ কথাটা শেষ করতে পারলে না।

বৌয়ের হয়ে আমিই ব'লে দিচ্ছি। বৌয়ের আজ স্বামীর পাশে ব'সে খেতে সাধ হয়েছে। ওদের জায়গা যেন পাশাপাশি হয়।

দু'হাতে আঁচল মুখে চাপে রাজেশ্বরী।

তড়িৎ গতিতে পালিয়ে যায় রান্না-বাড়ীর উঠোন থেকে ভাঁড়ার-ঘরে। ভাঁড়ার-ঘরে আত্মগোপন করে রাজেশ্বরী। লজ্জারক্ত মুখে আঁচলের পাড় দাঁতে কামড়াতে থাকে। কি ভাবলো কি বামুনদিদি?

—ও বৌ যাস কোথায়? শুনে যা, একটা কথা বলি। বললেন পূর্ণশশী।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বৌ তখন ভাঁড়ারে। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যেন ভুল ক'রে মর্ত্ত্যে অবতরণ ক'রেছেন, রাজেশ্বরীর শ্বশুরকুলের এই ভিটেয়। একেই দেবীর মত রূপ, প্রতিমার মুখশ্রী পেয়েছে রাজেশ্বরী। তায় পরিধান ক'রেছে আবীর রঙের লাল-শাড়ী। অঙ্গে অঙ্গে ঝকঝকে স্বর্ণাভরণ। শুধু মুকুট নেই মাথায়। একটি শুধু চুনী-পান্নার মুকুট মাথায় থাকলেই আর কোন পার্থক্য থাকতো না। চোর-পুলিশ খেলার খেলুড়ের মতই লুকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। খোলা দরজার পাল্লার ফাঁক থেকে দেখে উঠোনটা। শোনে, পূর্ণশশী থেমেছেন, না আরও লজ্জা দেওয়ার অভিপ্রায়ে আরও কিছু বলছেন। রাজেশ্বরীর ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিতে শিশুর সারল্য ফুটেছে।

—আয় বৌ, আয়। একটা কথা বলি শোন্।

বাইরে থেকে ডাকলেন পূর্ণশশী। খিল-খিল হাসির মাঝে মাঝে। রাজেশ্বরী তখন নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু। পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অচল-অনড় হয়ে। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখছে দরজার পাল্লার ফাঁক থেকে। দাঁতে আঁচল কামড়ে।

—কমনে গেলি বৌ? শোন্, জরুরী কথা আছে। মাইরী বলছি, শুনে যা।

কে কার কথা শোনে। রাজেশ্বরী যেন ধনুক-ভাঙা পণ করেছে, বেরুবে না ভাঁড়ার থেকে। থাকবে অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্নপূর্ণার মত। অনন্যোপায় হয়ে পূর্ণশশী ফের ডাক দেন,—বামুনদি, ও বামুনদি! এক-বার বেরুন তো রান্না-ঘর থেকে।

কি একটা ব্যঞ্জনের পাত্রে গরম মশলা ছড়াতে ছড়াতে ব্রাহ্মণী সাড়া দেয়,—যাই গো যাই।

—আসতে হবে না। দাসীদের কাউকে বলুন আপনাদের হুজুরকে ডাকবে। বললেন পূর্ণশশী।

পূর্ণশশীর কথা শুনতে পেয়ে রাজেশ্বরীর শরীরে লজ্জায় শিহরণ হয়।

ব্রাহ্মণী বললে,—দাসীরা গেল কমনে? বল' দিদি, আপনিই বল'। আমি ত্যাতক্ষণে থালা ক'টায় খাবার সাজিয়ে দিই।

যাতে রাজেশ্বরীর কর্ণকুহরে পৌঁছয় তত উচ্চকণ্ঠে পূর্ণশশী বললেন হাসতে হাসতে,—হুজুরকে ডাকতে হবে। আপনাদের বৌটির চোর-চোর খেলতে ইচ্ছে হয়েছে। দেখছেন না ভাঁড়ারের মাটির জালায় গিয়ে লুকিয়েছে। হুজুরকে ডাকা হোক, হুজুরই টেনে-হিঁচড়ে বের করবে বৌকে।

আর যায় কোথায়। তৎক্ষণাৎ ভাঁড়ার থেকে মা অন্নপূর্ণা সশরীরে লোকচক্ষে আবির্ভূত হন। আর হাসতে থাকেন পূর্ণশশী। খিল-খিল হাসির শব্দে রান্নাবাড়ীও হেসে ওঠে যেন। রাজেশ্বরী সত্যিকার ভয় আর ত্রাসে পূর্ণশশীর সন্নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রায় জড়িয়েই ধরে। প্রায়-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল,—দু'টি পায়ে পড়ি দিদি! ডাকতে মানা করুন। আমি আর কক্ষনও লুকাবো না।

আরও কিছুক্ষণ হেসে বললেন পূর্ণশশী,—তবে লা বৌ? যা শীগ্রি গিয়ে লুকিয়ে পড়্!

রাজেশ্বরী লুকাতে চেষ্টা করে পূর্ণশশীর আড়ালে। বলে,—দু'টি পায়ে পড়ি' আপনার।

হাসি থামিয়ে বলেন পূর্ণশশী,—ঠাগ্‌মা বললেন, তিনি ব'সে আমাদের খাওয়াবেন। নিজে ব'সে। বুড়ী মানুষ, নীচে নামতে পারবেন না। বললেন যে, দোতলার দালানে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

রাজেশ্বরী ভেবেছিল পূর্ণশশী বুঝি বা কৌতুক করছেন। বললে,—ঠাগ্‌মা বলেনি। আপনিই বলছেন।

—মাইরী বলছি, বিশ্বাস কর্। এই তোকে ছুঁয়ে বলছি। পূর্ণশশী কথা বললেন মুখ থেকে হাসি মুছে। সত্যিকার গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে।

—কি হবে দিদি? ভয়ে-ভয়ে শুধোয় রাজেশ্বরী। কি করি আমি?

হেসে ফেললেন পূর্ণশশী। রাজেশ্বরীর মৌখিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। বললেন,—কি আর করবি! স্বামী তোকে খাইয়ে দেবে আর তুই স্বামীকে—

—না না না। রাগের স্বরে বলতে বলতে ছুট দেয় রাজেশ্বরী। পায়ের অলঙ্কার ঝমঝমিয়ে বাজে। ভ্রম হয়, রান্নাবাড়ীতে এই নিশীথ রাতে কে নাচে বুঝি বা। নূপুর-নিক্কণের মতই শোনায়।

হেসে লুটিয়ে পড়েন পূর্ণশশী। অন্দরে প্রতিধ্বনি ভাসে হাসির। কিন্তু সত্যিই, মিথ্যা বলেননি পূর্ণশশী। মাত্র ঐ বৃদ্ধার কথার পুনরুক্তি করেছেন। বৃদ্ধার সাধ হয়েছে মনে। নাতজামাই আর নাতনীকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ানোর প্রবল বাসনা হয়েছে।

যুগলমিলন তো আর সত্যিই চোখে দেখা যায় না, চোখে দেখবারও নয়, তাই যা যতটুকু দেখতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধার অটুট সঙ্কল্প।

কিন্তু খেতে খেতে ঢুলুনি আসে রাজেশ্বরীর। চোখে নামে তন্দ্রার ঘোর।

অন্যান্য রাত্রি অপেক্ষা অনেক গভীর হয়েছে আজকের রাত। আহারে বসতেও যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। খাটা-খাটনিও কি কম হয়েছে

রাজেশ্বরীর আজ! ধকল গেছে কত। লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে মুখে গ্রাস তুলতে তুলতে ঢুলছে রাজেশ্বরী। কাজল-কালো চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে কখন।

পাশাপাশি তিন জনের মধ্যে কথা বলছেন শুধু পূর্ণশশী।

তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রাজেশ্বরীকে লক্ষ্য ক'রে তিনি শুধু সহাস্যে বললেন,—আহা!

শুনতে পায় না রাজেশ্বরী। কানে যায় না।

—কিচ্ছু খাচ্ছো না তো ভাই! বললেন বৃদ্ধা।

কৃষ্ণকিশোর সচকিতে বলে,—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ ভাই, তোমাকেই বলছি। আর কাকে বলব? বললেন বৃদ্ধা। —আমার নাতনী তো ঘুমে ঢুলছে। আর শশীদিদি আমার ঠিক খাচ্ছে। ওকে বলবার কিছু নেই।

রাজেশ্বরীর ঘুম ভেঙে গেল, ঠাগ্‌মার কথার শব্দে। দেখলো, সে শয্যায় নেই। আহারের থালা সমুখে। আবার খেতে লাগলো রাজেশ্বরী। মুখের খাদ্যটুকু চর্ব্বণ করতে লাগলো।

কৃষ্ণকিশোরও সত্যি কিছু খায় না। তাকে যেন মনে হয় ভাবালু। মনে হয়, নেই এ জগতে। বৃদ্ধা ঠিক লক্ষ্য ক'রেছেন, মুখে কিছু তুলছে না।

আগামী কালের প্রতীক্ষায় মনটা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে মধ্যে মধ্যে। একসঙ্গে অতগুলো টাকা—জমিদারীর বকেয়া খাজনা দেওয়ার অলীক প্রতিশ্রুতি—গহরজানের ডালিম—কুমুর খোরপোশের টাকাটা বাকী ফেলেছে কাছারী, কি লজ্জা—একসঙ্গে কত কত ভাবনা—জালের বুনন মনে মনে! রাতের আঁধারকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে আগামী কালের সূর্য্যোদয় হবে কখন?

অনন্তরাম দালানের প্রান্ত থেকে হঠাৎ কথা বললে,—তোমার নামে ডাক আছে।

—আমার নামে? থালা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

—হ্যাঁ, তোমার নামে।

—খাম না পোষ্টকার্ড ?

—খাম। বললে অনন্ত।—খুলে, দেবো তোমাকে ?

—হ্যাঁ !

এখনও ডাকে চিঠি আসলে কখনও কখনও ছাঁৎ ক'রে ওঠে কৃষ্ণকিশোরের বুকটা। কুমু যদি নরম হয়ে কখনও ফেরার কথা জানায়! বালিশে ঘেঁটে-যাওয়া এলোমেলো চুলে বাম হাতের আঙুল চালাতে চালাতে বললে,—কে লিখলে চিঠি।

অনন্তরাম ফ্যাঁস ক'রে ছিঁড়ে ফেললে খামের একদিক। বললে,—চিঠি এক টুকরো আর, আর—

কথা বলতে বলতে কেন থামলো অনন্তরাম ?

সকলের চোখ প'ড়লো অনন্তরামের প্রতি। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আর ?

অনন্তরাম ক'বার পত্রগ্রহীতার মুখপানে তাকিয়ে বললে,—আর একটা ছবি।

ছবি ? শুধু ছবি ? শুধু পটে লিখা ?

—কার ছবি অনন্ত ? আগ্রহে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম তখন ভাবছিল বলবে কি বলবে না। যার ছবি তাকে এই বাড়ীতে কেবল মাত্র জানে অনন্তরাম। তাই ভাবছিল, বলবে কি বলবে না এই গেরস্থের সামনে।

—কথা ব'লছো না যে অনন্ত ?

ছবির মানুষটির আসল পরিচয় ব্যক্ত করবার স্থান নয় অন্দরে। বিষয়টা লঘু ক'রে দেওয়ার জন্যই বলে অনন্তরাম,—এ সেই মরা মেয়েটার ছবি। তার বাপ পাঠিয়েছে।

পূর্ণশশী আর রাজেশ্বরীর পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হয়। রাজেশ্বরীর মুখটা কেন থম-থম করছে!

—কে মরা মেয়ে? কার বাপ পাঠালো ছবি?

মাদকতার গুণে স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে নাকি কৃষ্ণকিশোরের!

অনন্তরাম বললে,—সেই যে হে, তোমার ফিরিঙ্গী বন্ধুটার বোনের ছবি। ম্যালোয়ারীতে ভুগে-ভুগেই কচি মেয়েটা সাবাড় হয়ে গেল! আহা!

—ও! বললে কৃষ্ণকিশোর।

চোখের সমুখ থেকে রঙ্গমঞ্চের পর্দ্দা উঠে অন্য এক দৃশ্য দেখা দেয় যেন। ঘরে মশাল জলছে। পিয়ানো বেজে চলেছে। অপেল পাথরের গয়না আর সাদা রেশমের লেস্‌ দেওয়া গোলাপী ঘাগরা-পরা লিলিয়ান। মৃদু মৃদু হাসছে আর পিয়ানোয় বাজিয়ে চ'লেছে চার্চ্চ-সঙ্গীত। রিপন ষ্ট্রীটের বাঙলো প্যাটার্ণের বাড়ীর একটি কামরায় কত রোমাঞ্চ!

—দেখি দাও। বললে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম চিঠি আর ছবিটা নামিয়ে দেয় কাছাকাছি এক পাশে।

সেই ছবিটা না? যেটা ছিল ওদের ড্রইং রুমের ফায়ার-প্লেশের শীর্ষে? পরীর মত সেই মেয়েটা না? ছবি পাশে রেখে দিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকে কৃষ্ণকিশোর। সব আগে দেখে কে লিখেছে? চিঠিতে লেখা—

প্রিয় বন্ধু,

আমার পুত্র এবং কন্যার বিদায় গ্রহণের জন্যই যে আপনার সাক্ষাৎ পাই না তাহা আমি অনুমানে বুঝিয়াছি। আমার পুত্র এখন ফেরারী আসামী। সে আমার কলঙ্কস্বরূপ। কিন্তু আমার কন্যা? আমার সেই আদরের লিলির একটি প্রতিকৃতি পাঠাইতেছি। গ্রহণ করিবেন। আমার লিলির স্মৃতি আমি জনচিত্তে ব্যাপ্ত করিতে চাই। সেই আশায় এই প্রতিকৃতি পাঠাইলাম। ফরাসী দেশ হইতে চিত্রটি প্রস্তুত করাইয়া আনাইয়াছি। আমার বক্ষের অন্তস্তলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদক

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র মুখার্জ্জী

চিঠিটা পড়া শেষ হ'লে কৃষ্ণকিশোর চুপচাপ ব'সে থাকে। দালানের প্রায় সকলেই গম্ভীর হয়ে যায়।

ঠাগ্‌মা আর থাকতে পারলেন না যেন। বললেন,—খাওয়ার পাতে ম্লেচ্ছদের ছবিটা ভাই স্পর্শ করলে? বাচ-বিচার করতে নেই?

রাজেশ্বরী ভেবে যেন কিছুই কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। ছবি! ফিরিঙ্গী বন্ধু! ফিরিঙ্গী বন্ধুর মরা-বোন কচি মেয়ে! কোন কিছুই যেন বোধগম্য হয় না রাজেশ্বরীর। চুপচাপ ব'সে কুল-কুল ঘামতে থাকে। যাক্, তবুও মেয়েটা যা হোক ম'রে গেছে।

—কাগজে দোষ হয় না ঠাকুমা। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—তা ব'লে ভাই খাওয়ার পাতে ছোঁয়াছুঁয়ি? বৃদ্ধা বললেন,—না ভাই, সেটা উচিত নয়। যতই হোক ব্রাহ্মণের ছেলে! নাও, নাও, তোমরা খাওয়া থামিও না। আমি দেখি, তোমরা দু'টিতে খাও আমার সামনে। দেখে হিদয় আমার জুড়ুক। আমার মনে যে কত সাধ, কেউ কি জানে?

পূর্ণশশী বললে,—ঠাকুমা, আমার খাওয়া বুঝি দেখবেন না? নাতজামাই আর নাতনীর খাওয়া দেখলেই চলবে তো?

—ও আমার দিদিভাই, ম'রে যাই ম'রে যাই! বললেন বৃদ্ধা।—তোমার খাওয়া দেখবো না, তা কখনও হ'তে পারে? তুমি যে আমার দিদিভাই; আমার মায়ের পেটের বোন যে তুমি। আমার খাওয়া তুমি দেখবে। লক্ষ্মী মেয়ের মত কেমন আমার দুধ-মিষ্টি নিমেষের মধ্যে তৈরী করলে!

সদরের ফটকের কাছে ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে শুরু করলো। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

কোথা দিয়ে যে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যায় জানতে পারে না রাজেশ্বরী।

কথা শুনে ধড়মড়িয়ে যখন ওঠে তখন জানলা থেকে শরৎকালের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে।

—বৌ ওঠ'। উঠবে না?

—উঁ?

—বেলা হয়েছে কত! বৌ, উঠে পড়'।

—উঁ?

—ঠাকুমা যে ফিরে যাবেন। আজ তাড়াতাড়ি ওঠ', লক্ষ্মীটি।

চোখ মেলে তাকালো রাজেশ্বরী। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু পত্রবহুল আয়ত আঁখি মেলে রাজেশ্বরী। যেন ধীরে ধীরে একটি পদ্মফুল পাপড়ি খুললো। চোখ খুলে দেখলো রাজেশ্বরী, পাশে ব'সে ডাকছে তাকে কৃষ্ণকিশোর। একটু মৃদু হেসে পুনরায় চোখ দু'টি বন্ধ ক'রলো।

—উঠবে না বৌ?

—হ্যাঁ, এই যে উঠছি। আরেকটু ঘুমোই। রাজেশ্বরী মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে। চোখ বন্ধ ক'রে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে রাজেশ্বরীর কোঁকড়ানো চুলের কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা আচমকা ভেঙ্গে গেছে কৃষ্ণকিশোরের। কত কাজ আজ! এই দিনটির প্রতীক্ষায় কাতর হয়েছিল গতরাত্রি থেকে। কৃষ্ণকিশোর কিছুতেই ভেবে পায় না, অতগুলো নগদ টাকা কেমন ভাবে পৌঁছে দেবে গহরজানের হেফাজতে। ঘুমন্ত রাজেশ্বরীর হাতের আঙুলগুলি ধ'রে নাড়াচাড়া করতে করতে কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল গহরজানকে।

গহরজানের রূপ। গহরজানের মুখ। গহরজানের—

সূর্য্য যেন আজ ভোর থেকেই মাতলামি শুরু ক'রেছে।

শরৎ-আকাশের পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের রাশি কোথা থেকে ভেসে আসছে নীরব স্বচ্ছন্দ গতিতে। রাশি রাশি মেঘে গলিত রৌপ্যের শুভ্রতা। সূর্য্য কখনও হাস্যময়, কখনও স্তব্ধ-গম্ভীর। কখনও তার আত্মপ্রকাশ আর কখনও আত্মগোপন। আলো-ছায়ার খেলা চ'লেছে শহর কলকাতায়। উড়ু-উড়ু বাতাস বইছে। সূর্য্যরশ্মিজালে নেই তেমন প্রাখর্য্য। আজকের আবহাওয়া যেন সকল মানুষকে করেছে অন্যমনা। কর্ম্মক্ষম মানুষও আলস্যমগ্ন হয়ে আছে যেন! বাতাসে কি ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত! মাটির ধূলা বৃত্তাকারে পাক খেতে-খেতে আকাশমুখী হয়ে উড়ছে উর্দ্ধগতিতে। শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি শোনা যায়। দূর-দূরান্তর থেকে উড়ে-আসা শ্বেতপক্ষীর ঝাঁক, কলকাতার আকাশ-পথে উড়ে চ'লেছে দূরে, বহু দূরে। বলাকার সারি একেকটি, উড়ছে দল বেঁধে। মৎস্যলোভী বক অসংখ্য। চিৎপুরের মসজিদের মিনারের মাথায় সূর্য্যের খেলা দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে যায় গহরজান। একটা ভজন গানের একটা কলি গুন-গুন ক'রে গাইতে গাইতে আর সূর্য্যের খেলা দেখতে দেখতে গহরজান ভাবছিল আকাশ-পাতাল। আজকের মত সুখের দিন কবে এসেছে! ঘরের কোলের অলিন্দে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছিল গহরজান। ঘুম-ভাঙা চোখে।

মুখে-চোখে জল দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছিল গহরজান। পরনের পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে পরেছিল ধৌতবস্ত্র। বদলে ফেলেছিল গায়ের জামা দু'টো। আতরের শিশি থেকে হেনা আতরের এক বিন্দু লেপন ক'রেছিল হয়তো দুই ভুরুতে। হাস্নোহানার সুগন্ধে নেশা-নেশা লাগছিল

গহরজানের। কাছাকাছি কোন' ঘরে কেউ এই সাত্‌সকালে তালিম নিতে বসেছে। একটা ফাটা হারমনিয়মের সঙ্গে গলা সাধছে। ওস্তাদে হাতো তবলায় চাঁটি মারছে। হারমনিয়মের সজোর স্বরের সঙ্গে সঙ্গে তবলার মৃদু-মৃদু বোল ফুটছে। কালোয়াতের হাত, কলাবৎ কথা বলায় যেন বাদ্যযন্ত্রে। বাঁয়া-তবলার বুকে।

—আয় গহর, খাবি আয়!

ঘরের মধ্যে থেকে ডাকলো সৌদামিনী। গহরজান ঘুম-ঘুম চোখে ফিরে তাকালো।

আবার ডাকলো সৌদামিনী।—আয়, ঘরে আয়! মুখ-হাত ধুয়েছিস, কিছু মুখে দে।

গহরজান দেখলো মাসীর হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা। বেশ বড় একটা ঠোঙা। গহরজান বললে,—ঠোঙাতে কি আছে মাসী?

দন্তহীন মুখে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হাসলো সৌদামিনী। বললে,—গঙ্গার চান করতে গিয়ে ফিরতি পথে মতিলালের দোকান থেকে কিনে ফেললাম। ছাখ্ গহর, চার গণ্ডা পয়সায় কত, ছাখ্!

সত্যিই ঠোঙায় ছিল এক-ঠোঙা বেগুনী, পটলি আর ঝাল-ঝাল আলুর চপ।

চাঁপার কলির মত হাতের আঙুলে কপোল স্পর্শ করলো গহরজান। বললে,—ইস্!

সৌদামিনী আনন্দের হাসি হেসে বললে,—গরম, হাতটা আমার পুড়ে গেছে ঠোঙা বইতে-বইতে। তুই খা, দেখে আমার চক্ষু জুড়োক্।

সৌদামিনীর চোখ দু'টো এখনও লাল টক-টক করছে।

গঙ্গায় অবগাহনে আরো লাল হয়েছে। নগদানগদি কিছু টাকা গতকাল পেয়ে সৌদামিনী পরমানন্দে একটা সবুজ রঙের বোতল খুলে ব'সেছিল। অনেক দিন পরে খেয়েছিল সৌদামিনী। কাঁচা পেঁয়াজে কামড়

দিতে দিতে খেয়েছিল জলসোডাহীন দু'-চার পাত্র। সৌদামিনীর পানের পাত্রটা ছিল বোহেমিয়ান কাট্-গ্লাশের। রথের মেলা থেকে পছন্দ ক'রে কিনেছিল সৌদামিনী। একটা নয়, দু'টো।

জলসোডাহীন রঙীন পানীয়কে ভয় করে না সৌদামিনী। প্রথম প্রথম বেশ ডরাতো, ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে পরিণত ক'রে নিয়েছিল। তারপর যৌবন যেদিন থেকে সত্যিকার গত হয়েছে সেদিন থেকে রাশ টেনে ধ'রেছে। কিন্তু গতকাল হাতে টাকা পেয়ে ফূর্তির আতিশয্যে লোভ সামলাতে পারেনি সৌদামিনী। গহন রাতে ঘরের অর্গল তুলে দিয়ে একা-একা সাবাড় ক'রেছিল সবুজ বোতলটা। বেশ ভালো লেগেছিল সৌদামিনীর, বোতলের জল বেশ মিষ্টি-মিষ্টি লেগেছিল। প্রায় সরবতের মতই সবুজ বোতলটায় ছিল বিলাতী জিন। ড্রাই নয়, সুইট্।

তাই ভাঁটার মত হলুদ বরণ চোখ দু'টো সৌদামিনীর এখনও আজ রক্তিম হয়ে আছে।

ফিরে দাঁড়ালো গহরজান। এক নাচের ভঙ্গীতে। জরি-জড়ানো বিনুনীটা সপাং ক'রে পেছন থেকে বুকে পড়লো। চললো দরজামুখে।

সৌদামিনী বললে,—খাবি না? চল্লি কোথা?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে যেতে যেতে বললে গহরজান,—আমি কি রাক্ষুসী? খেতে পারি কখনও! ডেকে নে আসি আমার দোস্ত্ ক'জনকে।

—বেশ কথা। তাই যা। সকলে মিলে-মিশে খা। দেখে আমার চোখ জুড়োক। কথা বলতে বলতে তেলে-ভাজার ঠোঙা ঘরের কোণে নামিয়ে রাখলো সৌদামিনী। পথশ্রমে ক্লান্ত মুখখানা মুছলো ভিজে আর ময়লা গামছাটায়। বাহুতে ঝুলছিল গামছাটা।

কাদের ডাকতে গেল গহরজান! খুশীর উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের মত নাচতে নাচতে?

সহযাত্রী গহরজানের। একই ব্যবসায়ে সমান অংশীদার যারা। এই বারোয়ারী ইমারতে আর আর যারা আছে আপন আপন অংশে।

এক দল সখী। গহরজানের সুখ-দুঃখের সমব্যথী। এক দল হিন্দু আর মুসলমান নারী। কেউ ভাগ্যদোষে, কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে, আবার কোন' কোন' লালসাময়ী স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছে এই পাঁকের পৃথিবী।

যে-পাঁকে আছে গহরজানের মত গোলাপী পদ্ম দু'-একটা।

গহরজান দেখতে পায়নি তার পিছু পিছু অনুসরণ ক'রেছিল তার পোষা ডালিম বিল্লীটা। গহরজান দেখতে পেয়ে বুকে তুলে নেয় ডালিমকে। চেপে ধরে কোমল বুকে, যেখানে আছে সবুজ পাতলা ভেলভেটের পুরানো কাঁচুলী। রঙীন পুঁতির কাজ জামাটায়। গহরজান সোল্লাসে বললে,—তোর যে সাধি হবে ডালিম! চার ঘোড়ার গাড়ীতে যাবি সাধি করতে?

ডালিম কোন' প্রত্যুত্তর দেয় না। শুধু মিটি-মিটি তাকায়; লেজটা দোলায় স্নেহাতিশয্যে। গহরজানের বুকে চেপে ধরে মুখটা। একে-তাকে খোঁজে গহরজান। এ-ঘরে সে-ঘরে। কেউ আছে, কেউ নেই। গেছে পুণ্য অর্জ্জন করতে, গঙ্গাস্নানে।

একটি ঘরের দরজার সমুখে পৌঁছে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গহরজান!

ভৌতিক ব্যাপার না কি? অদ্ভুত এক গোঁঙানির শব্দ আসছে কোথা থেকে? কান্নার শব্দের মত। কে কাকে কি অত্যাচার করলো! যে কাঁদছে, তার কি এমন ব্যথা লাগলো! আর অতিরিক্ত কষ্টভোগ না করলে কেউ এমন কাঁদে না। খুব স্পষ্ট হয়ে প্রায় গহরজানের কাছে ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো কান্নার সুর, ঘরের ভেতর থেকে।

ঘরখানা চামেলী বিবির; কণ্ঠস্বরও কি তার?

চামেলী বিবির কি এমন দুঃখ যে এমন অসময়ে, যখন ঘরে কোন' মানুষ থাকে না তখন এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? আর থাকতে পারলো না গহরজান। দরজাটা মৃদু করাঘাতে খুলে ফেললো। ঘরটা প্রায়ান্ধকার। জানলাগুলো পর্য্যন্ত খুলতে ফুরসৎ পায়নি চামেলী।

একটা বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল চামেলী।

দরজা খুলতে যতটুকু আলো ঘরে প্রবেশ করলো তাতেই দেখলো গহরজান। চামেলীর ধবধবে ফর্সা দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছে। আর চামেলী কাঁদছে ফুলে-ফুলে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। গোঁঙানীর মত ক্রন্দন-ধ্বনিতে মুখর হয়ে আছে ঘরটা।

—কি হয়েছে দিদি?

ডালিমকে নামিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে চামেলীর পিঠে হাত বুলিয়ে শুধোয় গহরজান! সহানুভূতির স্নেহসিক্ত কণ্ঠে।

কোন' উত্তর মেলে না। চামেলীর সকরুণ ক্রন্দন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে থাকে যেন। একবারে যখন উত্তর পাওয়া যায় না, তখন আরও কয়েক বার জিজ্ঞেস করলো গহরজান। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুভারাক্রান্ত মুখ ফেরালো চামেলী। গহরজানের একটি হাত ধ'রে তাকিয়ে থাকলো কয়েক মুহূর্ত্ত। গহরজান বললে,—কাঁদো কেন ভাই?

—কে, গহর?

—হাঁ, আমি। তোমার চোখে জল কেন? কি হ'ল কি?

চামেলীর আঁখিদ্বয়ে বুঝি বন্যার ধারা নামলো তৎক্ষণাৎ। কেঁদে-কেঁদে চামেলীর চোখ দু'টি ফুলে উঠেছে। মাথার একরাশ রুক্ষ চুল এলো-মেলো হয়ে গেছে। অবিন্যস্ত দেহাবরণ। কোন' দিকে যেন খেয়াল নেই চামেলীর।

—কি হয়েছে কি? আবার জিজ্ঞেস করলো গহরজান। শাড়ীর আঁচলে চামেলীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে।

—উনি আর নেই। কাল রাত্তিরে মারা গেছে। অনেক কষ্টে মুখে কথা ফোটায় যেন চামেলী। তার বক্ষ মথিত ক'রে কণ্ঠে কথা ফোটে যেন।

—কে দিদি? অবুঝের মত বললে গহরজান।

—আমার স্বোয়ামী। পক্ষাঘাতে ভুগছিলো এত দিন। কত টাকা খরচা করেছি চিকিৎসে করাতে! কোন' কাজে লাগলো না? কাঁদতে কাঁদতেই বললে চামেলী।

বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক্ হয়ে যায় গহরজান। এ কি বলছে চামেলী! স্বামী কোথা থেকে পাবে চামেলী! নেশার ঘোরে মাতলামি করছে না তো! কত রূপশ্রী চামেলীর, কিন্তু এখন তাকে দেখাচ্ছে কত ভয়াবহ! একরাশ এলোমেলো চুল। রক্তাভ চোখ দু'টো বুঝি বা কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। লজ্জা ভুলে গেছে যেন চামেলী। খেয়ালই নেই পরনের শাড়ীটা লুটিয়ে পড়েছে দেহ থেকে। নেহাৎ একটা ছোট জামা ছিল উর্দ্ধাঙ্গে!

কিছু বুঝতে পারে না গহরজান। দেখে-শুনে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। গহরজানের সহযাত্রীদের কারও বিবাহিত স্বামী থাকতে পারে, তা যেন কল্পনাতীত তার কাছে। উঠে পড়লো গহরজান।

স্বোয়ামী! স্বামী! স্বামী মারা গেছে গতরাত্রে! চামেলী দিদির আবার স্বামী আছে না কি? না, নেশার ঘোরে মত্ততা প্রকাশ করছে! ঐ তো চামেলীর বিছানার ও-পাশে রয়েছে গতরাত্রির পানপাত্র। শূন্য বোতল। এখনও বোধ হয় একটা পাত্রে প'ড়ে আছে সামান্য মদিরা। যেন রক্তের মত।

চামেলী বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে থেকেই তার কান্নার কারণটা ব্যক্ত করে। গহরজান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্তর্পণে ত্যাগ করলো চামেলীর ঘর। যেতে যেতে ভাবলো, মাসীকে পাঠিয়ে দেবে। মাসী যদি সামলাতে পারে, বুঝতে পারে কান্নার উৎস কোথায়,

কোথায় আসল দুঃখ। চামেলীর চোখের জলের ছোঁয়াচ লাগে যেন গহর-জানের চোখে। ছল-ছল করে গহরজানের চোখ দু'টি, সহানুভূতির ব্যথায়। তাড়াতাড়ি পা চালায় গহরজান।

সৌদামিনী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে শুনলো গহরজানের কথা। চামেলীর ক্রন্দনের ইতিবৃত্ত।

গহরজান ভেবেছিল, মাসী শুনে কি বলবে না বলবে। কিন্তু সৌদামিনী বক্তব্যের শেষটুকু শুনে হাসলো আপন মনে। দুঃখের হাসি কি না বুঝলো না গহরজান। সৌদামিনী বললে,—যাক্, ভালই হয়েছে। এ্যাদ্দিনে হাড় জুড়োবে চামেলীর। শ'য়ে শ'য়ে টাকা খরচা ক'রেছে সোয়ামীটার জন্যে। সোয়ামী পক্ষাঘাতে ভুগছে আজ থেকে নাকি? চামেলী যা ওজগার ক'রেছে, দিয়েছে ঐ সোয়ামীর জন্যে। কখনও ভালো ক'রে পেটে খায়নি, একটা ভাল শাড়ী অঙ্গে চড়ায়নি। নেহাৎ অপ্সরীর মত রূপটা ছেলো, তাই রক্ষে। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে সৌদামিনী। বলে,—তা তোর চোখে জল কেন? বেঁচে গেলো তো চামেলী। অমন সোয়ামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। আয়, আয় তুই খাবি আয়।

গহরজান দুঃখ-কাতর কণ্ঠে বললে,—বড্ড কাঁদছে চামেলী দিদি। তুমি একবার যাও না মাসী!

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে আবার হাসলো সৌদামিনী! হাসতে হাসতেই বললে,—তোর তাতে ভাবনা কি? কাঁদতে দে, কাঁদতে দে। না কেঁদে বুকে শোক পুষে রাখলে আরও কষ্ট। গুমরে গুমরে মরার চেয়ে ডাক ছেড়ে কান্না ভাল। আর কাঁদবে কতক্ষণ? আপনিই চুপ ক'রে যাবে। তুই এখন খা দেখি!

ঠোঙা থেকে আহার্য্য তুলে নেয় গহরজান। দাঁতে কামড়ায় গরম গরম তেলেভাজা খাবার।

এমন সময়ে কার কণ্ঠস্বর!—মাসী আছস্ নাকি?

সৌদামিনী বললে,—হ্যাঁ আছি। তুমি কে ?

—আমি গো আমি। কত দিন দেখাশুনা নাই। তোমার কাছে বিকিকিনি করতে আইছি।

—অ, তুমি ত্রিলোচন না? সৌদামিনী জিজ্ঞেস করলো। কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গীতে।

—হাঁ গো হাঁ! ভুলে তো যাও নাই ছাখ্‌সি!

সৌদামিনী খিল-খিল হাসলো। হাসতে হাসতে বললে,—ত্রিলোচন, তোমারই ভীমরতি হয়েছে, চোখের দিষ্টি গেছে, মানুষ চিনতে পারো না তুমি! আমি ঠিকই আছি। বয়েসটা তোমার কত হ'ল শুনি ?

ত্রিলোচন প্রায় অশীতিপর। লোলচর্ম্মা। চোখে ঠুলী। সুতোয় বাঁধা চশমা। ত্রিলোচন সহাস্তে বললে,—বেশী হয় নাই। এই চুরাশী।

সৌদামিনী ফাজলামির হাসি হাসলো। বললে,—মোটে চুরাশী! তা ভাল। মাল কোথায় তোমার ? শুধু দর্শন ?

ত্রিলোচন বললে,—না গো মাসী, না। মাল সাথে না থাকলে আইমু ক্যান্? আছে, মাল আছে, কুলীর মাথায়। আমি কি আর বুড়া বয়েসে বইতে পারি ? যখন পারতাম তখন পারতাম। বল' তো প্যাটরা খুলে দেহাই দু'-চারখান!

আবার হাসলো সৌদামিনী। মস্করার হাসি। বললে,—তা দেখাও। নয় তো তোমার মত বুড়ো মানুষকে দেখে আমাদের কি লাভ বল' ?

কুলীর মাথা থেকে প্যাটরা নামায় ত্রিলোচন। বলে,—বটেই তো। বুড়া দিয়ে কোন কাম হয়? যা ঢাকাই শাড়ী দেখাবো মাসী, দেখে তোমাগোর চক্ষু ঠিকর‍্যা যাবা। একেবারে হাল্ ফ্যাশনের। যেমন খোল, তেমন আঁচলা, তেমনি পাড়!

ব্যাধি জরা বৃদ্ধের ঠাঁই নেই এখানে।

বার্দ্ধক্যের লজ্জায় ত্রিলোচন কথা বলে না আর। কথা থামায়। সওদা

খুলে বসে। প্যাটরা থেকে একেক শাড়ী বের করে আর দেখায়। সৌদামিনী দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। দেখে এমন ভঙ্গীতে যে যেন এমন এমন অনেক দেখেছে সে।

গহরজান ভাবছিল ঘরের কোলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে, ভৌতিক ব্যাপার নয় তো! বাতাসের দাপাদাপিতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোন্ দিক থেকে আসছে আওয়াজ। চামেলী বিবির কান্নাটা যেন চার দিকে দৌড়াদৌড়ি করছে। তেলেভাজা দাঁতে কামড়াতে ভাল লাগছে না গহরজানের। তার চেয়ে ঢের ভাল লাগছে জরি-জড়ানো সাপের মত বেণীটা হাতে ধ'রে খেলা করতে।

কিন্তু বাম চোখটা কেন এমন বার বার নর্ত্তন করলো!

গহরজান বিস্ময় মানে। বিশ্বাস করতে মন চায় না। ছুটে যায় মাসীর কাছে। আবদারের স্বরে বলে,—মাসী, মাসী, হামার বাম-চোখ দু'টো নাচলো।

স্থূলকায় সৌদামিনী। মেদবহুল শরীরটা নড়তে-চড়তেই কত ঘণ্টা। মাসী ঘাড় বেঁকিয়ে বকুনির ঢঙে বললে,—চুপ্, চুপ্, চুপ্,—বলিস নে কাকেও। বলতে নেই। ভালই তো। আয় তোকে সাজিয়ে দিই। মুখে পেণ্ট্ করে দি।

—বলতে নেই বুঝি মাসী? শুধোয় গহরজান।

—না। বললে আর কাজ হয় না। তা, আমাকে যখন বলেছিস তখন দোষ নেই। আমি তো তোর মায়ের মত। কথাগুলো সৌদামিনীর কেমন যেন মাতৃত্বের স্নেহে সিক্ত।

চমকে ওঠে যেন গহরজান।

গহরজান ভীষণ ডরায় মাসীকে। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদকে অত্যন্ত ভয় করে গহরজান। মাসী কিচ্ছু চায় না, শুধু টাকা চায়। শুধু টাকা। মাসীর গুণকীর্ত্তনের কথা ভেবে শিউরে শিউরে ওঠে গহরজান।

পাশবিক অত্যাচার, যাকে সচরাচর বরদাস্ত করতে পারে না গহরজান, সেই অত্যাচারের যত মূল ঐ মাসী। ঐ সৌদামিনী।

সৌদামিনী গভীর জলের মাছ।

গহরজান যার কাছে শিশু। গহরজান জানে কিছু কিছু, মাসীর টাকা দিয়ে কি কাম। সৌদামিনী আবার শেষ বয়সে ফিরে যাবে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে—যে উদ্দেশ্য বুকে গোপন রেখে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা চ'লেছে। সৌদামিনী স্থির ক'রেছে, শেষ কালে কাশীবাসী হবে। কাশীতে মরবে।

কাশীতে তাই একটা জমি কিনতে বদ্ধপরিকর হয়েছে সৌদামিনী। খান কয়েক ঘর তুলে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা কাশীতেই। জীবনের যত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে সৌদামিনী। কে জানে বরাতে কি আছে শেষটায়!

—ত্যাখ্ গহর, তোর জন্যে এই দু'খানা রাখছি। বললে সৌদামিনী।

ঠিক সাপের মত ফণা বেঁকিয়ে ধারালো দৃষ্টিতে তাকালো গহরজান। দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বললে,—হামি জানি না।

সৌদামিনী বললে,—তুই আবার জানবি কি? চিরকাল আমিই তো যা-কিছু পছন্দ করেছি। তুই কি জানতে যাবি?

সত্যিই দু'খানা জবর শাড়ী মাসী পছন্দ ক'রে ফেলেছে। একসঙ্গে দু'খানা শাড়ী! একটা সূতী আর একটা জরির ঢাকাই। একটা আকাশী, আর একটা ধূপছায়া রঙের। একটার দাম আটারো সিকে, আরেকটার সাড়ে দশ টাকা। ঢাকাই শাড়ীর জরি মানুষের করস্পর্শে ঝলমল ক'রে উঠলো। ঠিক যেন একরাশ স্বর্ণালঙ্কার।

নারী জাতির বাম অঙ্গ কম্পিত হওয়া নাকি শুভ লক্ষণ।

গহরজান অনেক ভেবেও কিছু ভেবে পায় না, কি তার ভাল হতে পারে। কি লাভ হবে। সহসা গহরজানের মনে পড়ে, আজকে গহরজান

বেশ মোটা টাকা পাবে ডালিমের বিয়ে বাবদ। পাবে হাতে-হাতে, পাবে নগদানগদি। পাবে একটা রৌপ্যস্তূপ। কুইন ভিক্টোরিয়ার আবক্ষ মূর্ত্তির ছাপমারা রাশি-রাশি টাকা। তার মধ্যে দু'-পাঁচ গণ্ডা আকবরী মোহরও যে না থাকতে পারে এমন নয়। ডালিমের বিয়ে হবে কত জাঁকজমকের সঙ্গে, কত বাদ্যি বাজবে, কত আতসবাজী পুড়বে—ভাবতে ভাবতে বুঝি পুলকের জোয়ার ওঠে গহরজানের দেহ-মনে। দিল্ খুশ হয়ে যায় তার। মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে সে। গুন-গুন শব্দে একটা দাদ্‌রা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কথা ভাবতে থাকে। ভাবে, কতক্ষণে দেখা পাবে। কতক্ষণে টাকা পাবে।

পথ জনবহুল। যেদিকে ফিরাও আঁখি শুধু জনপ্রবাহ।

বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম পর্ব্ব দুর্গোৎসব আসন্ন। রাজা-রাজড়া আর বনেদী বাবুদের গৃহে মা দুর্গার পূজা হবে। দশপ্রহরণধারিণীর পূজা। প্রতিমা গঠনের কাজ চলেছে দালানে দালানে। গহরজান লক্ষ্য করে, কেমন যেন একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের ঢেউ বইছে এ তল্লাটে। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসেছে। ঠেল মেরেছে এই গরাণহাটা পর্য্যন্ত। গহরজানের চোখে পড়ে জায়গায় জায়গায় রঙ-করা পাটের চুল; তবলকীর মালা; টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তরোয়াল আর নানা রঙের ছোবানো প্রতিমার পরনের কাপড় ঝুলছে। ফেরীওয়ালার দল বেরিয়েছে। কেউ বলছে,—"মধু চাই! খাঁটি মধু নেবে? সুন্দরবনের মধু!" কেউ হাঁকছে,—"শাঁকা নেবে গো!" ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে ত্যাগ করেছে। আদেখ্‌লারা যত পারছে আর্সি, ঘুনসি, গিল্‌টির গয়না ও বিলেতী মুক্তো একচেটেয় কিনছে। সেই সঙ্গে

বেলোয়ারী চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলেতী সোনার শীল আংটিও চুলের গার্ডচেনেরও অসংখ্য খরিদ্দার।

পুজোর দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাজারের কেনা-বেচার হৈ-হল্লা সপ্তমে উঠছে। কলকাতা তত গরম হয়ে উঠছে। পথের অদূরে একটা কোলাহল। একটা ছোটখাটো জনারণ্য। পুজোর মরশুমে খুনে, দাঙ্গাবাজ, সিঁধেল-চোর আর বাটপাড়ের কারবার ফলাও হয়েছে। একটি মহিলার নাক থেকে সোনার নথ ছিঁড়ে নিয়ে পালাতে যেয়ে একজন গাঁটকাটা ধরা পড়ে বেদম মার খাচ্ছে আর পরিত্রাহি চীৎকার করছে। চোখ বড় ক'রে দেখছে গহরজান। মহিলা রক্তাক্ত নাক চেপে ধ'রে চোরের চৌদ্দ-পুরুষান্ত করছে।

দেহে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকে থেকে-থেকে।

একটা দাদ্‌রা স্থরের গান গুন-গুন গাইতে গাইতে গহরজান ভাবছিল ডালিমের বিয়ের কথা। কত আয়োজন হবে, কত বাজনা বাজবে, কত বাজী পুড়বে। গ্যাসবাতির গেট আর রেলিঙের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে গরাণহাটা পল্লী। চারি দিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। মেঠাই, মাংস আর মোঘলাই পরোটার মেলা বসবে গহরজানের ঘরে। সেই সঙ্গে মদ। মদের বন্যায় ভাসবে গহরের পরিচিত জন-মানুষেরা।

কিন্তু টাকা সমেত দেনেওয়ালার পাত্তা নেই কেন ?

ভাবছিল গহরজান, আর কত দেরী। টাকার ঘড়া হাতে পৌছতে আর কতক্ষণ ?

অলিন্দের নীচে একতলায় সর্পিল পথ। একজন পানওলা পানরাঙা দাঁত দেখিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞেস করে,—পান পাঠাবো বিবিজান ? তবক দেওয়া পান।

মুখখানা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়ে নেয় গহরজান।

পোড়ামুখো পানওলাকে দেখে বিরক্তির পূর্ণমাত্রায় ঘরে ঢুকে পড়ে মুখ ঘুরিয়ে। আক্রোশের সঙ্গে বলে,—বেয়াদপ !

ঘরে গিয়ে এ[illegible] ফাটা আয়নার সামনে চলে যায় গহরজান। আয়নায় দেখে মুখটা। মাসী কতক্ষণে পেণ্ট্ ক'রে দেবে? ইতিমধ্যে পৌঁছে যায় যদি টাকার ঘড়া আর—

কৃষ্ণকিশোর কাছারীতে বসেছিল।

হেড-নায়েবের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। হেড-নায়েব বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে কাজকর্ম্ম মিটিয়ে ফেলছেন। অঙ্ক কষে দেখছিলেন, ক'ঘর প্রজা আর কতটা জমি। অত্যন্ত জরুরী কাজ, হেড-নায়েব তাই ক'খানা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। প্রজারা জলের দেশের মানুষ, জলের মতই মানুষ। স্বচ্ছ মন, মুক্ত চিন্তা প্রজাদের। স্পষ্ট কথার মানুষ। ঘোর-প্যাঁচ জানে না।

হেড-নায়েব কানে কলম গুঁজে বললেন,—হুজুর, কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আজকেই হুজুরের প্রজারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কাজটা চুকিয়ে না ফেললে ওদের আসাই বৃথা হবে। কৃষ্ণকিশোর শুনছিল হেড-নায়েব আর প্রজাবৃন্দের বাক্য-বিনিময়। কাজের কথা। বললে,— আপনি কাজ চুকিয়ে ফেলুন। কথা পরে হবে।

স্বয়ং হুজুর সমুখে ব'সে আছেন, প্রজারা আর গমস্তা-নায়েবের দল ভয়ে সিঁটিয়ে তটস্থ হয়ে আছে যেন। প্রজারা কথা কচ্ছে আর হুজুরের পানে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। আমলারা তাকাচ্ছে না মুখ তুলে, যন্ত্রের মত কাগজের বুকে কালির আঁচড় তুলছে। নাম, গোত্র আর টাকার সংখ্যা। হেড-নায়েবের হাতে অনেক কাজ।

জমিজমার কাজ। জমি আর জমার কাজ।

হেড-নায়েব লিখছিলেন। শূন্য, ফাঁক পূর্ণ করছিলেন।

জমাবন্দি বা কড়চার নম্বর লিখছিলেন। প্রজার নাম আর জমির

পরিমাণ লিখছিলেন। খাজনা, সেস্, একুন লিখছিলেন। খতিয়ান নম্বর। দখলিকার প্রজার নাম লিখছিলেন। লিখছিলেন মূল জমিদারের নাম। যথা—ভারত-সম্রাট, জমিদার অমুক, পত্তনিদার কৃপানাথ মণ্ডল, দরপত্তনিদার লক্ষ্মণ হাজরা, গাঁতিদার যুধিষ্ঠির বরাট, প্রজা দাশরথি ঝা।

যত সব জলের দেশের মানুষ। জলের মত মানুষ। শুধু মহামান্য ভারত-সম্রাট আর অমুক জমিদার মানুষ কেমন, জানে শুধু প্রজাবৃন্দ। প্রজা শুধু প্রজা, সম্রাট শুধু নয় প্রজানুরঞ্জক। যেমন শাসন তেমনি শোষণ। গায়ের রক্ত পর্য্যন্ত জল হয়ে যাচ্ছে প্রজাদের। খাজনা দিতে দিতে।

মানুষগুলো বে অব বেঙ্গলের। গঙ্গা আর সাগরের।

আলে চাষ করে। আলেই বাস করে। জমিতে ধান আর সরষে ফলায়। ঘরে হাঁস আর মুরগী পোষে। ডায়মণ্ড হারবারের রক্ষী-সৈন্যদের ডিম যোগায়। ইংরাজ সৈন্যদের ডিম আর নারী আর দেশী মদ যোগায়। কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে চাষ করে আর জলে মাছ ধরে। বজরার দাঁড় টানে। দূর-দূর দেশে বাঙলার মাল-মশলা সরবরাহ্ করে। ঝঞ্ঝা, দুর্য্যোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে। টাইফুন্ সামলায় বছরের পর বছর। ঘর ভাঙ্গে ঝড়ে, আবার মাটির ঘর করে। তালপাতার ছাউনী দেওয়া ঘর।

প্রজার জাতটায় ঘুণ ধ'রে গেছে তাই যত দুঃখু।

খ্রীশ্চান মিশনারীর সৎকাজে আত্মোৎসর্গ করেছে ক'দল জাতভাই। ভিন্নধর্ম্মী হ'য়েছে। কালো মানুষ সাদা হতে চেষ্টা ক'রেছে। খ্রীশ্চান মিশনারীদের শ্যেনদৃষ্টি প'ড়েছে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে। দুঃস্থ অভাবীদের অভাব ঘুচে যাচ্ছে খ্রীষ্টস্মরণে। গ্রামে গ্রামে গির্জ্জা আর পাঠশালা গ'ড়ে উঠছে রাতারাতি। ইতিমধ্যে দুটো বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছে গাঁয়ে। একটি, "সাধ্বী ইলিসাবেত্ বিদ্যালয়" আর অন্যটি "সাধ্বী গ্যাসারেৎ বিদ্যালয়"। পাদরীরা পড়ায়। পাখী পড়ায়। ধর্ম্মকথা শোনায়। যীশুর বাণী শোনায়।

খ্রীশ্চান-হয়ে-যাওয়া দেশোয়ালী ভাইদের অপকর্ম্মের লজ্জায় সমগ্র জাতটা যেন ভেঙে প'ড়েছে। একটা শুধু সান্ত্বনা, ঐ বিধর্ম্মীদের কৃত-কার্য্যের জন্য নাকি ভবিষ্যতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শীতলা, কালী, কেষ্টকে ছেড়ে খ্রীষ্টকে? পোর্ট ক্যানিঙের জনমানুষ কি এক ধর্ম্মমোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। মন্দিরে ঘণ্টা বাজে না সেখানে, মসজিদে মানুষ নেই, শেয়াল; গির্জ্জায় কিন্তু ঘণ্টা বাজে। গ্রামকে জাগিয়ে রাখে যেন গির্জ্জার ঘণ্টা।

সুবর্ণরেখা, দামোদর আর গঙ্গানদীর মিলন অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে।

সাগর সঙ্গম অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে পথ চিনে এসেছে সপ্তসাগরপারের মানুষ। সাদা মানুষ। ধর্ম্মের বীজ ছড়াচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। পুরোহিত কল্কে পায় না, মোল্লার মুলুক ব'লে কোন কিছু নেই, পাদরীদেরই জয়জয়কার। শুধু ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্ছে না, ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছে পাদরীরা। জীবনপথে চলার শিক্ষা দিচ্ছে। কথার ছলে শিক্ষা দিচ্ছে।

গহরজানকে টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন কোন শান্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

অস্বস্তি বোধ করছে কৃষ্ণকিশোর। টাকাটা গহরের হেফাজতে গেলে যেন রেহাই পাওয়া যায়। ঐ একটা চিন্তার সুরাহা না হওয়া পর্য্যন্ত এমন কি গহরজানকেও মনে পড়ছে না ভাল ক'রে। গহরজানের দেহে কত আকর্ষণ! কত সম্মোহন! কত লোভানির স্পষ্ট চিহ্ন!

গহরজানের অঙ্গবরণ ঠিক শুভ্র নয়। হলুদ-শুভ্র।

মুখের মধ্যে অধর আর কপোল শুধু রক্তাভ, নয় তো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গহরজান যেন রক্তহীনা। পাংশু। দুর্ব্বল। হাওয়ায় পড়ে যাবে। বৃক্ষ নয়, নারী বৃক্ষলতা। গহরজান নারী। তাই বৃক্ষ চায়, আশ্রয় চায় একটা চিরকালের মত। লতার মত জড়িয়ে থাকতে চায়।

ঝড়ের আগের এঁটো পাতার মত যেথায়-সেথায় উড়তে চায় না। বহু নয়, এক চায়। এক আশ্রয়। একটা মাত্র ঠাঁই। থাকা-খাওয়ার।

কোথা থেকে ঘুরে আসে অনন্ত। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে।

আকাশে সূর্য্যের প্রথম চিকন খেলতেই শয্যা ত্যাগ করেছিলেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। পৌত্রীর শ্বশুরালয়ে উপরোধে একটি রাত্রি অতি-বাহিত করেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হ'তেই খোঁজ করেছেন পাল্কী কিংবা অশ্ব-যানের। নাতনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেননি। তখন যেমন আকাশে সূর্য্যালোকের প্রথম শুভ্রতা ছিল তেমনি ছিল অন্য দিগ্বলয়ে রাত্রির অন্ধকারের ক্ষীণ কালিমা। পাখীরা পর্য্যন্ত সাহসভরে বাসা ত্যাগ করেনি। শুধু মাত্র ঐককলস্বর পাখীদের। ঘর থেকে বেরিয়ে দাসী-ভৃত্যদের ডাকাডাকি করতে প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অনন্তরামের। বৃদ্ধা কাকুতি-মিনতি করেছিলেন অনন্তরামকে। বলেছিলেন,—অনন্ত, ওদের জন্যে অপেক্ষা করলে আজকে আর আমার জপ-আহ্নিক হবে না।

অনন্তরাম মনিবের দিকে টেনে কথা কয়েছিল। বলেছিল,—আপনার নাতনীর ঘরেও ঠাকুরদালান আছে। সেখানে জপ-তপ ক'রে নাও না।

বৃদ্ধা বেজায় আপত্তি জানিয়েছিলেন।—না অনন্ত, সেখানে আমার জপের মালা প'ড়ে আছে। তসর কাপড়, তাও সঙ্গে নেই। আমার যে অনেক হাঙ্গামা। তুমি আমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও অনন্ত!

সাত-সকালে জুড়ী মেলেনি। তাই অগত্যা একটা পাল্কী বের করিয়ে পাইক-পেয়াদা সমেত পৌঁছে দিয়ে আসে অনন্তরাম। যাওয়া-আসার পথক্লান্তিতে অনন্তরামের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

কৃষ্ণকিশোর প্রশ্ন করলে,—কোথায় গিয়েছিলে অনন্তদা?

অনন্তরাম গামছা পাকিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে,—কোথায় আবার, তোমার বুড়ী দিদিশাউড়ীকে পৌঁছে এলাম। ভোর থেকে উঠে

বুড়ী নাছোড়বান্দা। তবু যুবতী হ'লে না হয় কথা ছিল। বুড়ীকে যে কত বুঝিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিছুতেই শুনলে না। গাড়ী অত ভোরে পাওয়া গেল না, তাই পাল্কী বের করিয়ে গেল। সঙ্গে গেলাম। যতই হোক আমাদের হুজুরের দিদিশাউড়ী। সঙ্গে না গেলে—

কৃষ্ণকিশোর বৃদ্ধার কীর্ত্তি শুনে হাসলো মৃদু-মৃদু। বললে,—হ্যাঁ, ঠাকুমাটি যেন এক ধরণের! জপ-তপ নিয়েই থাকেন।

অনন্তরাম গামছায় মুখখানা মুছতে মুছতে বললে,—ধরণের ব'লে ধরণের? পাল্কীর পাল্লা একবার খুলে দেন আবার বন্ধ ক'রে দেন।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কেন?

অনন্তরাম উত্তর দেয়,—আমার সঙ্গে তো দু'চোখ বন্ধ ক'রে কথা বললেন। চোখই খুললেন না। পাল্কীর পাল্লা টেনে দিতে হচ্ছে শূদ্দুরদের জন্যে। কিছুতেই মুখদর্শন করবেন না জপের আগে। পাল্কীর পাশ দিয়ে মানুষ গেলেই চেঁচাচ্ছেন, অনন্ত, অনন্ত! ভ্যালা ফ্যাঁসাদে পড়েছিনু বুড়ীকে নিয়ে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—অনন্তদা, ভারীকে বল' স্নানের ঘরে জল তুলে দেবে। আমি সকাল সকাল বেরুবো। কাছারীর কাজে আদালতে যেতে হবে। বামুনদিকে বল' খেয়ে যাবো আমি। তাড়াতাড়ি খাবার চাই। বৌ জানে, তবুও তুমি বৌকে ব'লে দাও।

—যো হুকুম হুজুরের। অনন্তরাম কথা বলে ব্যঙ্গের সুরে। কথা বলে আর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। শব্দহীন পদক্ষেপে।

হেড-নায়েবের কথা ব্যতীত অন্য কারও মৌখিক শব্দ নেই কাছারীতে।

নায়েব মশাই জমিজমার কাজ করছিলেন। জমাজমির কাজ। লিখছিলেন আর লিখছিলেন। জলের মত জলের দেশের মানুষগুলি চুপ মেরেছিল। কপালের ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জিত টাকা দিয়ে দিতে হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে। বুকের পাঁজরা-ভাঙ্গা টাকা।

একটা নতুন চর মাথা তুলেছে জমিদারীর চৌহদ্দীতে।

সাড়ে তিন হাজার বিঘের চর। কালো মাটি। জল-কাদায় পা চলে না। কিন্তু ফসলী জমি। আবাদ করা চলে। চাষী-প্রজাদের মধ্যে জমি জমা নেওয়ার দর-কষাকষি চলে। জমির মত জমি। শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। জমা-দেওয়া টাকার চতুর্গুণ ফিরে আসবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় মরাই উপচে পড়বে। বলা যায় না, পোর্ট কোম্পানীর ফেরী-জাহাজ যদি যাত্রী ওঠা-নামার ঘাট বানায়, তা হ'লে আরেক মোটা অঙ্কের আয়।

কিন্তু চরকে কেন্দ্র ক'রে যদি জমিদারে জমিদারে, জমিদারে প্রজায় কিংবা প্রজায় প্রজায় বিবাদ লেগে যায়? যদি রক্তারক্তি হয়? যদি বাধে দাঙ্গা? মানুষ কাটাকাটি?

হেড-নায়েব জানতেন সাগরের গর্ভজাত এই চরের দখলিদার সত্যি সত্যিই হুজুরের এষ্টেট্। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারদের জমি যখন গভর্ণমেণ্ট থাকবস্ত জরিপ আর রেভেনিউ সার্ভে করলেন, তখন সরকারী পিঠা-ভাগে হুজুরের পূর্ব্বপুরুষ পেয়েছিলেন ঐ চর।

ঐ চর, চরবসন্তপুর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম মাথা চাড়া দিয়েছিল। তখন জরিপ বা সার্ভে কিছুই হয়নি। চরবসন্তপুরে সেবার খুনোখুনি মারামারি হয়েছিল। বল্লম, তীর আর লাঙলের ফলা চলেছিল। গুলীও চলেছিল শেষে। দখল পেয়েছিলেন হুজুরের পূর্ব্বপুরুষ। দুই পক্ষে হতা-হতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল হাজার খানেক। কয়েক শত মানুষের কোন হদিসই মেলেনি। কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে সাগরের জলে খোলামকুচির মত ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সাগরের স্বচ্ছ জলে কারা যেন সেদিন হোলী খেলেছিল মানুষের উষ্ণ রক্তে। ঝড়ো হাওয়ায় মানুষের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষু মানুষের শেষ ডাক কারুও কানে যায়নি। মৃত্যুভয়ে কত মানুষ ঝাঁপ দিয়েছিল বে অব্ বেঙ্গলে। দাঙ্গার অব্যবহিত পরে কত গলিত

শবদেহ চড়ায় ভিড়েছিল! শকুনদের মোচ্ছব লেগেছিল সেদিন। নরমাংস। দুর্লভ।

কি করবে, কেমন পথে যাবে, কোথা দিয়ে যাবে স্থির ক'রে ফেলেছিলেন হুজুর।

মনটা তেনার আনচান করে যত, ফুলবাবুটি সেজে কতক্ষণে গৃহত্যাগ করা যায় এই চিন্তায় মন তাঁর যত বিব্রত এবং ব্যস্ত হয় ততই সেই জটিলতম সমস্যাটা জলের মত জল হয়ে যায়। মিথ্যাকে আশ্রয় করলে আর দু'-দশ টাকা খরচা করলে মানুষের মুখে কুলুপ এঁটে দিতে কতক্ষণ?

ঘড়ার টাকা ঘড়াতেই থাক।

যা থাকে তাই। তাই দিয়ে দেবে বিবির পায়ে ছড়িয়ে। সোনার গিনি, রূপোর টাকা যা থাকবে। মণি-মাণিক্য থাকলে তাও। আর একবার দিয়ে দিলে চিরটি দিনের মত নিশ্চিন্তি। বিবি হয়ে থাকবে পায়ের গোলাম। ঘুরবে পায়ে-পায়ে। জড়িয়ে থাকবে পায়ে-পায়ে। কৃষ্ণকিশোর শুধু মনে মনে এঁচে নেয় ব্যাপারটা। কোথা থেকে কি করা যায়।

কিছুই করা হবে না।

ঘড়াটা শুধু জুড়ীগাড়ীর ভেতরে বসিয়ে দিলেই হবে। তারপর জুড়ীর পদশব্দে কোন' শালা কাছে ঘেঁষতে সাহসী হবে না। জুড়ী ছুটবে তো ছুটবে। হুজুর পরমানন্দে রুমালের গন্ধ শুঁকবেন।

পথ সামান্য। চিৎপুর বরাবর।

দু' কদম গেলেই গহরজান। জলজ্যান্ত গহরজান। হুজুরের মনের নোলায় জল ঝরে। এখন তো আর ভয়-ভাবনা নেই। কা'কেই বা ভয়? যাকে ভয় করতেন করতেন, আর আর সকলকে তো থোড়াই কেয়ার।

শুধু পিসীমা। হেমনলিনী।

কবে যেন দেখা হ'তে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন আড়ালে। যেখানে কেউ ছিল না এমনি এক ঘরে কৃষ্ণকিশোরকে ডেকে বলেছিলেন হেমনলিনী। কখনও গম্ভীর হয়ে কথা বলেন না, সেদিন কথা বলতে বলতে অসাধারণ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণকিশোর সেদিন হেমনলিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু আনত চোখে দেখেছিল পিসীকে। পিসীর রূপ দেখেছিল। কী অসামান্য রূপ এখনও! এই বয়সে!

হেমনলিনী বললেন,—দেখো কিশোর, তুমি অন্যায় করবে আর বাবা-কাকার মাথা হেঁট করবে তেমন কাজ ক'রো না। চোখে দেখতে পাচ্ছো না? তোমার পিসে মশাই আর তাঁর ছেলেদের দেখছো না!

—পিসীমা!

হেমনলিনী কোন' কথা শুনতে চান না।

বলেন,—কেলেঙ্কারী করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তুমি সমাজছাড়া হও। সাহস দেখাও। বুক ফুলিয়ে লাম্পট্য কর। ভয় পেয়ে লুকিয়ে চোরের মত—

—পিসীমা!

—না কিশোর, আমি তোমাকে এই শেষ বারের মত বলছি, তুমি যদি চালিয়ে যাও, পয়সার শ্রাদ্ধ কর, আমার সঙ্গে কোন' সম্পর্ক রেখো না। তুমি জানবে তোমার পিসীমা আর নেই।

—পিসীমা!

কৃষ্ণকিশোরের কণ্ঠের আতঙ্ক বাতাসে লীন হয়ে যায়।

হেমনলিনীও কথা থামিয়ে দেখতে থাকেন। অপলক চোখে, সামান্য জলের আভা-ভরা চোখে চেয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত্ত।

—পিসীমা!

হেমনলিনী দেখলেন কৃষ্ণকিশোরের কত পরিবর্ত্তন! দেহে যৌবন।

দেখতে দেখতে কেন কে জানে অসাধারণ লজ্জা পেয়েছিলেন। অন্য কোন' বাক্যব্যয় না ক'রে গম্ভীর বদনে ও ধীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সেই নির্জ্জন স্থান ত্যাগ করেছিলেন। হেমনলিনীর মনোভাব অন্য। লোককে না-হাসিয়ে না-জানিয়ে যা-খুশী কর। সংযম চাই, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না। হেমনলিনী মনে করেন, বাসনাকে অতৃপ্ত রাখতে নেই। অতৃপ্ত থাকলে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। হেমনলিনীর এই জীবন-দর্শন তাঁর নিজের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে। হেমনলিনী মনের মত স্বামী না পেয়ে—

রূপ আর যৌবনকে বৃথা যেতে দেওয়া উচিত নয়।

সহসা দেখলে বোঝা দায়, হেমনলিনী সুখে আছেন, না দুঃখ পাচ্ছেন জীবনভোর। কিন্তু একটা যেন পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। স্বস্তি আর শান্তির পথ। অবিচলিতের মত থাকতে হবে। কারও কোন অপকর্ম্মে রোষ প্রকাশ চলবে না। হেমনলিনী এমনি ধারার জীবন-ধারায় ভেসে চলেছেন। সাহিত্য আর সঙ্গীতের রসোপলব্ধি ক'রে চলেছেন। যা ভাল বই পান পড়েন। ভাল গানের সুর তোলেন বাদ্যযন্ত্রে। হেমনলিনী দেখতে দেখতে ভক্ত হয়ে পড়েছেন রবিবাবুর গানের।

কে যেন অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানে সৎগ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে দেয় তাঁকে। রবিবাবুর গানের স্বরলিপি জোগাড় ক'রে দেয়। হেমনলিনীর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায় না। বই পাঠে আর গান গেয়ে দিন বেশ কেটে যায় তাঁর। হেমনলিনীর প্রিয়তম গানটির সুর প্রায়ই শোনা যায় গুঞ্জনের মত ভেসে আসে হেমনলিনীর খাস-কামরা থেকে। গানটি এই :

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান—

রবিবাবুর গান! তাঁর কবি-জীবনের অন্যতম প্রাথমিক রচনা। ভানু-সিংহের পদাবলীর একটি পদ। কে যেন আছে, যে বোঝে হেমলিনীর মনের ভাষা—যে তাঁকে বই আর গান উপহার দেয়। বাছাই-করা বই আর বাছা-বাছা গান।

এমন [illegible]ও আর যেন তেমন পূর্ব্বের মত ভয় করে না কৃষ্ণকিশোর। তেমন ভক্তিও বোধ করি করে না। কৃষ্ণকিশোরের চোখে এখন কেউ নয়, শুধু সে। শুধু গহরজান বিবি। মনেও কারও ঠাঁই নেই। শুধু ঐ বিবিজান অধিকার ক'রে আছে সকল কিছু।

কাছারীর তক্তপোষ থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। চললো হয়তো স্নানাহার শেষ করতে। অন্দরে রাজেশ্বরীর কাছে।

রাজেশ্বরী একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও শয্যা ত্যাগ ক'রেছে কিয়ৎক্ষণ আগে।

বাসি শাড়ী আর জামা ছেড়ে পরিধান ক'রেছে ধৌত বাস। কি চমৎকার মানিয়েছে রাজেশ্বরীকে! টিয়াপাখী রঙের শাড়ীতে। যেন [illegible] মধ্যে থেকে উঁকি মারছে সদ্যপ্রস্ফুটিত একটি স্থলপদ্ম। মলয় বাতাসে থরো-থরো দুলছে সশাখ ফুলটি।

—বৌ! একটা জরুরী কথা আছে।

—ডাকছো আমাকে?

—হ্যাঁ। তুমি বোধ হয় জানো না, ঠাকুমা ভোর হ'তে না হ'তেই রওনা হয়ে গেছেন পাল্কীতে?

—শুনেছি এই মাত্র। একবার দেখা হোক না, বুড়ীকে যদি না কামড়ে দিই—

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করলো রাজেশ্বরীর মুখাকৃতি। দেখলো উপহাস নয়, রাজেশ্বরী সত্যিই ক্রোধের স্বরে কথা বলছে। বললে,—ছিঃ, বলতে নেই এমন কথা। কামড়ে দেবে, সে কি কথা?

—দেখো না তুমি! না ব'লে-ক'য়ে চলে যায় কেন? বললে রাজেশ্বরী। সক্রোধে।

হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। বৌয়ের কথার ধরণ শুনে। বলে,—বৌ, একটা জরুরী কথা আছে।

রাজেশ্বরী বসেছিল গালচের মধ্যিখানে। ভেলভেটের গালচে। উঠে পড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—জরুরী কথা? কি আবার জরুরী কথা?

—বলছিলাম যে, তোমার একদিন পিসীমার ওখানে যাওয়া দরকার। বেড়িয়ে আসা দরকার। বললে কৃষ্ণকিশোর। গম্ভীর হয়ে বললে,—না গেলে ভাল দেখায় না। আজকে যাও না বৌ, বেড়িয়ে এসো না!

আহ্লাদে গদগদ হয়ে যায় রাজেশ্বরী।

তার মিষ্টিমুখে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে। খুশীর প্রাবল্যে বললে,—বেশ তো, আজই যাই। সেই ভাল কথা। হ্যাঁ, না গেলে কথা উঠতে পারে। আজই যাই। খেয়ে-দেয়ে যাবো?

—আমার পিসীমা এমনই গরীব তোমাকে এক পাত খাওয়াতে পারবে না? কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর কথা বলতে বলতে।

—তাই বুঝি বলেছি? শুধোয় রাজেশ্বরী। খুশীর স্বরে বলে,—তবে এখনই যাই। কি বল? সেজে-গুজে নিই?

—হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি নাও। পিসীমাকে বলবে যে আপনার জন্যে মন কেমন করছিল তাই এসে পড়েছি। কৃষ্ণকিশোর কথা শিখিয়ে দেয় বৌকে। সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। বলতে যায় আর কিছু হয়তো।

কিন্তু রাজেশ্বরীর উচ্ছ্বসিত কথায় বলা হয় না। রাজেশ্বরী বললে,—সে তোমাকে শেখাতে হবে না। যা বলবার আমি বলবো। এখন বল', কি কি গয়না পরি? কোন্ শাড়ীটা পরি?

কথা শুনে হক্‌চকিয়ে যায় যেন কৃষ্ণকিশোর। অলঙ্কার ও আভরণের সে কি বোঝে! কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে নেয় সে! বলে,—পর' না যা মন চায়। আমি কি বুঝি?

—সোনা পরব', না জড়োয়া পরব'? পান্নার সেটটা যদি পরি?

—হ্যাঁ, খুব ভাল হয়।

—সেই সঙ্গে সবুজ রঙের বেনারসীটা? যেটা তোমাদের এখান থেকে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু দেরী করলে চলবে না। তুমি গিয়ে জুড়ী পাঠালে তবে আমি আদালতে যেতে পারবো।

—না, না, দেরী হবে না। এক্ষুণি তৈরী হয়ে নেবো। বলে রাজেশ্বরী। চাবি-ঝুলানো আঁচলটা খোঁজে। আলমারী আর দেরাজের চাবি। গয়না আর কাপড়ের দেরাজ আর আলমারী। তোরঙ্গ আর ক্যাশবাক্সর চাবি। রূপোর চেন আর রূপোর রিং। একগুচ্ছ চাবি।

শাড়ী আর অলঙ্কার প'রে সাজাগোজা করতে খুব ভালবাসে রাজেশ্বরী।

কোন্ শাড়ীতে কেমন মানায় তাই দেখে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কোন্ গয়নায় কেমন। আর কোন' কিছুর প্রতি তেমন নয়, পোষাক-পরিচ্ছদ আর অলঙ্কারের প্রতি এক প্রবল তৃষা আছে যেন রাজেশ্বরীর। পৃথিবীর আর আর মেয়ের মত রাজেশ্বরীও বিলাসিনী। বসন-ভূষণের প্রতি অদমনীয় লোভ। পান্নার সেট আর সবুজ শাড়ী কোন' দিন অঙ্গে চাপায়নি রাজেশ্বরী। আজকে মনের সুখে দেখবে আয়নায়। দেখবে, কেমন দেখিয়েছে তাকে। সুর্মা আর সিঁদুর টিপে কেমন মানিয়েছে। ওষ্ঠের রক্তিম বর্ণটা বেশী মাত্রায় হয়নি তো?

—তুমি তবে তৈরী হয়ে নাও। আমি গাড়ীতে ঘোড়া জুততে বলছি।

কৃষ্ণকিশোর কথার শেষে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যাই হোক, টাকা পাচার করার প্রথম ধাপটা নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হ'লেই মঙ্গল। রাজেশ্বরীই যদি না থাকে, কে দেখলো না দেখলো কি যায়-আসে! কি পোষাক পরলো কে দেখছে? গাড়ীতে কে এবং কি উঠলো কে দেখছে? জুড়ী কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে কে দেখছে? কার প্রয়োজন?

কাছারীতে চলেছিল কৃষ্ণকিশোর।

হেড-নায়েব মশাইকে শুধু একটা কথা বলবে। আর পাইক পাঠাবে

আত্তাবলে। জুড়ী বের করতে বলবে। বেশ প্রফুল্ল চিত্তে চলেছিল কৃষ্ণকিশোর। অন্দর থেকে সদরে। তালতলার ভটচাযি্য মার্কা চটি জুতোর শব্দ করতে করতে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছিল।

প্রজাবৃন্দ যেমনকার তেমান বসে আছে এখনও ?

দূর থেকে দেখে কৃষ্ণকিশোর। কালো-কালো মানুষ আর মানুষের মাথা। হেড-নায়েবকে এখন ডাক দেওয়া চলে না। তিনি জমাজমির কাজ করতে করতে ঘর্মাক্ত হয়ে প'ড়েছেন !

মুহূর্ত্ত কয়েক অতিবাহিত হয়েছে কি হয়নি।

অনন্তরাম বললে,—বৌ তৈরী ! আমাকে কি পৌঁছে আসতে হবে ?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—নিশ্চয়ই। তোমাকে সেখানে থাকতে হবে আজ সারাদিন। বৌ যতক্ষণ না ফিরছে।

—বাঃ, বেশ কথা। তার মানে দিনটাই বেবাক—

অনন্তরাম জানে মিথ্যা বাক্য অপচয়ে কোন লাভ নেই। যেতেই হবে তাকে। নয় তো বংশের ইজ্জত থাকবে না। লোকে বলবে, লোক-জন নেই নাকি শ্বশুর-বাড়ীর ? পাইক-বরকন্দাজ ? দাস কিংবা ভৃত্য ?

বিদায়কালে রাজেশ্বরী দেখা দিয়ে যায় অন্দরের দরজার মুখে। জুড়ীতে ওঠবার আগে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। দেখায়, ঠিকঠাক হয়েছে, না কোন' ত্রুটি থেকে গেল।

লজ্জানত পরী যেন, উড়ে এসেছে ফুলের বন থেকে।

ফুলের মতই দেখাচ্ছে রাজেশ্বরীকে। পান্নার অলঙ্কার আর সবুজ শাড়ীর ফাঁক থেকে রাজেশ্বরীর ফুলের মত মুখ—শ্যামল পদ্মবনে যেন একটি সদ্য-ফোটা গোলাপী পদ্ম। পায়ের অলঙ্কারের ঝম্ ঝম্ শব্দ হয় শুধু। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। দেখায় নিজেকে।

—গাড়ীটা যেন পাঠাতে দেরী ক'র না। আমি ফিরে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। তুমি ফিরে আসবে।

অনন্তরাম উঠে কোচবাক্সে ব'সলো। রাজেশ্বরী ব'সলো ভেতরে। আর ব'সলো এলোকেশী। সইস গাড়ীর দরজা ফস্ ক'রে টেনে দেয়। অন্ধকার হয়ে যায় গাড়ীর অভ্যন্তর। একটা উগ্র গন্ধ বইতে থাকে গাড়ীর ভেতরে। রাজেশ্বরী সেই গন্ধটা ছড়ায়। ৪৭১১-মার্কা কি একটা বিদেশী সুগন্ধ। যূঁই না বেলের বোঝা যায় না। কিন্তু গন্ধে মাতাল-করা আমেজ।

তাড়াতাড়ি জুড়ী চাই আজ। হুজুর যাবেন যেন কোথায়। রঙ্মহলে?

হেমনলিনী তখন পেছনে দু'টি হাতে ভাঁড়ার-ঘর তদারক করছিলেন।

তাঁর অনুগ্রহের দাসীরা ক'জন তোলা-পাড়ার কাজে লেগেছিল। হেমনলিনী তাম্বুলরাগে অধর রাঙিয়ে শুধু পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন দাসীদের কাজকর্ম। পেছনে দু'টি হাত হেমনলিনীর। হাতে একটা পানের ডিবে। বই-ডিবে। কাশীর ডিবের অনুকরণে রূপোয় তৈরী। নক্সা-কাটা। হেমনলিনীর নামটি খোদিত আছে ফুল আর লতাপাতার নক্সায়—লেখা আছে 'হেম'।

—আয় বৌ, আয়। আমার কি ভাগ্যি?

হেমনলিনী তাঁর গৃহের প্রবেশ-দ্বারে এসে নামিয়ে নেন রাজেশ্বরীকে। বলেন,—আয় বৌ, আয়। কথা বলতে বলতে খুশীর উচ্ছ্বাসে বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। গালে চুমা খান। মুখে যেন তাঁর কথা আসে না। রাজেশ্বরীকে হঠাৎ এমন বেশে চোখের সমুখে দেখতে পেয়ে বিশ্বাস হয় না যেন নিজের চোখকে। লজ্জানত বধূ রাজেশ্বরী। তার মুখেও সাড়া নেই।

অল্প গুণ্ঠনের ফাঁক থেকে চোখ মেলে দেখে পিসীমাকে। দেখে পিসীমার ঘর-দোর। দেখে স্বচ্ছ দিবালোকে পিসীমার দর-দালান। সাদা আর কালো চতুষ্কোণ চুনারী পাথরের দালান।

হেমনলিনীর বাহুবেষ্টন শিথিল হ'লে রাজেশ্বরী পদধূলি নেয় পিসীমার। অত্যন্ত সন্তর্পণে। ধীরে ধীরে। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে বৌ। এক গা গয়না আর জংলা শাড়ীর কণ্টক বিঁধছে যে সর্ব্বাঙ্গে!

—বৌ, তুই যে হঠাৎ চলে আসবি, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কেন এলি বল্ তো? হেমনলিনী কথা বলতে বলতে হাসেন। পরম পরিতৃপ্তির হাসি। হাতের ডিবেটা খুলে একটা কি দুটো পান মুখে পুরে ফেললেন। আরও রাঙা হয়ে উঠতে থাকে হেমনলিনীর অধর। যেন রক্ত পান করেছেন।

রাজেশ্বরীও মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বলে।—পিসীমা, বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে মনটা কেমন—

—এ্যাঁ! পিসীমার কণ্ঠে সহসা বিস্ময়।—বলিস কি বৌ? এই তো ক'দিন আগেও দেখা হয়েছে। তা, আমার বাপের বাড়ীর সকলে ভাল আছে তো? চল্ চল্, আমার ঘরে বসবি চল্।

রাজেশ্বরী ত্রস্তপদে অনুসরণ করলো হেমনলিনীকে।

অন্দরে ঢুকতে ঢুকতে মাথার ঘোমটা খুলে ফেললেন পিসীমা। এখানে আর কাকে লজ্জা। তাঁরই সংসার। রাজেশ্বরী পিছন থেকে লক্ষ্য করছিল পিসীমার বদ্ধকবরী। কি চমৎকার খোঁপা! সোনার কাঁটায় পরিপূর্ণ। দেখছিল হেমনলিনীর অঙ্গের বাস। ফরাসডাঙ্গার জরদপাড় ধোয়া শাড়ী পরনে। ব্যাস, আর কিচ্ছু নেই। যা আছে তা হ'ল কেবল হেমনলিনীর অঙ্গের বরণ। শুভ্র-লোহিত রঙ। তেমনি গঠন আঁটসাঁট। দু'হাতে গোছা-গোছা চুড়ি, শাঁখা। গলায় ভারী ওজনের মটরমালা। কানে টাপ। হীরে আর চুনীর টাপ।

—ভাল আছে সকলে। শুধু—

চলতে চলতে আর বলতে বলতে থেমে যায় সহসা কথার মধ্যপথে। আর কিছু বলে না। নীরব হয়ে যায় রাজেশ্বরী।

—থামলি কেন বৌ? বললেন হেমনলিনী।

রাজেশ্বরী আমতা আমতা করে। বলে,—জমিদারীর খাজনা বাকী পড়ায় আদালতে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে ক'দিন ধরে।

পেছন ফিরলেন হেমনলিনী। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন,—সে কি কথা বৌ? তুই ঠিক জানিস? জমিদারীর খাজনা বাকী পড়তে যাবে কেন! বালাই ষাট!

—হ্যাঁ পিসীমা, টাকার ঘড়ায় হাত প'ড়েছে। অনেক টাকা যে। বললে রাজেশ্বরী অকপট কণ্ঠে।

কিন্তু পিসীমা হেমনলিনী বিশ্বাস করতে চাইছেন না কেন? তবে কি মিথ্যা! কথাটি ভাবতেও রাজেশ্বরীর রক্ত যেন জল হয়ে যায়। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ে।

—বলিস কি বৌ? আমার ভায়েদের জমিদারীর খাজনা যে কখনও বাকী পড়েনি! সাত পুরুষ ব'সে ব'সে খেলেও যে তাদের টাকা শেষ হবে না! কি কথা শোনালি বৌ? কেমন দুঃখকাতর কথার স্বর হেমনলিনীর। তিনি যেন ভেঙ্গে পড়লেন বিষয়টা শুনে। মুহূর্ত্তের মধ্যে কত কি ভাবলেন। কত ভাল-মন্দ কথা। কপাল পুড়ে যাওয়ার কত পরিচিত ঘটনা মনে পড়লো হেমনলিনীর। লাখো-লাখো টাকার সম্পত্তি কত কত জনের, উড়ে-পুড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া যে স্বচক্ষে দেখেছেন তিনি।

বৌ আর কথা কয় না। সে যেন শুধু ব'লেই খালাস।

রাজেশ্বরী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে পিসীমার ঘর-দোর। দর-দালান। ঘরে ঘরে সৌখীন আসবাবপত্র মেহগনির। দেওয়ালে দেওয়ালে বিরাট বিরাট আয়না আর ছবি। দালানের কোণগুলিতে তেপায়ায় পাম্ গাছের বাহার। দ্বারে দ্বারে রঙীন নেটের পর্দ্দা।

—এত টাকা করলে কি! ঘড়া-ঘড়া টাকা ছিল যে দাদাদের। খাজনা বাকী পড়লো শেষে! কথাগুলি আপন মনেই স্বগত ক'রে যান হেমনলিনী। দোতলার সিঁড়ির কাছ বরাবর পৌঁছে বললেন,—চল্ বৌ, তুই ওপরে চল্, আমি আসছি এখনই।

শ্বেত-প্রস্তরের সিঁড়ি। ছুঁচ প'ড়ে থাকলে দেখা যায়, এমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। রাজেশ্বরী সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। পায়ের অলঙ্কারের শব্দ শোনা যায় ঝম্‌ঝম্। সিঁড়ির দালানে মেহগনির হ্যাট্-ষ্ট্যাণ্ড্ আর ইটালীয়ান পাথরের মূর্ত্তি। নগ্ন পরী কয়েক জোড়া, উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

সিঁড়ির মুখ থেকে অন্যত্র চলে গেলেন হেমনলিনী।

চিন্তাকুল দৃষ্টি তাঁর চোখে। চললেন দ্রুতপদে।

—দাসী, ও দাসী। ডাকলেন রান্না-বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে।—গেলে কোথায় তোমরা?

কেউ কোথাও যায়নি। সবাই আছে। হেমনলিনীর অনুগ্রহের পাত্রীরা আছে সকলেই যে যার কাজে। কিন্তু বৌ এসেছে যে বাড়ীতে। নতুন বৌ একটি! প্রতিমার মত। হঠাৎ নেমেছেন স্বর্গলোক থেকে। লক্ষ্মী না সরস্বতী কে জানে!

দাসীর দল গেছে বৌ দেখতে।

হুজুরনীর ভেয়ের পুত্রবধূকে দেখতে। কোন' খানদানি ঘরের মেয়ে হয়তো, ডাকসাইটে সুন্দরী। সচরাচর নাকি দেখা যায় না এমনটি। এমন একটি।

বালিকা-বধূ রাজেশ্বরী।

জানে না পৃথিবীর কোন' কিছু। শুধু হাসতে জানে। উল্লাস আর উচ্ছ্বাস তার সকল কিছুতে। জ্ঞান নেই কোন', অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন রাজেশ্বরী।

দাসীদের ভিড় দেখে রাজেশ্বরী হাসলো মিটিমিটি। দোতলার দালানে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি-ভাঙ্গার ক্লান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে হাসলো রাজেশ্বরী।

—ইদিকে এসো, ইদিকে হুজুরনীর খাস্-কামরা।

বললে দাসীদের একজন, যে হয়তো পুরানো। বললে,—বৌয়ের মতন বৌ হয়েছে। যেন লক্ষ্মীপ্রিতিমে!

অন্যান্য দাসী চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়েছিল।

যেন জন্মে কখনও দেখেনি! কেউ কেউ মন্তব্য করলো যে কেবল মাত্র বৌ গেঁয়ো মেয়ে নয় এবং শহরের মেয়ে ব'লেই নাকি বৌয়ের এত রূপ। এত সৌন্দর্য্য। শহরের মেয়ে তো মেয়ে নয়, মেম।

রাজেশ্বরীকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পুরানো দাসীটি পুনরায় কথা বললে,—হুজুরনী এলেন ব'লে। তুমি বৌ ব'স না ঐ কেদারায়।

হুজুরনী অর্থাৎ হেমনলিনী ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন ব্রাহ্মণীকে। কথা বলেন নাতিউচ্চ কণ্ঠে। বলেন কি কি রন্ধন হবে তারই ফর্দ্দ। বৌ এসেছে, বৌকে পাত সাজিয়ে খাওয়াতে হবে। খাক্, না খাক্, দিতে হবে সাজিয়ে।

হেমনলিনীর ঘর দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে যায় রাজেশ্বরী।

ঘরে কি এক ফুলের সুবাস। ঐ তো চীনা ফুলদানিতে রয়েছে এক রাশ ফুল, ঘরের এক কোণে। রাজেশ্বরী চোখ ফিরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। ছত্রী দেওয়া ডবল বিছানার বিলাতী খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। আলপাকার বালিশ। লেসের ঝালর গোলাপী নেটের মশারিতে। আবলুস আর মেহগনির আলমারী, কেদারা, দেরাজ, ডেভানপোর্ট আর পিয়ানো। আয়না দেওয়া শো-কেশে কত পুতুল, কত খেলনা। ঘরের মেঝেয় জাজিম বিচিত্র বর্ণের। কড়িকাঠে রঙীন বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠন। দেওয়ালে পৌরাণিক দেবদেবীর ছবি, হেমনলিনী স্বয়ং তাঁদের পোষাক পরিয়েছেন। ছবির মুর্ত্তিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন যেন। একটা বুক-কেশে ঠাসা-ঠাসা

বই। বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির রচনাবলী। কিন্তু পিসীমা গেলেন কোথায়?

হেমনলিনী বুঝিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

ব্রাহ্মণী আর দাসীদের বলছিলেন রান্নার জোগাড়ের কথা। মাছ আর মিষ্টান্ন আনাতে হবে। আর আর যেন কি কি আনাতে হবে বাজার থেকে। রূপোর বাসনে খাওয়াতে হবে। আদব-কায়দার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আদর-আপ্যায়নের যেন অভাব না হয়।

—আহা, একলাটি ব'সে আছিস বৌ!

বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন হেমনলিনী। হাতের পানের ডিবেটা রাখলেন খাটের 'পরে।

রাজেশ্বরী বসেছিল আড়ষ্ট হয়ে। পিসীমাকে দেখে মনে স্বস্তি পায় যেন। হাসি-হাসি মুখ করে। বলে,—কি চমৎকার আপনার বাড়ী পিসীমা!

—পছন্দ হয়েছে বৌ তোর? আমি যে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছি এই ঘর-দোর। এমনটি তো ছিল না। ছিল নাম মাত্র ক'খানা ঘর আর দালান। খুশীভরা কথা বলেন হেমনলিনী। শাড়ীর আঁচলে মুছে ফেলেন কপাল আর গণ্ডদেশ। চলাফেরায় ঘাম ঝরেছে যে! বলেন,—তা এখন কি খাবি বল্ বৌ? জল খাবার?

—কিচ্ছু না পিসীমা! জল খেয়েই আসছি। রাজেশ্বরী বললে ভয়ে-ভয়ে। খাওয়ার ভয়ে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই এখন জিরো। সে কথা পরে হবে। এক মুহূর্ত থামলেন হেমনলিনী। বললেন,—আয় তোর গয়না-পোষাক ছাড়িয়ে দিই। দাঁড়া, একখানা শাড়ী তোকে দিই। পরনের শাড়ীটা ছেড়ে ফ্যাল্। এত গয়না আর ঐ জংলা প'রে কষ্ট হবে তোর।

—হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। সেই ভাল, একটা শাড়ী দিন। আমি ছেড়ে ফেলি এই শাড়ীটা।

আঁচলে ছিল রূপোর চেন। চাবির রিং সমেত।

একটা আলমারী খুলে ফেললেন হেমনলিনী। বিরাট একটা আলমারী।

দেখে চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হয় রাজেশ্বরীর। আলমারীতে শুধু শাড়ী আর শাড়ী। কিংখাব, বেনারসী, ঢাকাই আর তাঁতের শাড়ী। সোনা আর রূপোর সুতোর জামা। সত্যিই চোখ ঝলসে যায় রাজেশ্বরীর। একটি শাড়ী বের ক'রে বললেন হেমনলিনী,—এইটে পর্ বৌ। তোকে যা মানাবে! কথার শেষে বন্ধ করলেন আলমারী।

রাজেশ্বরী দেখলো কাপড়টা। মিহি সুতোর তাঁতের শাড়ী একটা। খুনখারাপি রঙের। এমন দু'-একখানা শাড়ী আগে প'রেছে রাজেশ্বরী। প'রে দেখেছে আয়নায়। দেখেছে, কি সুন্দর দেখায় নিজেকে। বেশীক্ষণ দেখা যায় না যেন। চোখ দু'টো ঝলসে ওঠে।

—পেন্নাম হই মামী।

হঠাৎ কথা শুনে চমকে ওঠে যেন রাজেশ্বরী। গুণ্ঠনটা টেনে দেয় সে সঙ্গে সঙ্গে। কে না কে কথা বলছে কে জানে। কিন্তু দু'জন কথা বললে না একই সঙ্গে? মামী ডাকে সম্বোধন করলে যে!

জহর আর পান্না। হেমনলিনীর দুই অবাধ্য পুত্র।

হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে গৃহে কৃষ্ণকিশোরের স্ত্রী এসেছে শুনে। ঘরে ঢুকে দু'জনেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বললে,—পেন্নাম হই বৌঠান।

রাজেশ্বরী গেছে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে। কিন্তু দেবরদ্বয়ের অতি ভক্তিতে না হেসেও পারে না। গুণ্ঠনের আড়ালে হাসে মুখ টিপে-টিপে। হেমনলিনীও ছেলেদের কীর্তি দেখে হেসে ফেললেন। বললেন,—থাক্, থাক্, ঢের হয়েছে। এখন যা দেখি ঘর থেকে, তোদের বৌঠান কাপড় ছাড়বে।

—ও বাবা! কাপড় ছাড়বে?

চোখ বড় ক'রে বললে জহর। ফাজলামি মাখানো ঢঙে। বললে,—চল ভাই এখান থেকে।

পান্না বললে,—এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়।

দু'জনে গমনোদ্যত হয়। জহর ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে বলে,—কিন্তু বৌঠান, হ্যাঁ, কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে।

পান্না বললে,—জানো তো বৌঠান, দেওর মানে দ্বিতীয় বর। আমরা তোমার—

ধমকে উঠলেন হেমনলিনী,—যা, যা, দূর হ' এখান থেকে। বিদেয় হ'। নজরছাড়া হ'!

জহর বললে,—কিন্তু বৌঠান, গল্প না করলে যেতে দেবো না। অবিশ্যি আমরা এখন যাত্রা করছি। অর্থাৎ তোমার গিয়ে বেরুচ্ছি।

দৃপ্ত কণ্ঠে শুধোলেন হেমনলিনী,—কোন্ চুলোয় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

জহর বললে বিরক্তির স্বরে,—এ কি! তোমাকে তা হ'লে কাল এত ক'রে কি বোঝালুম? আমরা মল্লিকদের বাগানবাড়ীতে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে চড়ুইভাতি করছি, থাকছি সারাটা দিন, মনে নেই তোমার?

—না, মনে নেই। হেমনলিনী আলমারী সশব্দে বন্ধ ক'রে বললেন,—যাও, যাও, যেখানে খুশী যাও। জাহান্নমে যাও।

পান্না সক্রোধে বললে,—তুমি আলমারী বন্ধ করলে যে?

হেমনলিনী কোন প্রত্যুত্তর দেন না। তাঁর মুখাকৃতিতে নেমেছে ভীষণ গাম্ভীর্য্যের ছায়া। বৌ সমুখে নেহাৎ তাই, অন্য সময় হ'লে গর্ভজাতদের বক্তব্য শুনে হয়তো নিরুপায় হয়ে অশ্রুপাত করতেন ঐ হেমনলিনী। রাজেশ্বরীর অবস্থিতি এবং উপস্থিতিতে এখন অত্যন্ত অপমান বোধ করেন, পুত্রদের অসভ্যতায় লজ্জানুভব করেন। মনে মনে গুমরে মরেন। মহাদুঃখে।

জহর ছাড়বার পাত্র নয়। বললে,—আলমারীটা বন্ধ করলে কেন? আবার তো খুলতে হবে।

হেমনলিনী প্রায় ক্রন্দনের স্বরে মিনতি করলেন,—তোমরা এখান থেকে বিদেয় হবে কি না বল'? আমাকে রেহাই দাও, দোহাই তোমাদের!

জহর বললে,—আমাদের মিটিয়ে দিলেই রেহাই পাবে। অতি সহজ কথা।

পান্না বললে,—এতক্ষণ দিয়ে দিলে এতক্ষণে আমরা পৌঁছে যেতুম। তুমি মা অহেতুক দেরী করিয়ে দিচ্ছো! ফূর্ত্তিটা মাঠে মারা যাবে।

হেমনলিনী বললেন,—কি চাই তোমাদের?

জহর বললে,—শুধু হাতে যাবো নাকি আমরা! দাও, কিছু টাকা দাও।

হেমনলিনী শুধু বললেন,—কত?

রাজেশ্বরী মাতা-পুত্রের বাক্য-বিনিময় শুনতে শুনতে তটস্থ হয়ে যায় যেন। ভয়ে কাঁপে হয়তো। বুকটা ধুক-পুক সুরু করে। ঘাম ঝরে ঘোমটা-ঢাকা কপালে। চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে। দুঃখ হয় পিসীমাকে দেখে। হেমনলিনীর আঁখি দু'টি কি জলসিক্ত হয়েছে!

পান্না বলল,—দু'খানা ফুল গিনি দিয়ে দাও, ল্যাটা চুকে যাক্। আমরাও বিদেয় হয়ে যাই তোমাকে পেন্নাম ঠুকে।

একটা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেমনলিনী। তাঁর বক্ষদেশ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে ধীরে ধীরে যথাকার ধারণ ক'রলো শ্বাসপতনের সঙ্গে সঙ্গে। ভূমিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আলমারীর চাবি খুললেন। কোথায় আছে গিনি। খুঁজলেন এখান-সেখান। হাতড়ালেন।

ঐ তো হাতীর দাঁতের ক্যাস্কেটটা।

তাতেই আছে ক'খানা গিনি। তা থেকেই দিলেন দু'টি গিনি।

গিনি দু'খানা হস্তগত হওয়া মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দুই ভাই। হেমনলিনীর মুখাবয়ব দেখে কেউ আর কোন বাক্যব্যয় করতে সাহসী হয় না। রাজেশ্বরী কম্পমান বক্ষে দাঁড়িয়ে দেখে পিসীমাকে। হেমনলিনীর মুখে যেন গভীর দুঃখের ছায়া নেমেছে। চোখে হতাশা। কিছুতেই তিনি যেন এঁটে উঠতে পারছেন না অবাধ্য সন্তানদের। ছেলেরা তাঁকে মানে না,

ফিরেও তাকায় না। শুধু যখন তাদের অর্থের প্রয়োজন তখন দুই ভাই আসে গর্ভধারিণীর কাছে। টাকা চাই। টাকা চায়। না দিলে নানা ভীতিপ্রদর্শন করে। আত্মহত্যার ভয় দেখায়। গৃহের ছাদ থেকে লম্ফ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

অনেকক্ষণ পরে হেমনলিনী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,—দেখলি তো বৌ? আমার ছেলেদের কীর্ত্তি দেখলি? মরেও না ছাই!

—আহা, অমন কথা বলবেন না পিসীমা! বললে রাজেশ্বরী। দেবর দু'জন চলে যাওয়ায় স্বস্তির শ্বাস ফেলে। বলে,—পয়সা হাতে দেন কেন? শাসন করতে পারেন না? গিনি দু'খানা দিয়ে দিলেন?

অন্যের ঘরের নবাগতা বধূ রাজেশ্বরী। অধিক কথা বলা তার সাজে না। চুপ মেরে যায় সে।

হেমনলিনী বললেন,—কি করি বল্ বৌ! আমি যে পারি না বাগ মানাতে। বাপও কিছু দেখে না। নেশার খেয়ালে যেদিন ধরেন সেদিন কি আর আস্ত রাখেন ছেলেদের! রক্তগঙ্গা ক'রে ছাড়েন। আমি চোখে দেখতে পারি না মারা-ধরা। ঘরে গিয়ে দুয়োর বন্ধ ক'রে বসে থাকি তখন। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থামেন। আবার বলেন,—মরুক গে, যা খুশী করুক গে। নে, তুই শাড়ীটা বদ্‌লে নে। আমি গয়না ক'টা খুলে দিই।

—আপনার ছেলেদের বিয়ে দেবেন না পিসীমা? শুধোয় রাজেশ্বরী। পরনের শাড়ী খুলতে খুলতে বলে। কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সঙ্গে বলে।

—বিয়ে! বললেন হেমনলিনী।—আমি বিয়ে দেবো না এখন। ছেলেদের মতি-গতি ভাল না হ'লে বিয়ে দেবো না। দু'টো মেয়েকে কি ঘরে এনে তাদের সর্ব্বনাশ ক'রবো? আমার ছেলেদের আমি তো চিনি। যেমন আছে থাক। অমন ছেলেরা থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল।

—আহা, মা হয়ে আপনি এমন কথা বলবেন না! বিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। বললে রাজেশ্বরী। বললে পাকা গিন্নীর মত।

—ভুল, ভুল, মস্ত ভুল ধারণা তোমাদের। বিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যায় না। আরও বিগড়ে যায়। পরের ঘরের মেয়েদের কপাল পুড়িয়ে কি হবে? মানুষ কি সকলে হ'তে পারে বৌ? সামান্য ভদ্রতা, আচার-ব্যবহার শিখলো না! সকল তাতেই ইতরামি?

রাজেশ্বরীর পান্নার অলঙ্কার খুলতে খুলতে কথা বলেন হেমনলিনী।

চোখ দু'টি তাঁর কখন জলে ভ'রে গেছে লক্ষ্য করেনি রাজেশ্বরী। পিসীমার মুখখানি যেন শ্রাবণের মেঘ। দুঃখে আর অপমানে কেমন যেন থম-থম করছে। তাম্বুলরাগরক্ত অধর কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে!

—পিসে মশাই কোথায় পিসীমা? তাঁকে দেখছি না? শুধোয় রাজেশ্বরী।

—কাজে গেছেন তিনি। জরুরী কাজ প'ড়েছে, ভোরে উঠেই বেরিয়েছেন। বললেন হেমনলিনী। পান্নার নেকলেসটা খুলতে খুলতে বললেন।—ছেলে দু'টো যদি আমার তবু মানুষের মত হ'ত! ওঁকে কাজে-কর্ম্মে সাহায্য করতে পারতো। উনি তো খেটে-খেটে সারা হয়ে গেলেন। কাজের মানুষ, ব'সে থাকতে পারেন না মোটে। কেবল কাজ আর কাজ। টাকা আর টাকা।

সত্যিই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন হেমনলিনীর স্বামী। শিবচন্দ্র বাবু।

যত সব জাঁদরেল সাহেব-সুবোদের মদ্যপান করিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। কৃতজ্ঞতায় বেঁধে ফেলেন। কাজ পান, টাকা পান। লাভ করেন মোটা-মোটা টাকা। কাঁচা টাকা। ভেট পাঠান কত জনাকে। বড়দিন, গুড্-ফ্রাইডে'র সময়ে কেশ্-কেশ্ স্কচ্ হুইস্কি, হরেক রকমের ফল আর ফুল পাঠিয়ে দেন সাহেবদের। নগদ টাকা ঘুষ দিতে পারেন না, প্রকারান্তরে দেন তাই। তারই ফলে অর্থোপার্জ্জনের পথটা তাঁর সুগম হয়।

আর মাসে মাসে, বছরে বছরে, ভারী ভারী ওজনের নতুন নতুন গহনা ওঠে হেমনলিনীর অঙ্গে। পুরানো মামুলী প্যাটার্ন যায় বাতিল

হয়ে, আসে আনকোরা নতুন ফ্যাশনের অলঙ্কার। হেমনলিনী নিজেই প্যাটার্ন এঁকে দেন। নাকচ ক'রে দেন ব্যবহৃতদের।

লোহার সিন্দুক উপচে পড়ে হেমনলিনীর।

নীল ভেলভেটের বাক্সে পরিপূর্ণ হয়ে যায় একেকটা সিন্দুক। হেম-নলিনীর সর্ব্বসমেত কত গহনা আছে হেমনলিনীই জানেন না। জড়োয়া অলঙ্কার নয়, খাঁটি সোনার। হীরা-জহরতের কোন' মূল্য দেন না শিবচন্দ্র বাবু। যত মূল্য সোনার। হীরায় দাগ পাওয়া যায়, মুক্তো গলিত হয়ে যায়, রঙীন কাচের মূল্য কি—কিন্তু সোনা? সোনার কোন' দাম নেই। সোনা অমূল্য। সোনা সর্ব্বদেশের। চিরকালের।

ছেড়ে-ফেলা কাপড় জড় ক'রে রেখে দেয় রাজেশ্বরী।

একটা দেওয়াল-আনলায় ঝুলিয়ে রেখে দেয়। একটি একটি অলঙ্কার অতি সাবধানে খুলে রাখেন হেমনলিনী। হাতীর দাঁতের ঐ ক্যাস্কেটে রেখে দেন। বলেন,—বৌ, কাপড়টা ওমনি ক'রে রাখলি, নাট হয়ে যাবে না? দে, আমাকে দে, দাসীদের দিই, পাট ক'রে দিক্।

মহামূল্য শাড়ীটা হেমনলিনীর হস্তে সমর্পণ ক'রে রাজেশ্বরী ব'সলো জাজিমে।

আঁচল চেপে-চেপে মুছলো মুখটা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে যেন রাজেশ্বরী। ভেতরের জামাটা বোধ হয় তার ভিজেই গেছে।

—দাসী! দাসীরা গেলো কোথায়? ডাকলেন হেমনলিনী।

—আছি গো আছি। যাবো আবার কমনে? হুজুরনীর হুকুম তামিল করতে তো হরবকৎ দাঁড়িয়েই আছি। হুকুম হোক হুজুরনীর!

—ও! কে, আয়েষা?

—হাঁ, হুজুরনী! বললে আয়েষা! হুকুম হোক্।

হেমনলিনী দাসীর কথার ধরণ শুনে মৃদু হেসে বললেন,—এই নে, বৌয়ের শাড়ীটা ভাল ক'রে পাট ক'রে রাখ্।

শাড়ীটা আয়েষা লুফেই নেয়। বলে,—যো হুকুম। আমি এসেছি বৌদিদিকে দেখতে। দেখি নাই তাকে! তোমার ভাইয়ের ছেলে-বৌকে। শুনেছি খুপসুরৎ বৌ হয়েছে।

—ভ্যাখ না ঘরে ঢুকে। দেখে তোর চোখ কপালে উঠবে। বললেন হেমনলিনী। গর্ব্বিত কণ্ঠে।

আয়েষা দরজার মুখে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যস্থিত অপরিচিতাকে দেখে। বলে,—বাঃ, বেশ মেয়ে পেয়েছে হুজুরনীর বৌঠাকরুণ। অমন চাঁদপানা মুখ, দুধের মত রঙ, মোমের মত গড়ন, আর কি চাই? এমনি মেয়ে না পেলে তোমার ছেলেদের বিয়ে দিও না।

আয়েষার কথা শুনে ক্ষীণ হাসলেন হেমনলিনী। হতাশ-হাসি!

অন্য কেউ এই ধরণের অনধিকার-চর্চ্চা করলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন গৃহকর্ত্রী। কিন্তু সে যে আয়েষা। হেমনলিনী যখন বধূরূপে এই গৃহে এসেছিলেন সেই তখনকার মানুষ আয়েষা। কে বলবে যে জাতে মুসলমান! শুধু যা ঐ সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কীর বৈচিত্র্য। বৌ দেখতে এসে নিজেই প্রায় বৌ সেজে এসেছে আয়েষা। হোক না বয়স, চুলগুলোয় না হয় পাক ধ'রেছে, দাঁতগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে—তবুও বুড়ী আয়েষা গায়ে গয়না চড়িয়েছে। কানে মাকড়ি, গলায় হাঁসুলী, হাতে বালা আর কাচের চুড়ি। রৌপ্যালঙ্কার। হুজুরনীর খাস বাঁদী, যেমন-তেমন বেশে দেখা দিতে পারে কখনও! একটা ফেঁসে-যাওয়া নীলাম্বরী পরতেও ভোলেনি আয়েষা। কেবল যা বার্দ্ধক্যের অভিশাপ-চিহ্ন ফুটেছে শরীরে। ঈষৎ কুঁজো হয়ে গেছে আয়েষা। শরীরে তেমন আর শক্তি নেই। পক্ক কেশ, চর্ম্ম লোল হয়ে গেছে। তথাপি সাজ-সজ্জার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি আয়েষা। হুজুরনীর খাস বাঁদী যে আয়েষা! একেবারে খাস-মহলের।

—আমার ছেলেদের বিয়ে আমি দেবো না। হেমনলিনীর প্রদীপ্ত কণ্ঠ।

আয়েষা তো হতবাক্ হয়ে থাকে কিয়ৎক্ষণ। কানের মাকড়ির রাশি ছুলিয়ে বলে,—সাদি দেবে না, সে কেমন বাত! সাদি দেবে না কেন?

—যা, তুই যা দেখি। নিজের কাজে যা। হুকুম করলেন গৃহকর্ত্রী।

গেল না আয়েষা। পিঙ্গল চোখ ছু'টিতে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে বললে,—বৌ, তোমার নামটা কি বললে না?

—রাজেশ্বরী। বললে রাজেশ্বরী।

হুঁকো-খাওয়া কালো ঠোঁটের ফাঁকে হাস্তরেখা দেখা দেয় আয়েষার। বলে,—রাজরাজেশ্বরী? বাঃ, বেশ নাম তো!

কথার শেষে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বহির্গত হয় আয়েষা। কোন' রকমে দরজাটা ধরে, টাল সামলে নেয়। তার পর দেওয়াল ধ'রে ধ'রে চলে। দালানে।

হেমনলিনী কখন যে খাটে উঠে প'ড়েছেন তিন-ধাপের সিঁড়ি বেয়ে, দেখতেই পায়নি রাজেশ্বরী। দেওয়ালে সত্যিকার পোষাক-পরানো ছবি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে। দুর্ব্বাসার অভিশাপ, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, যম এবং সাবিত্রী, বনবাসিনী সীতার সঙ্গে যুদ্ধনিপুণ লব-কুশ প্রভৃতির রঙীন ছবির মানুষদের পোষাক পরিয়েছেন হেমনলিনী নিজেই।

একটা নরম তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছেন হেমনলিনী। কাছেই ছিল পালখের হাত-পাখা। তুলে নিয়েছেন পাখাটি। বাতাস খাচ্ছেন। আয়েষা চ'লে যেতেই ডাকলেন,—আয় বৌ, খাটে আয়। জাজিমে বসবি তুই?

রাজেশ্বরী উঠলো পায়ের অলঙ্কার বাজিয়ে।

শুভ্র ছু'টি পা, অলক্তক-শোভিত। বসলো উঠে খাটে। সলজ্জায় বসলো খাটের কিনারা ঘেঁসে।

—বৌ, তোর গান ভাল লাগে না?. পাখা করতে করতে একটু হেসে বল্লেন হেমনলিনী।

—গান?

—হ্যাঁ রে।

রাজেশ্বরী চোখ বড়-বড় করে। বলে,—হ্যাঁ। খু-উ-ব ভাল লাগে। বিশেষতঃ আপনি যখন গান।

চুপ মেরে যান হেমনলিনী। মুখে তাঁর মৃদু হাস্য। পাখাটা রেখে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হ'লে বললেন,—তুই বৌ, মন-রাখা কথা বলছিস! আমি কি গাইতে পারি?

—খু-উ-ব ভাল গাইতে পারেন। আমি বাজে কথা বলি না। ঘরের অন্যান্য ছবি চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললে রাজেশ্বরী।

ফটোগ্রাফ। সিপিয়া রঙের আলোকচিত্র।

রাজেশ্বরী লক্ষ্য করে ঐ তো পিসে মশাই, পাশে পিসীমা। আর ওঁরা কারা? হয়তো হেমনলিনীর শ্বশুরকুলের কেউ কেউ। দেওয়ালের আলোক-চিত্র সমূহ কোন্ বিলেতী আলোকচিত্রীর দোকানের। চৌরঙ্গী অঞ্চলে নাকি সেই দোকান। শিবচন্দ্র বাবুর সখেই তোলানো হয়েছিল।

কিন্তু উনি কে?

কে ঐ পুরুষ, যে বাঙ্গালী হিন্দু, কিন্তু যার আকৃতিতে নবাবী কেতা। স্কন্ধলম্বিত কেশ মাথায়, দীর্ঘ আঁখি। বিস্তৃত ললাট। খাঁড়ার মত নাক। ওষ্ঠে অদ্ভুত হাসির আভাষ।

—উনি কে পিসীমা? কার ছবি? শিশুর মত প্রশ্ন ক'রে ব'সলো রাজেশ্বরী। কৌতূহলী কণ্ঠে।

—কে বল্ তো? কোন্ ছবিটায় আবার তোর চোখ প'ড়লো? চোখ ফিরিয়ে তাকালেন হেমনলিনী। যা ভেবেছিলেন তাই?

দেখে-দেখে এত ছবি ঘরে থাকতে চোখ প'ড়লো ঐ ছবিতেই। তবুও একটা আলমারীর প্রায় আড়ালে রেখেছেন হেমনলিনী—যাতে কারও নজরে না পড়ে। ইচ্ছা হ'লে দেখতে পান শুধু হেমনলিনী।

—অ! উনি আমার এক ভাওর। বললেন হেমনলিনী।

রাজেশ্বরীর চোখ কিন্তু ফেরে না। সে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

বিষয়টা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্তই বোধ করি পিসীমা অন্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বললেন,—তোর বুঝি বৌ গান-টান আসে না ?

—আঁজ্ঞে না। বললে রাজেশ্বরী। সলজ্জ কণ্ঠে।—গান শুনতে খুব ভাল লাগে। আমি গাইতে জানি না। ঠাগ্‌মা যে শেখায়নি। যেন ঠাগ্‌মারই যত দোষ, এমনি কথার স্বর রাজেশ্বরীর।

এমন সময়ে এক দাসীর প্রবেশ। হাতে জল-খাবারের রেকাবী। জলের পাত্র।

—কিছু মুখে দে বৌ। দাসীকে দেখে বললেন হেমনলিনী।

দাসীর রঙ কষ্টিকালো। হাতের পাত্র দু'টি রৌপ্যাধার—দাসীর অবয়বের কৃষ্ণতায় চাকচিক্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে থাকে ঐ পাত্র দু'টির।

—এখন কিছু খাবো না পিসীমা। বললে রাজেশ্বরী। অনিচ্ছার সুরে। এতক্ষণ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ব'সেছিল, বেশ গুছিয়ে ব'সলো। খাটের কিনারায় রইল আলতা-রাঙা পা দু'টি।

—তাই কি হয় ? উঠে বসলেন হেমনলিনী।—কিছু খা বৌ। দাসী অত কষ্ট ক'রে আনলে !

মুখ ব্যাজার ক'রলো রাজেশ্বরী। বললে,—না পিসীমা, খাওয়ার নামে যেন আমার গা গুলোয়। বমি আসে।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না হেমনলিনী। শুধু বললেন,—তাই নাকি রে ? কবে থেকে এমনটি হয়েছে বল্ তো ?

লজ্জানত হয়ে যায় রাজেশ্বরীর ঢলো-ঢলো মুখ। আনত দৃষ্টিতে শাড়ীর আঁচলের স্তো টানাটানি করতে থাকে।

—আচ্ছা, বেশ কথা। আমিই তবে আয় খাইয়ে দিই। দাও তো দাসী রেকাবটা !

সত্যি সত্যিই খাওয়াতে উদ্যোগী হ'লেন হেমনলিনী। রেকাবী থেকে একটা মিষ্টান্ন তুলে দাসীকে বললেন,—যা, এই একটাই ও খাক্। মুখ তোল্ বৌ!

মুখ তুললো রাজেশ্বরী। চোখ তুললো।

মুখের কাছে মিষ্টান্ন ধ'রে আছেন হেমনলিনী। বললেন,—খেয়ে নে বৌ। খেতে কত বেলা হয় ছাখ্ এখন। আমার রাঁধুনী আমার বাপের বাড়ীটির মত নয়। বড্ড বলাবলি করতে হয়, দেখিয়ে দিতে হয়। তোর জন্যে বৌ আজ আমি নিজে মাংস রাঁধবো। দেখিস্ খেয়ে।

কিন্তু খায় কে? খাওয়ার নামে যে তার বমনের উদ্রেক করে।

রাজেশ্বরী বললে,—কেন পিসীমা আপনি উনুনের তাতে যাবেন? না, মাংস অন্য একদিন হবে। আমি আপনাকে যেতে দেবো না।

—আমি যে বৌ মাংস আনাতে বাজারে লোক পাঠিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন। বললেন হেমনলিনী।—নে তুই খেয়ে নে মিষ্টিটা।

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিষ্টান্নটা মুখে পুরলো রাজেশ্বরী।

ঘরের তৈরী নরম পাকের গরম একটা 'তাল-শাঁস' সন্দেশ। দাসীর হাত থেকে জলপাত্র নিয়ে জলপান ক'রলো। খায় না রাজেশ্বরী, গলাধঃকরণ করে যেন জোর ক'রে। বমনের বেগ সামলায়। কি হয়েছে রাজেশ্বরীর, কে জানে! শরীরটা ক'দিন যাবৎ ঠিক নেই। বসলে উঠতে চায় না, আলস্য লাগে। মাথাটা সময়ে সময়ে ঘুরতে থাকে। এমন কত সময়ে রাজেশ্বরী তাদের স্নানের ঘরের অর্গল তুলে দিয়ে বমি করেছে। কি হয়েছে তার কে জানে!

জলের পাত্রটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে আবার খাটের কিনারা ঘেঁসে বসলো রাজেশ্বরী।

হেমনলিনী কেমন যেন চিন্তিত হয়ে আছেন। বৌয়ের হ'ল কি? হেমনলিনীর খুশীতে হাসি এবং দুঃখে কান্না পায় যেন। বৌয়ের কথা

কানে পৌঁছানো থেকে তিনি বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছেন বৌকে। কৈ, দেহের তো কোন' পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে না? শুধু কেমন একটু ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে যেন বৌটা। চোখের দৃষ্টিতে শ্রান্তির ছায়া।

—পিসীমা, নতুন কি গান তুললেন? শুধোলে রাজেশ্বরী।

ডিবে খুলে তখন পান মুখে পুরছিলেন হেমনলিনী। বললেন,—হ্যাঁ। বৈষ্ণব পদাবলী তুলেছি একটা।

বৈষ্ণব পদাবলী?

সে আবার কি! অত-শত বোঝে না রাজেশ্বরী। জানে শুধু গান শুনতে।

গানকে গান ব'লেই জানে। কে বৈষ্ণব আর কে রবিবাবু, চেনে না বৌ। তার কি দোষ! ঠাগ্‌মা যে শেখায়নি তাকে। রাজেশ্বরী বললে,—বৈষ্ণব পদাবলী কাকে বলে পিসীমা? আপনি উঠুন, গানটা আমাকে শোনান।

সামান্য স্ফূর্ত্তি মুখে ফেলে বললেন হেমনলিনী,—গাইতে যে লজ্জা করে! লোকে শুনলে কি বলবে! বলবে যে, মরবার বয়েস হয়েছে তবুও সখ এখনও মিটলো না।

—না না, কেউ কিচ্ছু বলবে না। বললে রাজেশ্বরী।—আপনি উঠে বাজনায় গিয়ে বসুন।

—আচ্ছা একটু বাদে গাইবো'খন। তুই বৌ একটু জিরো। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন হেমনলিনী।

—বেশ তাই গাইবেন। বলে রাজেশ্বরী।

মুখে একমুখ পান হেমনলিনীর। ঘরের হাওয়ায় স্ফূর্ত্তির সুগন্ধ।

পান চিবোতে চিবোতে বললেন হেমনলিনী,—হ্যাঁ রে, তুই যা বললি আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না বৌ!

—কোন্ কথা পিসীমা? রাজেশ্বরী জিজ্ঞেস করলো।

—ঐ যে বললি, জমিদারীর খাজনা ফেল্ প'ড়েছে! হেমনলিনীর কণ্ঠে বিস্ময় সেই পূর্ব্বের মতই। বললেন,—এত টাকা গেল কোথায়! তুই বৌ, ঠিক জানিস তো?

—হ্যাঁ পিসীমা। আপনাকে মিথ্যা বলবো আমি? রাজেশ্বরী কথা বলে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে।

—ঐ দুধের ছেলে এত টাকা কখনও দেখতে না দেখতে উড়িয়ে দিতে পারে! বললেন হেমনলিনী।—তুই ঠিক জানিস না বৌ। তুই ধান শুনতে কান শুনেছিস।

—হ্যাঁ পিসীমা, সত্যি কথা। কালকে উকিল-বাড়ী গেছলো, আজ আদালতে যাবে। খাজনার টাকা দিয়ে আসবে। এক ঘড়া টাকা বের করেছে সেই জন্যে।

হেমনলিনী বললেন,—ঘড়ার টাকায় হাত প'ড়েছে? সে কি কথা বৌ? তুই কি বলছিস? ক'ঘড়া টাকা বেরিয়েছে বললি?

—এক ঘড়া।

—আর যে সব ঘড়া ছিল, সেগুলো? হেমনলিনীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলো রাজেশ্বরী। ঘরের কড়িকাঠে চোখ তুললো। বললে,—সেগুলো ঠিক আছে।

—তবে? সহাস্যে বললেন হেমনলিনী।—তবে বৌ? তুই কিচ্ছু জানিস্ না। খাজনা দেওয়ার জন্যে নয়, অন্য কোন দরকারে হয়তো টাকা নিয়েছে। তুই জানিস্ না। ওঃ, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লুম।

—আচ্ছা পিসীমা, আপনার ঐ যে দেওর, উনি আপনার বাড়ীতে থাকেন? রাজেশ্বরীর কৌতূহল মিটতে চায় না যেন।

পান চিবোতে চিবোতে বললেন হেমনলিনী,—না, না, এখানে থাকেন না। মধ্যে মধ্যে আসেন, থাকেন দু'-চার দিন!

রাজেশ্বরী বালিকা বধূ। তার চোখে পড়ে না। সে দেখতে পায় না। দেখবার মত চোখ আর অভিজ্ঞতা তার নেই। নয় তো দেখে বুঝতো, কথা বলতে বলতে কেমন এক লজ্জার অদৃশ্য রেখা ফুটে ওঠে হেমনলিনীর মুখাকৃতিতে। কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে। স্পষ্ট কথা বলতে পারেন না, কথা জড়িয়ে যায়। ঘরে কেউ থাকলে, দেওয়ালের ঐ ছবিটির প্রতি চোখ পর্য্যন্ত ফেরাতে পারেন না। লজ্জায় বাধা দেয় হয়তো।

—উনি কি করেন? বোকার মত আবার তারই কথা শুধোলে রাজেশ্বরী।

হেমনলিনীর কণ্ঠ নত হয়ে যায় সহসা। বললেন,—অন্য কিছু করেন না, সাহিত্য করেন। আমাকে কত বই পড়িয়েছেন। গানের স্বর যোগাড় ক'রে দিয়েছেন। উনি বেশ ভাল লোক। যেমনি শিক্ষিত তেমনি ব্যবহার। এখন আছেন্ আমার বাড়ীতে, ক'দিন হ'ল এসেছেন।

'সাহিত্য' কথাটি শুনে চোখ কপালে ওঠে রাজেশ্বরীর। সাহিত্য আবার কোন্ বস্তু!

মানুষটির প্রতিকৃতিতে মানুষটিকে দেখলে কিন্তু চট্ ক'রে চোখ ফেরানো যায় না। ঘরের মধ্যে আছে এত মহার্ঘ দ্রব্যাদি, কিন্তু অন্যান্যকে ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ ছবিখানি। এ-কথা সে-কথার ফাঁকে ফাঁকে তাই রাজেশ্বরীও বোধ করি দেখে ঐ ছবি। ঐ সুপুরুষাকৃতি।

—বৌ, আমার ভাইপোটিকে তোর মনে ধ'রেছে তো?

অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন হেমনলিনী। কথাগুলি বললেন সহজ হাসির সঙ্গে। আরও একটা পান পুরলেন মুখে। অধর তাঁর রক্তিম হয়ে উঠেছে। স্ফূর্তির সুমিষ্ট গন্ধ বইছে ঘরের বাতাসে। লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় এলিয়ে পড়লেন হেমনলিনী। মুখে তাঁর তামাসাময় হাসি।

রাজেশ্বরী প্রশ্নটা শুনে স্বাভাবিক সঙ্কোচে দৃষ্টি আনত ক'রলো।

ক্ষীণ হাসলো যেন। উত্তর দিলো না কথার। ঘামতে লাগলো।

হেমনলিনী ঠাট্টার সুরে বললেন,—জানিস তো বৌ, চুপ ক'রে থাকলে, হ্যাঁ বোঝায়। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

না, এতটা বোঝে না রাজেশ্বরী।

বুঝলে অন্তত চুপ ক'রে থাকতো না। রাজেশ্বরী হঠাৎ কথা বলে,—ভাল, তবে শিক্ষিত নয় মোটে এই যা।

হেসে ফেললেন হেমনলিনী। খিল-খিল শব্দে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। হাসতে হাসতেই বললেন,—কি, কি বল্লি বৌ, আর একবার বল্ তো কথাটা। কথা শেষ হ'তে পুনরায় হাসি।

রাজেশ্বরী আর পুনরুক্তি করে না সে কথার। ব'সে থাকে চুপচাপ। হাসির বেগ সামলে বললেন হেমনলিনী,—লেখাপড়াটা যে শিখলো না। আর অসময়ে দাদারা চ'লে গেলেন যে। দেখবার মত কেউ আর রইলো না তো। বৌঠানও কি ঐ অবাধ্য ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে কম চেষ্টা ক'রেছে! শেষকালে বায়না ধ'রেছিল টোলে পড়বো না, পণ্ডিতের কাছে পড়বো না, ইংরিজী স্কুলে পড়বো।

রাজেশ্বরীর নিদ্রার স্বপ্ন ছিল হয়তো অন্য। মনের সঙ্গোপনে সে রচনা ক'রেছিল বোধ করি অন্য এক পৃথিবী। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সেই যে কেমন এক রঙীন দুনিয়া গড়ে তুলেছিল, শুভ-বিবাহের ধাক্কায় সেটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রাজেশ্বরী ভেবেছিল, সে রাজেশ্বরী। সে বিত্তশালিনী। সেও ঐশ্বর্য্যালঙ্কারে ভূষিতা।

হয়তো মন থেকে কামনা করেছিল এমন একজনকে, যার শিক্ষা আছে, দীক্ষা আছে। জ্ঞান আর বুদ্ধি আছে।

তার রূপটা যে রাজেশ্বরীর কল্পনায় কেমনটি ছিল কে জানে! হয়তো অপরূপ।

হুজুরনী, মাংস এনেছে। বামুন পিসী ডাকতেছে আপনাকে।

দরজায় না জানলায় কোথায় এক দাসী কথা বললো। হুজুরনী বললেন,—বল' আমি আসছি।

—না পিসীমা, আমি আপনাকে যেতে দেবো না উনুন তাতে। বললো রাজেশ্বরী। সত্যিকার শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে।

—যাবো আর আসবো। বললেন হেমনলিনী।—নইলে মাংসটা অখাদ্য করবে। মুখে তুলতে পারবি না।

—তাই কি হয়? বললে রাজেশ্বরী।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় মাথার ঘোমটা উড়ে যায়। গাছের শাখা-দোলানো হঠাৎ হাওয়া কোথা থেকে উড়ে আসে ঘরে। খোলা জানলা অতিক্রম ক'রে আসে। রাজেশ্বরী আর টানে না ঘোমটা। কে আর আছে এখানে?

—আমিও তবে যাই আপনার সঙ্গে। দেখি আপনার রান্না।

বায়নার সুরে কথা বললো রাজেশ্বরী। মুখে মিনতি ফুটিয়ে!

কি যেন ভাবলেন হেমনলিনী।

পান চিবোতে-চিবোতে ভাবলেন কিয়ৎক্ষণ। হাসতে হাসতে বললেন,—একেবারে আমার গেরস্থালী দেখে তুই ছাড়বি? বেশ তাই চল'। তোমাকে একটি পিঁড়ি দেবো। ব'সে থাকবে তুমি।

উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী। তৎক্ষণাৎ।

যেন বেঁচে গেল। পায়ের অলঙ্কারে ঝঙ্কার তুলে এক লাফে নামলো খাট থেকে। শাড়ীর আড়াল থেকে ক্ষণেকের মুক্তি পাওয়া অলক্তক-শোভিত পদযুগল দেখে পিসীমা বললেন,—আলতা দিয়েছে কে পায়ে?

রাজো বললে,—এলোকেশী। আমার ঝি।

সহসা মনে প'ড়ে যায় যেন হেমনলিনীর।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মুহূর্ত্ত মধ্যে। বলেন,—ঐ দেখো, কুটুমবাড়ীর

লোকটিকে জলখাবার খাওয়াতে বলতে ভুলেছি আমি! চল্‌ বৌ চল্‌, পা চালিয়ে চল্‌। আমি না বললে বাড়ীতে হবে না কিছুটি।

পা চালালো রাজো। ঝম্‌-ঝম্‌ শব্দ তুললো।

হেমনলিনীর পিছন-পিছন চললো তিনি যে দিকে চললেন।

কুটুমবাড়ীর লোক!

কথাটা শুনে হাসি পায় রাজেশ্বরীর। হয়তো দুঃখের হাসিই হাসে বৌটা। সেই কুটুমবাড়ীতে কে যে কুটুম আছে সেই কথা চিন্তা ক'রেই হাসে রাজো। সাতকুলে কে আছে তার? ঐ বুড়ী ঠাগ্‌মাটা?

সেই বৃদ্ধাও মরণের কোলে।

মৃত্যুক্রোড়ের মানুষ আছে আজ, কাল সে কোথায়! তারপর, তারপর আর কে রইলো রাজেশ্বরীর পিত্রালয়ে?

তবুও পতি পরম গুরুজনটি যদি যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ হ'তে পারতেন! একটা যেন কাঁটা আছে রাজেশ্বরীর বুকের কোথায়। সেই কাঁটা থেকে থেকে বিদ্ধ করে তার বুকটা। কী ভয়ঙ্কর অস্বস্তি-বোধ তখন!

মানুষটির অবস্থা তখন সঙ্গীন হয়ে প'ড়েছে।

সত্যিই, কত লোক ঘিরে বসেছে! কত ধরণের লোক। কত জাতের।

কে জানে, কে জানালো তাদের! সময় বুঝে ঠিক এসেছে কিন্তু তারা। মানুষটিকে কেন্দ্র ক'রে ব্যূহ রচনা করেছে।

কৃষ্ণকিশোর ব'সেছিলেন ফরাসে।

একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন আর থেকে থেকে পানপাত্র মুখে তুলছিলেন। মুখ বিকৃত করছিলেন।

একটি পর্দা-ঢাকা জানলার ফাঁক থেকে মধ্যে মধ্যে মৃদু হাসি মুখে মাখিয়ে সুসজ্জিতা কে একজন উঁকি মারছিলেন। ঘরের দেওয়াল-গিরির

জোরালো আলোকে মহিলাটির ফুটন্ত যৌবনের মতই তাঁর নাসিকার সূক্ষ্ম অলঙ্কারটি চিক-চিক করছিলো।

ঘরের মানুষের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হ'লে নেপথ্যের ঐ নারীর মুখে হাসির উদ্রেক হয় অধিক। তাঁর আলতা-রাঙা অধর কী যেন আবেদন জানায়। কিসের আবেদন কে জানে!

রমণীর বক্ষে ফিরোজা কাঁচুলী। আঁটসাঁট।

একটা রেশমী কাপড়ের টুকরোকে টানটান বেঁধেছেন বক্ষে। স্কন্ধ থেকে জানু পর্য্যন্ত ঝুলছে দোপাট্টার দুই অঞ্চল। পবনাঘাতে উড়ছিল যেন।

চোখে মুসলমানী সুর্ম্মা না হিন্দুর ঘরের কাজল?

একটা কিছুর অতিরিক্ত স্পর্শ আছে যেন চোখে। দুই চোখের মধ্যস্থলে একটি কৃষ্ণবিন্দু। কাচপোকার টিপ।

যারা ঘিরে ধ'রে আছে তারা এসেছে টাকা লুটতে।

কাঁচা কাঁচা টাকা রাশি রাশি লুটতে আর চোখে ধুলো দিতে। আর যাঁর চোখে ধূলি পড়বে তিনি পানপাত্রে চুম্বন করছিলেন আর আড়-নয়নে দেখবার চেষ্টা করছিলেন ঐ কৌতুকময়ীকে। যিনি ঐ বাতায়নের আড়ালে। সস্তা নেটের পর্দ্দার অন্তরালে। গোলাপী নেট।

ঘরে আছে ব্যাণ্ডপার্টির লোক। কলকাতার গ্যাঁড়াতলার মুছলমান। অমৃতসরের আতরওলা। চিৎপুরের ডেকরেটর। গ্যাসবাতির আড়ৎদার। আতস-বাজী বানানোর ওস্তাদ। মদের দোকানের প্রোপাইটর! হালুইকরের দালাল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণকিশোর তসরের একটি বুটিদার বেনিয়ান পরিধান করেছিলেন।

কালাপেড়ে কাঁচির মিহি-কোঁচান ধুতি। মাথায় ঘন-লাল ভেলভেটের নবাবী টুপী। জরির কারুকাজ আছে।

দেওয়াল গিরির জোরালো আলোর ছায়ায় হঠাৎ হঠাৎ স্বর্ণাভা বিকিরণ করে। জরির কারুকাজে সূক্ষ্ম শিল্পীর করস্পর্শ আছে অতি অবশ্য।

ঘরে আতরের উগ্র মিষ্ট গন্ধ। হেনার গন্ধ।

আকাশে তখনও ছিল অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা।

দিগন্তে লীন হয়ে যাচ্ছে দিনের শুভ্রতা।

গরাণহাটার অলিগলিতে দোকানে আলো জ্বালা হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রঙ-বেরঙের বেলোয়ারী কাচের আলো। নানা ঢঙের, নানা রঙের।

দেখে দেখে অন্ধকারের আভাষ পেয়ে জোনাকী এলো নাকি! একবার আলো একবার কালো হচ্ছে কেন? কৃষ্ণকিশোরের চোখের দৃষ্টি সেই খদ্যোতের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ঐ নারীর নাসিকায় হীরকখণ্ড আছে কি! অধরোষ্ঠে কি তিনি লোহিত রক্ত মাখিয়েছেন। তাঁর মুখে কেমন বক্র হাসি। কখনও বা রমণীর অঙ্গ সঞ্চালনে কানের ঝুমকো আনত ফুলের মত দুলছে।

ঘড়ার টাকা যথায় পৌঁছে দিয়ে আরাম ক'রে, পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে কৃষ্ণকিশোর চুম্বন করছিলেন পানপাত্রকে। পাত্রে কে যেন রক্ত মিশ্রিত ক'রেছে! প্রায় অর্দ্ধেক পান ক'রেছেন তৃষ্ণার্ত্ত মানুষটি।

যারা ব'সেছিল তারা যে যার বক্তব্য পেশ করছে।

দর বলছে। বলছে, এক দর। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দরাদরিতে আবার বলছে এক দর।

মজা দেখছে গহরজান জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে!

ঘরের আতরদানে হেনা। হাওয়ায় হেনার নেশা। বেশ লাগে লাল-জল পান করতে। তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় না এফেক্ট, কিছুক্ষণ অতীত না হ'লে কাজ করে না এই রক্ত-জল। আর যখন কাজ করে তখন যা-তা নেশা নয়। আমীরী নেশা।

প্রথমে কয়েক মুহূর্ত্ত যাঠ ঝলসে যায় আক, যখন এই মদিরার ঝর্ণা অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় অন্তর্দেহে।

দিন বুঝে পাত্র পূর্ণ ক'রে দিয়েছে সৌদামিনী নিজে।

বাবুকে আজ ঘায়েল করতে হবে যে! মুরগী যে আজ জবাই হবে। সৌদামিনীর হাতে বধ হবেন নেশায় চুর মানুষটি।

ঝপ ক'রে কোপ বসাবার পাত্রী সৌদামিনী নয়।

অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে, মদের নেশায় চুর ক'রে দিয়ে ছুরি শানাতে ব'সবে। সেই কারণেই তো আজ আর অন্য কিছু দেয়নি। পাত্র ভ'রে দিয়েছে ইটালীয়ান ওয়াইনে—যার রঙ রক্তকেও হার মানায়। মানুষটির চাঞ্চল্যে পূর্ণপাত্রটি চলকে-চলকে ওঠে।

গহরজান জানলায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল আর হাসছিল তির্য্যক্ হাসি।

সৌদামিনী টাকা সমেত ঘড়াটি এক ঘরে রেখে দরজায় বেশ ভারী ওজনের একটা কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

টাকার মালিক টাকা হস্তান্তরের সময় বলেছেন,—ঘড়া থেকে হাজার পাঁচেক টাকা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। বাদবাকী টাকা খরচা হবে ডালিমের বিয়েতে। গহর যেমন খুশী খরচ করবে।

কথাগুলো শুনে ভাল লাগেনি সৌদামিনীর। মুখটা তার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে হেসেছিল শুধু।

পাত্র হাতে ফরাস থেকে উঠে পড়েন কৃষ্ণকিশোর।

জানলার কাছে গিয়ে বললেন,—এদের কি ব'লবো? তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলবে না?

গহরজান হাসলো। সেই মনমাতানো শব্দহীন হাসি।

মুক্তার মত দাঁতের সারি দেখা গেল। গহরজান আঁখি নিমীলিত ক'রে বললে,—আমি কি বলবো! আমি কি কথা বলতে জানি!

—আমিও যে বুঝি না দরাদরি। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

গহরজান ফর্সা গাল দু'টিতে টোল ফুটিয়ে হাসলো আবার। বললে,—ছেড়ে দাও না ওদের। মাসী বোঝে দরাদুরি, মাসী বুঝবে।

—সেই ভাল। বললেন কৃষ্ণকিশোর। এক চুমুকে পাত্রের অবশিষ্টটুকু নিঃশেষ ক'রে ফেললেন।—সেই ভাল, আমি ওদের কাল-পরশু আসতে ব'লে দিই।

সোনালী জরি-জড়ানো বেণীটা ধ'রে খেলা করতে করতে গহরজান বললে,—হাঁ, তাই দাও। ঘর খালি করিয়ে দাও। ওদের ভাগাও।

যারা ঘরে ব'সেছিল চোখে লোভ ফুটিয়ে তারা একে একে কখন বিদায় হয়ে যায় হুজুরের আদেশে। সেলাম ঠুকতে ঠুকতে যায় কেউ-কেউ।

চমকে উঠে গহরজান। কার পদশব্দ হঠাৎ? .

—কেঃ! ক্যোন্ হ্যায়? হাওয়ার সঙ্গে যেন কথা বলে গহরজান।

কোথায় কে? আড়-নয়নে চেয়ে থাকে সিঁড়ির মুখে। ডালিম নয় তো! খুনী ডাকাতও হ'তে পারে। হ'তে পারে কোন' মাতাল বদ্মাস। হ'তে পারে কোন' ঠগ্ জোচ্চোর।

—ফুল লিবি না?

অনেক দিনের ফুলওয়ালা। কত দিন দেখছে তাকে গহরজান!

হাতে ফুলের ডালি তার। তার বৌ গেঁথে দেয়। ফুলওয়ালা ঘরে-ঘরে ঘুরে ঘুরে টাটকা ফুল বিকিকিনি করে। বাহুতে ঝুলতে থাকে ফুলের মালা—হাতে ধ'রে থাকে ফুলের গয়না—চুড়ি, মুকুট আর ফুলের পাখা। আর ফুলের ছোট ছোট তোড়া।

ফুলওয়ালাকে ইশারা করে গহরজান। চোখের ইশারা।

দেখিয়ে দেয় ঘরের মানুষকে। ফুলের গয়না আর মালা বিক্রী হয়ে যায় এক কথায়।

টাটকা ফুল। ঘরের বাতাসে হেনার সুগন্ধকে কিন্তু ছাপাতে পারে না। গহরজান ঘরে প্রবেশ করে দোপাট্টার আঁচল লুটোতে লুটোতে। আলতা-মাখা হাতে তার আরেক পাত্র।

ইটালীয়ান ওয়াইন্। চ'লকে-চ'লকে উঠছে গাঢ় লাল জল। যেন তাজা রক্ত অর্দ্ধপাত্র!

চোখে নেশা ফুটিয়ে আবার হাসলো গহর। কপাল থেকে তাচ্ছিল্যে সরিয়ে দেয় কয়েকটা চূর্ণ কুন্তল। ঝলমল করছে গহরজান। আর তার ফিরোজা রঙের কাঁচুলীটা! জানলাভেদী খটখটে দিবালোকে।

—হ্যাঁ অনন্ত, যা শুনছি তা কি সত্যি?

অনন্তরামকে আড়ালে ডেকে প্রশ্ন করলেন হেমনলিনী। ভয়-কাতর কণ্ঠে।

—কি দিদিমণি?

প্রসঙ্গটা জানতো না অনন্তরাম। কণ্ঠে তার বিস্ময়।

—এই যে শুনছি আমার ভায়েদের জমিদারীর খাজনা বাকী প'ড়েছে! ঘড়ার টাকায় হাত প'ড়েছে! তুমি কি কিছুই জানো না? হেমনলিনী কথা বলেন মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে।

আকাশ থেকে পড়ে যেন অনন্তরাম। মুখাকৃতি তার এমন হয় যে স্পষ্ট বোঝা যায় সে এই বিষয়ে একান্তই অজ্ঞ। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে অনন্তরাম বললে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে,—কি সত্যি আর কি যে মিথ্যে আমরা কোথা থেকে জানবো দিদিমণি? কর্ত্তারা যাওয়া থেকে আমাকে কি কেউ আর মানুষ ব'লে মনে করে! জমিদারীর খাজনা বাকী পড়েছে, এমন কথা তো শুনি নাই দিদিমণি! তুমি কেমনে শুনলে?

—ঐ যে বৌ বলছিলো। শুনে আমি মরমে মরে আছি অনন্ত! আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না। কত বড় অপমান আমার দাদাদের! হেমনলিনী কথা বলেন যেন অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে। মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

হেমনলিনীর কথা শুনে অনন্তরাম হেসে ফেললো। বেশ কিছুক্ষণ হাসলো আপন মনে। দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, উবু হয়ে ব'সে পড়লো হাসতে হাসতে।

—এত অপমানেও হাসি আসছে তোমার অনন্ত? বিরক্তি সহকারে বললেন হেমনলিনী।

—হাসি কি আর সাধে আসে দিদিমণি! তোমাদের ঐ বৌয়ের কথা শুনে তুমি বিশ্বেস করলে? সে কি মানুষ দিদিমণি! বৌটা একটা মোমের পুতুল, ওকে দেরাজে সাজিয়ে রাখলেই ভাল। কথা বলতে বলতে খানিক থামলো অনন্তরাম। হাসির বেগ সামলে বললে,—বড় ভাল মানুষ দিদিমণি, বড় ভাল মানুষ! পৃথিবীর কিছু কি জানে বৌটা?

—আমিও তাই ভাবছি। বৌ হয়তো জানে না। হেমনলিনীর কণ্ঠস্বরে আশ্বাস।

অনন্তরাম বললে,—বৌকে যা বোঝাবে তাই বুঝবে। বৌয়ের কথা শুনে তুমি দিদিমণি মন-টন খারাপ ক'র না। খাজনা বাকী পড়তে যাবে কেন? খোঁজ নাও ঘড়ার টাকা কোথায় গেছে! হয়তো শুনবে মেয়েমানুষের পায়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

—মেয়েমানুষ! বল কি অনন্ত! হেমনলিনী চুপি চুপি বললেন।

—হ্যাঁ গো দিদিমণি, হ্যাঁ। মেয়েমানুষ, জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ। তাও যদি আমাদের ঘরের মেয়ে হ'ত!

—তবে?

—মুসলমান, মুসলমান বাইজী একটাকে পুষে রাখেনি তোমার

ভাইপোটি? বললে অনন্তরাম। চোখ বড় বড় ক'রে বললে। মুখের হাসি কখন অনন্তরামের মিলিয়ে গেছে কথা বলতে বলতে।

—ওমা, কি হবে গো! তুমি ঠিক জানো অনন্ত? হেমনলিনী যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি শুনলেন তিনি? তাও শুনলেন যার-তার মুখ থেকে নয়, পুরাতন ভৃত্য অনন্তরামের মুখে!

—মদ খাওয়া ধ'রেছে পাকাপাকি, বাইজী পুষেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, আর কি কিছু বাকী আছে? না জেনে আমি কথা বলি না দিদিমণি! অনন্তরাম তার কথায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে কথা বলে।

—তাই বল'! বললেন হেমনলিনী। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। বললেন,—শুনেছিলুম মদ খাওয়া ধ'রেছে অনেক দিন, অস্থানে-কুস্থানে যাতায়াত আছে তাও জেনেছি, কিন্তু বাইজী পুষেছে শুনিনি এ্যাদ্দিন। কথা বলতে বলতে দুঃখের হাসি হেসে বললেন,—আর বলতে হবে না, ঘড়ার টাকা কোথায় গেছে আর আমাকে বলতে হবে না। সব বুঝে নিয়েছি আমি।

সত্যিই যেন সকল কিছু বুঝে ফেলেছেন পিসীমা।

অনেক দেখেছেন যে হেমনলিনী, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে দেখছেন। অন্যের ঘরেও দেখেছেন, নিজের ঘরেও দেখছেন। দেখে-দেখে অভিজ্ঞতায় জর্জ্জরিত হয়ে আছেন। পুরুষ মানুষ যদি শুধু মদ খেয়েই ক্ষান্ত থাকে! পুরুষের যদি বহু নারীভোগের তৃষা না থাক্‌তো!

—তুমি বুঝবে না তো কে বুঝবে দিদিমণি? অনন্তরামের কথায় দুঃখের করুণতা।—তুমি যে দেখে-দেখেই এত বড়টা হয়েছো।—সারাটা জীবন তুমি যে কষ্টটা ভোগ ক'রে চলেছো, আমার চেয়ে কে বেশী জানবে!

—বৌটার জন্তেই আমার যত কষ্ট অনন্ত! আহা, ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মেয়েটার জন্তেই আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে!

—বৌমা কোথায়? শুধোলে অনন্তরাম।

হেমনলিনী বললেন,—বেলায় খেয়ে শুয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছে অবেলায়। আহা, ছেলেমানুষ, তাই আমি আর ঘুম ভাঙাইনি।

—ডেকে দাও দিদিমণি, ডেকে দাও। বললে অনন্তরাম।—অবেলায় ঘুমোলে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করবে।

—হ্যাঁ, যাই তাকে তুলেই দিই। ভরসন্ধ্যেয় আর ঘুমোয় না।

কথার শেষে ধীর পদক্ষেপে ত্যাগ করলেন এই নির্জ্জনতা। ফাঁকা দালান একটা। একতলায়। সিঁড়ির পথ ধরলেন হেমনলিনী। যেতে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অনন্তরাম ব'সে রইলো দালানে। আকাশে চোখ তুললো।

আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেশ, আবেগ আর আঘাত খেয়ে যেদিকে তাকিয়ে জ্বালা দূর করে সেই আকাশ পানে তাকিয়ে একলা বসে আছে তো আছেই অনন্তরাম! ভাবছে, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে সেও ভাবছে ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমার মত বধূটিকে। তার সুখ আর দুঃখের কাহিনী। তার সংসারের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা।

আকাশে সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে আছে।

সন্ধ্যাতারা চিক্-চিক্ করছে হেথায়-সেথায়। রাতের পাখী নীড়ের মায়া ত্যাগ ক'রে শূন্যে উড়েছে। ঘরে-ঘরে আলো জ্বালছে কলকাতা নগরীর অধিবাসী। শরত-আকাশের এলোমেলো মেঘের মতই এলোমেলো হাওয়া। বইছে থেকে-থেকে।

কোন ঘরে ঘড়ি বাজলো ঠুং ঠুং ঠুং। দোতলার কোন ঘরে।

দিন আর রাত্রির মিলন-লগ্ন ঘোষণা করলো যেন মেকেবের টেবিল-ক্লক।

—আয় বৌ, চুল বেঁধে দিই।

খাস-কামরায় প্রবেশ ক'রেই ডাকলেন হেমনলিনী।

রাজেশ্বরীর ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙেছিল। তবুও সে শয্যা ত্যাগ করেনি।

একটা তসরের চাদরে আবক্ষ আবৃত ক'রে শুয়েছিল জেগে-জেগে। পত্রঘন সুদীর্ঘ আঁখি মেলেছিল ঘরের দ্বারে। কে কখন আসে! পিসীমা ব্যতীত এই গৃহের অন্য কাকেও যে চেনে না রাজেশ্বরী। চোখে ঘুমের জড়িমা ছিল তখনও। শরীরে যেন অলস-আচ্ছন্নতা। এলোমেলো হাওয়ায় বক্ষে কাঁপন লাগে বৌয়ের। শীতার্ত্ত বাতাস যে! পিসীমা গেলেন কোথায়? এ কি লজ্জা, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে রাজো!

বাইরের গাছে-গাছে পাখীদের সন্ধ্যাসঙ্গীত চলেছে। রাজেশ্বরী উঠে বসলো। তসরের আবরণ সরিয়ে নামলো খাটের ধাপ পেরিয়ে। বললে,—ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম পিসীমা!

—বেশ করেছিলি। বললেন হেমনলিনী। সস্নেহে।

এক গাল হাসলো রাজেশ্বরী। খুশীর হাসি। বললে,—গান তো শোনালেন না পিসীমা? আমিও এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি।

তৃপ্তির হাসি হাসলেন হেমনলিনী। বললেন,—আচ্ছা শোনাবো, তোকে আগে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিই। নিজে চুল বেঁধে নিই। কাপড়টাও বদলে নিই।

—বেশ, তাই শোনাবেন। খুশী হয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। হেমনলিনীর প্রতিশ্রুতির আশায় খুশী হয় সে।

—হজুরনী, আলো এনেছি। ঘরে যাবো?

বাইরে থেকে এক ঝলক আলো ঘরের মানুষ দু'টির রূপপ্রভা যথেষ্ট বর্দ্ধিত ক'রলো। হেমনলিনী বললেন,—লণ্ঠন এনেছিস্ আয়েষা, দিয়ে যা।

সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ হেমনলিনীর। পরিচ্ছন্ন লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ক্ষণেকের মধ্যে। তেলের আলো। বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠন।

হেমনলিনী লক্ষ্য করেন রাজেশ্বরীর নিদ্রালু চোখ। বললেন,—যা বৌ, মুখে-চোখে জল দিয়ে আয়। এসে জলখাবার খা। আমি দাসীকে বলছি তোর খাবার দিয়ে যাক্।

খাওয়ার নামে যে বমনের উদ্রেক করছে।

অনিচ্ছা প্রকাশ করে রাজেশ্বরী বিকৃত মুখাকৃতিতে। বলে,—না পিসীমা, এখন আমি কিচ্ছু খেতে পারবো না। দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে খেতে বলবেন না। বেলায় খেয়ে হাঁসফাঁস করছি এখনও।

লণ্ঠনের আলোয় বৌয়ের মৌখিক আপত্তিতে হেসে ফেললেন পিসীমা। বললেন,—বেশ, তবে থাক্। যখন খাবি তখন খাবি। আমাদের খেতে যে বড্ড বেলা হয়ে গেছে। তুই তবে মুখে জল দিয়ে আয়। আমি চুল বেঁধে দিই।

কথা বলতে বলতে দেরাজ থেকে কেশচর্চ্চার সামগ্রী বের করেন তিনি। রাজেশ্বরী ভয় আর ত্রাসে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। স্নানের ঘর আছে কাছেই। চোখে-মুখে জল দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে বৌ! দালানটা যা অন্ধকার! স্নানাগারও তেমনি। এই সবে ঘরে-দালানে আলো দেওয়া হচ্ছে। খানসামার দল ঘোরাফেরা করছে হাতে মশাল ধ'রে।

—কোন্ শাড়ীটা পরবি বৌ? তোর যেটা পছন্দ।

বৌ ঘরে প্রবেশ করতেই প্রশ্ন করলেন হেমনলিনী। অন্য একটি দেরাজ খুলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি রাজেশ্বরীর প্রতীক্ষায়। সে দেখে যেটি পছন্দ করবে, পিসীমার নিজের সেই শাড়ীটাই শুধু পরতে দেবেন না, একেবারে চিরকালের মত দিয়ে দেবেন। আর ফেরৎ নেবেন না। ফিরিয়ে দিলেও নয়। রাজেশ্বরী জানতো পিসীমার এই দাতব্যের কথা। রাজেশ্বরী দেখলো, দেরাজ পরিপূর্ণ। কত হরেক রকমের পোষাক। জামা আর কাপড়। সুতি, রেশমী আর জরিদার জামা আর শাড়ী।

রাজেশ্বরী আড়ষ্ট হয়ে ব'সলো। সলজ্জায় বললে,—বেশ আছে তো পিসীমা! যেটা প'রে আছি, সেইটেই থাক। আমার খুব পছন্দ এই কাপড়টা।

খুনখারাপি রঙের তাঁতের শাড়ী একখানা অঙ্গে ছিল বৌয়ের।

বৌ আসতেই পরিধান করতে দিয়েছিলেন হেমনলিনী। শাড়ীটাও ছিল নূতন। একটি বারের জন্যও কখনও পরেননি পিসীমা! সে বয়সও আর নেই যে কনে বৌয়ের মত বৌ-পাগলা রঙের শাড়ী পরবেন!

—তোর খুব পছন্দ হয়ে গেছে? তোকে তো দিয়ে দিয়েছি শাড়ীটা। এখন যদি অন্য কোন কাপড় পরতে ইচ্ছা হয়, বল্? লজ্জা কি, বল্ না? হেমনলিনী উন্মুক্ত দেরাজের সম্মুখে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন।

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে যেন রাজেশ্বরী। বলে,—না পিসীমা, এই কাপড়টাই থাক। দেরাজ বন্ধ ক'রে তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে দিন। দেরী হয়ে যাচ্ছে মিথ্যে মিথ্যে। আমি কিন্তু আপনার গান না শুনে যাবো না!

কথাগুলি শুনে খুশীই হন হেমনলিনী।

কবে কে বলেছে এত আগ্রহের সঙ্গে? কে তাঁর কণ্ঠের গান শুনতে চায় এত আনন্দ সহকারে? পিসীমা দেরাজের চাবি বন্ধ ক'রে বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, গান তোকে শোনাবো। পাগলী মেয়ে, আমি কি গান জানি, না ঠিক-ঠিক গাইতে পারি? কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর নত করলেন তিনি। বললেন,—আমার কি আর সে বয়েস আছে বৌ! মরবার বয়েস হ'ল যে! ছেলেরা কিশোরের বয়েসী, বিয়ে দিলে ঘরে ছেলের বৌ আসতো!

—ছেলেদের কবে বিয়ে দেবেন পিসীমা? শুধোলে রাজেশ্বরী। আঃ, এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ফেললো বৌ। দেরাজটা বন্ধ করেছেন হেমনলিনী, নিশ্চিন্ত হ'ল যেন রাজেশ্বরী। এতক্ষণ চোখ দু'টি যেন তার ঝলসে উঠছিল। রঙ আর জরির জৌলসে। কত রঙের পোষাক! ভেলভেটের জামা কত রঙের! ভেলভেটের জামা, জরির জড়োয়া কারুকাজে অলঙ্কৃত। যেন বেশীক্ষণ তাকিয়ে দেখা যায় না ঐ উন্মুক্ত দেরাজের দিকে। চোখ ঠিকরে যায়।

—বিয়ে আমি দেবো না বৌ! দীপ্তকণ্ঠে যেন মনের অভিমতটা ঘোষণা করলেন হেমনলিনী। এত হাসি ছিল মুখে, কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই হাসি!

এই একই কথা পূর্ব্বেও কয়েক বার পিসীমাকে বলতে শুনেছে রাজেশ্বরী। তাই এই প্রসঙ্গটা সম্পর্কে অধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে চায় না রাজেশ্বরী। বৌ বেশ লক্ষ্য করেছে, এই একটা কথা বলার সময় পিসীমার মুখাবয়ব আর স্বাভাবিক থাকে না। কেমন যেন ক্রোধ আর কষ্টের জ্বালা ফুটে ওঠে মুখে। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখা দেয় কথায়।

কথা সমাপ্ত ক'রে হেমনলিনী বসলেন রাজেশ্বরীর পিছনে। কথার জের টেনে বললেন,—দু'টো মেয়ের সর্ব্বনাশ করবো আমি? বেঁচে থাকতে নয়—

রাজেশ্বরী বসে থাকে জবুথবুর মত। মুখে তার কথা জোগায় না।

কি বলতে কি বলবে। পিসীমার উত্তর শুনে সে মৌন হয়ে যায়। হেমনলিনী আবার কথা বলেন, ক্রোধের ভঙ্গিমায়,—লেখাপড়া শিখবে না, জ্ঞানগম্যি হবে না, তার ওপর গোঁফের রেখা ফুটতে না ফুটতে বাইরে মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকবে, আমি বৌ এ চোখে দেখতে পারবো না! যে যাই বলুক—

—ঠিক কথা। বললে রাজেশ্বরী। কি আর বলবে সে! রাজেশ্বরী ভাবছিল, তবে যে কত লোকে বলে যে, বিয়ে দিয়ে দিলে অনেক পুরুষ শান্ত হয়ে যায়। থাকে না আর তেমন উগ্রতা।

কিন্তু দেশের হাওয়া যাবে কোথায়! সমাজের ধারা?

দেশের হাওয়া দেশেই বইবে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ!

রাজেশ্বরী হতাশ-চোখে ব'সে থাকে। হেমনলিনী বৌয়ের গুণ্ঠন খুলে দিয়ে বললেন,—কি যে কেবল কেবল ঘোমটা দিয়ে থাকিস্?

পাশেই ছিল কেশ-প্রসাধনের সাজ-সরঞ্জাম।

একটা রূপোর বিচিত্র রেকাবীতে। চিরুণী, কাঁটা, ফিতা, ফুলেল তেল আর সিঁদুর-কৌটা। বৌকে চুল বেঁধে দেবেন অপূর্ব্ব ছাঁদে। দেরাজ থেকে একটা রূপালী জরির চওড়া ফিতা বের করেছেন হেমনলিনী। বৌয়ের খোঁপাটা ঐ ফিতায় ঘিরে দেবেন। রাজেশ্বরীর বিনুনী খুলতে লাগলেন পিসীমা অভ্যস্ত হাতে। চিরুণী চালাতে থাকলেন।

হেমনলিনী হঠাৎ স্বগত করলেন,—আমার বৌঠান কি কম দুঃখে ঘরছাড়া হয়েছে? জ্ব'লে-পু'ড়ে খাক হয়ে শেষকালে কাশীবাসী হয়েছে। বেঁচেছে, বেঁচেছে বৌঠান।

রাজেশ্বরীর দেহটা অবশ হ'তে থাকে। নিথর হ'তে থাকে।

বক্ষযুগল থরথরিয়ে ওঠে পিসীমার মাত্র ঐ একটি কথায়। রাজেশ্বরীর শাশুড়ী-মাঠাকুরাণীর কথায়। কিন্তু এ জন্য রাজেশ্বরীর করণীয় আছে কি? সে কি করতে পারে? সে শুধু মৌন হয়ে থাকে। মনটা তার ক্ষণেকের মধ্যে বিষিয়ে ওঠে যেন। বীতরাগ হয়ে থাকে বৌ। ভাবতে থাকে, পিসীমার ছেলেদের বিবাহের কথা না বললেই ভাল হ'ত। শুনতে হ'ত না কোন কথাই।

কি যেন ভাবলেন পিসীমা। বললেন,—আমি বলি, তুই বৌ, চালাক-চতুর হওয়ার চেষ্টা কর্। তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ! জানবি কোত্থেকে?

—কেন পিসীমা? রাজেশ্বরী প্রশ্ন করলো শিশুসুলভ কৌতূহলে।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললেন হেমনলিনী,—নয় তো ঠক্‌বি চিরটা কাল।

আর কোন কথা বলে না বৌ। পিসীমার কথাটি মনে লাগে তার। সে কি তবে মূর্খ, বোকা? কেন ঠকবে সে? কে ঠকাবে? নানা কথার জাল বুনতে থাকে রাজেশ্বরী। ঠ'কে যাওয়ার ব্যর্থতায় মনটা তার ভাসতে থাকে বুঝি।

হেমনলিনী বৌয়ের চুলের জট ছাড়াতে থাকেন। এলো চুলে চিরুণী

চালাতে থাকেন। রাজেশ্বরী চোখ কড়িকাঠে তুলে নানা কথার জাল বুনতে থাকে মনে-মনে। বহুদিন পরে আজ যেন একটি মানুষের না-দেখা মুখ মানস-পটে দেখতে পায় রাজেশ্বরী। ছবিতে দেখা শাশুড়ীর মুখটি মনে পড়ে। কত কঠোর তিনি! কত নিষ্ঠুর! কেমন মানুষ কে জানে তিনি, যাঁর মনে ক্ষমার স্থান নেই?

—বৌঠান ক'দিন আগে একটা চিঠি দিয়েছে আমাকে। আছে আমার ঐ বালিশের নীচে। একবার পারিস তো পড়বি বৌ। হেমনলিনী চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে বললেন।

পিসীমার কথাটি শুনে বুকের ভেতরটা বৌয়ের ছাঁৎ ক'রে উঠলো যেন। কি লিখেছেন কে জানে! কোথায় তিনি এখন কে জানে? কে জানে কেমন আছেন? রাজেশ্বরী ভাবছিল, সেই পলাতকাকে যদি ক্ষণিকের জন্য কাছে পাওয়া যায়! সেই কুমুদিনীকে যদি দেখতে পায় রাজেশ্বরী! তাঁকে কাছে পাওয়া গেলে রাজেশ্বরী অভিমানের আবেগে কাঁদবে প্রথমে। তাঁর পা দু'টিতে মাথা রেখে বলবে, ফিরে আসতে। বলবে, ক্রোধ পরিত্যাগ করতে। বলবে, ক্ষমা করতে তাঁর পুত্রসন্তানকে। কিন্তু সেই অভিমানী অধরাকে কি দেখতে পাওয়া যাবে!

রাজেশ্বরী ভাবছিল বলবে, না, বলবে না। শেষ পর্য্যন্ত যেন আর থাকতে পারলো না। মুখ ফুটে ব'লে ফেললে,—পিসীমা, আমি যদি কাশীতে যাই?

—কেন রে বৌ? জিজ্ঞাসা করলেন হেমনলিনী।—কাশীতে যেতে যাবি কেন?

রাজেশ্বরী ভাবলো এক মুহূর্ত্ত। বললে,—আমি গিয়ে যদি তাঁর পায়ে মাথা রেখে অনুরোধ করি, মা ফিরে আসবেন না?

দুঃখের হতাশ-হাসি হাসলেন হেমনলিনী। রাজেশ্বরীর চুলে বিনুনী পাকাতে পাকাতে বললেন,—বৌঠান কি সেই মেয়ে যে নিজের কোট

ছেড়ে চলে আসবে! তাকে ফেরাতে পারে এমন কেউ আছে এই দুনিয়ায়? তা হ'লে আর ভাবনা ছিল!

রাজেশ্বরী আবার বললে,—আমি আর আপনি যদি যাই?

—না রে বৌ, না। বৌঠান সে জাতের মেয়ে নয়। তাকে ফেরাতে পারে এমন সাধ্যি কারও নেই। যখন যায় তখন কি আর আমি বলতে কসুর করেছি কিছু? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না। আহা, কেমন ঘরের বৌ! কত কষ্টই না পাচ্ছে সেখানে!

আর কোন বাক্যব্যয় করে না রাজেশ্বরী।

কড়িকাঠে দৃষ্টি মেলে থাকে। অপলক দৃষ্টি তার চোখে। রাজেশ্বরীর চিন্তা, কল্পনা, প্রস্তাব ধূলিসাৎ হয়ে যায় যেন পিসীমার কথায়। তবে আর রাজেশ্বরী কি করতে পারে! তার কি দোষ!

কুমুদিনী, শাশুড়ীর মুখখানি মানসপটে ভেসে ওঠে।

সেই সেদিনের দেখা কুমুদিনীর ধারালো মুখবিম্ব। যেদিন প্রথম দেখেছিল রাজেশ্বরী, সেই সেদিনের দেখা উপবাসক্লিষ্ট তপস্বিনীর মুখটি বারে বারে দেখতে পায় যেন চোখের সম্মুখে। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর প্রাঙ্গণে যেমনটি দেখেছিল কুমুদিনীকে, তেমনি মুখ কল্পনায় দেখতে পায় বৌ। তিনিই তো নিজের বৌকে পছন্দ করেছিলেন। নিজে দেখে পছন্দ করেছিলেন। মনে মনে কষ্ট পায় রাজেশ্বরী। বুকের ভেতরটা যেন গুমরে গুমরে ওঠে থেকে-থেকে। রাজেশ্বরী ভাবে, একখানা পত্র লিখলে কেমন হয়! তাঁকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বৌ যদি লেখে একটা চিঠি! তিনি কি উত্তর দেবেন! এক জনের অপরাধে আরেক জন নিরপরাধীকে কি তিনি পায়ে ঠেলবেন?

খোঁপা জড়িয়ে খোঁপায় সোনার কাঁটা বিঁধছিলেন হেমনলিনী। হেমনলিনী কেশচর্চ্চা জানেন বটে! কত বড় খোঁপাটা রচনা করেছেন তিনি! রাজোর মাথাটা যেন খোঁপার ভারে নুয়ে পড়ছে।

সব ক'টা কাঁটা বিঁধে খোঁপার চতুর্দ্দিকে রূপালী জরির কুঞ্চিত ফিতার বেষ্টন দিতে দিতে বললেন হেমনলিনী,—বৌ, তোর পছন্দ হবে তো? আমরা আবার সেকেলে মেয়ে, জানি না অত-শত।

—হ্যাঁ পিসীমা! খোঁপা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে রাজেশ্বরী।—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। কিন্তু আপনি যেন দেরী করবেন না পিসীমা। তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে নিন আপনার। আমি কিন্তু গান না শুনে এক পা নড়ছি না।

হেসে ফেললেন হেমনলিনী। খুশীর হাসি হাসলেন। বললেন,—আচ্ছা রে আচ্ছা। তোরও তো দেখছি জিদ কম নয়! আমি যে বৌ ভাল গাইতে পারি না। শুনে কানে আঙুল দিবি না তো?

—আপনি আর দর বাড়াবেন না পিসীমা! একটা-দু'টো গান শুনবো বৈ তো নয়। কথার শেষে উঠে পড়লো রাজেশ্বরী। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, —কোন্ বালিশের তলায় মায়ের চিঠি আছে পিসীমা?

—ঐ যে আমার বালিশের তলায়। আমি চুলটা বেঁধে নিই। তুই চিঠিটা প'ড়ে যা গা ধুয়ে আয়। কিন্তু কিছু খাবি না বৌ? জলখাবারের জোগাড়ই সার হবে আমার?

রাজেশ্বরী আলনা থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ নিতে নিতে বললে,—এখন নয় পিসীমা, যাওয়ার আগে যদি পারি তো কিছু খাবো'খন। স্নান-ঘর থেকে এসে চিঠিটা প'ড়বো।

—বেশ, তুই যা বলবি। হেমনলিনী নিজের চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে বললেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বললেন।

রাজেশ্বরীর মুখটি তৈলাক্ত হয়ে উঠেছিল। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ত্রস্তপদে।

সাঁঝের আঁধার আকাশে। এখন আর ঐ মহাশূন্যে একটি-দু'টি নক্ষত্র

নয়, অনেকানেক তারকার উদয় হয়েছে। সন্ধ্যাদেবী যেন কালো রঙের আচ্ছাদনে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। সোনালী চুমকি-খচা আচ্ছাদন। রাশি রাশি চুমকি ঐ আকাশে। ধুক্‌ধুকির মত জ্বলছে দপ্‌দপিয়ে। শরতের এলোমেলো বাতাসে কাঁপছে নাকি থরো-থরো!

—হেম আছো না কি ঘরে?

—হ্যাঁ, এই যে।

—নলিনী, হেমনলিনী, দেখো কি এনেছি তোমার জন্যে!

—কি গো, কি আবার আনলে আমার জন্যে?

—দেখোই না। হাতে নিয়ে দেখোই না। অপছন্দ হ'লে বলবে, ফেরত দিয়ে আসবো।

একটি স্বর্ণালঙ্কার। কণ্ঠহার।

নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন হেমনলিনী। গদ্‌গদ চিত্তে বললেন, —শোন' একটি কথা বলি। আমার ভাইপো-বৌ এসেছে আজ। তাকে যদি দিই গয়নাটি, আমাকে অন্য একটা এনে দেবে না?

—নিশ্চয়ই দেবো। কখন এসেছে বৌমা? কোথায় সে?

—গেছে পোষাক বদলাতে। স্নানের ঘরে। এসেছে সকালের দিকে। সন্ধ্যে উৎরোলে চ'লে যাবে। এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আহা, কি লক্ষ্মী বৌ!

—তা হ'লে হারটা তাকেই দিও। আমি তোমার জন্যে অন্য একটা কিনে আনবো।

কথা বলছিলেন হেমনলিনীর স্বামী। শিবচন্দ্র বাবু।

কৃষ্ণকিশোরের পিসে মশাই। কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরেই উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রথমেই এসেছেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। পরিশ্রান্ত শরীর তাঁর। সারা দিনের পরিশ্রমে দেহে ক্লান্তি নেমেছে। অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন যেন।

—পোষাক-আষাক ছাড়ো। আমি জল-খাবার আনি। কিছু মুখে দাও। হেমনলিনী উঠে পড়লেন কেশ-চর্চ্চার মধ্যপথে।

শিবচন্দ্র বাবু একটা আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে বললেন,—তাই দাও। বড্ড ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। বয়েস কি আর আছে, না সামর্থ্য আছে আগের মত? সারা দিন কি ভীষণ খাটুনি গেছে!

—তুমি কি এখন আবার বেরুবে? শুধোলেন হেমনলিনী সন্দিহান মনে।

—হ্যাঁ, একটু পরেই বেরুবো। তুমি ফিরে এসে আমার জামা-কাপড় বের ক'রে দাও। বললেন শিবচন্দ্র বাবু।

ভেঙে পড়লেন যেন হেমনলিনী।

দুঃখের ছায়া ঘনালো তাঁর মুখে। স্বামীর বহির্গমনের সংবাদ শুনে তাঁর যত আনন্দ এক নিমেষে অতৃপ্তিতে পরিণত হয়। ভাল লাগে না যেন কোন কিছু। স্বর্ণালঙ্কারের নীল ভেলভেটের বাক্সটা রেখে চ'লে গেলেন ঘর থেকে। ভাবতে ভাবতে গেলেন, সংসারে এমন অনেক অন্যায় আর অবিচার আছে, যাদের মেনে নিতেই হয়। নয় তো অশান্তির কালো ছায়া নামে। কলহ-বিবাদ হয়। মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুরামাত্রায়। কিন্তু হেমনলিনী শান্তিপ্রিয়। বাধা দেন না কাকেও। এমন কি তাঁর স্বামীকেও নয়। হেমনলিনী বেশ জানেন, কিয়ৎক্ষণের মধ্যে স্বামী তাঁর পরিচ্ছন্ন পোষাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবেন। যাবেন শিমলের কাছাকাছি কোথায়—যেখানে না কি আছে কে এক জন নারী—যে বশ ক'রেছে তাঁর স্বামীকে। সেখানে যাবেন, গিয়ে মদ গিলবেন। থাকবেন কতক্ষণ তার ঠিক নেই। ফিরবেন কখন কেউ জানে না!

শিবচন্দ্র বাবু বললেন,—হেম, আমার কাপড়-জামা বের ক'রে দাও। একটা বেনিয়ান আর কোঁচানো ধুতি চাই।

হেমনলিনী বেশ জানেন স্বামী তাঁর কোথায় যাবেন। তবুও বললেন,—কোথায় যাবে এখন? ভাইপো-বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবে না? কথা বলবে না?

—কোথায় সে? বেশী দেরী হ'লে কিন্তু দেখা হবে না। টাইম দেওয়া আছে, একজন সাহেবের বাসায় যেতেই হবে। নয় তো অনেক টাকার কাজ ফস্‌কে যাবে।

—কাল সকালে যদি যাও? বললেন হেমনলিনী।—ক্ষতি হয়ে যাবে? বৌ গেছে স্নানঘরে। এক্ষুণি আসবে।

—নিশ্চয়ই, ক্ষতি ব'লে ক্ষতি! অনেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। কথা বলতে বলতে আরামকেদারা থেকে উঠে পড়লেন শিবচন্দ্র বাবু। পরনের জামার দুই পকেট থেকে বের করলেন যা কিছু ছিল। কাগজ-পত্র আর টাকা। এক বাণ্ডিল্ কারেন্সী নোট। কত টাকা কে জানে!

কথা বলতে বলতে কখন নিজের চুল বেঁধে ফেলেছেন হেমনলিনী।

পূর্ব্বে তিনি ছিলেন কেশবতী। ছিল রাশি-রাশি কোঁকড়ানো চুল। এখন আছে তারই অবশেষ। বাঁধতে সময় লাগে না অধিক্ষণ। হেমনলিনী উঠে শিবচন্দ্র বাবুর বরাদ্দ দেরাজটা খুললেন। খুঁজে-খুঁজে বের করলেন একটা আদ্দির বেনিয়ান। কোঁচানো ধুতি। রুমাল। আতরের বাক্স আখরোট কাঠের। বললেন,—আর কিছু চাই?

—আবার কি চাই? কিচ্ছু চাই না। কথা বলতে বলতে একটু থেমে বললেন শিবচন্দ্র বাবু—হেম, বড্ড ক্ষুধা লেগেছে। ঘরে আছে না কি কিছু?

—কেন থাকবে না? কি খাবে বল'? দাদার পুত্রবধূ এক হাঁড়ি মিষ্টি এনেছে। আবার-খাবো সন্দেশ। দেবো গোটা দু'য়েক?

—মিষ্টি! এখন আবার মিষ্টি! দাও, তুমি যখন বলছো। বললেন শিবচন্দ্র বাবু। বললেন,—দ্বিজপদ কোথায়? আছে না কি সে? না, বাড়ী চ'লে গেছে?

হেমনলিনীর মুখাকৃতিতে সামান্য লজ্জা খেলে যায়। খানিক নীরবতার পর বললেন,—হ্যাঁ, আছে। তার ঘরেই আছে। লিখছে বোধ হয় কোন কিছু।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন শিবচন্দ্র বাবু। বললেন,—ব'লে দিও, লিখে কিছু হবে না। না খেতে পেয়ে মরবে। তার চেয়ে বরং একটা চাকরী-টাকরী করুক। দু'পয়সা ঘরে আসবে।

হেমনলিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন,—তুমিই না হয় ব'ল। আমার কি দরকার বলবার। তোমার ভাই, তুমি বললেই ভাল দেখায়। সে তো আর আমার কেউ নয় যে গলা জড়িয়ে বলতে যাবো!

—সে আমার সামনে আসে কৈ? ভারী লাজুক ছেলে। বাড়ীতে একটা মানুষ আছে কে বলবে। বললেন শিবচন্দ্র বাবু। অন্তর্বাস ফতুয়াটা খুলতে খুলতে বললেন। তার পর নির্জ্জন ঘরে আবার শরীর এলিয়ে দিলেন আরাম-কেদারায়। পরিশ্রম আর ক্লান্তিতে চক্ষু মুদিত ক'রে ফেললেন।

সন্ধ্যার এলোমেলো বাতাস বইছিল থেকে-থেকে। হিমেল হাওয়া।

ঘরের দরজা আর জানলার পর্দ্দা উড়ছিল হাওয়ার বেগে।

মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যে ফিরে এলেন হেমনলিনী। দু'হাতে দু'টি রূপার পাত্র। জলপাত্র আর খাবারের রেকাবী। লণ্ঠনের আলোয় পাত্র দু'টি চিক-চিক করতে থাকে।

—খাবার এনেছি। বললেন হেমনলিনী। স্বামীর তন্দ্রার ঘোর টুটিয়ে দিয়ে বললেন।

উঠে বসলেন শিবচন্দ্র বাবু। বললেন,—গেছো আর এসেছো?

সে-কথার কোন উত্তর দেন না হেমনলিনী। অনুমানে বুঝতে পারেন দরজার বাইরে কে যেন অপেক্ষা করছে। দেখেন, লক্ষ্য ক'রে দেখেন কার যেন ছায়া! বলেন,—বৌ এসেছিস?

বাইরে যার ছায়া, তার মুখে কোন কথা নেই।

সে দেখেছে দ্বারের মুখে চৌকাঠের কাছাকাছি কোন' পুরুষের পাদুকা। এক জোড়া জুতো। এক জোড়া পাম্প স্যু। চক-চক করছে দালানে ঝুলানো বেল-লণ্ঠনের আলোয়।

—আয় বৌ, ঘরে আয়। ডাকলেন হেমনলিনী। স্নেহ-ভরা কণ্ঠে।

একগলা ঘোমটা টেনে রাজেশ্বরী ঘরে প্রবেশ করে। সেই খুনখারাপি রঙের শাড়ী-পরিহিতা রাজেশ্বরী। ত্রাস আর সঙ্কোচের সঙ্গে পিসে মশাইয়ের পদধূলি নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো। কি এক সুগন্ধিতে ঘরের হাওয়া যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কি এক অঙ্গবাসে গাত্র মার্জ্জনা করেছে রাজেশ্বরী। বিলেতী লালাবাই সাবানের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় বুঝি!

শিবচন্দ্র বাবু বৌয়ের মস্তকে হাত ঠেকিয়ে বললেন,—এসো মা, এসো। আমাকে দেখে এত ঘোমটা কেন? কখন এসেছো মাঠাকরুণ?

গুণ্ঠনের আবরণে রাজেশ্বরীর মুখ অদৃশ্যই থাকে। হেমনলিনী বললেন, —এসেছে সকালের দিকে।

শিবচন্দ্র বাবু মিষ্টান্নের রেকাবী হাতে নিয়ে বললেন,—খাওয়ান-দাওয়ান ভাল হয়েছে তো?

পরিহাস ছলে হেমনলিনী বলেন,—না, উপোস করিয়ে রেখেছি। কি বল্ বৌ?

রাজেশ্বরী স্বল্প হাসে। পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

শিবচন্দ্র বাবু দু'টি মিষ্টি গলাধঃকরণের পর জলের পাত্র নিঃশেষ ক'রে উঠে পড়লেন আরাম-কেদারা থেকে। বললেন,—হেম,। আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি। বৌমা লজ্জা পাচ্ছে আমাকে দেখে। তুমি আমার কাপড়, জামা, টাকা-কড়ি দিয়ে আসবে চল'। আমার হয়তো ফিরতে রাত্তির হবে।

ক্ষোভের সঙ্গে বললেন হেমনলিনী,—কোন্ দিন আর রাত্তির হয় না? এখন আর ভাবি না আমি। অভ্যেস হয়ে গেছে।

শিবচন্দ্র বাবুর মত বেপরোয়া লোকও স্ত্রীর এই কথায় লজ্জানুভব করলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গেলেন পাশের কামরায়।

কণ্ঠস্বর সহসা নত ক'রে বললেন হেমনলিনী,—বৌ, তুই সাজাগোজা কর্। আমি গা ধুয়ে আসছি এখুনি। আর বিদেয় ক'রে দিয়ে আসি আমার স্বোয়ামীটিকে।

কথায় সরলতা মাখিয়ে রাজেশ্বরী বলে,—পিসে মশাই কোথায় যাচ্ছেন এখন পিসীমা? এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন? একটু জিরোতে বলুন না।

হেমনলিনী কৃত্রিম হেসে বললেন,—তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না আমার কথা যদি শুনতো! যাবে আর কোথায়! যাচ্ছে মদ টানতে, যাচ্ছে মেয়েমানুষের ওখানে। একটা মেয়ের বয়েসী স্ত্রীলোককে বাঁধা রেখেছে যে। শুনিস্‌নি তুই?

রাজেশ্বীর বক্ষঃস্থল হঠাৎ থরথরিয়ে উঠলো।

কেমন যেন ভীতির সঞ্চার হয় তার অবচেতন মনে। সে বলে,—না তো, আমি কিচ্ছু শুনিনি।

সহজ স্বরে কথা বলেন হেমনলিনী,—কা'কেও বলিস্‌নে যেন! তুই এখন আমাদের ঘরের মেয়ে। ঘরের কথা কি কা'কেও বলতে আছে? কি বল্ বৌ?

কি বলবে রাজেশ্বরী! কা'কেই বা বলবে! কে-ই বা আছে তার!

নিরুত্তর থাকে সে। অপলক চোখে তার স্থিরদৃষ্টি। শুষ্ক মুখ।

স্বামীর পোষাক-পরিচ্ছদ তুলতে থাকেন হেমনলিনী। এক হাতে কাপড় আর জামা। অন্ত হাতে টাকা-পয়সা। কারেন্সী নোটের তাড়া। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন,—বৌ, তুই পড়লি চিঠিটা? বৌঠানের চিঠিটা?

রাজেশ্বরী বলে,—না পিসীমা! এইবার পড়বো।

কিন্তু পড়বে কি রাজেশ্বরী! রাজেশ্বরী কি আর রাজেশ্বরীতে আছে? পিসীমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে মন তার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভাল লাগছে না কিছু। আরেক মুহূর্ত্ত থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না এই গৃহে। পিসীমার মত সর্ব্বগুণান্বিতার জন্য মন তার দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কে এমন মানুষ আছে যে ঐ পিসীমাকে অবহেলা করতে পারে? হেমনলিনী কখন ঘর থেকে অন্তর্হিতা হয়েছেন দেখতে পায়নি রাজেশ্বরী। আচ্ছন্ন হয়ে গেল যেন রাজোর দেহ আর মন। খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে পাষাণ-মূর্ত্তির মত।

এমনি ভাবে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরীই জানে না।

পিসীমার বালিশের তলা থেকে চিঠিটা খুঁজে নেয় যন্ত্রচালিতের মত।

লণ্ঠনের আলোর কাছাকাছি গিয়ে খাম থেকে চিঠিটা বের ক'রে পড়তে থাকে রুদ্ধশ্বাসে। পড়তে থাকে:

শ্রীশ্রীদুর্গা ভরসা

সাবিত্রীসমানেষু ভাই ঠাকুরঝি,

বহুকাল যাবৎ তোমাদের কোন সংবাদাদি না পাওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছি। আমি সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি কখনও কখনও তোমাদের জন্য এই পোড়া মনটা হু-হু করে। কয়দিন ধরিয়া তোমার জন্য কেন জানি না, মানসিক চাঞ্চল্যে কষ্টভোগ করিতেছি এবং সেই কারণেই এই পত্র দিতেছি। যথা সত্বর এই চিঠির একটুকু উত্তর প্রদান করিলে যৎপরোনাস্তি খুসী হইব। তুমি তোমার সংসার লইয়া সদাক্ষণ ব্যস্ত থাকো। তোমাকে পত্র দিয়া তদুপরি ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তুক এই পৃথিবীতে আমার কে-ই বা আছে? আমার শরীর ক্রমশঃ ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিতেছে। বাতের কষ্টে উত্থানশক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। অপর এক নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে আমি চোখে দেখিতে পাই না। চক্ষের দৃষ্টি হারাইয়াছি। চশমা লইয়াও কোন

ফল হয় নাই। একজন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা দয়াপরবশ হইয়া আমার দেখা-শুনা করিতেছেন। তিনি এক বিশিষ্ট পরিবারের কুলবধূ। স্বামীকে অকালে হারাইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তিনি আমার সকল কার্য্যের পথপ্রদর্শক। তাঁহাকে দিয়াই এই পত্র লিখাইতেছি। যাহা হউক, তুমি অনতিবিলম্বে দুই ছত্র উত্তর দিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ লইবে। তোমার পুত্রদ্বয়কে আমার স্নেহপূর্ণ আশীষ দিবে। অধিক আর কি লিখিব? তোমার পত্রোত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। ভগবান তোমাকে সকল দিক দিয়া খুশী করুন—ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার বৌঠান

পত্র পাঠে নিমগ্না রাজেশ্বরীর চক্ষু ছল ছল করে কেন!

তার হৃদয়ে কি বিষময় জ্বালা! তার সম্মুখস্থ সকল কিছু ঘূর্ণায়মান মনে হয়। পদতলের ভূমি কম্পমান হয়ে ওঠে। চক্ষুর্দ্বয় মুদিত ক'রে কিয়ৎক্ষণ অবিচলিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। এ অবস্থায় রাজেশ্বরীর কর্ত্তব্য কি আছে? সে একজন নাবালিকা বধূ। এই নাতিদীর্ঘ পত্রে পুত্রবধূর সম্বন্ধে কৈ এক ছত্র লিখতেও পরাঙ্মুখ হয়েছেন তিনি। রাজেশ্বরীর মনের গহনে মাত্র একটি চিন্তা, মাত্র একটি কল্পনা বার বার উদিত হয়, তার শ্বশ্রূমাতা কত কঠোর! কি পরিমাণ অভিমান তাঁর! কেমন নিস্পৃহ কুমুদিনী! লোকে বলে, নারীচিত্ত অতীব কোমল। এখন লোকে এসে দেখতে পারে, নারী কতটা নিষ্ঠুরা হয়! দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই নারী-মনে! নেই বাৎসল্য, নেই ক্ষমা!

—বৌ?

রাজেশ্বরীর দুই কানে তালা লেগেছে কি!

—ও বৌ, শুনছিস্?

রাজেশ্বরীর কর্ণেন্দ্রিয় কি বধির হয়েছে !

—অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, জল-খাবার দিতে বলি ? কিছু মুখে দিবি না ?

রাজেশ্বরীর বোধশক্তি কি লোপ পেয়েছে ! বাক্‌শক্তি !

সহসা চমকে শিউরে উঠলো রাজেশ্বরী। শাড়ীর অঞ্চলে চোখের গড়ন্ত অশ্রুধারা মুছে বললে,—ডাকছিলেন পিসীমা ?

—হ'ল কি তোর ? ডাকছি কতক্ষণ, কোন সাড়াশব্দ নেই ? খাবি না কিছু ? জল-খাবার দিতে বলি এখন ? সস্নেহে বললেন হেমনলিনী।

মনোভাব গুপ্ত করে বৌ। বলে,—মাথাটা বড্ড ঘুরছিল পিসীমা ! যা খেয়েছিলুম সব বমি হয়ে গেল চানের ঘরে যেতেই। খানিক বাদে খাবো।

—পান খাবি একটা ? পান অম্লনাশক। পিসীমা বলেন।

—হ্যাঁ, খাবো। দিন একটা পান। রাজেশ্বরীর কম্পিত কণ্ঠ।

হেমনলিনীর হাতেই ছিল পানের ডিবে। খুলে ধরলেন।

রাজেশ্বরী একটা পানের খিলি তুলে নেয়। মুখে দেয় !

পিসীমা বললেন,—স্ফূর্তি জর্দ্দা খাবি কিছু ? খাস্ তো খা।

—ও বাবা ! তা হ'লে আর রক্ষে আছে ! মাথা ঘুরে পড়বো !

স্মিতহাস্তে কথা বললে রাজেশ্বরী। ব'সে পড়লো জাজিমে। পান চিবোতে লাগলো অধর সিক্ত ক'রে। পিসীমা দেখলেন, বৌকে যেন কেমন কাহিল মনে হচ্ছে। যেন রক্তহীন পাণ্ডুর শরীর। আয়ত চোখের কোলে কালিমা প'ড়েছে। চোখে হতাশ দৃষ্টি।

হেমনলিনী বললেন,—পড়লি চিঠি ? বৌঠানের দৃষ্টি গেছে লিখেছে, দেখলি ?

—হ্যাঁ। কত কষ্ট পাচ্ছেন তিনি ! কিছু উপায় হয় না পিসীমা ? ভগ্নকণ্ঠে কথা বলে রাজেশ্বরী।

হেমনলিনী বললেন,—না বৌ, না। কোন উপায় নেই। তাঁদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, তবু বৌঠানের কথার নড়চড় হবে না। বরাতে দুঃখু আছে যার, কে খণ্ডাবে বল্? তা তোর এত ঘোমটার বহর কেন বল্ তো বৌ?

—পিসে মশাই যদি এসে পড়েন? বললে রাজেশ্বরী। লাজুক হেসে বললে।

হেমনলিনী ঠোঁট ওল্টালেন। বললেন,—কোথায় পিসে মশাই! তিনি তো বেরিয়ে গেছেন।

—ও। গুণ্ঠন মোচন ক'রে বলে রাজেশ্বরী। বলে,—কখন ফিরে আসবেন আবার?

দুঃখের হাসি ফুটে উঠলো হেমনলিনীর মুখে। বললেন,—সে-কথা আর বলিস্‌নি বৌ! কখন আসে তার ঠিক কি! আজকে আর না-ও আসতে পারেন। হয়তো ফিরবেন সেই কাল সকালে। তা তোর গাড়ী আসবে কখন?

রাজেশ্বরী বললে,—ব'লেছেন তো আদালত থেকে ফিরে জুড়ী পাঠাবেন। এখনও যে কেন এলো না কে জানে! আপনার গান না শুনে কিন্তু যাবো না পিসীমা! তাড়িয়ে দিলেও যাবো না।

—কি যে বলিস্ বৌ! সহাস্যে বললেন হেমনলিনী।—চল্ তবে ঐ ঘরে, যে ঘরে অর্গ্যানটা আছে। ভুলেও ভুলিস্ না দেখছি। জুড়ী যতক্ষণ না আসে—

রাজেশ্বরী উঠে দাঁড়ালো সানন্দে। গান শোনার আনন্দে।

জুড়ী যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ মনের আনন্দে গান শুনবে সে। পিসীমার মধুকণ্ঠের গান।

জুড়ী তখনও গরাণহাটার গলির মুখে।

মালিক তখনও গহরজানের রুদ্ধদ্বার কক্ষে। গল্প-গুজব করছিলেন বিবিজানের সঙ্গে। হাস্য-বিনিময় করছিলেন। পানপাত্র প'ড়েছিল এক পাশে। ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে। শতেক অনুরোধেও আরেক পাত্র মুখে তুলতে চাইছিলেন না কৃষ্ণকিশোর। অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন একটা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে। গহরজান ব'সেছিল খুব কাছাকাছি।

রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত করে কে?

উন্মোচনের নিমিত্ত সশব্দ আহ্বান জানায়। কড়া ধ'রে নাড়ে। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ধনুকের মত তীক্ষ্ণ ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে গহরজানের। বিরক্তিতে। সাড়া দেয় সে,—কে, কে, কৌন হায়?

ডাকছিল সৌদামিনী। বিশেষ প্রয়োজনে ডাকছিল,—দরজাটা খোল্ না গহর। একটা কথা আছে।

—মাসী ডাকছো? ঘরের ভেতর থেকে কথা বলে গহরজান। বেসামাল পোষাক ঠিক করতে করতে একান্ত অনচ্ছিাসত্ত্বেও দ্বারের অর্গল খুলে দেয়। বলে,—ডাকছো মাসী?

—হ্যাঁ লো হ্যাঁ। ডাকছি। কতক্ষণ থেকে ডাকছি বল্ তো? সৌদামিনীর কথাতেও বিরক্তি ফুটে ওঠে।

গহরজান বললে,—বল' কি বলবে?

সৌদামিনী শ্বাস টানে একটা। দীর্ঘশ্বাস। বলে,—তোমরা দু'জনেই শোন'। পুরুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে তোমার ডালিমের বিয়ের পাকা কথা নে' এসেছি। আসছে বেরস্পতিবারে বিয়ে। হাতে মাত্তর পাঁচটা দিন!

আনন্দোচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে যেন গহরজান। পরমানন্দে জড়িয়ে ধরে সৌদামিনীকে। সহাস্য বদনে। বলে,—মাসী, তবে তুমি বিলকুল ব্যবস্থা ক'রে ফেলো! আমি কিচ্ছু জানি না। তুমি যা করবে তাই হবে।

—তোর নাগর আপত্তি করবে না তো? তোর কথাই কথা তো? না, যার টাকা তারও কথা নিতে হবে? সৌদামিনী কথাগুলি বলে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে। অভিমানের স্বরে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে গহরজান।—আমি ওনার কথা নিয়েছি। তুমি যা বলবে, যা করবে তাই-ই হবে।

উনি তখন কিন্তু নেশাচ্ছন্ন হয়ে প্রায় জ্ঞানহারা অবস্থায় আধা-শোয়া হয়ে প'ড়েছিলেন ফরাসে। একটা তাকিয়ায় এলিয়ে দিয়েছিলেন দেহ। ইটালীয়ান ওয়াইনের নেশা। ঘরে কারা যেন কথা বলছে। রক্তবর্ণ চক্ষে কোন' রকমে দেখলেন কৃষ্ণকিশোর। দেখলেন অনেক কষ্টে। ওরা দু'জনে কে! দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে! গহরজান গেল কোথায়? শেকল কেটে পাখী উড়ে গেল নাকি!

—গহরজান! কোথায় গেলে তুমি? জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন কৃষ্ণকিশোর।

—এই তো আমি। আধো-আধো কণ্ঠে কথা বলে গহরজান। দরজায় পুনরায় অর্গল তুলে দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে এসে ফরাসে বসলো! চোখে মদালস চাউনি তার। বললে,—আজকে তোমাকে ঘরে ফিরতে দেবো না। থাকবে তুমি আমার কাছে।

কৃষ্ণকিশোর জড়িত কণ্ঠে বললেন,—না, না আজকে নয়। কতক্ষণ এসেছি বল' তো! এখন আমি যাই। ছুটি দাও আজ আমাকে। কাল আসবো সকাল সকাল। তুমি আমাকে জুড়ীতে তুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর'।

আন্তরিক দুঃখের ছায়া নামলো গহরজানের চোখে-মুখে। বললে,—চ'লে যাবে তুমি আমাকে ছেড়ে?

কৃষ্ণকিশোর তাকিয়া ত্যাগ ক'রে উঠতে চেষ্টা করেন। বলেন,—হ্যাঁ, কাল আবার আসবো। তাড়াতাড়ি আসবো। থাকবো অনেকক্ষণ। না গেলে বাড়ীতে সকলে ভাববে। হৈ-হৈ পড়ে যাবে।

—তো তবে। গহরজান দোপাট্টার আঁচল পাকাতে পাকাতে কথা বলে।—আমি লোক ডাকি। তোমাকে গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—হ্যাঁ। লোক ডাকো। না গেলে বাড়ীতে যে ভাববে সকলে।

সকলের মধ্যে ব্যস্ত হওয়ার কে-ই বা আছে! এক রাজেশ্বরী ব্যতীত কে-ই বা আছে!

রাজেশ্বরী তখন সকল কিছু ভুলে পিসীমার গান শুনছিল। হেমনলিনী অর্গ্যানে ব'সে দরদী-কণ্ঠে গাইছিলেন রবিবাবুর একটি গীত। গাইছিলেন,—'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—'

কখন গান শুনেছিল রাজেশ্বরী, কানে যেন স্বরটা লেগে আছে এখনও।

হেমনলিনীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আর গানের শব্দঝঙ্কার যেন চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারে না বৌ। গান শুনতে শুনতে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিসীমার দক্ষতায় বিস্মিত হয়েছিল। আর বোধ করি গানের রচনাকারের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মনে তার কৌতূহল উদ্রেক করেছিল। যেমন গান তেমনি কি তার স্বর! রাজেশ্বরী বদ্ধ-গাড়ীতে ব'সে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করতে করতে ভাবছিল ঐ গান। রবি বাবুর গান—'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন'। ভোরের সূর্য্যালোক ছড়িয়ে প'ড়েছে দিকে দিকে; নিশার আঁধার কখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অভিসারিকার লজ্জার অন্ত নেই। সরমে জড়িত চরণে পথের মাঝে যেতে হবে যে! গাছের শাখে-শাখে পাখী ডাকছে ভোর হওয়ার আনন্দে, গাগরী ভরণে চলেছে পল্লীবধূগণ—এমন সময়ে শিথিল কবরী আবরি' কেমনে আপন কাজে যায় অভিসারিকা! লোকলজ্জা নেই?

গান গাওয়া শেষ হ'লে রাজেশ্বরী থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল, —হ্যাঁ পিসীমা, কার গান গাইলেন? রামপ্রসাদের?

কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন হেমনলিনী। বৌয়ের বিদ্যার বহর দেখে হয়তো হেসেছিলেন! হাসতে হাসতে বলেছিলেন,—রামপ্রসাদের কেন হ'তে যাবে? রবীন্দ্রনাথের গান। রবি বাবু নইলে এমন গান কে লিখবে!

অত-শত জানে না রাজেশ্বরী! কে রামপ্রসাদ আর কে রবীন্দ্রনাথ! নামটা শুনেছিল কবে যেন রামপ্রসাদের। শুনেছিল, তিনি গান রচনা করেছেন। সুতরাং গান মাত্রেই রামপ্রসাদের তাতে আর সন্দেহ কি! গান শুনতে শুনতে কয়েক বার ঘরের জানলার বাইরে আকাশটা লক্ষ্য করেছিল বৌ! রাত্রির অন্ধকারে আকাশ কালো হয়েছে কি না তাই দেখছিল। রাজেশ্বরী তো আর অভিসারিকা নয় যে, রাত্রির আগমনে খুশীর বন্যায় ভাসতে থাকবে? তার মনে তখন ভাবনা। জুড়ী এখনও তাকে নিতে আসছে না কেন? খাজনার বাকী টাকা জমা পড়েছে কি? স্বামী তার আজকে আবার কোন্ মূর্ত্তিতে ফিরে আসবে কে জানে!

যাই হোক, সাঁঝের আঁধারে দিক্‌চক্র ঢাকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিল অনন্তরাম। বলেছিল,—দিদিমণি, জুড়ী এসে গেছে। আমাদের বাড়ীর বৌটিকে এখন ছুটি দাও।

হেমনলিনীর গান তখন শেষ হয়ে গেছে। তবুও তিনি বাদ্যযন্ত্রের সম্মুখের আসনে ব'সেছিলেন। গল্প করছিলেন বৌয়ের সঙ্গে। এ-কথা সে-কথা কইছিলেন। জুড়ী এসেছে শুনে বলেছিলেন,—কিছু খেয়ে যাবি না বৌ? বিকেলে জল-খাবার তো মুখে দিলি না!

—রক্ষে করুন পিসীমা! উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল রাজেশ্বরী। বলেছিল হাসতে হাসতে।—আপনি কষ্ট ক'রে উঠে আমার গয়না-কাপড় বের ক'রে দেবেন চলুন। শাড়ীটা আবার বদলাতে হবে।

—সেটি হচ্ছে না বৌ! কথা বলতে বলতে হেমনলিনীও উঠলেন।

বললেন,—তোমার কাপড়-গয়না তুমি নেবে চল', কিন্তু এই কাপড়টা ছাড়তে পাবে না। শাড়ীটা আমি তোমাকে দিলুম। তুমি এইটি প'রে ঘরের বৌ ঘরে ফিরে যাও মা!

—কেন পিসীমা, হঠাৎ বিনি কারণে এমন শাড়ীটা আমাকে কেন দিতে যাবেন! বৌ কথা বলে কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়ে।

হেমনলিনী বলেছিলেন,—সে কৈফিয়ৎ কি তোর কাছে আমাকে দিতে হবে বৌ? আমার সাধ হয়েছে দিয়েছি। আর কোন কথা নেই।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকেছিল রাজেশ্বরী।

পিসীমার মুখের ওপর কোন্ কথা বলবে তাই খুঁজেছিল। কিন্তু কথা জোগালো না তার মুখে। হেমনলিনীর আন্তরিক স্নেহলাভে ধন্য হয়ে গিয়েছিল যেন!

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল অনন্তরাম।

রাজেশ্বরীকে উদ্দেশ ক'রে বলে,—আর দাঁইড়ে থেকো না বৌমা! জুড়ী বহুৎক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

হেমনলিনী বলেছিলেন,—চল্ বৌ, চল্, তোর গয়না-কাপড় দিই গে। একটা ছোট ট্রাঙ্ক দিই, তাতে ক'রে নিয়ে যা। সময় মত ট্রাঙ্কটা ফেরত পাঠিয়ে দিস'খন।

—সেই ভাল। বলেছিল রাজেশ্বরী।—গয়না পরতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।

সেই খুনখারাপি রঙের বৌ-পাগলা শাড়ীটাই ছিল রাজ্যের পরনে। বন্ধ-গাড়ীর মধ্যে সে আর একোকেশী। গাড়ীর কপাট বন্ধ, রাজেশ্বরীর দমও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। গাড়ীর জানলা নেই, শুধু কয়েকটা কাচের আড়াল থেকে গাড়ীর বহির্দেশ দেখা যায়। তাও যদি কিছু দেখা যেতো! কাচ কয়েকটা বেগুনী রঙের। রঙীন দেখায় সকল কিছু।

জুড়ী চলছে তো চলছে।

বাহকদ্বয়ের পদশব্দ, বেশ একটা একটানা ছন্দের মত যেন কানে বাজে। রাজেশ্বরী হাঁফিয়ে উঠছে যেন। গাড়ীর দোলা খেয়ে না, অন্য কোন কারণে কে জানে নিজেকে যেন ঘূর্ণায়মান মনে হচ্ছে তার। অস্বস্তি বোধ করেছে খুব। বমনের উদ্রেক হচ্ছে যে!

বেশ বিরক্ত হয়ে রাজেশ্বরী বললে,—যাচ্ছে দেখো না গাড়ী! এলো, বলতে পারিস একটু জোরে চালাতে?

এলোকেশীর হাতে ছিল ছোট একটা ট্রাঙ্ক। যক্ষের মত আগলে ছিল যেন।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে এলোকেশী,—বেশ তো যাচ্ছে। আরও জোরে চালালে তো এখুনি বাড়ী ফিরে যাবি! আবার তো সেই কেল্লার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হবে!

এলোকেশীর কথা শোনে কি শোনে না রাজেশ্বরী।

মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। হেলিয়ে পড়ে। চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে থাকে। এখন আর কিছু ভাল লাগছে না বৌয়ের। ফাঁকা শয্যায় একটু শুতে পায় যদি তবেই স্বস্তি। কি জানি এ আবার কি হ'ল পোড়া-শরীরটার, মধ্যে মধ্যে ভাবছিল রাজেশ্বরী।

আর জুড়ী ছুটছিল সেই ঢিমে-তেতালায়।

সেই একটানা শব্দটা শুধু থেকে থেকে কানে বাজছিল। জুড়ীর খুরের শব্দ।

কোচবাক্সে ছিল অনন্তরাম।

এমন মিষ্টি শরৎ-সন্ধ্যার হাওয়া, মাথার 'পরে কলকাতা মহানগরীর মহাকাশ, বিশ্রী লাগছিল যেন অনন্তরামের গ্রাম্যচোখে। আর মন যদি ভাল না থাকে তখন স্বর্গ দেখে ভাল লাগে!

কোচম্যান আবদুলকে বাজিয়ে দেখেছে অনন্তরাম।

তার মুখে যা যতটুকু শুনেছে, সে সব ভাল কথা নয়। কথা কি আর ভাঙতে চায় মুসলমানটা! নিমক খাচ্ছে, কখনও নিমকহারামী করতে পারে? জনম-ভোর আছে, পেটের রোটি পাচ্ছে, বেইমানী করতে যায় কেন খামকা! তবুও যা যতটুকু মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছে তাতেই বুঝে নিয়েছে অনন্তরাম। হাঁড়ীর একটা চাল টিপেই বুঝেছে। আবদুল কোন কথা আর ভাঙছে না দেখে হেসে ফেলে অনন্তরাম।

পূজোর বাজার, দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে। সম্ভার উপচে পড়েছে দোকান থেকে পথের ধারে। নগরবাসী যেন পেয়েছে কোথায় আনন্দের আভাস। পূজা, মহাপূজা সমাগত যে। সতী-সাধ্বী শূলধারিণী দক্ষকন্যা ক্রূরা সুন্দরী দুর্গার পূজা। দিকে দিকে যেন তাঁরই শুভাগমন প্রতীক্ষার হাওয়া চলেছে। আনন্দের হাওয়া। কলকাতার পথে-পথে দোকানে-দোকানে আলোকসজ্জা। অফুরন্ত ব্যবস্থা। যা চাও তাই পাবে। যত চাও তত। জনাকীর্ণ পথে জুড়ীর বেগ সামলাতে হয় আবদুলকে। পথের মানুষ পথ চলতে জানে না। কায়দা-কানুন জানে না পথ চলার। জুড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে কত বার তবুও রাশ টেনে ধ'রেছে আবদুল।

বন্ধ-গাড়ীতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় রাজেশ্বরীর।

দরজার পাল্লা দু'-দুটো থাকলেও খুলে দেওয়া যায় না। লোকে কি বলবে! মুখাকৃতি বিরক্তিপূর্ণ হয়ে আছে রাজেশ্বরীর। কতক্ষণে যে গাড়ী পৌঁছবে কে জানে? আর যেন পারে না সে। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে বসেই থাকে রাজেশ্বরী। একান্ত নিরুপায়ের মত। বমনের বেগ সামলায় অতি কষ্টে।

কি যে হয়েছে রাজেশ্বরীর, সে নিজেই জানে না।

কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে তার দেহে। কখনও এমনটি ছিল না। কিন্তু কি যে হয়েছে কিছু বুঝতে পারে না! সময় নেই, অসময়

নেই, যখন-তখন জ্বরের জ্বালা অনুভব করে যেন। মাথাটা ঘুরতে থাকে। হাত-পা অবশ হয়ে আসে। যা খায় পেটে থাকে না কিছু। অন্নের কোন্ রোগ নয় তো! দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা বসে থাকতে মন চায় না। কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। শুয়ে থাকলেই যেন সে ভাল থাকে।

হেমনলিনী শুধু রোগটা ধ'রেছেন। কি দেখে, কি শুনে ধরলেন কে জানে!

বৌকে নিরালায় পেয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন,—ত্থাখ্ বৌ, তোর পেটে বাচ্ছা এসেছে। খু—ব সাবধানে থাকবি। আর কি কি করবি না করবি শীঘ্রি একদিন গিয়ে ব'লে দেবো।

ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের কথাটি শুনে রাজেশ্বরী মৌন হয়েছিল বহুক্ষণ। বোধ করি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল। শুনে কোথায় খুশী হবে, হাসবে, আনন্দ করবে, তা নয়, শুনে কেমন যেন অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গেছে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। বুকে যেন তার বেদনার ঝড় বইতে লেগেছে।

জুড়ী ছুটছে তো ছুটছেই।

মধ্যে মধ্যে আঁখিদ্বয় উন্মীলিত ক'রে পলকহীন চোখে ফ্যাল-ফ্যাল তাকায় রাজেশ্বরী। মধ্যে মধ্যে আজকে বড় বেশী ক'রে যেন মনে পড়ছে তার। সেই দুঃখবিলাসিনী পলাতকার না-দেখা মুখটি। কুমু, কুমুবৌকে যেন চোখের সমুখে দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ। যেন স্বপ্নের মত দেখছে।

কোথায় এখন সেই সর্ব্বত্যাগী ভয়ঙ্করী নারী? সেই বিশালাক্ষী?

বারাণসীর কোন্ এক ঘাটের পৈঠায় ব'সেছিলেন তখন কুমুদিনী। তাঁর পাশে ছিলেন কে একজন অপরিচিতা। কাদের গৃহের পরিত্যক্ত কুলবধূ। আরেক সর্ব্বহারা। এক অকালবৈধব্যের অধিকারিণী।

—বৌ? কথা বলছিলেন কুমুদিনী।—বৌ, কোথায় গেলে মা?

—কোথাও যাইনি তো মা!

অপরিচিতার কথার স্বর অত্যধিক মিষ্ট। পাশেই ছিলেন তিনি। দেখছিলেন প্রবহমান গঙ্গানদী। সবেগে ছুটছে জলধারা। বোধ করি অনন্তকাল থেকে ছুটছে।

কুমুদিনী বললেন,—আমাকে ঐ দিকে ফিরিয়ে দাও তো মা!

দুঃখের হাসি হাসলেন ঐ নারী। বললেন,—আপনি মা ঐ দিকেই ফিরে ব'সেছেন যে।

—ও, আমি তো মা দেখতে পাচ্ছি না কিছু। কুমুদিনীর কম্পমান কণ্ঠ। বললেন,—সবই অন্ধকার দেখছি চোখে।

কুমুদিনী দৃষ্টিহারা হয়েছেন। দূরের নিকটের কোন' কিছুই দেখতে পান না। সব অন্ধকার দেখেন।

বর্ত্তমানে একটি অভ্যাস তবুও তাঁর রক্ষা করা চাই, চোখে দৃষ্টি না থাকলে কি হবে! তবুও ভিখারিণীর মত সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন, যতক্ষণ গঙ্গাতীরে থাকেন। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে গেছেন, সেখান থেকেও দেখেছেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

কুমুদিনীর চোখে এখন মণি-কর্ণিকা। পৃথিবীর আর অন্য কিছু নয়।

যে মহাশ্মশানে চিতার আগুন জ্বলছে অবিরাম। দিবারাত্র। কত যুগ থেকে জ্বলছে কেউ জানে না। অঙ্গচ্ছেদের কালে দক্ষকন্যার কর্ণ যেখানে ভূমি-অবলুণ্ঠিত হয়েছিল। কুমুদিনীর প্রার্থনা, ঐ শ্মশানের এক কোণে স্থান পান। দগ্ধ হয়ে যান তিনি চিরকালের মত। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না জানি না, জুড়ী যখন ফটক পেরিয়ে অন্দরের দ্বারপথে পৌছেচে তখনও বুঝতে পারেনি রাজেশ্বরী। মেয়ে নড়ছে-চড়ছে না দেখে এলোকেশী ডাকলো,—অ রাজো, নামবি না?

ডাক শুনে চোখ চাইলো রাজেশ্বরী!

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোন রকমে নামলো গাড়ী থেকে। এখন আর অন্য কোথাও নয়, একেবারে শয্যায়। এক জোড়া পায়ের অলঙ্কার ঝম্‌ঝমিয়ে বাজতে লাগলো।

কাছারী আর গৃহের অন্যান্য মানুষ দূর দূর থেকে লক্ষ্য করলো, খুনখারাপি রঙের শাড়ী পরিধানে, গৃহকর্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন।

পায়ের অলঙ্কারের শব্দে অন্দরের পরিচারিকাগণ অনুমানে বুঝলো, বৌঠাকরুণ দিদিমণির গৃহ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন।

কোথায় ছিল বিনোদা?

ছুটে এলো রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে। বৌকে সম্মুখে দেখেই ফেটে প'ড়লো ক্রোধ আর ঘৃণার আতিশয্যে।

আনত চোখ তুলে দেখলো একবার রাজেশ্বরী। আরেকবার দৃষ্টিপাত না ক'রে ঐ কুৎসিতাকৃতি নারীকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হয় রাজেশ্বরী। অবিচলিতের মত।

বিনোদা গালে হাত দেয়। বলে,—কালে কালে কতই না দেখবো!

রাজেশ্বরী সিঁড়ির প্রথম ধাপে পদার্পণ করতেই শুনলো, কে যেন ডাকলো।

—ওগো বৌ, শুনে যাও।

ডাকলো বিনোদা। রাজেশ্বরীর কাছাকাছি পৌঁছে বললো,—উদিকে মদে চুর হয়ে যে হুজুর ফিরেছেন। খেয়াল আছে?

রাজেশ্বরীর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়।

কোন কথা বলে না। সিঁড়ি বইতে থাকে। যন্ত্রের মত চলতে থাকে। ঐ একটি অভিযোগ, দিনের পর দিন শুনতে শুনতে যেন কাণ তার ঝালাপালা হয়ে গেল। স্বামী মদ্যপান করেছেন, রাজেশ্বরীর করণীয় কি আছে? সে কি করবে? কি করতে পারে! দেখে-শুনে মনে মনে ব্যথা পাবে। ভাগ্যকে দুষবে, গুমরে মরবে। যার জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছে

কতদিন, জানিয়ে দেখেছে যে কোন' কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি। হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন। তরণী বহে যাক্ যেদিকে খুশী। যা মন চায় করুক, আর ফিরেও তাকাবে না রাজেশ্বরী।

কিন্তু এ কি হ'ল রাজেশ্বরীর!

শরীর বইছে না কেন? দেহে যেন কত কালের ক্লান্তি। অবশ পা।

খাস-কামরায় ঢুকতেই নজর পড়লো। একটি আরাম-কেদারায় এলিয়ে প'ড়েছেন কৃষ্ণকিশোর। মুদিতচক্ষু।

রাজেশ্বরীর পায়ের অলঙ্কারের শব্দ শুনেই হয়তো চোখ খুললেন। ঘোর লাল রঙে চোখ তাঁর ঝলসে উঠলো ক্ষণেকের তরে। রক্তবর্ণ চোখ বিস্ফারিত ক'রে যেন লক্ষ্য ক'রে দেখলেন স্ত্রীকে। রাজেশ্বরীর আপাদমস্তক দেখলেন। কোথায় সেই সবুজ শাড়ী আর পান্নার গহনা? সকালে দেখেছিলেন যে পোষাকে, কোথায় হ'ল তাদের অন্তর্ধান?

সবুজ থেকে লাল। এমন শাড়ীটা পরতে কি রাজেশ্বরীই চেয়েছিল! পিসীমা জোরজার করলেন। তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেনি বৌ।

—পিসীমা ভাল আছেন?

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসা করলেন এক পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বরে। কেমন যেন গম্ভীর ভগ্নকণ্ঠ। রাজেশ্বরী ঘরে প্রবেশ করা মাত্র গন্ধ পেয়েছে, উগ্র স্পিরিটের কড়া গন্ধ নাকে যেতেই বমনের বেগ সামলেছে অতি কষ্টে। সূক্ষ্ম ভ্রূ দুটো তার খড়্গের মত বক্র হয়ে উঠেছে চরম বিরক্তিতে। মুখে কথা নেই।

—এই নে রাজো, এক্ষুণি তুলে রাখ্।

এলোকেশী জাজিমের 'পরে নামিয়ে রাখলো হাতের ট্রাঙ্ক।

বাক্সে গয়না আর কাপড় আছে রাজেশ্বরীর। যে পোষাকে সকালে যাত্রা করেছিল সেই পোষাক। কথার শেষেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে এলোকেশী। রাজোর স্বামীকে একবার দেখেছে ঘৃণার দৃষ্টিতে।

—কি আছে ট্রাঙ্কে ?

গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী ভেবেছিল কোন কথা বলবে না। মৌন হয়ে থাকবে। ইতস্তত কণ্ঠে বললে,—যেগুলো পরে গেছলাম সেগুলো।

—পিসীমা ভাল আছেন ?

পুনরায় প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকিশোর।

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী।

আলমারীর চাবি খুলতে খুলতে বললে।

—লাল শাড়ী পিসীমা দিয়েছেন ?

কৃষ্ণকিশোর কথা বলেন নিমীলিত চক্ষে ! বোধ করি রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি দেখাতে তিনি পরাঙ্মুখ।

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী।

—খাজনার টাকা জমা প'ড়েছে। আর কোন ভাবনা নেই। অনেক কষ্টে জমা দিয়েছি।

নেশার ঘোরে কি না কে জানে, কৃষ্ণকিশোর কথাগুলি বললেন। অপ্রত্যাশিত হ'লেও এ কথা যেন রাজেশ্বরীকে জানানোর প্রয়োজন ছিল।

—জেনে আমার দরকার নেই। আমি শুনতে চাই না।

রাজেশ্বরীর কণ্ঠ অশ্রুতপূর্ব্ব ঝাঁজালো। এমন স্বরে কোন' দিন কথা বলে না সে।

কেনই বা বলবে না ! কোন্ অভিসম্পাতে তার ললাট দগ্ধ হয়েছে !

অনেক দিন আর অনেক রাত্রে মনে মনে কত খতিয়ে ভেবেছে। ভেবে ভেবে কিছু ঠাওর করতে পারেনি। কি এমন পাপটা সে করলো এই জন্মে ! হঠাৎ কেমন যেন কঠোর হয়ে গেছে রাজোর মত মেয়েও।

কিন্তু বড় ভীষণ উগ্র দেখাচ্ছে রাজেশ্বরীকে।

প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। ভয়ঙ্করী কোন এক দেবী-প্রতিমার মত। লাজে লাল হয়ে আছে যে! রাঙা অধর।

সীমন্ত লাল। কপালে সিন্দুর। রক্তিম বাস। পদে অলক্তক।

কথা শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। পায়ের অলঙ্কার অবাধ্যের মত তুললো শব্দঝঙ্কার।

বেশ লাগছিল রাত্রির প্রথম আবির্ভাব।

বেশ হৃষ্টচিত্তে ছিলেন কৃষ্ণকিশোর। নেশাটা বেশ জমেছিল। এমন মিষ্টি নেশা কোন' দিনের জন্ম হয়নি। কোন্ জাতীয় সুরা পান করেছিলেন কে জানে! রাজেশ্বরীর কথায় ব্যাজার হ'লেন।

ইটালীয়ান ওয়াইন। যার রঙ হয়তো রাজেশ্বরীর শাড়ীর মতই ঘোর লাল।

ঘরের জলন্ত সন্ধ্যা-দীপের শিখার প্রতি চোখ রেখে কৃষ্ণকিশোর মনে করতে চেষ্টা করছিলেন সেই মদিরার রঙ, যা তিনি পান করেছিলেন সানন্দে। পান ক'রে অন্য দিনের মত অখুশী হওয়ার পরিবর্ত্তে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। এখনও তার যথেষ্ট আমেজ আছে। দেহ ও মন যেন রিমঝিম করছে। অবশ হয়ে গেছে শরীরটা।

শুধু কি মদের নেশা!

গহরজানের নেশা নেই? গহরজানকে যে দেখতে দেখতে নেশা লাগে দু' চোখে। হোক পতিতা, হোক বহুভোগ্যা, গহরজান বাইয়ের আকৃতিটায় এখনও আছে সম্মোহন। দেহতীরে অপূর্ব্ব আকর্ষণ!

সত্যিই দেখলে নেশা লাগে চোখে। অনেক কিছুর মিশ্রণ-নেশা। যেন অনেক জাতের মদের একত্র-পানের নেশা।

রাজেশ্বরীর হঠাৎ ঝাঁজালো কণ্ঠ শুনে মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর। অপমান বোধ করেছিলেন। বৌ কি তাঁকে অবহেলা করেছে! তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি!

আরাম-কেদারার একটি হাতের অগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে চেপে ধ'রলেন কয়েক বার। রুদ্ধক্রোধ প্রকাশ করলেন যেন। উঠে পড়লেন কেদারা থেকে। সোজা এগিয়ে গেলেন একটি দেরাজের কাছে। কি যেন খুঁজছেন কৃষ্ণকিশোর। দেরাজের 'পরে কি আছে!

ঐ তো রয়েছে। সবুজ কাগজ-আঁটা বাহারী শিশিটা রয়েছে। যা হয় এক শিশি পাওয়া গেলেই চলবে। ৪৭১১-মার্কা বিদেশী সুগন্ধির শিশি। উগ্র স্পিরিটের বিশ্রী গন্ধটা যদি ঢাকা পড়ে! সেণ্টের শিশিটা খুলে অনেকটা গন্ধজল ঢেলে ফেললেন গাত্রবাসে। স্পিরিটের গন্ধ না হয় দূরীভূত করা গেল, কিন্তু নেশার প্রকাশ রোধ করা যায় কি! ইটালীয়ান ওয়াইনের তীব্র নেশা!

শিশি রেখে কৃষ্ণকিশোর আরাম-কেদারায় বসলেন না, পালঙে বসলেন। টেনে নিলেন লাল ভেলভেটের একটা তাকিয়া। বেশ আরাম পেলেন যেন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাজেশ্বরী অন্যত্র কোথাও যায়নি।

ঘরের সামনে দালানের একটা সুবৃহৎ জানলার কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আশাহত, ব্যথাহত মুখ তুলে দেখছিল হয়তো রাত্রির আকাশ। দেখছিল অনন্ত শূন্য, আঁধার, আঁধার, আঁধার! তমসাবৃত আকাশে ছড়িয়ে আছে মাত্র কয়েকটি নগণ্য নক্ষত্র। সহজে চোখে পড়ে না। মুমূর্ষুর হৃদয়ের মত ধুকপুক করছে। সোনালী আলোকরশ্মি ক্ষীণ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। যত দূর দৃষ্টি যায় দেখছিল রাজেশ্বরী। একটা নক্ষত্র চোখে পড়লো কেন? কোথায় লুকিয়ে পড়লো অন্যান্য। এক তারা যে দেখতে নেই। রাজেশ্বরী মনে মনে সুগন্ধি পুষ্পের একেক নাম আওড়াতে থাকে। নাঃ, ঐ তো আরও একটা। একটা আর একটায় দু'টো। ঐ তো আরেকটা। তিনটে।

এক তারা মানুষ মরা—

নেশায় আচ্ছন্ন স্বামী ঘরে ব'সে আছেন, ভাবতেও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রাজেশ্বরীর। মুখদর্শন করতেও ইচ্ছা হয় না স্বামী-দেবতার! তার চেয়ে বরং মৃত্যু হোক রাজোর। সেই ভাল। দেখতে হবে না আর এই সামাজিক কুশ্রীতা। বেঁচে ম'রে থাকা অপেক্ষা ম'রে গিয়ে বাঁচবে সে। কোথাও গিয়ে মনের জ্বালা জুড়াবে!

আকাশে স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে দিচ্ছে কি কেউ?

মুঠো-মুঠো সোনা এলো কোথা থেকে, আকাশের এক প্রান্তে!

বোধ করি চাঁদ উঠবে। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বাভাষ।

সামান্য আলোর আমেজ ফুটেছে। সোনালী আলো। শরৎ-দিনের দূরাগত পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ, কলকাতা মহানগরীর আকাশে এতক্ষণে জমায়েৎ হ'তে থাকে। আছে হয়তো এখানে কোন' যক্ষপ্রিয়া। কোন' এক যক্ষ। নগরীর কোলাহল স্তিমিত হয়েছে এখন। কলকাতা কি রামগিরির রূপ ধারণ করছে!

—গেল কোথায়? কারও যে পাত্তা পাওয়া যায় না!

তাকিয়া সরিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন কৃষ্ণকিশোর। কথাগুলি উচ্চারণ করলেন আপন মনে। ঘরের দীপশিখার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। লণ্ঠনটা জ্বলছে। সুউচ্চ শিখা। কম্পমান শিখার আলোও কাঁপছে। সারা ঘরটা যেন কাঁপছে। কাঁপছে নয়, জলমধ্যে জলযানের মত যেন দুলছে।

ঘড়ি-ঘরে হঠাৎ ঘণ্টা পড়লো। সেই ফটকের পাশের ঘড়ি-ঘরে।

এক, দুই, তিন; সময় কত হ'ল?

ঘরের মধ্যস্থিত ঘড়িটাও বেজে চলেছে ঠুং ঠাং ঠুং। কে যেন হঠাৎ পিয়ানোতে হস্তস্পর্শ করলো। গ্রাণ্ডফাদার্স ঘড়িটায় জলতরঙ্গের ধ্বনি বেজে উঠলো।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় যেন পৃথিবীর অন্য সকল ঘড়ির শব্দকে ম্লান ক'রে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। দুর্গের মত সুবৃহৎ অট্টালিকা। যেন কোন্ এক ক্যাসেল্ থেকে অস্তিত্ব ঘোষণা করে মহাকাল!

বহু—বহুদূর পর্য্যন্ত শোনা যায়, ভেসে যায় ঘড়ি-ঘরের আওয়াজ।

ফোর্ট উইলিয়ামের তোপের গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ পর্য্যন্ত হার মেনে যায়।

গহরজান বাইজীর স্মৃতি কেন কে জানে মন থেকে যেন মুছতে চায় না। গহরজানের রূপের স্মৃতি শুধু নয়, গহরজানকে জড়িয়ে আরও অনেক, অনেক কিছু দেখা বস্তু আর পরিবেশের ছায়াচিত্র দেখেন চোখে কৃষ্ণকিশোর। গোঁফের সূক্ষ্ম দুই প্রান্তে অঙ্গুলিবিন্যাস করতে করতে বাইজীটার রঙে যেন রঙীন হয়ে থাকেন।

অর্থদানের লাভ গহরজান। টাকা ফেলে পাওয়া।

টাকার সম্পর্কের। টাকা ফুরালে গহরজানও ফুরিয়ে যাবে। সম্পর্ক ঘুচে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ টাকা হাতে আছে ততক্ষণ কেন বৃথা অপব্যয় হ'তে দেওয়া যায়। আর, একটা মেয়েকে পুষতে কতই বা অর্থব্যয় এত যেখানে আধিক্য! ঘড়া ঘড়া টাকা। শুধু টাকা? গিনি মোহর হীরামাণিক্য! একটা গোটা তোষাখানা।

কৃষ্ণকিশোর বিশেষ আজ যেন লক্ষ্য করলেন গহরজান বাইজীর অন্য এক রূপ। ডালিম বেড়ালের বিয়ের টাকা হাতে পেয়ে ভোল যেন পাল্টে গেল মেয়েটার। স্ফূর্ত্তিতে উচ্ছ্বসিতা হয়ে উঠলো ক্ষণেকের মধ্যে।

সেই হাসি-হাসি মুখ। সেই শঙ্খিনী না পদ্মিনী, যার মুখের মিষ্টি হাসিতে বিমোহিত হয়েছেন কৃষ্ণকিশোর। পয়সা খরচা ক'রে প্রেম বা ভালবাসাবাসির খেলা করছেন।

ঘরময় কে বুঝি আচম্কা কি এক পুষ্পগন্ধ ঢেলে দিয়ে যায়। ৪৭১১-সেণ্টের খোষবয়ে খাসকামরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

কার যেন পদশব্দ শুনে দ্বারপথ দেখলেন কৃষ্ণকিশোর।

দেখলেন স্বয়ং রাজেশ্বরী। শ্রাবণের মেঘের মত যেন তার মুখাবয়ব। থম থম করছে। লালে লাল হয়ে আছে খুনখারাপি রঙের শাড়ীতে। সিন্দুর, শাড়ী আর অলক্তকে।

বৌকে দেখে সামান্য হাসির সঙ্গে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—আমার একটি কথা রক্ষা করবে তুমি ?

আড়নয়নে একবার দেখলো রাজেশ্বরী।

কথাটি শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো। কোমরটুলীর মূর্ত্তির মত দেখলো যেন রাজোকে। লক্ষ্মীমূর্ত্তির মত।

—কি বলতে চান, বলুন। চেষ্টা করবো।

রাজেশ্বরী ভাঙ্গা-গলায় বললে। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে।

কৃষ্ণকিশোর ক্ষণিক চিন্তিত হ'লেন। বললেন,—আপনি চুনীর অলঙ্কার পরিধান করুন।

হেসে ফেললো রাজেশ্বরী।

দুঃখের হাসি হাসলো। রাজেশ্বরীও অনুরোধ শুনে চিন্তাকুল হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তের মধ্যে। নেশার ঘোরের খেয়াল, হাসলো তাই রাজেশ্বরী। কিন্তু কোন দিন এই ধরণের অনুরোধ জানাননি কৃষ্ণকিশোর, ভেবে আকুল হয়ে ওঠে বৌ।

চুনীর গয়না। শুধু চুনী, আর কিছু নয়। তাও আছে রাজেশ্বরীর। চুড়ি আছে, হার আছে, কানবালা আছে। আর কি থাকবে! ক্রাউনের নকলে চুনীর ক্রাউনও আছে। এই ঘরের দেরাজেই আছে। রাজেশ্বরী বললে,—আপনার আদেশ পালন করছি জানবেন।

—তথাস্তু। বললেন কৃষ্ণকিশোর। সহাস্যে।

যখন-তখন দেরাজ আর আলমারী খুলতে সাহসী হয় না রাজেশ্বরী।

গয়নাগাটি আছে। আবার যদি কোন' একটা হারায়! চুরি যায়! নানা কথা ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী।

আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছ টেনে আলমারীটা খুলতে উদ্যোগী হয়। চাবি খুলতেই লণ্ঠনের আলোয় ঝলসে যায় যেন কৃষ্ণকিশোরের রক্তচক্ষু। রঙীন পোষাক আছে আলমারীতে। রূপালী আর সোনালী জরির চাকচিক্য খেলতে থাকে। রঙচঙে ভেলভেটের জামা, হাসতে থাকে বুঝি আলোর স্পর্শলাভে।

কোথায় গেল সেই কালো ক্যাশবাক্সটা!

চুনীর অলঙ্কার আছে সেই আধারে। আলমারী হাতড়াতে থাকলো রাজেশ্বরী। পোষাকের ভীড়ে হাত চালালো। আলমারীতেই আছে ক্যাশবাক্সটা। অদৃশ্য হয়ে আছে। খোঁজাখুঁজি করতে-করতে কিছু-কিছু পরিধেয় আলমারী থেকে মেঝেয় প'ড়ে যায়। সেদিকে খেয়াল নেই বৌয়ের। বেপরোয়ার মত যেখানে-সেখানে হাত চালায় সে। মরীয়া হয়ে গেছে যেন, এমনি তার মুখভঙ্গী। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

সোজা হয়ে কেন কে জানে বসতে পারছেন না কৃষ্ণকিশোর। ব'সে বসে'ই টলছেন যেন।

নেশার তীব্রতায় যেন অঙ্গ তাঁর শিথিল হয়ে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। চেষ্টা ক'রে সামলে নিতে হয়, ভদ্রভাবে বসতে হয়। নয় তো যদি ধরা পড়ে যান, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণকিশোর বেশ ভীত হয়ে থাকেন। বৌ যদি ধ'রে ফেলে মদ খাওয়া হয়েছে।

এতক্ষণে পেয়েছে রাজেশ্বরী।

হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। মেঝেয় প'ড়ে-যাওয়া পোষাক তুলে রাখছে জড় ক'রে। একান্ত অবহেলার সঙ্গে রাখছে ঠেসে-ঠেসে। যেখানকার যা নয় সেখানে তাই রাখছে। আর হাঁফ ধ'রে যাওয়ার নিশ্বাস ফেলছে জোরে-জোরে। ক্রোধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে যেন রাজেশ্বরীর চাল-চলনে। ক্যাশবাক্সটা জাজিমে নামিয়ে আলমারী বন্ধ ক'রে ফেললো। তার পর আঁচল চেপে ঘেমে-ওঠা মুখটা মুছলো অনেকক্ষণ ধ'রে। লাল হয়ে উঠলো মুখটা।

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি নেই বৌয়ের।

ফিরেও তাকাচ্ছে না রাজেশ্বরী। ঘরে যেন অন্য মানুষই নেই। রাজো চাপটি খেয়ে ব'সলো জাজিমে। বাক্সটা খুলে ফেললো কি এক কল টিপতেই। বাক্সের ডালা খুলতে-খুলতে হাসলো আপন মনে। খুশী হওয়ার হাসি না ক্ষোভের হাসি বোঝা গেল না। তবে একটা অস্ফুট হাসির বিদ্যুৎ চমকালো যেন ঘরের ভেতরে।

কৃষ্ণকিশোর উঠে পড়লেন।

টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন একটি টেবিলের কাছে।

টেবিল প্রায় ফাঁকা। শুধু একটা কাঁশর। ঝুলছে কাঠের দোল্‌নায়।

কৃষ্ণকিশোর কাঁশর বাজালেন। কয়েকবার বাজালেন। কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতে।

চমকে উঠলো রাজেশ্বরী। হঠাৎ কাঁশরের শব্দে। পরম বিরক্তি অনুভব করলো। বাঁকা চোখে দেখলো একবার। দেখলো গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখ কৃষ্ণকিশোরের। চোখ ফিরিয়ে চুনীর অলঙ্কার পরতে থাকলো। চুড়ি, হার আর কানবালা। লাল কাঁচের টুকরো এক মুষ্টি।

তবে কি বৌ ধ'রে ফেলেছে আসল অবস্থাটা!

সকালে যার হাসিমুখ দেখে জমিদারীর বকেয়া খাজনা জমা দেওয়ার অছিলায় টাকা সমেত উধাও হয়েছিলেন, সেই হাসিমুখে হাসি দূরের কথা, একটা কথাও নেই!

কাঁশরের শব্দ শুনে কোন এক ভৃত্যের আগমন হয়। দালান থেকে হাজিরা জানায়।—হুজুর, হাজির আছি।

খুলে-যাওয়া ঘোমটা টানলো রাজেশ্বরী।

তার ধপধপে ফর্সা একটা বাহু লালের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আলোয় ভেসে উঠলো। সুডৌল বাহু।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—ফুলদানিতে ফুল নেই কেন? বাগানের ফুল কি আর ফুটছে না?

ঘরের ফুলদানি সত্যিই শূন্য রয়েছে।

বিশেষতঃ পোরসিলেনের ফুলদানিটি। সাদা রঙের। এক নগ্ন নারী-মূর্ত্তি বেষ্টন ক'রে আছে ফুলদানি। অন্যান্য দিন ফুল থাকে ঐ পাত্রে। আজকে শূন্য থাকতে দেখে সত্যিই মনে মনে রাগান্বিত হন কৃষ্ণকিশোর। হুজুরের অভিযোগ শুনে দাঁতে জিহ্বা কাটলো অপেক্ষমান ভৃত্যটি। তড়িৎগতিতে দালান থেকে ছুটলো। শব্দহীন পদক্ষেপে। হয়তো ভুলে গেছে ফুল রাখতে।

চুনীর অলঙ্কার কয়েকটা অঙ্গে চড়িয়ে উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী।

ক্যাশবাক্সটা যথাস্থানে রেখে আলমারী বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত্ত।

কৃষ্ণকিশোর পেছনে দুই হাতে পায়চারী করছিলেন কক্ষমধ্যে। গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখ। পায়চারী করছেন প্রায় টলতে টলতে। তাঁর লুটন্ত কোঁচা। রূপালী জরির কুঁচানো ধুতি যেন মেঝে সাফ করার কাজ করছে। সেদিকে খেয়ালই নেই হুজুরের।

এখন কি করবে, তাই ভাবছিল রাজেশ্বরী।

ঘরের অভ্যন্তরে অসহ্য নীরবতা। কথা বলতে রাজেশ্বরীর মন চাইছে না। শয্যায় যদি আশ্রয় পাওয়া যায় যৎসামান্য! দেহ এলিয়ে দিয়ে যদি কিছুক্ষণের বিশ্রাম পাওয়া যায়! চোখ বন্ধ ক'রে চুপ-চাপ শুয়ে থাকবে রাজো। মাথাটা যে তার ঝিম-ঝিম করছে এখনও। পা দু'টো থেকে থেকে কাঁপছে ঠক্‌ঠকিয়ে। লণ্ঠনটা নিবিয়ে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায় বৌ। কিন্তু মুখ ফুটে কি বলতে পারে বৌ-মানুষ হয়ে। তথাপি রাজেশ্বরী পালঙে ব'সলো পা মুড়ে। কত আশঙ্কা বুকে চেপে অত্যন্ত সন্তর্পণে ব'সলো পালঙের এক পাশে। গালে হাত দিয়ে ব'সলো শূন্যদৃষ্টিতে। ব'সতে গিয়ে খুলে গেল মাথার ঘোমটা।

কৃষ্ণকিশোর পায়চারী করছিলেন তখনও।

বৌকে পালঙ্কে বসতে দেখেই কিনা কে জানে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—বাড়ীতে বৌ আনা হয়েছে বিছানায় শুধু ব'সে থাকতে নয়! সংসারের কাজকর্ম্ম দেখা, গেরস্থের কাজ করাই বৌ-ঝিয়ের কাজ।

বৌ-ঝি! ব'সেছিল রাজেশ্বরী। কথাগুলি শুনে উঠে প'ড়লো তৎক্ষণাৎ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কার প্রতি এই কথার লক্ষ্য? খড়্গের মত ভ্রূ বক্র হয়ে উঠলো। রাগ এবং অভিমানে ফুলতে থাকলো যেন। অপমান বোধ করলো। কি যেন বলতে গিয়েও বললো না। পায়ের অলঙ্কার শব্দায়িত হয়ে উঠলো। ঘরের বাইরে চললো রাজো। অধর দংশন করতে করতে বেরিয়ে গেল।

—যাও কোথায়?

ডাকলেন কৃষ্ণকিশোর।

দালানের অনেক দূর থেকে কথা ভেসে এলো,—সংসারের কাজকর্ম দেখতে, গেরস্থের কাজ করতে।

এতক্ষণে যে হৃদয়ঙ্গম হয় কৃষ্ণকিশোরের, কথাগুলি বলা উচিত হয়নি।

বড় অসময়ে বড় অন্যায় উক্তি করেছেন। নেশার ঘোরে কখন যে কি কাকে বলেন তার ঠিক আছে! মনে মনে বোধ করি অনুতপ্ত হন কৃষ্ণকিশোর। ঘরের দরজার দিকে কোন ক্রমে এগিয়ে ডাকেন,—বৌ, ও বৌ শুনছো?

কোথায় কে? দালান ফাঁকা।

অন্য দিন এমন সময়ে একা যাওয়া-আসা করতে বেশ ডরায় রাজেশ্বরী। কখন কোথায় কাকে দেখতে পায়, এই ভয়ে। স্বর্গগত কোন মানুষ, এই বংশের মৃতজন কেউ যদি সশরীরে অবতীর্ণ হয়ে দেখা দেন, তখন!

রাজেশ্বরীর বক্ষে ভয় ও ত্রাস যেন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, তবুও আজ আর তার কোন' দিকে দৃক্‌পাত নেই। গৃহময় ঝম্-ঝম্ শব্দের ঝঙ্কার। রাজেশ্বরীর পায়ের অলঙ্কারের শব্দ।

কাজে চ'লেছে রাজেশ্বরী। কাজ করতে চ'লেছে।

সংসারের কাজ-কর্ম দেখতে। গৃহস্থের কাজ করতে। যেতে যেতে ইচ্ছা হয়, চুনীর গয়না ক'টা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। কি ভাবে বৌ, একা একা এগিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। রান্না-বাড়ীর দিকে যাচ্ছে।

গৃহবধূকে সহসা সশরীরে দেখতে পেয়ে রান্না-বাড়ীর জন-মানুষ তো হতবাক্! কার' মুখে কথা ফোটে না। রাজেশ্বরীর মুখেও নয়। সে শুধু দাঁড়িয়ে প'ড়েছে। একটা থামের আড়ালে। ঠিক এই মুহূর্তে মুখখানি কাকেও দেখানো যায় না।

চোখ ভ'রে গেছে রাজোর। জলে ভিজে গেছে। অশ্রুজলে।

সোজাসুজি বললেই তো পারতেন, রাজেশ্বরী কি শুনতো না? সোজা কথা বললেই চলতো, বাঁকা কথার কি প্রয়োজন ছিল? কোন দিনের তরেও কোন কথা কি অমান্য করেছে রাজো?

—বৌদিদি, তুমি হেথায় কেন?

একজন পরিচারিকা। কে তার কে জানে! একজন দাসী।

রাজেশ্বরী ভিজে-যাওয়া চোখ আঁচলে মুছতে মুছতে ভাবছিল, স্বামীকে সুখী করতে, খুশী রাখতে সে কি চায় না! যখন তিনি যা বলেছেন তাই শুনেছে হাসিমুখে। কৃষ্ণকিশোরের মন যাতে ঘরে বাঁধা পড়ে সে জন্য রাজেশ্বরী মরতেও প্রস্তুত ছিল। এখনও আছে।

—কথা কও না কেন বৌদিদি? হ'ল কি তোমার?

দাসী আবার জিজ্ঞেস করলো। কেমন যেন ভীতকণ্ঠে।

কিন্তু অনেক দিনের অনেক দুঃখের চাপা-কান্নার বাঁধ ভেঙেছে এখন। চোখের জলে আঁচল ভিজে যাচ্ছে। একটা লণ্ঠন-হাতে অন্য এক দাসীর দেখা পাওয়া যায়। দূর থেকে কথাবার্তা শুনে দাসী আলো এনে হাজির করে। দেখা যায় রক্তাম্বর-পরিহিতা রোরুদ্যমানাকে। লাল শাড়ীর সিক্ত অঞ্চলও দেখা যায়।

—কিচ্ছু হয়নি। বললো রাজেশ্বরী।

—কাঁদছো যে তুমি?

—ও কিছু নয়। যাও তোমরা, কাজে যাও। বললো রাজেশ্বরী। তাই ব'লে কি রাজো এত মূর্খ যে সামান্যা পরিচারিকাদের কানে ঘরের কথা ভাঙবে? তাদের দু'জনকে এক রকম তাড়িয়ে দেয় যেন সে। স্বামী না হয় কটু কথা বলেছেন, তাই ব'লে কি—

কক্ষমধ্যে তখনও পায়চারী করছিলেন কৃষ্ণকিশোর। সত্য সত্যই তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন। নেশার ঘোরে খেয়াল ছিল না, কাকে কখন কোথায় কোন্ কথা বলতে হয়। তিনি ভাবছিলেন, স্ত্রীর শরীর হয়তো ক্লান্ত হয়েছিল; সারাদিন পরে হয়তো বিশ্রাম করতে বসেছিল। চুনীর অলঙ্কার পরলো বৌ, সে তো শুধু তাঁরই কথায় নয়, আদেশে। দু'বার বলতে হয়নি তাঁকে।

কিন্তু চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কেন?

এইক্ষণে যে কথা ভাবছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ মানসপটে উদিত হচ্ছে কেন? এ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া কি! স্পিরিটের নেশায়? না, হঠাৎ চোখে প'ড়লো?

দেওয়ালে নির্ব্বাক্ চিত্র!

পলকহীন দৃষ্টি। মহারাণী যেন কোথাকার। তেমনি বেশভূষা।

কুমুদিনীকে দেখে কুমুদিনীকে মনে পড়লো কৃষ্ণকিশোরের। মাকে মনে পড়লো ছেলের।

মা তখনও বসে আছেন গঙ্গাতীরে। এখনও তাঁর চোখ পলকহীন।

দৃষ্টি হারালেই বা, কুমুদিনী তবুও তাকিয়ে আছেন ঐ দিকে।

যে দিকে মণি-কর্ণিকা। যে দিকে দাউ-দাউ চিতা জলছে। শেষ-আশ্রয়ের দিকে চোখ কুমুদিনীর। ভুলে গেছেন পৃথিবী। পেছনে কে প'ড়ে আছে, ফিরে দেখবার মত সময় নেই।

চিত্রে কুমুদিনীর মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন হয়ে গেল কেন চকিতের মধ্যে!

কৃষ্ণকিশোরের চোখে হঠাৎ দেখা দিয়েছে গহরজান বাইজী। দেখার ভুল নয় তো!

নেশার ঘোরে কখন কি ভাবেন, কখন চোখে কি দেখেন তার ঠিক থাকে কখনও? বাইজীটাকে চোখের সমুখে দেখতে পেলেন যেন কৃষ্ণকিশোর। সঙ্গে সঙ্গে তার যেন সান্নিধ্যলাভের আনন্দ উপভোগ করলেন! মনটা যেন তাঁর হু-হু ক'রে উঠলো। কোথায়, কোথায়, কোথায় গহরজান!

কোথায় আবার, যেখানে ছিল সেখানে।

খোস-গল্প করছিল মাসির সঙ্গে। হাসির উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছিল যখন-তখন। গহরজানও যে পান করেছিল। একটুতে তার মন ওঠেনি, খেয়েছিল অনেকটা। নেহাৎ অভ্যাস আছে তাই রক্ষা।

ডালিমের বিয়ের বিষয়ে কথা বলাবলি করছিল পরস্পরে।

কি হবে, কি না হবে সেই সব কথা বলতে আর শুনতে শুনতে মসগুল হয়েছিল গহরজান।

মাসী সৌদামিনী শুধু দেখছিল কতক্ষণে গহরজানের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। নেশায় জড়িয়ে আছে, কখন ঘুম আসবে। সৌদামিনী এঁচে আছে যেন। গহরজানও ঘুমাবে, মাসীও তৎক্ষণাৎ গহরের দরজায় শেকল এঁটে দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে বসবে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসবে একা-একা।

টাকার ঘড়াটা উপুড় ক'রে ঢালবে। মনের সুখে গুণবে টাকার রাশি। মুঠো-মুঠো টাকা রাতারাতি সরিয়ে ফেলবে এমন জায়গায়—

কৃষ্ণকিশোর ব'সে পড়লেন আরাম-কেদারায়!

কি যেন মনে পড়লো তাঁর। অস্বাভাবিক বিকট চীৎকারে ডাকলেন,—অনন্ত! অনন্ত! অনন্তরাম!

বৃহৎ অট্টালিকা। প্রতিধ্বনি উঠলো গৃহস্বামীর ডাকের। বহুদূর পর্য্যন্ত ভেসে গেল ঐ তীব্র আহ্বানের শব্দ। কাছাকাছি যারা ছিল চমকে শিউরে উঠলো ডাক শুনে।

অনন্তরামের আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়। সে যখন শোনে।

—ডাকছিলে আমাকে?

অনন্তরাম হাজির হয়। সাড়া দেয়।

—হ্যাঁ ডাকছি। তুমি আর কিচ্ছু দেখো না অনন্তদা, দেখো তো ঘরের দেওয়ালে কত ঝুল!

অনন্তরাম তো অবাক্। কথার স্বরই পালটে গেল।

কৃষ্ণকিশোর কথা বললে অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে। অনন্তরাম কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বললে,—ওঃ, এই কথা বলতে এমন ষাঁড়ের মত চীৎকার ক'রছো?

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। বললেন হাসতে হাসতে,—তুমি আমাকে ষাঁড় বললে অনন্তদা!

—তুমি শুধু ষাঁড় নয়, তুমি একটা মূর্খ, তুমি একটা—

কথা বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে গেল অনন্তরাম।

আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়লেন কৃষ্ণকিশোর। চক্ষু মুদ্রিত করলেন। ৪৭১১ সেন্টের সুগন্ধ, ভারী ভাল লাগছে যেন গন্ধটা।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে কাকেও কিছু না জানিয়ে।

রাত্রির নির্জনতায় ঘণ্টাধ্বনি অধিক দূর পর্য্যন্ত শোনা যায়।

রাজেশ্বরীও শোনে। সেই অন্দরের রান্না-বাড়ীতে ব'সে ব'সে শুনতে পায়। তাকে কিছু করতে দেয়নি ব্রাহ্মণী আর দাসীদের দল। ন'ড়ে বসতে দেয়নি। একটা পিঁড়ে পেতে দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। জবুথবুর মত এক নাগাড়ে ব'সে থাকতে থাকতে শুধু ঘামছে রাজেশ্বরী। তার বুক-পিঠের জামা ভিজে গেছে ঘামতে ঘামতে।

রান্না-বাড়ীতে পাঁচ-ফোড়নের গন্ধ।

আরও কত কি আহার্য্যের মিশ্রিত গন্ধ। ব্রাহ্মণী রাঁধছে রাত্রির আহার। কড়াইয়ে ফুটছে। ডালের হাঁড়ি উপচে পড়ছে! ক'জন দাসী ময়দা ঠেসছে এক দালানে।

আর রাজেশ্বরী চুপচাপ ব'সে দেখছে ইদিক-সিদিক।

একজন দাসী পেছনে দাঁড়িয়ে হাত-পাখার হাওয়া বওয়াচ্ছে। তবুও ঘামছে রাজেশ্বরী জানলাহীন ঘরটায়।

—ও বৌদিদি, তোমাকে হুজুর ডাকতে পাঠিয়েছে। দাসীদের কে এক জন কথা বললে সসম্ভ্রমে। নাতি-উচ্চ কণ্ঠে।

কথাটা যেন শুনেও শুনতে পায় না রাজেশ্বরী। ডাকছে তা কি করতে হবে? যাবে না রাজেশ্বরী, সংসারের কাজকর্ম্ম আর গৃহস্থের কাজের দেখাশুনা করবে। হুকুম করা মাত্রই যে গিয়ে হাজির হ'তে হবে এমন কোন কথা আছে? যাবে না, কিছুতেই যাবে না রাজেশ্বরী। ক্রোধ আর অভিমানে থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে রাজেশ্বরী। একটা কিছুর চাপা কষ্ট বুকটা তার মথিত করছে যেন। মদ খেয়ে যে মানুষ নেশায় ডুবে আছে তেমন মানুষের সংস্পর্শেও যেতে চায় না বৌ।

ওদিকে বাড়ী-কাঁপানো গগন-বিদারক কণ্ঠস্বর।

কৃষ্ণকিশোর ডাকছেন কাকে যেন। অন্য দিন এমনটি করেন না। আজকেই ব্যতিক্রম ঘটেছে। যখন-তখন চীৎকার করছেন তিনি। ডাকছেন যাকে খুশী মন চাইছে। সাড়া না পেলে আরও জোরে গলা ছাড়ছেন। বৌকে ডেকেছেন। তবুও বৌয়ের দেখা না পেয়ে ডাকাডাকি করছেন কাকে যেন।

—ডাকছিলেন আমাকে?

ঘরের বাইরে থেকে কথা বললে রাজেশ্বরী। ইচ্ছা না থাকলেও চীৎকারের আতিশয্যে আসতে বাধ্য হয়েছে সে।

একেবারে আরেক মানুষ। নম্র কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণকিশোর বললেন,—হ্যাঁ গো বৌ, কোথায় চ'লে গেলে তুমি? ডেকে ডেকে সাড়াই পাওয়া যায় না তোমার!

খানিক চুপ ক'রে থাকলো রাজেশ্বরী। আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবলো। বললে,—গেছলাম সংসারের কাজ দেখতে। আপনি যে বললেন, বৌ-ঝিয়ের সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখতে হয়। আপনি ডাকছেন, রান্নাবাড়ী থেকে আমি শুনতেই পাইনি।

কৃষ্ণকিশোর হো-হো শব্দে হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—তুমি কি বল' তো বৌ? আমি বলেছি ব'লে তুমি চ'লে গেলে রান্নাবাড়ীতে?

নিরুত্তর থাকলো রাজো। কোন কথা বললে না।

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হাসির রেশ টেনে কৃষ্ণকিশোর বললেন,—বাইরে কেন? ঘরে এসো না।

রাজেশ্বরী বললে,—এখনও সংসারের কাজকর্ম্ম মেটেনি যে!

—তা হোক। তুমি ঘরে এসো।

কৃষ্ণকিশোরের কথায় যেন অনুরোধের ইঙ্গিত।

রাম কি গঙ্গা, কোন কথা বলে না রাজেশ্বরী। স্থির পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে তো দাঁড়িয়েই থাকে।

রাগ নয়, অনুরাগের সুরে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—কথা শুনছো না কেন? ঘরে এসো তুমি।

—ঘরে গিয়ে কি করবো আমি? শুধোলে রাজেশ্বরী। বললে,—কত কাজ বাকী এখনও! আমার আসতে রাত হবে।

আরাম-কেদারা থেকে উঠলেন কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতে এগোলেন দরজার কাছে। বৌয়ের একটা হাত ধ'রে প্রায় টানতে টানতে ঘরে এনে হাজির করলেন। বললেন,—তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি

শুধু এই পালঙে ব'সে থাকবে। তোমাকে সংসার দেখতে হবে না। দেখবার বহু লোক আছে।

—তা তো জানি যে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক আছে আপনাদের বাড়ীতে। খেয়ে, ঘুমিয়ে আর ব'সে ব'সে দিন কাটাচ্ছে। তবুও বৌ-ঝিয়ের কাজই হ'ল গেরস্থ দেখা।

কৃষ্ণকিশোর কথার স্বর পরিবর্ত্তিত করলেন। বললেন,—তুমি যেন বৌ এক ধরণের! একটা কথা ব'লেছি, তার জন্যে তুমি যে কেমন করছো!

নিরুত্তর থাকলো রাজো! কেন কে জানে দর-দর বেগে অশ্রুপাত করতে থাকলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

চোখে জল দেখলে যেন থাকতে পারেন না কৃষ্ণকিশোর।

বৌকে বেঁধে ফেললেন বাহু-বন্ধনে। চিবুক ধ'রে বৌয়ের মুখটি তুললেন। বললেন,—রাগ কর' কেন? তুমি যদি কথায়-কথায় রাগারাগি কর' আমি তো নাচার। আমার আর কে আছে বল'?

কোন কথার জবাব দেয় না রাজো।

আঁচলে চোখের জল মোছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে থেকে থেকে।

কৃষ্ণকিশোর হাসির রেশ টেনে কি খেয়ালে কে জানে বললেন,—জানো বৌ, একটা বেড়ালের বিয়ে দিচ্ছি।

কথাটি শুনে যেন আপাদমস্তক জলতে থাকলো রাজেশ্বরীর। তবুও সে বললে,—কোথাকার বেড়াল? কার বেড়াল? আমি তো জানি না?

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। কার বেড়াল তা আর জিজ্ঞেস ক'র না।

রাজেশ্বরী বেশ বুঝতে পারে, স্বামীর কথার কোথায় যেন বেশ একটু রহস্য লুক্কায়িত হয়ে আছে। বৌ বললে,—বেড়ালের বিয়ে দিচ্ছেন, কার বেড়াল, কোথাকার বেড়াল যদি না বলেন তবে আর বললেন কেন কথাটা?

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। এ কি করছেন বুঝতে পারছেন না তিনি নিজেই। সব কথা ফাঁস ক'রে দিচ্ছেন তিনি নিজেই।

—বলছি গো বলছি। তুমি যে দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে কথা বলছো। কৃষ্ণকিশোর কথা বলেন বাহুপাশ দৃঢ় করতে-করতে।

—কত কাজ বাকী এখনও! আপনি খাবেন, বাড়ীর লোকজন খাবে, কাজ শেষ হ'তে অনেক দেরী এখনও। বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। চিবিয়ে-চিবিয়ে।

—আর তুমি? তুমি খাবে না?

—না, আমার আর খেতে ইচ্ছে নেই।

—কেন?

—কেন? কথার মাঝে হাসলো রাজেশ্বরী। দুঃখের হাসি। বললে, —আমার জন্তে ভাবছেন কেন? আমি তো কত খেলাম বাড়ী ফিরতেই।

—কখন? কে আবার তোমাকে খাওয়ালে?

—আপনিই তো খাওয়ালেন? পেট আমার ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আর খেতে ইচ্ছে নেই।

ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লেন কৃষ্ণকিশোর। ভাবলেন, কখন আবার তিনি খাওয়ালেন। কি খাওয়ালেন! বললেন,—আমি আবার কখন খাইয়েছি! কৈ, না তো। আমার তো মনে পড়ছে না।

—মনে নেই আপনার? নেশা করলে মানুষের কিছু মনে থাকে না। আপনি নেশা করেছেন কি না! রাজেশ্বরী কথা বলে বেপরোয়ার মত। ভয়লেশহীন কণ্ঠে।

কৃষ্ণকিশোর কথাগুলি শুনে ক্ষুব্ধ হ'লেন যেন কিঞ্চিৎ। খানিক নীরব থেকে বললেন,—কে বললে যে আমি নেশা করেছি? কথা বলতে বলতে বাহুবন্ধন শিথিল করলেন। বললেন,—বেড়াল আমার মেয়ে-মানুষের, তারই

বিয়ে দিচ্ছি। খরচা করছি হাজার পঁচিশেক টাকা। মানুষের বিয়েতেও চট ক'রে এত টাকা ব্যয় করে না।

—কেন? বললে রাজেশ্বরী। দুঃখের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বললে,—আমার ঠাগ্‌মাই তো লাখ খানেক টাকা খরচা ক'রেছে একটা আহাম্মুখ বাঁদরের বিয়েতে।

সজোরে বাহুর আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে গেল রাজেশ্বরী। ঘৃণা ফুটে উঠলো তার মুখে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটলো অবজ্ঞা।

—কবে আবার তিনি বাঁদরের বিয়ে দিলেন। জানি না তো আমি? কখনও তো বল'নি! বললেন কৃষ্ণকিশোর অদম্য কৌতূহলে।

—কেন? আমারই তো বিয়ে দিয়েছেন লাখ টাকা খরচা ক'রে। রাজেশ্বরী কথা বললে দীপ্ত কণ্ঠে। বেপরোয়ার মত।

—তোমার তা হ'লে বিয়ে হয়েছে একটা বাঁদরের সঙ্গে? আমি তা হ'লে—কথার মধ্যপথে থেমে গেলেন কৃষ্ণকিশোর।

—নিশ্চয়ই, বাঁদর তো ছার। তার চেয়েও যদি—

—মুখ সামলে কথা বলবে তুমি। বললেন কৃষ্ণকিশোর ক্রুদ্ধ স্বরে।—তুমি ভুলে যাচ্ছো যে কার সঙ্গে তুমি কথা ব'লছো?

—উঁহু, আমি তো আর মদ খাইনি যে বাজে কথা বলবো। আমি ঠিকই বলেছি। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যোগী হয় রাজেশ্বরী।

হুকুমের স্বরে কথা বলেন কৃষ্ণকিশোর। বলেন,—যাচ্ছো কোথা? দাঁড়াও। আমি যতক্ষণ না আসছি ততক্ষণ এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎ না ভেবে কথা বললে তার শাস্তিভোগ করতে হয়।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কৃষ্ণকিশোর। দ্রুতপদে।

রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে থাকে একা। ঘরের কড়িকাঠ গুণতে থাকে হয়তো।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হ'তে না হ'তে ফিরে আসেন কৃষ্ণকিশোর। তাঁর হাতে একটা নাতিবৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র। একটা রাইফেল বোধ হয়।

—ওটা আবার কি হ'বে? এত রাতে শিকারে বেরোবে নাকি? ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে কথা বললো রাজেশ্বরী।

—শিকার করতে বেরুতে হবে না। ঘরে ব'সেই শিকার করবো। কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুক দাগতে দাগতে বললেন। ক্রোধ এবং অপমানে কাঁপতে কাঁপতে বললেন।

—তামাসা রাখো এখন। বললো রাজেশ্বরী।—অনেক কাজ এখনও বাকী। তামাসা ভাল লাগে না এখন।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—তামাসা নয়, সত্যি সত্যিই শিকার করবো।

বন্দুক উঁচিয়ে ধরতেই আঁৎকে উঠলো রাজেশ্বরী। ভয়ে শিঁটিয়ে গেল যেন! ভীতিকাতর কণ্ঠে বললে,—ওগো, এ কি ক'রছো তুমি? হাত ফসকে যদি—

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—যা করছি ঠিকই করছি। তোমার মত স্ত্রী না থাকাই ভাল!

—কেন, আমি কি করেছি? ওগো, বন্দুক রেখে দাও তুমি। তোমার পায়ে পড়ছি আমি। আর কখনও এমন কথা মুখে আনবো না আমি। এইবারটির মত ক্ষমা কর' তুমি! রাজেশ্বরীর কথায় অন্তরের মিনতি। কাঁদো-কাঁদো স্বর যেন।

—ক্ষমা আমি কাউকে করি না। ক্ষমা করতে আমাকে কেউ শেখায়নি। কৃষ্ণকিশোর কথা বলেন জোরালো স্বরে।

গুড়ুম!! গুড়ুম!!

প্রথম কার্তুজটা ফসকে যায়। দেওয়ালে বিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় কার্তুজ বিঁধে যায় রাজেশ্বরীর কণ্ঠে। রক্তধারা গড়াতে থাকে। কি যেন বলতে গিয়েছিল সে। বলা হয় না। মুখ থেকে কথা বেরোয় না আর।

গুড়ুম!! গুড়ুম!!

আবার দু'টো আওয়াজ। দু'টি কার্তুজ দেগে বোধ করি তৃপ্ত হন না

কৃষ্ণকিশোর। তাই আরও দু'বার ট্রিগার টানলেন। একটি লাগলো রাজোর ডান বাহুতে। অপরটি লাগলো বুকের ঠিক মধ্যস্থলে।

মূলচ্যুত বৃক্ষের মত ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যায় রাজো। ছট-ফট করতে থাকে। কি এক অসহ্য কষ্টে যেন কাৎরাতে থাকে। গোঁঙানির শব্দ পাওয়া যায় রাজোর মুখ থেকে। আয়ত চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় যেন।

গুলীর বিকট শব্দে গৃহের জনমানুষ ছুটে আসে। ঘরে প্রবেশ করতে কেউ সাহসী হয় না। দরজার বাইরে দালানে ভীড় জমায়। ঠক-ঠক কাঁপতে থাকে কেউ-কেউ। ভয়ে আর আশঙ্কায়।

কৃষ্ণকিশোর বন্দুকটা রেখে দেন ভূলুণ্ঠিতা রাজেশ্বরীর পাশে। রাজো তখন স্থির আর অচঞ্চল হয়ে গেছে। আহত স্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছে। মেঝেয় রক্তের ধারা বইছে। গাঢ় লাল রক্ত। বৌয়ের খুনখারাপি রঙের শাড়ীটা ভিজে যাচ্ছে।

—এ কি করলে তুমি? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো অনন্তরাম।

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। হাস্তমুখে বললেন,—আমি নয় অনন্তদা! ও নিজেই নিজেকে মেরেছে! আত্মহত্যা, সুইসাইড করেছে।

—আমাকে আর বোকা বানিও না তুমি! আমি তোমাকে খুব চিনি। বন্দুক বৌ পাবে কোত্থেকে শুনি? তুমি যে কতটা গোঁয়ার তা আর আমার জানতে বাকী নেই। অনন্তরাম কথা বলে সজল চোখে।

—যাও যাও, নিজের কাজে যাও তুমি। তিরস্কারের স্বরে বললেন কৃষ্ণকিশোর। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দালানের ভীড় ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে চললেন।

কান্নার একটা রোল উঠলো দালানে। কে কে যেন ডাক-ছেড়ে কাঁদতে থাকলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় মধ্য রাত্তে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। তারা আসে ঘোড়া ছুটিয়ে।

একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বোধ করি একজন ডেপুটি কমিশনার। আর তাঁর সঙ্গে কয়েক জন সার্জ্জেন। কমিশনার উপস্থিত হওয়া মাত্র সাক্ষাৎ করতে চাইলেন গৃহের মালিকের সঙ্গে। দেখতে চাইলেন নিহতকে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখেই বললেন,—আপনিই মার্ডার করেছেন?

—নাঃ, কে এ কথা বললে? কার কাছ থেকে শুনলেন?

—হামরা রিপোর্ট পেয়েছি। এখনই থানায় যেটে হবে আপনাকে। ডেপুটি কমিশনার বললেন অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে। সহকর্ম্মীদের বললেন,—হাতকড়া লাগাও টুমলোগ্।

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। বললেন,—লোহার হাতকড়া আমি প'রতে পারবো না। বড্ড লাগে যে! অপেক্ষা করুন। কথার শেষে ডাক ছাড়লেন,—কে আছে এখানে?

—আমি আছি হুজুর। হেড-নায়েব সাড়া দিলেন বৈঠকখানার বাইরে থেকে।

কৃষ্ণকিশোর সহজ স্বরে বললেন,—কাছারীর সিন্দুক থেকে সোনার হাতকড়াটা শীঘ্রি নিয়ে আসুন। দেরী হয় না যেন।

ডেপুটি কমিশনার বললেন,—আপনি কি ড্রিঙ্ক করেছেন? মদ খেয়েছেন?

—সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে সাহেব? সহাস্যে বললেন কৃষ্ণকিশোর।

—আলবৎ। হামরা এসেছি টোমাকে গিরিফ্তার করতে। রিপোর্ট নিতে। ডেপুটি কমিশনার কথা বললেন তাচ্ছিল্যের স্বরে। কথার শেষে হাতের জলন্ত পাইপ মুখে তুললেন। ধোঁয়ার জাল বিস্তার করলেন।

কৃষ্ণকিশোর যেন অনন্যোপায় হয়ে বললেন,—ড্রিঙ্ক আমি করি। অভ্যাস আছে। আজকেও খেয়েছি। লিখে নাও সাহেব।

—ঠিক বাত্ আছে। কথা বলতে বলতে আমার পকেট থেকে কাগজ আর পেন্সিল বের করলেন সাহেব। বললেন,—মার্ডার আপনিই করেছেন ?

—আমি ? সবিস্ময়ে বললেন কৃষ্ণকিশোর।—না সাহেব, না, আমি নয়। সুইসাইড কেশ। সে আত্মহত্যা করেছে। আমি কখনও আমার স্ত্রীকে খুন করতে পারি ? আমি ড্রিঙ্ক করেছি এই দুঃখে সে সুইসাইড করেছে। আমি খুন করেছি, তার সাক্ষী আছে কেউ ?

বাঁকা হাসি হাসলেন ডেপুটি কমিশনার। বললেন,—আলবৎ আছে। আপনার স্ত্রী গান্ পাবে কোথায় ? আপনার বাড়ীর লোকই সাক্ষী ভেবে।

—ঘরেই ছিল বন্দুকটা। টোটা-ভর্ত্তি বন্দুক। বললেন কৃষ্ণকিশোর। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে।

এমন সময়ে সোনার হাত-কড়াটা আনলেন হেড-নায়েব। সাহেব দেখে শুধু বিস্মিত হ'লেন না, যেন হতবাক্ হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—সাহেব, তোমার সাগ্‌রেদদের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বল'। কিছু কথা বলতে চাই আমি।

—অল্ রাইট। বললেন ডেপুটি। ইংরাজীতে কি যেন বললেন। তৎক্ষণাৎ পারিষদবর্গ ঘরের বাইরে চ'লে গেল। কতকগুলো বুটের শব্দ হ'ল খটাখট। ঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

—চল' সাহেব, তোমাকে একটা ঘর দেখাই। দেখে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। উঠে পড়'। আর দেরী ক'র না। কথা বলতে বলতে ফরাস ছেড়ে উঠলেন কৃষ্ণকিশোর।

ডেপুটিও উঠলেন। মশ্-মশ্ শব্দ উঠলো। জুতোর শব্দ। চললেন হত্যাকারীর পিছু-পিছু।

এ-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে, অনেকগুলো দালান অতিক্রম ক'রে চললেন। সিঁড়ি ভাঙলেন।

কৃষ্ণকিশোর অন্দরের দোতলার একটি ঘরের সমুখে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন,—এই যাঃ, ঘরের চাবিটা আনতে ভুলে গেছি। অপেক্ষা কর' সাহেব। ডাক ছাড়লেন তিনি,—ওরে কে আছিস্?

একজন তাঁবেদার কাছাকাছি কোথায় ছিল। দৌড়তে দৌড়তে এসে উপস্থিত হ'য়ে কুর্নিশ ক'রে বললে,—হুকুম হুজুর।

—এই ঘরের চাবিটা নে আয় কাছারী থেকে। ছুটে যাবি। দেরী করবি না। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

রাত্রি কত কে জানে! অন্যান্য দিন কোন আলো এমন সময়ে জ্বলে না। নিবে যায়। গভীর রাত্রি যে! ঘড়ি-ঘরে কখন তিনটে বেজে গেছে।

—ডেড্-বডি এই ঘরে আছে? শুধোলে ডেপুটি।

—না সাহেব, না। যা আছে, দেখলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

চাবি এনে হুজুরের হাতে তুলে দেয় তাঁবেদার। সেলাম করতে করতে পিছু হ'টে যায়।

—যাস্ কোথায়? বললেন কৃষ্ণকিশোর।—একটা মশাল নে আয়। ছুটে যা। সিঁড়ির মশালটাই নে আয় আপাততঃ।

মশাল আনে তাঁবেদার। মুহূর্ত্তের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে চ'লে যায়।

সাহেব তো দেখে হতবাক্। পাশাপাশি ঘড়া। অনেকগুলো। পাশাপাশি সিন্দুক। অনেকগুলো।

একটা একটা সিন্দুক খোলেন কৃষ্ণকিশোর।

চোখ বড় ক'রে দেখে সাহেব। সোনা, রূপো আর হীরা জহরৎ।

দেখে যেন থ' হয়ে যায়। পাইপ টানতে টানতে দেখে। তার চোখে লোভ আর লোলুপতা।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—যা চাইবে তাই পাবে সাহেব। কিন্তু লিখে নিতে হবে সুইসাইড কেশ।

কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলো ডেপুটি কমিশনার। অনেক ভেবে বললে,—বেশ কথা। টাই হবে। But, আমি এখন কিছু নেবো না। পরে একদিন আসবো, এসে নিয়ে যাবো। কিন্তু কেউ যেন না জানটে পারে।

সহাস্যে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—শুধু তুমি আর আমি। কেউ জানবে না। ভগবানও নয়।

—অল্ রাইট। বললে ডেপুটি নিশ্চিন্ত হয়ে। বললে,—ডেড্-বডি বের ক'রে দাও বাড়ী ঠেকে। দেরী ক'র না। দেরী করলে লোক-জানাজানি হয়ে যাবে। আমি লিখে দিচ্ছি সুইসাইড কেশ। But, বডি নিয়ে যাওয়ার সময় যেন চীৎকার করে না কেউ। খুব সাবধান!

সানন্দে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—এক্ষুণি ডেড্-বডি চ'লে যাবে। তোমার কোন' চিন্তা নেই। তবে যতক্ষণ না ডেড্-বডি যায় তোমাকে সাহেব থাকতে হচ্ছে যে!

—বেশ কথা। হামি ঠাকবো।

—চল' তোমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে আসি আগে। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

তখন শেষ-রাত্রি।

একটি শবদেহ বহন ক'রে নিয়ে যায় কয়েক জন লোক। নীরব শোক-শোভাযাত্রা।

রাজেশ্বরী রাজ্যেশ্বরী সেজে ঘুমন্ত অবস্থায় লোকান্তরের পথে যাত্রা করে। বাড়ীতে একটা চাপা কান্নার রোল ওঠে। গলা ফাটিয়ে কাঁদে

[illegible] একেলাকেশী। সে-ই শিশু[illegible] থেকে যে হাতে ক'রে মানুষ করেছে রাজেশ্বরীকে!

কালো আকাশ! পাতালের মতই বোধ করি কালো আকাশ! আঁধার, আঁধার, আঁধার! আকাশ পাতাল! কলকাতায় মানুষ আছে কি নেই বোঝা যায় না।

পূর্ণশশী শুধু সেই রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে পুকুর-ঘাটে নামছিলেন স্নান করতে! তিনিই যে স্বহস্তে সাজিয়ে দিয়েছেন রাজোকে! লালে লাল ক'রে দিয়েছেন রাজোকে সিঁদুর আর আলতায়। সুগন্ধ ঢেলে দিয়েছেন রাজোর অঙ্গে। ৪৭১১ সেণ্টের পুরা শিশিটা।

পুকুর-ঘাটে নেমে কেমন যেন গা ছম-ছম করে পূর্ণশশীর!

চতুর্দ্দিক দেখেন ভয়ে-ভয়ে। দেখেন আঁধার, আঁধার, আঁধার! আকাশ পাতালের মতই কালো হয়ে আছে!

আকাশ-পাতাল!